ভারতের শাসনব্যবস্থা

(INDIAN CONSTITUTION)

[বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত]

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ

সুব্রত গুপ্ত
(যোগমায়া দেবী কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
এ. সেনগুপ্ত

এস গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স
৫৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
আর. গুপ্ত
এস্ গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স
৫৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৫
তৃতীয় সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৭
চতুর্থ সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৮
পঞ্চম সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৬৯

মুদ্রাকর :
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

মূল্য—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে বইটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিমার্জিত করা হইয়াছে, এবং বহু নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। গত একবছরে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক এবং বিধানসভার স্পীকারের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা ছাড়াও কতিপয় রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্পর্কের দিকটিও নূতনভাবে বিবেচিত হইতেছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর হইতেই বিভিন্ন রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে দল-ত্যাগের একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যাইতেছে এবং ইহাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি কিছু পরিমাণে দুর্বল হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত যে বিধান আছে, তাহা সংশোধন করিবার অধিকার যাহাতে পার্লামেণ্টের থাকে সেজন্য পার্লামেণ্টে সম্প্রতি যে বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বইয়ের বর্তমান সংস্করণে উপরোক্ত সমুদয় বিতর্কমূলক বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি, এবং এই আলোচনা কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহা পাঠক-পাঠিকাগণই বিবেচনা করিবেন। ১৯৬৯ সালের বি. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশ্নপত্রের সব উত্তর বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ তুলিয়া দেওয়ার জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি বিল সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়েও বইটির শেষে "বিশেষ অনুশীলনীতে" বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নপত্রগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং উত্তর-সংকেত দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হয় তাহার কয়েকটি নমুনা "বিশেষ অনুশীলনী" হিসাবে একটি পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। বইটির পরিমার্জনা কাজে আমরা শ্রীপূর্ণপ্রসাদ সেনগুপ্তের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি; তবে তাহা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেনা। শ্রীগোপাল মল্লিক প্রুফ সংশোধনের কাজে সহায়তা করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির ন্যায় বর্তমান সংস্করণটিও যদি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

সুব্রত গুপ্ত

এ. সেনগুপ্ত

কলিকাতা
১লা বৈশাখ ১৩৭৬

ভারতের শাসনব্যবস্থা

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রশ্নপত্র

———

প্রথম অধ্যায় | ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশ (Evolution of the Democratic System in India)

সাইমন কমিশনের মতে ১৯১৯ সালের পূর্বে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজের উপর শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব এবং ভারত সরকারের সমুদয় কার্যাবলীর জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টের চূড়ান্ত দায়িত্ব। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা না থাকিত তবে বৃটিশ পার্লামেণ্টের পক্ষে ইহার চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকর করার পথে অসুবিধার সৃষ্টি হইত।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয় Regulating Act-এর আমল হইতে, এবং ১৮৩৩ সালের Charter Act কার্যকর হইলে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চূড়ান্তরূপে দেখা যায়। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত শাসনবিভাগ এবং আইন প্রণয়ন বিভাগ একত্রিত ছিল। ১৮৩৩ সালের আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের পরিষদের শাসন সংক্রান্ত এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা টানা হয়। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে পরিষদকে সাহায্য করিবার জন্য একজন আইন সচিব নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপর একজন বিচারপতি, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রাদেশিক পরিষদ হইতে চারজন সদস্যকে কেন্দ্রীয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের এই সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ছিল আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকদের সাহায্যে আইন প্রণয়নকে বাস্তব ও আঞ্চলিক স্বার্থসম্মত করা। ১৮৬১ সালে Indian Council Act অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের পরিষদকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়। তাহা ছাড়া গভর্নর জেনারেলকে ছয় মাসের মেয়াদী জরুরী অবস্থা জারী করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই আইন অনুযায়ী বোম্বাই এবং মাদ্রাজ পরিষদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করা হয় এবং গভর্নর কর্তৃক মনোনীত এডভোকেট জেনারেলকে আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যদিও আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় ছিল তবুও শাসনবিভাগের কাজ এবং আইনপ্রণয়নের কাজের মধ্যে সীমারেখা যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকর হইয়াছিল। তবুও আমরা মনে রাখিব যে এই পরিষদকে কখনই পার্লামেণ্টের প্রতিভূ হিসাবে গণ্য করা যাইত না। কিন্তু স্যার চার্লস লর্ড ১৮৬৩ সালের বিলটি পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিবার সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতে তখন প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ গঠন

১৮৩৩ সালের Charter Act

১৮৬১ সালের Indian Council Act

করা অসম্ভব ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "I am sure that every one who considers the condition of India will see that it is wholly impossible to constitute a representative body......to talk of native representation is to talk of that which is simply and utterly impossible."

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন দাবি উঠে নাই। ভারতের শাসনব্যবস্থা যে গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন।

১৮৯২ সালে Indian Council Act বা ভারতীয় পরিষদ আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুযায়ী ভারতীয় আইন পরিষদের বে-সরকারী সদস্যদের মনোনয়ন করিবার অধিকার পায় বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স (Bengal Chamber of Commerce) এবং প্রাদেশিক আইনপরিষদগুলি।

১৮৯২ সালের Indian Council Act

আবার প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির বে-সরকারী সদস্যদের মনোনয়ন করিবার অধিকার পাইল কতিপয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যেমন......বিশ্ববিদ্যালয়, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, এই আইন অনুযায়ী আইন পরিষদগুলি সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বাৎসরিক হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার এবং শাসন কর্তৃপক্ষকে কোন কিছু প্রশ্ন করিবার অধিকার পাইল।

ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্বমূলক করিবার প্রথম প্রয়াস হইতেছে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার (Morley Minto Reforms)। লর্ড মর্লি ছিলেন তদানীন্তন ভারতসচিব এবং লর্ড মিণ্টো ছিলেন তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। মর্লি-মিণ্টো সংস্কার ১৯০৯ সালের ভারতীয় শাসন পরিষদ আইনে রূপ পরিগ্রহ করে। এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিদ্রোহের সম্ভাবনা এবং সন্ত্রাসবাদকে দাবাইয়া রাখা। এই আইন প্রকৃতপক্ষে ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহে নাই। ইংলণ্ডে হাউস্ অফ্ লর্ডসে যখন এই বিলের দ্বিতীয় পাঠ হয় তখন লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন, "If I were attempting to set up a parliamentary system in India, or if it could be said that this chapter of reforms led directly or necessarily upto the establishment of a parliamentary system in India, I, for one, would have nothing to do with it." শুধু আইন প্রণয়ন এবং শাসন সংক্রান্ত কাজে কতিপয় প্রতিনিধিত্বমূলক ভারতীয়কে গ্রহণ করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য। মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচনকেন্দ্র গঠন এবং

নির্বাচনের ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান করাকে কখনই পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রয়াস হিসাবে অভিহিত করা যাইতে পারে না। ইহার আড়ালে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া সর্বনাশা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে ভারতের বুকে আসন প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়া। এই আইনে পুরস্কৃত হইয়া মুসলমান সমাজের একটি বিরাট অংশ ভারতের জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায় এবং লর্ড মিণ্টোও স্বদেশে এইজন্য অভিনন্দিত হইলেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতার সৃষ্টি হইল এবং সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হইল। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়ে যে মাত্র ১৯০৬ সালেই ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যেই সেই দল সর্বভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিজয়কেতন উড়াইবার সুযোগ পায়।

১৯০৯ সালের আইনে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি

১৯০৯ সালের আইনে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে নির্বাচিত বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো হইল এবং ইহাতে সরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দূর হইল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় পরিষদে তখনও সরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন (Government of India Act, 1919): মর্লি-মিণ্টো সংস্কার ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাংখাকে সার্থক করিতে পারিল না। ইহার পর ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার আইন প্রণীত হয়। ১৯১৭ সালে শ্রীমতী এনি বেসান্তের নেতৃত্বে ভারতে হোম্ রুল (Home rule) আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই সময়ে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদের আন্দোলনও খুব প্রবল হইয়া উঠে। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংলণ্ডকে প্রচুর সাহায্য করে এবং ইংলণ্ডের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করে। ভারতের রাজনৈতিক পটভূমির এই পরিবর্তনের মুহূর্তে ইংলণ্ডের সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট পার্লামেণ্টে তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু (Mr. Montague) সেই নীতি ঘোষণা করেন।[১] এই

১। মিঃ মণ্টেগু এই নীতি ঘোষণা করিবার সময় পার্লামেণ্টে বলেন "The policy of His Majesty's Government, with which the Government of India is in complete accord, is that of the increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual developmenf of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire.........

নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি অ-দায়িত্বশীল সরকারকে ক্রমশঃ দায়িত্বশীল সরকারে পরিণত করা এবং ইহার মাধ্যম হিসাবে স্বয়ং-শাসিত সংস্থাগুলির উন্নয়ন করা। এই নীতির পরিণতি হিসাবে ১৯১৯ সালে ভারত সরকার আইন প্রণীত হয়।

১৯১৯ সালের আইনের পটভূমি

১৯১৯ সালের আইনটির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল; একটি হইতেছে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় দ্বৈতশাসনের প্রবর্তন, এবং অপরটি হইতেছে ভারতীয় আইনসভাকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করিয়া গঠন করা। এই আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রথমত, প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসনের প্রবর্তন করিয়া সরকারকে দায়িত্বশীল করা। অবশ্য ইহাতে গভর্নর জেনারেলের নিকট গভর্নরের দায়িত্বকে খর্ব করা হয় নাই। শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ছিল।

দ্বৈত-শাসনের প্রবর্তন

প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে আবার হস্তান্তরিত (transferred) এবং সংরক্ষিত (reserved), এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ব্যাপারে গভর্নর তাঁহার মন্ত্রিদের সাহায্যে শাসন কাজ নির্বাহ করিতেন। মন্ত্রিগণ অবশ্য আইন পরিষদের নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতেন এবং আইন পরিষদের সদস্যগণের মধ্যেও শতকরা ৭০ জন থাকিতেন নির্বাচিত সদস্য। এইভাবে দায়িত্বশীল সরকারের কর্মক্ষেত্র শুধু মাত্র অল্পসংখ্যক হস্তান্তরিত বিষয়গুলির সম্পর্কে সীমিত ছিল। অপর দিকে সংরক্ষিত বিষয়গুলি সংক্রান্ত শাসনকার্য গভর্নর তাঁহার শাসন পরিষদের (Executive Council) সাহায্যে নির্বাহ করিতেন এবং শাসন পরিষদকে এইজন্য আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকিতে হইত না। এইভাবে গভর্নরের সাহায্যকারী একদিকে ছিল একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা এবং অপরদিকে ছিল একটি অদায়িত্বশীল শাসন পরিষদ। গভর্নর শাসন পরিষদের সহযোগিতায় যে কাজগুলি করিতেন সেইগুলি ছিল ভারত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ। অপর দিকে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার সহযোগিতায় গভর্নর যে কাজগুলি করিতেন সেইগুলি ছিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ।

হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত, সরকারের ক্ষমতার এই দুই প্রধান বিভাগ

Progress in this policy can only be achieved by successive stage. The British Government and the Government of India, on whom the responsibility lies for the welfare and advancement of the Indian people, must be the judges of the time and measure of each advance, and they must be guided by the co-operation received from those upon whom new opportunities of service will thus be conferred and by the extent to which it is found that confidence can be reposed in their sense of responsibility".

দ্বিতীয়ত, হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিষয়গুলির শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে কখনই কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় নাই। তবে সব প্রদেশেই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রদেশের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, বিচার বিভাগ এবং অর্থদপ্তর সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে ব্যয়বরাদ্দের বাঁটোয়ারা প্রভৃতি কাজ গভর্নর নিজেই করিতেন। এইভাবে সরকারের দায়িত্বকে দ্বিধা-বিভক্ত করিবার পরিণতি ছিল দায়িত্ববোধকে বিনষ্ট করা, এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্র ছিল নয়টি প্রদেশেই হস্তান্তরিত বিষয় ; কিন্তু ভূমিরাজস্ব, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ ছিল সংরক্ষিত বিষয়। অথচ এই বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু দায়িত্বের বাঁটোয়ারা হইবার দরুণ এই দপ্তরগুলির কাজ কখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইত না।

হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত বিষয়গুলি শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব

তৃতীয়ত, প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা ও কাজকে আরও ব্যাপক করা হয়। প্রদেশের শান্তি-শৃংখলা যাহাতে বজায় থাকে এবং একটি সরকার যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে সেইজন্য আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিকে দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পূর্বে আদায় করিয়া প্রাদেশিক আইনসভা এমন কোন বিষয়ে আইন করিতে পারিত যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম-পরিধির মধ্যে পড়ে। আবার প্রাদেশিক সরকারের বাৎসরিক রাজস্ব ও ব্যয়বরাদ্দের হিসাব প্রাদেশিক আইনে পরিষদের কাছে পেশ করিতে হইত যদিও আইন পরিষদ এই ক্ষেত্রে কোন ভোট প্রদান করিতে পারিত না।

চতুর্থত, প্রদেশে কোন কারণে জরুরী অবস্থা চলিলে গভর্নর প্রয়োজনীয় অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া, প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা, ইহা বজায় রাখা এবং ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতাও গভর্নরের ছিল। যদিও আইন পরিষদের মেয়াদ ছিল তিন বৎসর, তবুও গভর্নর ইচ্ছা করিলে ইহার মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারিতেন। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে (bill) সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া গভর্নরের ইচ্ছাধীন ছিল এবং প্রয়োজনবোধে তিনি যে কোন বিলে নিজে সম্মতি প্রদান না করিয়া ইহা গভর্নর জেনারেলের বিবেচনার জন্য পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। প্রদেশে কোন শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে গভর্নর ইচ্ছা করিলে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক আইন পরিষদের উপর গভর্নরের ক্ষমতা

প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে ১৯১৯ সালের আইনের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি

ছিল। দ্বৈতশাসন প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড (Prof. Coupland) লিখিয়াছিলেন, " The new constitution (i. e., the Act of 1919) failed to fulfil its authors' primary purposes. It did not provide a training in parliamentary responsible government and it did not bring about a subordination of communal allegiance and antagonism to the common pubic interest."[২] দ্বৈতশাসনের এই ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে ভারতবর্ষে এই প্রথম প্রাদেশিক সরকারগুলি শাসনসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা পায় এবং এই প্রথম ভারতের শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ (devolution) আরম্ভ হয়। সর্বশেষে, ১৯১৯ সালের আইনের আরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ভারতীয় আইন পরিষদ (The Indian Legislature) এই আইন অনুযায়ী পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় আইন পরিষদের কাছে কোন কাজের জন্য দায়ী থাকিতেন না। গভর্নর জেনারেল তাঁহার শাসন পরিষদ সহ ভারত-সচিবের মাধ্যমে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের কাছে নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিতেন। যদিও শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় আইন পরিষদের বিশেষ কোন হাত ছিল না, তবুও এই সর্বপ্রথম ভারতীয় আইন পরিষদকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট (bicameral) করা হয়। ইহার উচ্চকক্ষের নামকরণ করা হয় Council of States এবং ইহার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৬০ জন। এই ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ৩৪ জন ছিলেন নির্বাচিত সদস্য। আইন পরিষদের নিম্নকক্ষের নামকরণ করা হয় আইনসভা বা Legislative Assembly। ইহার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ১৪৪ জন এবং তাঁহাদের মধ্যে ১০৪ জন ছিলেন নির্বাচিত সদস্য। অর্থ-সংক্রান্ত বিলে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা শুধু নিম্নকক্ষকে দেওয়া হয়; ইহা ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান ছিল। নির্বাচিকমণ্ডলী এই আইনেও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হইত এবং মর্লি-মিণ্টো নীতিকে এই-ক্ষেত্রে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

১৯১৯ সালের আইনের ত্রুটিবিচ্যুতি

১৯১৯ সালের শাসনসংস্কার ভারতবাসীদের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত না করিতে পারায় ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যদিও এই আইনে সরকারী ক্ষমতার তথাকথিত বিকেন্দ্রীকরণ হইয়াছিল, তবুও শাসন পরিষদ সমেত গভর্নর জেনারেলই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শাসন তান্ত্রিক কাঠামোর চাবিকাঠি, এবং তাঁহার মাধ্যমে ভারত সচিবও

১৯১৯ সালের আইনের সমালোচনা

২। Reginald Coupland, India, a Restatement p. 121.

চূড়ান্তভাবে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টই ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক হইয়াছিল। জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছিল দ্বৈত-শাসনের প্রবর্তনের জন্য। একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং অপরদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 'স্বরাজ্য-দল' গঠন করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। ১৯২৯ সালে শ্রীজহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানায়। জনসাধারণের এই অসন্তোষের তীব্রতা বুঝিতে পারিয়া ইংরাজ সরকার স্যার জন্ সাইমনের (Sir John Simon) নেতৃত্বে শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ইংলণ্ডে একটি গোলটেবিল বৈঠকে (Round Table Conference) আলোচিত হয়। ইহাতে বৃটিশ সরকারে প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই বৈঠকের অধিবেশনের পর একটি শ্বেত পত্র বা White Paper তৈয়ারী করা হয় এবং তাহা বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও ভারত সরকারের একটি যৌথ সিলেক্ট কমিটি দ্বারা ১৯৩৪ সালে পরীক্ষিত হয়। এই পরীক্ষার পরিণতি স্বরূপ ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের (The Government of India Act, 1935) খসড়া প্রস্তুত হয়।

সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক এবং ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন সৃষ্টি

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award): ১৯১৯ সালের আইন প্রবর্তিত হইবার পর হইতেই সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অভিশপ্ত করে। ১৯৩২ সালেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড (Mr. Ramsay Macdonald) এই অজুহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা মুসলমান এবং অ-মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন যে এই দুইটি সম্প্রদায় কিছুতেই ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিতেছে না। এখন হইতে কোন রাজনৈতিক চুক্তি বা বোঝাপড়ার পূর্বে এই দুইটি ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বোঝাপড়াকে অবশ্য পূরণীয় সর্ত করা হইল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন যে শুধু মুসলমান এবং অ-মুসলমানের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক বাঁটোয়ারা করিয়াছিল, তাহা নহে, এই আইন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয়, ভারতীয় ক্রিশ্চিয়ান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও—সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করিয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতে ইহা ছিল বৃটিশ কূটনীতির ঐতিহ্য (a legacy of British diplomacy)। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভারতের মুক্তি-

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং ইহার অভিশাপ

সংগ্রামে ফাটল ধরাইয়াছিল, ভারতীয় ঐক্যকে শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সর্বোপরি দেশমাতৃকার অঙ্গহানির উপযুক্ত পরিবেশ গঠনে সাহায্য করিয়াছিল। বৃটিশ রাজনীতির এই কূটনৈতিক চালের ফাঁদে যদি ভারতবর্ষ না পড়িত তাহা হইলে আজ হয়ত ভারত বিভাগ হইত না।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন ঃ ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি যথা—(ক) সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি, (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বৈত-শাসনের প্রবর্তন এবং (গ) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন ও দায়িত্বশীল সরকার গঠন করিবার সুযোগ প্রদান। আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহার পূর্বে যতগুলি শাসনসংস্কার আইন প্রবর্তিক হইয়াছিল, সবগুলিই চূড়ান্তভাবে একটি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল। এই দিক হইতে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন একটি ব্যতিক্রম। ১৯৩৫ সালের আইনে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব কয়া হয় তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইউনিট বা মূল রাজ্য হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে কিনা তাহা তাহাদের ইচ্ছাধীন ছিল, এবং যেহেতু দেশীয় রাজ্যগুলি কখনই এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে নাই, সেইজন্য ১৯৩৫ সালের প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কখনই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে নাই। এই প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অন্যতম সর্ত ছিল যে ভারতের দেশীয় রাজ্য গুলির মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেক জনসংখ্যা সমন্বিত কয়েকটি রাজ্য যদি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চাহিত, তবেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইত ; কিন্তু সেই সমর্থনও দেশীয় রাজ্যগুলির নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে উড়িষ্যা এবং সিন্ধু দুইটি আলাদা প্রদেশের সৃষ্টি করিয়া মোট প্রদেশের সংখ্যা রাখা হয় এগার।

প্রাদেশিক সরকারগুলির মর্যাদা সমান ছিল না

প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল মূল প্রদেশগুলির মধ্যে দর্শনীয় বৈষম্য ; বিভিন্ন প্রদেশের আয়, জনসংখ্যা, অর্থ নৈতিক সম্পদ, সরকারী মর্যাদা এবং ক্ষমতার মধ্যে কোন সমতা ছিল না। একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র সকল মূল রাজ্যের মধ্যেই মর্যাদার সমতা থাকা উচিত ; কিন্তু, ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে সেই সমতা সম্পর্কিত কোন বিধান ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা এবং যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিতে পারিত এবং প্রাদেশিক তালিকা-

ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারগুলি আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, একটি লিখিত শাসনতন্ত্র এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রভৃতির বিধান প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে ছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন

যদিও প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করে নাই তবুও ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বিভিন্ন প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন হয় এবং দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষ গভর্নর এবং মন্ত্রিসভাকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য গভর্নরকে এমন একজনকে আহ্বান করিতে হইতে যাহার উপর আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশ্বাস আছে। আইন সভার নিকট যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠন করিতেন; অর্থাৎ, মন্ত্রিদের নিজেদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতে হইত এবং যদি কখনও প্রাদেশিক আইনসভা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অথবা কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিত তবে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইত। মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সময় প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখিতে হইত যেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণও মন্ত্রিসভায় যথোপযুক্ত স্থান পান। ১৯৩৫ সালের আইনের ৫২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাদেশিক গভর্নরের নিম্নলিখিত বিশেষ দায়িত্ব ছিল—(১) প্রদেশের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে এই রকম যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিপদ বা বিপদের আশংকার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (২) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ করা, (৩) সরকারী কর্মচারীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা, (৪) ব্রিটিশ প্রজাদের বিপক্ষে শাসন-সংক্রান্ত কাজে কোন তারতম্যের প্রতিবিধান করা, (৫) বহির্ভূত অঞ্চলগুলির (excluded areas) শান্তি সুরক্ষিত রাখা, (৬) রাজ্যের শাসকদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা বজায় রাখা এবং (৭) গভর্নর জেনারেলের আদেশ বা নির্দেশকে কার্যকর করা। তাহা ছাড়া, যদি গভর্নর মনে করিতেন যে একটি সশস্ত্র ষড়যন্ত্রের দ্বারা একটি প্রদেশের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে, তবে তিনি যে কোন মন্ত্রীর কার্যভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারিতেন। 'গভর্নরের আইন' এই মর্মে তিনি অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিতেন এবং কোন আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিতেন। সর্বশেষ পর্যায়ে কোন প্রদেশে কোন শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে গভর্নর সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের সমুদয় কার্যভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারিতেন। গভর্নরের এই সংরক্ষিত ক্ষমতাগুলির সমালোচনা করিয়া জনৈক উদারপন্থী নেতা মন্তব্য করিয়াছিলেন,

গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব

"Responsibility was buried in a pile of reservations, safeguards and directions."[৩] অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে গভর্নরের কতিপয় সংরক্ষিত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

প্রাদেশিক আইনসভা

বাংলা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং আসামে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সৃষ্টি করা হয়। এই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভার উচ্চকক্ষগুলিকে বলা হইত আইন পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্ন কক্ষগুলিকে বলা হইত ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly)। অন্যান্য প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক আইনসভার একটিই কক্ষ ছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রিদের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হইতে হইত। যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার নিজপদে অধিষ্ঠিত হইবার সময় আইন সভার সদস্য না থাকিতেন তবে মন্ত্রী হইবার ছয়মাসের মধ্যেই তাঁহাকে আইনসভার সদস্য হইতে হইত।

কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বৈত-শাসন ও গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বৈত-শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনসংক্রান্ত সমুদয় ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার ক্ষমতা আবার দুই-ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ব্যপার, ধর্মীয় ব্যাপার এবং উপজাতি অঞ্চলের শাসনকাজ গভর্নর জেনারেল নিজের ইচ্ছাধীনে তাঁহার উপদেষ্টাদের সাহায্যে (In his direction with the help of the councillors) নির্বাহ করিতে পারিতেন। এই উপদেষ্টাগণকে নিযুক্ত করিতেন গভর্নর জেনারেল নিজেই, এবং তাঁহার আইনসভার কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতেন না। (২) উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে গভর্নর জেনারেলকে তাঁহার মন্ত্রিদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে হইত এবং মন্ত্রিরাও তাঁহাদের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতেন। কিন্তু এইক্ষেত্রেও ইহা লক্ষ্য করার মত যে গভর্নর জেনারেল যদি মনে করিতেন যে কোন একটি ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ দায়িত্বগুলির (special responsibilities) মধ্যে কোনও একটি জড়িত আছে, তবে তিনি সেইক্ষেত্রে মন্ত্রিদের পরামর্শের বিরুদ্ধেও কাজ করিতে পারিবেন। 'বিশেষ দায়িত্বগুলির' ক্ষেত্রে পভর্নর জেনারেলকে ভারতসচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের কোন উপদেষ্টা অথবা কেন্দ্রীয় আইন-সভার কাছে দায়িত্বশীল কোন মন্ত্রিসভা কখনও গঠিত হয় নাই। পুরাতন

৩। চিন্তামণি এবং মাসানী লিখিত "India's Constitution at Work" বই হইতে উদ্ধৃত।

১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের যে শাসন পরিষদ (Executive Council) ছিল, তাহাই ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের পূর্ব পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিত। গভর্নর জেনারেলের বিশেষ দায়িত্বগুলি ছিল নিম্নরূপ—(১) ভারতবর্ষ অথবা ভারতবর্ষের যে কোন অংশের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে এই রকম যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিপদ বা বিপদের আশংকার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (২) যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক স্থায়িত্ব সুরক্ষিত রাখা, (৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ করা, (৪) সর্বভারতীয় চাকুরিগুলির বা সরকারী কর্মচারীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা, (৫) ইংলণ্ডের এবং ব্রহ্মদেশের কোন জিনিসের ভারতে অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে বাণিজ্যিক পক্ষপাতিত্ব প্রতিরোধ করা, এবং (৬) দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের অধিকার এবং মর্যাদা সুরক্ষিত রাখা।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং ইহার উপর গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ছিল। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা এবং সরকারের বাজেটে অনুমোদন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও ইহার ক্ষমতার কতিপয় সীমা ছিল; যেমন, (১) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে শুধু যে গভর্নর-জেনারেলই ভেটো (Veto) প্রদান করিতে পারিতেন তাহা নহে, ইংলণ্ডের রাজাও ইহাতে ভেটো (Veto) প্রদান করিতে পারিতেন, (২) যদি গভর্নর জেনারেল মনে করিতেন যে আইন পরিষদের কোনও আলোচনার সংগে তাঁহার কোন বিশেষ দায়িত্ব (special responsibility) সংশ্লিষ্ট আছে, তবে তিনি আইন পরিষদে সেই আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। (৩) আইন পরিষদের অধিবেশন না চলিতে থাকিলে গভর্নর জেনারেলের শুধু অর্ডিন্যান্স জারী করিবারই ক্ষমতা ছিল না, স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও ছিল তাহাতে তিনি তাঁহার বিশেষ দায়িত্বগুলির প্রতিপালন করিতে পারেন, (৪) গভর্নর জেনারেলের পূর্বসম্মতি ব্যতীত কোন বিল অথবা সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে উত্থাপন করা যাইত না। যদিও ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি ১৯৩৫ সালের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে নাই, তবুও ১৯৩৫ সালের আইনের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করিত।

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছিল; প্রথমত, বৈদেশিক ব্যাপার, মুদ্রা সম্পর্কিত ব্যাপার, নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী এবং

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন

বিমান বহর, লোক গণনা প্রভৃতি ব্যাপারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা করা হয়। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকেই দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, পুলিশ, প্রাদেশিক সরকারী চাকুরি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, কতিপয় বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়কেই আইন প্রণয়ন করিবার জন্য যুগ্ম ক্ষমতা দেওয়া হয়, যেমন, ফৌজদারী আইন, দেওয়ানী মামলা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিচার, প্রভৃতি। জরুরী অবস্থায় সৃষ্টি হইলে প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদে ছিল। তাহা ছাড়া, যদি দুই বা ততোধিক প্রাদেশিক আইনসভা ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ যে কোন প্রাদেশিক বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারিত।

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন প্রবর্তিত হইবার পর ভারতের অবস্থা ঃ ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হইল; কিন্তু এই আইনেও দেশবাসী সন্তুষ্ট হইল না। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল এবং একটি শাসনতন্ত্র তৈয়ার করিবার জন্য গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করিবার দাবি করিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত ইংরাজ সরকার কোনো প্রকারে এই দাবি ঠেকাইয়া রাখিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের তৎকালীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বুঝিতে পারিল যে ভারতের স্বায়ত্তশাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেইজন্য ভারতীয়দের নিজেদেরই একটি শাসনতন্ত্র গঠন করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে (Sir Stafford Cripps) ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষে পাঠাইবেন। ক্রিপ্‌স বৃটিশ সরকারের কতিপর প্রস্তাব লইয়া আসিলেন এবং এই যুক্তি দেখাইলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারতের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি একমত হয় তবেই এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইবে। তাঁহার প্রস্তাব ছিল ঃ (১) ভারতীয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে এবং এই গণপরিষদ ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে, (২) এই শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষকে বৃটিশ কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর মধ্যে একটি ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিবে। (৩) একটিই ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত

গণপরিষদ গঠনের দাবি এবং শাসনতন্ত্রের দাবি

ক্রিপস্ মিশন

হইবে এবং সমুদয় প্রদেশ ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ; কিন্তু, (৪) যদি কোন প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্য শাসনতন্ত্রটি গ্রহণ করিতে না চাহে, তবে ইহারা তৎকালীন নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা বজায় রাখিতে পারিবে এবং যোগদানে বিরত এই প্রদেশগুলি সম্পর্কে বৃটিশ সরকার আলাদা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

পাকিস্তান গঠনের দাবী

কিন্তু, এই সময়ে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ দাবি করিল যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতকে বিভাগ করিয়া আলাদা দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে, এবং একটি গণপরিষদের পরিবর্তে দুইটি আলাদা গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে। মিঃ জিন্নার এই দাবীতে কংগ্রেস ক্রিপ্স্ প্রস্তাব বর্জন করে। তাহা ছাড়া, ক্রিপ্সের চতুর্থ প্রস্তাবটিও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

"ভারত ছাড়" আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধী ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" (Quit India) আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন এবং যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া (কমিউনিষ্ট দল এবং মুসলিম লীগ ছাড়া) ভারতের জনসাধারণ এই আন্দোলনে সাড়া দিল। জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলেন এবং যুদ্ধ চলাকালে ইহার কোন সুরাহা হইল না। যুদ্ধ শেষ হইবার সংগে সংগেই ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে বৃটিশ সরকার পুনরায় বিচলিত হইল। একদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কোহিমা পর্যন্ত আসিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজ (Indian National Army) "দিল্লী চলো" অভিযান সুরু করিল। অপরদিকে ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা গেল। তাহা ছাড়া, জাতীয় নেতাগণ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াই পুনরায় পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সুরু করিলেন। ইহার পর ১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার ক্রিপ্স্, পেথিক লরেন্স প্রমুখ মন্ত্রিসহ তিনজন ক্যাবিনেট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল (Cabinet Delegation) ভারতে পাঠাইলেন। ক্যাবিনেট মিশন জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে একটি বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা করিলেন।

ক্যাবিনেট মিশন

ক্যাবিনেট মিশন মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবি এবং এইজন্য একটি আলাদা গণপরিষদ গঠন করিবার দাবী সমর্থন করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা যে প্রস্তাব দিলেন তাহাতে প্রকৃতপক্ষে মুসলীম লীগের দাবিগুলি মানিয়া লওয়া হইল। তাহাদের প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এইরূপ :—

(১) একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকিবে বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। অবশিষ্ট সমুদয় ক্ষমতা (residuary powers) থাকিবে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির হাতে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের একটি আইন প্রণয়ন ও একটি শাসনবিভাগ থাকিবে, এবং ইহা বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে। কিন্তু আইনসভায় যদি কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত এবং ভোট প্রদান করিতেছেন তাঁহাদের মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সমুদয় সদস্যদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত এবং ভোট প্রদান করিতেছেন তাঁহাদের মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সেই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে।

(৩) বিভিন্ন প্রদেশ নিজেদের শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ লইয়া দলবদ্ধ হইতে পারিবে এবং প্রতিটি সংঘবদ্ধ দলই নিজেদের সংগঠনের আওতায় আনা যাইতে পারে এই প্রকার প্রাদেশিক বিষয়সমূহ নির্ধারিত করিবে।

তাহা ছাড়া, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের তৃতীয় বিধানটি অর্থাৎ প্রদেশগুলির দলবদ্ধ হইবার বিধানটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল, এবং ইহার ব্যাখ্যা লইয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ হয়। বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে একটি ঘোষণায় মুসলিম লীগকে সমর্থন করিয়া বলিলেন যে যদি গণপরিষদে ভারতীয় জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব না থাকে তবে বৃটিশ সরকার দেশের অনিচ্ছুক অংশের উপর এই শাসনতন্ত্র জোর করিয়া চাপাইয়া দিবেন না। অর্থাৎ ইংরাজ সরকারের "Divide and Rule" নীতি পুনরায় ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইল। ইহার পরিণতি-স্বরূপ ১৯৪৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে গণপরিষদের অধিবেশন মুসলিম লীগের যোগদান না করা সত্ত্বে সুরু হইল। মুসলিম লীগ তখন গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার দাবি করিলেন। আবার ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করিলেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান নিশ্চয়ই হইবে এবং শাসন-কর্তৃত্ব তখন ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত করা হইবে। কিন্তু যদি এই সময়েব মধ্যে একটি সম্পূর্ণ প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ কাজ না করিতে পারে তবে বৃটিশ সরকারকে পুনরায় ভাবিতে হইবে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হইবে, না কিছু ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হইবে। ইংরাজদের নিকট হইতে এই প্রশ্রয় পাইয়া মুসলিম লীগ ইহার 'পাকিস্তান' দাবি আরও জোরদার করিল। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে ইংরাজ সরকার ঘোষণা করিলেন যে পাঞ্জাব এবং বাংলার আইনসভার সদস্যদের ভোটে স্থির হইবে যে এই দুইটি প্রদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইবে কিনা। তাহা ছাড়া উত্তর-

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে পুনরায় বিরোধ

দেশ বিভাগের প্রস্তুতি

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের সিলেট জেলায় গণভোটের দ্বারা স্থির হইবে তাহারা ভারত অথবা পাকিস্তান কোন্ দেশে যোগদান করিবে। এই ভোটপর্বের ফলাফল যে কি হইবে তাহা পূর্ব হইতেই সকলের জানা ছিল। ১৯৪৭ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের জন্য একটি আলাদা গণপরিষদ গঠন করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। কারণ ইতিমধ্যে ১৮ই জুলাই তারিখে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭) বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947): ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের দ্বারা ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের আইনটির প্রয়োগ সংশোধিত করা হয়। প্রথমত, এই আইনে ভারতের ক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব এবং দায়িত্বের অবসান হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষও আর ইংলণ্ডের অধীনস্থ একটি দেশ হিসাবে বিবেচিত হইবে না। দ্বিতীয়ত, এখন হইতে ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভারতের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হইবে না। তৃতীয়ত, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ হইতে পূর্বতন ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভারত এবং পাকিস্তান এই দুইটি ডোমিনিয়নে পরিণত হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুইটি দেশ নিজেদের শাসনতন্ত্র তৈয়ার করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটি দেশে ডোমিনিয়ন বৃটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশন্স্-এর সদস্য থাকিবে। চতুর্থত, এই দুইটি ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেলগণ এখন হইতে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজ করিবেন। এই আইন অনুমোদিত হইবার পূর্বে গভর্নর জেনারেল এবং গভর্নরগণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ ক্ষমতাগুলি (extra-ordinary powers of legislation) ভোগ করিতেন, সেইগুলি এখন হইতে তাঁহারা হারাইলেন। পঞ্চমত, যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়া ইহার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গণপরিষদই কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসাবে কাজ করিবে। সর্বশেষে, ডোমিনিয়ন আইনসভার (Dominion Legislature) বা কেন্দ্রীয় আইন সভার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য

যে গণপরিষদ ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিল তাহা প্রাদেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের (জনসংখ্যার ভিত্তিতে) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা হইবার কথা ছিল ২৯২ জন এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যগুলিকে সর্বোচ্চ সংখ্যা ৯৩ জন নির্বাচিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। প্রত্যেক প্রদেশেই মুসলমান, শিখ এবং এই দুইটি ব্যতীত অন্যান্য

গণপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন

সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে তাহাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বণ্টন করা হইল। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে হইলে উহা পরামর্শের ভিত্তিতে করা হইত। কিন্তু দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান এবং আসামের সিলেট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতীয় আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যা কমিয়া হয় ২৯৯। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর যখন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়, তখন ২৮৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা ইহাতে তাঁহাদের স্বাক্ষর প্রদান করেন।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস প্রায় দুই শতাব্দীর। এই শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের উলেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে Regulating Act., ১৮৩৩ সালের Charter Act., ১৮৬১ সালের Indian Council Act, ১৮৯২ সালের Indian Councils Act., ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো সংস্কার অনুযায়ী ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন, ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন এবং ১৯৩৫ সালের ভারত আইন। ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনে যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করা হয়, তবুও এই আইনে প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সব ব্যাপারেই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ১৯৩৫ সালের আইনের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ভারতে প্রবর্তিত না হইলেও এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে গণপরিষদ গঠিত হয় এবং ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী দেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পর প্রথমে ভারতবর্ষ ছিল একটি "ডোমিনিয়ন", ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র কার্যকর হয় এবং ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

Exercise

1. Give an outline of the administrative reforms in India from time to time. [বিভিন্ন সময়ে ভারতে যে প্রশাসনিক সংস্কার হইয়াছে তাহার একটি বিবরণী দাও।]

2. Examine the main provisions of the Government of India Act, of 1909 [১৯০৯ সালের ভারত সরকার আইনের বিধানগুলি পরীক্ষা কর।]

Or, Comment on the Morley-Minto Reforms of 1909.
(১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের উপর মন্তব্য কর)

3. Examine the main provisions of the Government of India Act of 1199. [১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনের প্রধান বিধানগুলি পরীক্ষা কর।

Or, Comment on the Montagu-Chamesford Reforms of 1919.
[১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের উপর মন্তব্য কর]

4. Critically discuss the main provisions of the Government of India Act,. 1935. [১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনের প্রধান বিধানগুলির একটি সমালোচনা-মূলক আলোচনা কর।]

5. Discuss the position and powers of the Governor-General of India under the Government of India Act, 1935.

[১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনে গভর্ণর-জেনারেলের মর্যাদা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

6. Trace the development of the circumstances leading to the partition of India. [যে অবস্থাগুলির পরিণতি হিসাবে দেশ-বিভাগ হইয়াছিল সেইগুলি আলোচনা কর।]

7. Discuss the main provisions of the Indian Iudependence Act, 1947. [১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইনের প্রধান বিধানগুলি আলোচনা কর]

8. Write notes on :—

(a) Morley-Minto Reforms, (b) Montagu- Chamesford Reforms, (c) Communal Award, (d) Cripps Proposals, (e) Indian Independence Act, 1947, (f) Constituent Assembly of India, (g) Cabinet Delegation in 1946.

পরিশিষ্ট

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন[১]

ভারতের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করার আগে আমাদের জাতীয় আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানা দরকার। কারণ ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্য এবং অভীপ্সাকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এই শাসনতন্ত্রের মধ্যে। হয়ত এই চেষ্টা সর্বাংশে সফল হয় নাই। তবুও ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং জাতীয় আন্দোলনের নানাদিক আলোচনা না করিলে আমাদের শাসনতন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবধারার প্রভাব ভারতের জাতীয় জীবনে নবযুগের সূচনা করে। ইংরাজরা প্রায় দুইশত বৎসর আমাদের শাসন করিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইংরাজ শাসনের পূর্বে ভারত যেমন বহুধা বিভক্ত ছিল, ইংরাজ শাসনে তাহা ছিল না। বিদেশী শাসনে আমরা একদিকে যেমন অত্যাচারিত হইয়াছি, অপরদিকে তেমনি আমরা নিজেদের চিনিতে শিখিয়াছি এবং বিদেশী শাসন হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাও চালাইয়াছি। জাতীয় এবং রাজনৈতিক ঐক্যের সৃষ্টির

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব

১। এই আলোচনা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নহে। শুধু ছাত্রছাত্রীগণের মনে যাহাতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয় সেইজন্য ইহা সংযোজিত হইল।

পিছনে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষতঃ ভারতের তিনটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান মোটেই কম নহে। ১৮৫৭ সালে ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার সুরু হয়, অপরদিকে তেমনি সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে দেশে নূতন রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতেও জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে।

রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

রাজা রামমোহন রায়কে ঐতিহাসিক স্পিয়ার (Spear) উনবিংশ শতাব্দীর ভারত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম "সৃজনী প্রতিভা" (Greatest creative genius) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন শুধু ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে এক নূতন জাতীয়তাবাদী ভারত গঠনের পুরোধা। রাজা রামমোহন যে নূতন জাতীয় চেতনার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার উপরই নির্ভর করিয়া ইউরোপীয়ান ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত "Young Bengal" পুরাতন অন্ধ কুসংস্কার হইতে যেমন শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে মুক্ত করিয়াছিল, তেমনই দেশপ্রেম এবং দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তাহাদের অনুপ্রাণিত করিয়া ঐক্য ও জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করিতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু রামমোহন এবং ডিরোজিওর প্রভাব ছিল শিক্ষিত ও যুব সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যিনি জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধের প্রেরণা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেশপ্রেমের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" সাধারণ মানুষকে নূতনভাবে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করিল। প্রকৃতপক্ষে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র ভারতীয়গণকে যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দিয়াছিল, অন্য কোন পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহার নজির পাওয়া কঠিন। তাহা ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ "কমলাকান্তের দপ্তর" এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, দেশপ্রেম প্রভৃতির আদর্শের প্রচার এবং শক্তিপূজার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল অসামান্য। দেশপ্রেমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত, কবি মাইকেল মধুসূদন এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন। রঙ্গলালের কবিতা "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়", জনগণের মনে এক নূতন ভাবাবেগের সৃষ্টি করে।

ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত "Young India"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র, এবং জাতীয়তাবোধ

ঈশ্বর গুপ্ত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান

তাহা ছাড়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কবিতাও জনগণকে দেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়াছিল। ১৮৬১ সালে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই মেলা জনগণকে দেশাত্মবোধের প্রেরণার উদ্বুদ্ধ করে। এই সময় ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থাকে আত্মসচেতন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন কামারপুকুরের নিরক্ষর ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ তেজোদীপ্ত শিষ্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)। অধ্যাত্মবাদের সহিত কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়, সর্ব ধর্ম সমন্বয়, দেশপ্রেমের আদর্শ, জাতীয়তার তীব্র ভাবাবেগ সৃষ্টি, নিঃস্বার্থ সেবকদলের সৃষ্টি, জনহিতকর কাজের মাধ্যমে দুঃস্থ আর্তের দুঃখ মুক্তির প্রয়াস—স্বামীজির এই শিক্ষা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক নূতন তরঙ্গ বহন করিয়া আনে যাহা ভারতের দেশপ্রেমিককে দিল সহিষ্ণুতা, বীর্য, নিষ্ঠা এবং এক নূতন দেশপ্রেম, যাহার প্রভাবে শত শত যুবক ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া গেল। 'হে ভারত! ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত,…ভুলিও না নীচ জাতি, মুর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"—স্বামীজির এই বাণী শত শত যুবককে নিঃস্বার্থভাবে সব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিতে প্রেরণা দিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধ

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগে কয়েকজন খ্যাতনামা ইউরোপীয় যেমন ১৮৮৮ সালে জর্জ ইউল, ১৮৮৯ সালে উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় সভাপতি ছিলেন শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার পর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীআনন্দমোহন ঘোষও জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ। এই পূর্ব সূরীদের প্রদর্শিত পথেই আমাদের জাতীয় আন্দোলন চলিতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেস প্রথমেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে নাই। প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ সরকারের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিয়া ভারতীয়দের কতিপয় সুযোগ এবং অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু অবস্থার পরিবতন হয় ১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত করিবার প্রস্তার করেন। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন তখন দেশে এক তুমুল

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং দেশপ্রেমের নূতন জোয়ার

আলোড়নের সৃষ্টি হইল। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল এবং ভারতীয় জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এক নূতন ভাবের জোয়ার আনিল। তাঁহার "বাংলার মাটি, বাংলার জল" কবিতা সৃষ্টি করিল এক নূতন জাতীয়তাবোধের। সেই সঙ্গে রজনীকান্ত সেনের, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এবং চারণকবি মুকুন্দদাসের গানও বাংলাদেশের মানস লোককে একটি পবিত্র পরিবেশে উত্তীর্ণ করিয়াছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসবে হিন্দু-মুসলমান এবং ধনী-নির্ধনের এক মিলন-সেতু রচিত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিণতি হিসাবে আরম্ভ হইল স্বদেশী আন্দোলন। যাহা স্বদেশী, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং যাহা বিদেশী তাহাই পরিত্যজ্য এই মনোভাব হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বিদেশী সামগ্রী বর্জন এবং স্বদেশী জিনিস ব্যবহার ও স্বদেশী শিক্ষার প্রচলন ছিল স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচী। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শত শত যুবক স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

স্বদেশী আন্দোলন

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত জাতীয় জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, বঙ্গবাসী, হিন্দু, লিডার ও মারাঠাকেশরী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি দেশাত্মবোধ এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের অবদান

স্বদেশী আন্দোলন চলাকালেই বাংলাদেশে চরমপন্থীগণ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আরম্ভ করেন। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ শহীদগণ এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ক্ষুদিরাম ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন বিসর্জন দেন এবং প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও আলীপুর বোমার মামলায় ধৃত হন। এই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আইন শাস্ত্রের প্রয়োগ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় শ্রীঅরবিন্দ ফাঁসির হাত হইতে অব্যাহতি পান।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসে একটি চরমপন্থী (Extremists) এবং একটি নরমপন্থী (Moderates) দলের সৃষ্টি হয়। তিলক, অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন চরমপন্থী দলের নেতা এবং দাদাভাই নৌরজী, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন নরমপন্থী দলের প্রধান। লালা রাজপৎ রায় ছিলেন চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা। ১৯০৭ সালে সুরাট

কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী এবং নরমপন্থী দলের মধ্যে মত পার্থক্য

কংগ্রেসে চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। নরমপন্থীগণ চাহিতেন ইংরেজদের সহিত আপোষ করিয়া চলিতে কিন্তু চরমপন্থীগণ তাহা মানিতে রাজী ছিলেন না। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, এই সময়ে তিলক এবং এনি বেসান্তের প্রচেষ্টায় যে Home Rule Movement আরম্ভ হয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাহা সমর্থন করেন।

হোমরুল আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে দুইজন নেতা ভারতের রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মহাত্মা গান্ধী। ১৯১৯ সালে রাউলাট আইন প্রণয়ন করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর উপর বিনা বিচারে কঠোর দণ্ড প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ৬ই এপ্রিল ইহার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে অভূতপূর্ব ধর্মঘট পালিত হইল এবং হজার হাজার লোক ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। সরকার গান্ধীজিকে কারারুদ্ধ করায় আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে বৈশাখী মেলা উপলক্ষে প্রায় দশহাজার লোক জমায়েত হয় এবং ইংরাজ সেনাপতি ও'ডায়ার এই মেলা আইন অমান্যের প্রতীক হিসাবে ঘোষণা করিয়া সেই উদ্যানে যাতায়াতের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া নৃশংস-ভাবে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইলেন। বহুশত লোক ইহাতে নিহত হয়। সমগ্র দেশ ইহাতে স্তম্ভিত হইয়া যায়। সরকার এই ঘটনা চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সেই চেষ্টা বিফল হইল। দেশের সব নেতারা তখন কারান্তরালে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর পক্ষ হইতে বৃটিশ সরকারকে ধিক্কার প্রদান করিয়া গভর্ণর জেনারেলকে চিঠি দিলেন এবং স্যার উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। ১৯১৯ সালের শেষদিকে সরকারের বিরুদ্ধে আর একটি আন্দোলন আরম্ভ হইল, ইহার নাম ছিল খিলাফত আন্দোলন। এইরূপে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে যে ইংরাজবিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন প্রণীত হইল। ১৯২০ সালে গান্ধাজী অসহযোগ আন্দোলনের বা Non-Co-operation Movementএর আহ্বান জানাইবার পর সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা নামক স্থানে ইহা হিংসার রূপ ধারণ করায় গান্ধীজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ "স্বরাজ্য পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন অনুযায়ী

১৯১৯ সালে রাউলাট আইন

জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্যার উপাধি বর্জিত

অসহযোগ আন্দোলন

গঠিত আইন সভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে স্বরাজ্য পার্টি শক্তিহীন হইয়া যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলা দেশে দেশবন্ধুর তিরোধানের পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকিয়াও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরু কর্তৃক স্বরাজ্য পার্টি গঠন

১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করিলেন দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য। এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করায় ভারতবাসী সম্পূর্ণভাবে এই কমিশন বর্জন করিল। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে মতিলাল নেহরু ভারতের জন্য Dominion Status দাবি করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু এই অধিবেশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং শ্রীজহরলাল নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করিলেন। গান্ধীজীর চেষ্টায় মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময় মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে এবং কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের সহিত অসহযোগিতা আরম্ভ করে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ইংলণ্ডের গোলটেবিল বৈঠকের (Round Table Conference) ব্যবস্থা করা হইল। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে লাহোরে শ্রীজহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করিল। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মহম্মদ আলি জিন্না চৌদ্দদফা দাবি পেশ করিলেন এবং ইহাতে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হইল।

সাইমন কমিশন

১৯২৯ সালে স্বাধীনতার দাবি

১৯৩০ সালে গান্ধীজী তাঁহার বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযানে বাহির হইলেন এবং সমগ্র দেশে পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে ১৯৩০-৩২ সালে ইংলণ্ডে গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হইল; কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান করিল না। সরকার তখন বাধ্য হইয়া বিনা শর্তে গান্ধীজীকে মুক্তি দিলেন। গান্ধীজী লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিলেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিলেন। লর্ড আরউইনও চুক্তি অনুযায়ী বিনা শর্তে সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিলেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান

দেশের এই অশান্ত বিক্ষুব্ধ আন্দোলন চলিবার সময়ে প্রেরণার উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক এই কবি দেশের জাতীয়তাবাদের

উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন তাঁহার অমর লেখনীর দ্বারা। তাঁহার "জাতীয়তাবাদ" পুস্তকে ভারতীয় জাতীয়তবোধকে আদর্শ উপযুক্তভাবে বিবৃত হইল। এই সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দের সমুদয় কাজের প্রেরণার উৎস ছিলেন বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রভৃতির অজুহাতে যখন ইংরাজ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, তখন আরও একজন নেতা ভারতের যুব-মানসের প্রতীক হিসাবে জাতিকে নেতৃত্ব প্রদান করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। তিনি হইতেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করিবার জন্য নেতাজী সুভাষের প্রচেষ্টায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত (National Planning Committee) হইল এবং জহরলাল নেহরু ইহাক সভাপতি হইলেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করিলেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। এই কংগ্রেসে নেতাজীর সহিত গান্ধী, রাজাজী, প্যাটেল প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতাদের মতবিরোধ হইল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন। দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। বৃটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করিল। কিন্তু ইংরাজের লৌহ কারাগার সুভাষ-চন্দ্রকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। সুভাষচন্দ্রকে ১৯৪১ সালে গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়; কিন্তু সেই অবস্থায়ই সুভাষচন্দ্র পলায়ন করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই অমিত ক্ষমতাশালী নেতা দেশের বাহিরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া দিল্লী অভিযানের জন্য তৎপর হইলেন। তাঁহার "জয়হিন্দ" শ্লোগান আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীকে নূতন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করিল। ভারতের স্বাধীনতালাভই ছিল নেতাজীর স্বপ্ন। দেশপ্রেমের এই জলন্ত উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম দেখা যায়। ভারতের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর জাতি নেতাজীর নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক জাতীয় আন্দোলনকে প্রেরণা দান

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং জাতীয় কংগ্রেস

নেতাজী কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং "দিল্লী চলো" অভিযান

১৯৪২ সালে গান্ধীজী "ভারত ছাড়" (Quit India) আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। দেশের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হইল। জনসাধারণ এই আন্দোলনে সাড়া দিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতের শাসন ব্যাপারে বৃটিশ সরকার সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। একদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কোহিমা পর্যন্ত আসিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ "দিল্লী চলো" অভিযান সুরু করিল; অপর-দিকে ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। নেতৃবৃন্দ কারাগার হইতে

মুক্ত হইয়াই পুনরায় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার ভারতে একটি Cabinet Delegation পাঠাইলেন।*

কেবিনেট মিশন, গণপরিষদ গঠন এবং ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা আইন

কেবিনেট মিশন যদিও মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সম্মতি দিলেন না, তবুও তাহাদের সুপারিশে মুসলিম লীগের প্রধান দাবিগুলি স্বীকৃত হইল। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদ গঠিত হইল এবং মুসলিম লীগ ইহাতে যোগদান করা হইতে বিরত রহিল। অবশেষে অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ যোগদান করিল। ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা আইন বিধিবদ্ধ করিলেন এবং ২৬ জুলাই গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের জন্য একটি আলাদা গণপরিষদ গঠন করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্যায় খুবই করুণ। অখণ্ড স্বাধীন ভারতের জন্যই অসংখ্য শহীদ নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্যই ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত হইল।

* কেবিনেট মিশনের সুপারিশগুলির বিস্তৃত আলোচনার জন্য প্রথম অধ্যায়ে পুর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Outstanding Features of the Indian Constitution)

[ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অন্যান্য শাসনতন্ত্র হইতে অনেক কিছু ধার করা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য—লিখিত শাসনতন্ত্র, খুব কঠোর অথবা খুব নমনীয় নয়, কেন্দ্রিকতার ঝোঁক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, এক-নাগরিকতা, বিচার-বিভাগের আংশিক স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, নির্দেশাত্মক নীতি প্রভৃতি।]

যদিও ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের উপাদান লইয়া ("ransacking all the known constitutions of the world") গঠিত হইয়াছে, তবুও ইহার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যাহা ইহাকে পৃথিবীর অন্যান্য শাসনতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে।[১] যদিও আমাদের শাসনতন্ত্র একটি "ধার করা" ("borrowed") শাসনতন্ত্র, তবুও শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের কৃতিত্ব এই যে ইহা বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র হইতে শুধু ভাল জিনিসগুলিই ধার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের যে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দেখা যায়, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ সেইগুলি পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালনার কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles) গৃহীত হইয়াছে, এবং ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের অনুরূপ জরুরী অবস্থা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে কতিপয় বিধান রাখা হইয়াছে। অপরদিকে আইনগত বিরোধের সম্ভাবনা যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিবার জন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে

১। ভারতীয় শাসনতন্ত্র গঠনের প্রধান উদ্গাতা ডক্টর আম্বেদকর মন্তব্য করিয়াছিলেন, "One likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. More than hundred years have rolled when the first written constitution was drafted. It has then been followed by many other countries reducing their constitutions to writing...Given these facts, all constitutions in their main provisions must look similar. The only new things, if there be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and so accommodate it to the needs of the country.

অন্যান্য শাসনতন্ত্র অপেক্ষা বেশী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহাতে প্রতিটি বিধানের তাৎপর্য পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয়।

ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল।[২] প্রথমে ইহার ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ (Articles) এবং ৮টি তালিকা (Schedules)ছিল। পরে ২টি অনুচ্ছেদের সহিত কিছু অংশ এবং তালিকা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রটির আকৃতি এত বড় হইবার কারণ হইল ইহাতে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় নাই, রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকাগুলির মধ্যেও সম্পর্ক খুব জটিল। অনেক ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহ পরিষ্কার নয়। শুধু তাহাই নহে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির বর্ণনা, সরকারী চাকুরী, সরকারী ভাষা তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিবিধ ধারা শাসনতন্ত্রে স্থান পাওয়ায় শাসনতন্ত্রটির আকার এত বড় হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের একটি অংশ সরকারী ভাষা এবং অপর একটি অংশ জরুরী অবস্থাকালীন বিধানের সহিত জড়িত।

ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করা যাইতেছে :
(১) ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) হিসাবে গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকিলেও কাঠামোর দিক হইতে ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। মোট ১৭টি রাজ্য এবং নেফা সমেত ১১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। অঙ্গরাজ্য সমূহ হইতেছে,— ১। অন্ধ্রপ্রদেশ, ২। আসাম, ৩। বিহার, ৪। মহারাষ্ট্র, ৫। মধ্যপ্রদেশ, ৬। তামিলনাড়ু, ৭। মহীশূর, ৮। গুজরাট, ৯। উড়িষ্যা, ১০। রাজস্থান, ১১। পাঞ্জাব, ১২। হরিয়ানা, ১৩। উত্তরপ্রদেশ, ১৪। পশ্চিমবঙ্গ, ১৫। কেরল, ১৬। জম্মু ও কাশ্মীর, ১৭। নাগাভূমি।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহ :—১। দিল্লী, ২। হিমাচলপ্রদেশ, ৩। মণিপুর, ৪। ত্রিপুরা, ৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ৬। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীনদ্বীপপুঞ্জ, ৭। দাদরা ও নগর হাভেলী, ৮। গোয়া, দমন ও দিউ, ৯। চণ্ডীগড়, ১০। পণ্ডিচেরী। ১১। নেফা অঞ্চল।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোয় আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এবং

২। *Delhi Laws, Act Case*-এ J. Mahajan বলিয়াছিলেন, ..."No country in the world has such an elaborate and comprehensive constitution as we have in this country,"

ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের একটি সমন্বয় দেখিতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অথবা ইউনিয়ন তালিকার (Union List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার হইতেছে রাজ্য সরকারের। যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার আছে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট উভয়েরই। যদি কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের আইনের সহিত রাজ্য বিধানমণ্ডলের আইনের বিরোধ দেখা যায়, তবে সেক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের আইনই কার্যকর হইবে এবং বিধানমণ্ডলের আইনের অসঙ্গতিপূর্ণ অংশ বাতিল হইয়া যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার এবং কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন

কোন কোন রাজ্যতালিকার এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কোন রাজ্যে যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তিত হয়, তবে সেই রাজ্য সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের হাতে থাকে, এবং সেই রাজ্যের বাজেটও পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ অনুমোদন করে। ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের পূর্বতন এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া ইহাকে কতিপয় রাজ্য সরকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ন্যায় কতিপয় বিচ্ছিন্ন রাজ্যকে কেন্দ্রীয়করণ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূলরাজ্য হিসাবে গঠন করা হইয়াছে। কাঠামোর দিক হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার কেন্দ্রিকতার ঝোঁক। বিশেষতঃ দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে সমগ্র শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া যাইবে। জরুরী অবস্থায় প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমুদয় রাজ্য সরকারগুলির কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে কোন রাজ্যের শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং কোন রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনে সমর্থ নহেন তবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। ১৯৬৫ সালে কেরালায়, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এবং ১৯৬৮ সালে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যসরকারগুলির উপর

রাজ্য সরকারের উপর পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ

প্রাধান্যের প্রকাশ ১৯৬৭ সালের নির্বাচনোত্তর রাজস্থান রাজ্যেও কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে দেখা যায়। সেখানে সংখ্যালগিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস দলকে সরকার গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয় ও আইন সভায় তাহাদের পরাজিত হইবার আশঙ্কা দেখা গেলে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয় অথচ বিধানসভা বজায় রাখা হয়। বামপন্থী দলগুলির দ্বারা সরকার গঠন করার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়াও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করার মধ্য দিয়া রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যকে এইভাবে প্রকটিত করা হইয়াছিল।

তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ফিনান্স কমিশনের প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় কর এবং শুল্ক হইতে প্রাপ্য অংশ ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। কোন রাজ্যের আর্থিক সংকট যদি চরমে উঠে তাহা হইলেই রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন; অবশ্য ভারতে এখনও সেই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই।

শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলির বাহিরে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবার কারণ ঘটিয়াছে। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী যদি কখনও কেন্দ্রীয় আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং রাজ্য সরকারের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তবে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রণীত আইনই গৃহীত হইবে, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রপ্রবণতা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইজন্যই ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে অনেকেই কার্যক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক বলিয়া মনে করেন।[৩]

ক্ষমতা বণ্টনে কেন্দ্র-প্রবণতা।

(২) ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়াই লিখিত (written)। ইহাতে এমন অনেক বিষয় উল্লিখিত আছে, যেমন সরকারী ভাষা ও সরকারী চাকুরি ইত্যাদি, যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি সম্পূর্ণভাবে অনমনীয় নয়। ইহার মধ্যে আমরা নমনীয়তা এবং কঠোরতার সংমিশ্রণ (partly rigid and partly flexible) দেখিতে পাই। ভারতের সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায় না। অথবা ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন

৩। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইয়াছে।

করিবার পদ্ধতি আমেরিকার ন্যায় কঠোর নয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিতে হইলে সাধারণভাবে সংশোধনী প্রস্তাবটি কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের প্রতিটিরই অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই, এবং সেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেণ্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত সদস্য-সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হওয়া চাই। আবার কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নিয়ম, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইনগত সম্পর্ক, শাসনতন্ত্র সংশোধনের নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সংশোধনী প্রস্তাব প্রথমে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদিত হওয়া চাই এবং তৎপর ইহা মোট রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলির অন্ততঃ অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। শাসনতন্ত্রের কোন বিধানই সংশোধনের অযোগ্য নহে। বরং সাধারণভাবে আইন প্রণয়নের জন্য শাসনতন্ত্রের অনেক বিধানেরই সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটের জোরে পার্লামেণ্ট তাহা করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতের শাসনতন্ত্রের ৪নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যগুলির সীমানা, আয়তন এবং নামের পরিবর্তন, শাসনতন্ত্রের ১৬৯ নং ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্যে দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা অথবা তুলিয়া দেওয়া এবং ৭নম্বর ধারায় ৫নম্বর অনুচ্ছেদের ও ২১ নম্বর ধারার ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সিডিউল্ড অঞ্চল অথবা সিডিউল্ড উপজাতি শাসন করা প্রভৃতি ব্যাপারে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র কঠোরতা ও নমনীয়তা উভয়েরই সংমিশ্রণ। অধ্যাপক কে. সি. হোয়ারের (K. C. Wheare) মতে এই ধরণের সংশোধন পদ্ধতি যদিও কদাচিৎ দেখা যায়, তবুও ইহা সুবিবেচনা-প্রসূত।[৪]

শাসনতন্ত্রটি লিখিত; কিন্তু ইহা খুব কঠোর অথবা খুব নমনীয় নয়, যদিও নমনীয়তার দিকে ইহার বেশী প্রবণতা দেখা যায়

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বলিতে শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রই (Federal Constitution) বুঝায়; আমেরিকার মূল রাষ্ট্রগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। সুইজারল্যাণ্ডেও আমরা ক্যাণ্টনগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। কিন্তু ভারতবর্ষের মূল রাজ্যগুলির আলাদা কোন শাসনতন্ত্র নাই। তবে বৃটিশ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য এবং কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির জন্যও কতিপয় বিশেষ বিধান শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাও শাসনতন্ত্রটি বড় হইয়া যাইবার অন্যতম কারণ।

(৪) ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল নাগরিকদের কতিপয়

৪। "This variety in the amending process is wise but is rarely found," Wheare)

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)। শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে (Part III) ১২ হইতে ৩৫ নম্বর ধারায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলি কখনই অবাধ বা একক নয়; কেননা জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলি বাতিল করিতে পারেন। মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে। (ক) সাম্যের অধিকার (Right to equality), (খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom), (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to religious freedom), (ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ে অধিকার (Cultural and Educational Rights), (চ) সম্পত্তির অধিকার (Right to property) এবং (ছ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to constitutional remedies)। এই মৌলিক অধিকারের উপর কতিপয় বাধা-নিষেধও আরোপ করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিবর্তনমূলক আটকের (Preventive detention) কথা উল্লেখ করা যায়। অবশ্য নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থাকে অনেকেই সুষ্ঠু গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন। গ্রেটবৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যুদ্ধ এবং জাতীয় জরুরী অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য সময়ে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ করা হয় না। ভারতসরকার সকল সময়েই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। সাধারণ সময়ে নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকারগুলি আদালত-গ্রাহ্য। অর্থাৎ সরকার যদি নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার না করেন, তবে নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে আদলতের দারস্থ হইতে পারেন।

মৌলিক অধিকার

(৫) মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of State Policy) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির ন্যায় নির্দেশাত্মক নীতি-গুলিকে আদালত কর্তৃক কার্যকর করা যায় না। নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক ন্যায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ন্যায় বলিতে অর্থনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য উভয়ই বুঝায়; তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার পর্যায়ে অর্থনৈতিক অধিকারের (Economic Rights) ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে, অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে কর্মের অধিকার, বেকার, বার্ধক্য, অঙ্গহানি ও পীড়িতাবস্থায় সরকারী সাহায্য পাইবার অধিমার

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতি

ইত্যাদির ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রপরিচালার নির্দেতাত্মক নীতিগুলি অনুসৃত হইলে আমাদের দেশ একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

(৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the constitution) স্বীকার করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রই সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকারের উৎস। ভারতের সুপ্রীম কোর্টই শাসনতন্ত্রের রক্ষক। তাহা ছাড়া, যদি কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া এই হস্তক্ষেপ বাতিল করিতে পারে।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

(৭) শাসনতন্ত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাধারী একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ। যে কোন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই একটি স্বাধীন বিচারব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে একদিকে পার্লামেণ্টারি সার্বভৌমত্ব ও লিখিত শাসনতন্ত্র এবং অপরদিকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার (Judicial Review) বিধান, এই দুইটির মধ্যে সমন্বয় সাধন আমাদের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ বাস্তবে অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাই ইহা প্রমাণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্রের রাশ টানিয়া ধরিয়া রাহিয়াছে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে।[৫] মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত কোন আইনকে বাতিল করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের আছে। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টকে আইন প্রণয়নের তৃতীয় কক্ষ (Third Chamber) হিসাবে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অপর দিকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত ব্যাপারে যাহা খুশী তাহাই করিত পারে[৬] এবং ইংলণ্ডের আদালত পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন বাতিল করিতে পারে না।[৭] ভারতের শাসনতন্ত্র এইক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা এবং পার্লামেণ্টের প্রাধান্যের মধ্যে আপোষ

৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিউজেস্ (Hughes) সেইজন্য বলিয়াছিলেন, "The constitution (of the U. S. A) is what the Supreme Court says it is."

৬। "The Parliament can do everything that is not naturally impossible." (Blackstone)

৭। "The constitution has assigned no limits to the authoriity of Parliament over all matters and persons within its jurisdiction A law may be unjust and contrary to the principles of sound government. But Parliament is not controlled in its discretion and when it errs, its errors can be corrected only by itself," —May.

শাসনব্যবস্থা এবং ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা এই দুইটির মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করিয়াছে। ভারতের পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার বণ্টন নীতি অনুসরণ না করে এবং ইহা যদি ক্ষমতার বণ্টন নীতি অনুযায়ী পার্লমেণ্টের এক্তিয়ারের বহির্ভূত হয়, তবে সেই আইনকে শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আছে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে আইনসভার ক্রিয়াকলাপের উপর "বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা" করিবার ক্ষমতা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নাই। স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত মৌলিক অধিকার পার্লামেণ্ট সংশোধন করিতে পারে, যদি বিচার বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ ইহাতে জটিলতার সৃষ্টি করে।৮

ভারতের শাসনতন্ত্র এইভাবে লিখিত শাসনতন্ত্রের আওতার মধ্যেই আইনসভাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায় ভারতের পার্লামেণ্ট সার্বভৌম আইন-সভা নহে। শাসনতন্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই। তবে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাই এইরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে তবে সেক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল শাসনতন্ত্রটি সংশোধিত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রটি ব্যাখ্যা করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে থাকিবে।

সম্প্রতি বিচার বিভাগ বনাম আইনসভার মধ্যে পারস্পরিক অধিকারের (Privileges) সীমারেখা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিপূর্বে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার স্পীকার অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতিকে গ্রেপ্তার করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুপ্রীমকোর্টে এই ব্যাপারে আপীলের শুনানী হইবার পর সুপ্রীমকোর্ট নির্দেশ প্রদান করে যে বিচারবিভাগের কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আইনসভার স্পীকারের নাই। সম্প্রতি লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার সর্দার হুকুম সিং বলিয়াছেন যে শাসনতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই আইনসভা এবং বিচারবিভাগের নিজ নিজ এক্তিয়ার সম্বন্ধে একটি শাসনতান্ত্রিক সীমারেখা থাকা প্রয়োজন।৯

৮। এইক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ,—"No Supreme Court, no Judiciary, can stand in judgment over the sovereign will of Parliament, representing the will of the entire community. It can pull up that sovereign will if it goes wrong. But in the ultimate analysis, where the future of the community is concerned, no Judiciary can come in the way ....Ultimately the fact remains that the Legislature must be supreme and must not be interfered with the courts of law in such matters as social reform".

৯। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য পার্লামেণ্ট ও রাজ্যের আইন সভার সদস্যদের অধিকার শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৮) ভারতের শাসনতন্ত্রে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অথচ সরকারের কাঠামো রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের ন্যায়। রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার এবং মন্ত্রিসভা চালিত সরকারের এক সমন্বয় আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে করা হয় নাই। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। এখানে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনেকটা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে গঠিত। রাষ্ট্রপতি যদিও রাষ্ট্রপ্রধান, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনবিভাগের কাজ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। অবশ্য শাসনতন্ত্রে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয় নাই যে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতেই হইবে। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে এই বিষয়ে আদালতের নিকট কোনরূপ বিচার প্রার্থনা করা যায় না। আবার বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণও কেন্দ্রের মতই রাজ্যের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তবে সংবিধানে রাজ্যপালগণকে যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং যে ক্ষমতার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যপালগণ মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই করিতে পারেন তাহা হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে রাজ্যগুলিতে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বশীল সরকার গঠন সম্ভবপর নয়।

দায়িত্বশীল সরকার

(৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদিকে দেখিতে পাই লিখিত শাসতন্ত্র এবং অপরদিকে দেখিতে পাই রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থা। আবার ইংলণ্ডে আমরা একদিকে দেখিতে পাই অলিখিত শাসনতন্ত্র এবং অপরদিকে দেখিতে পাই পার্লামেণ্টারি সার্বভৌমত্ব। কিন্তু ভারতের শাসনব্যবস্থায় আমরা লিখিত শাসনতন্ত্র এবং পার্লামেণ্টারি সার্বভৌমত্বের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই।

লিখিত শাসনতন্ত্র এবং পার্লামেণ্টারী সার্বভৌমত্বের মধ্যে আপোষ

(১০) যদিও ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রণেতাগণ একটি বিরাট লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তবুও এই শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধান (Conventions) গড়িয়া উঠিবার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোন আকস্মিক কারণে একদিনের জন্য মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে ভোটে পরাজিত হয়, তবেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য কিনা সেই বিষয়ে কোন স্পষ্ট ইংগিত আমাদের শাসনতন্ত্রে দেওয়া হয় নাই। নীতিগতভাবে মন্ত্রিসভার তখন পদত্যাগ করা উচিত এই প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠা বিচিত্র

প্রথাগত বিধানের ভূমিকা

নহে। আবার কোন্ অবস্থায় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন, সেই সম্পর্কেও প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

(১১) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভারতীয়দের একনাগরিকতার (single citizenship) বিধান। ভারতীয়গণ সকলেই ভারতের নাগরিক,—কোন রাজ্য বিশেষের নাগরিকতা তাহাদের নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বি-নাগরিকতার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ভারতীয় নাগরিকগণকে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়।

এক নাগরিকতা

(১২) ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্র। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিক সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ভারতের শাসনতন্ত্রে সামাজিক সাম্য (Social Equality) প্রতিষ্ঠা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। শাসনতন্ত্রে ধর্ম, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান, ইত্যাদির ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশেও এখনও পর্যন্ত বর্ণগত বৈষম্য (racial discrimination) দেখা যায়। তাহা ছাড়া, ভারতে মাত্র শতকরা ২৩ জন শিক্ষিত ; অথচ এই দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বর্জন করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে ডাঃ জাকির হোসেনের ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন ভারতীয় শাসন তন্ত্রের ধর্ম নিরপেক্ষতার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং সামাজিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি

(১৩) ভারতের শাসনতন্ত্রে তপশীলভুক্তবর্ণ এবং তপশীলভুক্ত উপজাতিদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মূল শাসনতন্ত্রে এই বিশেষ সুবিধা ১০ বৎসর পর্যন্ত চালু রাখার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৯ সালে শাসনতন্ত্রের অষ্টম সংশোধন অনুযায়ী ইহার মেয়াদ আরও ১০ বৎসর বাড়ান হইয়াছে। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও ইহাদের দাবি অগ্রে বিবেচিত হইবার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্যভারতে তপশীলভুক্ত বর্ণ এবং উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন। শাসনতন্ত্রে ইহাদের যে সুবিধাগুলি দেওয়া হইয়াছে সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং রিপোর্ট প্রদান করার জন্য একজন বিশেষ কর্মচারীও আছেন।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা

(১৪) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে পূর্বতন দেশীয় নৃপতিশাসিত রাজ্যগুলি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে

কতকগুলি রাজ্য পাশাপাশি রাজ্যের সহিত একত্রিত হইয়া গিয়াছে। আবার কতিপয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছে (যেমন মহীশূর)। রাজস্থানে বিভিন্ন রাজ্য একত্রিত হইয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদ রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে অন্ধ্রের সহিত একত্রিত হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে দেশীয় রাজ্যের সংখ্য বর্তমানে অতি অল্পে দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বতন দেশীয় নৃপতি-শাসিত রাজ্যের সংযুক্তি

(১৫) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে শাসনতান্ত্রিক আইন সম্বন্ধে এমন কতিপয় ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে যেগুলিকে বর্তমান কালের শাসনতান্ত্রিক আইনজ্ঞগণ পুরাতনপন্থী বলিয়া মনে করেন;—এই ধারণা ডাইসির মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত।[১] ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রণেতাগণ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দ্বারাও যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এইজন্য শাসনতন্ত্রটি কিছু পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক হইয়াছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে যাঁহারা বাস্তবে রূপায়িত করিতেছেন, তাঁহারা সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি রাষ্ট্রগঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক শাসনতন্ত্র

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে শাসনতন্ত্রটি বাহ্যত যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও কার্য-কারিতার দিক হইতে এককেন্দ্রিক।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main Features of the Indian Constitution)—ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসন-তন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল। ভারতের শাসনতন্ত্র এত বড় হইবার কারণ হইল, ইহাতে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করা হয় নাই, রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যাইতেছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign De mocratic Rebuplic) হিসাবে গঠিত হইয়াছে। হরিয়ানা সমেত মোট ১৭টি রাজ্য লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান

১। ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ডক্টর জেনিংস মন্তব্য করিয়াছেন "The Constitution is dominated by a view of Constitutional Law which most constitutional lawyers now regard as out-moded—a view which derives from the work of Albert Vinn Diecy." জেনিংস

বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার কেন্দ্রিকতার ঝোঁক। বিশেষতঃ দেশে জরুরী: অবস্থার সৃষ্টি হইলে সমগ্র শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া যাইবে। শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় নাই এই রকম ক্ষমতাগুলি (Residuary powers) কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি লিখিত (Written)। ইহার পরিবর্তন করা খুব কঠিনও নহে এবং খুব সহজও নহে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)। এই অধিকারগুলি কখনই চিরকালীন নয়। দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে রাষ্ট্রপতি এইগুলি বাতিল করিয়া দিতে পারেন। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মের অধিকার, সরকারের দিক হইতে যদি অধিকার না দেওয়া হয় তবে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ইহার প্রতিকার করার অধিকার—এইগুলি হইতেছে ভারতীয় নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার।

মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of State Policy) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির ন্যায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে আদালত কর্তৃক কার্যকরী করা যায় না। নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনুসৃত হইলে আমাদের দেশ একটি কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

ভারতে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) স্বীকার করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রই সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকারের উৎস। ভারতের সুপ্রীম কোর্টই শাসনতন্ত্রের রক্ষক। তাহা ছাড়া, যদি কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া ইহা বাতিল করিতে পারে।

ভারতের শাসনতন্ত্রে দায়িত্বশীল সরকারের (Responsible Government) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অথচ সরকারের কাঠামো রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের ন্যায়। রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের এক সমন্বয় আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে করা হয় নাই। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইন সভার সদস্য হইতে হয় এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। এখানে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনেকটা বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে গঠিত। রাষ্ট্রপতি যদিও রাষ্ট্রের প্রধান, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনবিভাগের কাজ পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভারতীয়দের এক-নাগরিকতার (Single citizenship) বিধান। ভারতীয়গণ সকলেই ভারতীয় নাগরিক, কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিকতা তাহার নাই।

ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্র।

Exercise

1. Discuss the salient features of the Constitution of India.

[ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।] (২৫-৩৫ পৃষ্ঠা)

2. "In the Indian Constitution, we find elements of both the British and the American Constitutions."—Discuss the statement.

["ভারতের শাসনতন্ত্রে আমরা বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের শাসন তন্ত্রেরই উপাদান দেখিতে পাই"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।]

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য ও ইহার প্রস্তাবনা

(Philosophy of the Indian Constitution and the Preamble to the Constitution of India)

[ভারতীয় শাসনতন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য—শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য—বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ভারতের রাষ্ট্রশক্তির আইনগত এবং নৈতিক ভিত্তি হইতেছে জনসাধারণ—এই ব্যাখ্যা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় কিনা—'সার্বভৌম', 'গণতান্ত্রিক' এবং 'প্রজাতন্ত্র', এই শব্দ তিনটির ব্যাখ্যা—কমনওয়েলথের সদস্যপদের সহিত ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রূপের সংগতি]

প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেরই একটি দার্শনিক তাৎপর্য আছে। আমাদের শাসনতন্ত্রের মূল দর্শন নিহিত রহিয়াছে ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারী নেহরু কর্তৃক ঘোষিত উদ্দেশ্য প্রস্তাবের (Objectives Resolution) মধ্যে।[১] এই ঘোষণা শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণকে যে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল তাহার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্রটি প্রণীত হইয়াছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন,

---

১। (i) "This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an Independent Sovereign Republic and to draw up for her future governance a constitution.

(ii) Wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian States, and such other parts of India as are outside British India and the States as well as such other territories as are willing to be constituted into the Independent Sovereign India shall be a Union of them all ; and

(iii) Wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and retain the status of autonomous units, together with residuary powers and exercise all powers and functions of Government and administration, save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the Union, or as are inherent or implied in the Union or resulting therefrom , and

(iv) Wherein all power and authority of the Sovereign Independent India, its constituent parts and organs of Governments are derived from the people ; and

(v) Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political ; equality of status and

সার্বভৌম, প্রজাতন্ত্র হিসাবে গঠিত হইবে। গণপরিষদ ইহার জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে এবং বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি লইয়া ও ভারতের যে অংশগুলি বৃটিশ ভারতের বাহিরে আছে সেইগুলি লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সার্বভৌম ও স্বাধীন ভারত এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চল ও ইহাদের সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে সমস্ত ক্ষমতা লাভ করিবে। এই শাসনতন্ত্রে ভারতের জনসাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, আইনের চোখে মর্যাদা ও সুযোগের সমতা এবং আইনের অধীনে চিন্তা, মত প্রকাশ, ধর্মবিশ্বাস, পূজা-অর্চনা, বৃত্তি, সংঘবদ্ধ হওয়া প্রভৃতির স্বাধীনতা ভোগ করিবে। এই শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য, অনুন্নত ও উপজাতি অঞ্চলের জন্য এবং অনুন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে। সভ্যজাতিসমূহ কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ও ন্যায় বিচার অনুযায়ী এই প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা এবং স্থল, জল ও আকাশে ইহার সার্বভৌম কর্তৃত্ব শাসনতন্ত্রে রক্ষিত হইবে। সর্বশেষে, বিশ্বশান্তি প্রসারে ও মানবজাতির কল্যাণে এই পুরাতন দেশটি এই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ইহার ন্যায্য ও সম্মানজনক স্থান অর্জন করিবে।

শ্রীনেহরুর ভাষায় এই উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবটি একটি নিছক প্রস্তাব অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইহা হইতেছে একটি সুনিশ্চিত ঘোষণা, একটি স্থির সংকল্প ও একটি প্রতিশ্রুতি।[২]

যে দার্শনিক ভিত্তির উপর এই শাসনতন্ত্রের মূল প্রস্তাবটি তৈয়ারীকরা হইয়াছিল, তাহার ভিত্তিতেই এই শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা (Preamble) রচিত হইয়াছে।

---

of opportunity before the law ; freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality ; and

(vi) Wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes : and

(vii) Whereby shall be maintained the integrity of the territory of the Republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of civilised nations ; and

(viii) This ancient land attain its rightful and honoured place in the world and make its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind."

The Objectives Resolution dated 22-1-47

২। "It's a declaration, a firm resolve a pledge, an udnertaking and for all of us a dedication".

সমতার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিবার নীতিই আমাদের শাসনতন্ত্রে অনুসৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলি দেশের শাসনব্যবস্থাকে ন্যায় ও বিচারের উপর ভিত্তিশীল করিয়াছে। অপরদিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি দেশের শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করিয়াছে। বিচিত্র আমাদের দেশ,—এই দেশে বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও জাতির সমাবেশ। কিন্তু ইহার মধ্যেও একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। সেই ঐক্যানুভূতিকে শাসনতন্ত্রের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এই প্রস্তাবের মধ্যে। ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা (Preamble) আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবনার সংযুক্তিঃ প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রেরই একটি প্রস্তাবনা দেওয়ার নিয়ম আছে। পৃথিবীর বর্তমান লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রটিই সর্বাধিক প্রাচীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ ১৭৮৭ সালে তাঁহাদের একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করেন। এই প্রস্তাবনায়[৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ "অধিকতর সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে,—ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থায়ী করিবার জন্য, সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার জন্য,—সামগ্রিক কল্যাণ-বৃদ্ধির জন্য" এবং তাঁহাদের নিজেদের ও বংশধরদের জন্য—স্বাধীনতার আশীর্বাদ ভোগ করিতে যাহাতে সমর্থ হয়,—সেইজন্য সেই শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কোন প্রস্তাবনা নাই। তবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তাৎপর্য রহিয়াছে, তাহা হইতেছে মার্ক্‌স্ ও লেনিনের মতবাদের উপর ভিত্তিশীল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস। আয়ারল্যাণ্ড, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রেও প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হইয়াছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাননতন্ত্রের প্রস্তাবনা নাই,—অন্য কোন কোন দেশে আছে।

৩. "We, the *people of the United States in. order* to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility provide for the common defence, promote general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America".—Preamble to the constitution of the U. S.

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য (Objectives of a Preamble to the Constitution) : যে কোন শাসনতন্ত্রেরই প্রস্তাবনায় শুধু শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও নীতির বর্ণনা থাকে এবং ইহার আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে শুধু একটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা দেওয়ার উদ্দেশ্য এবং ইহার আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি

যে কোন আইনের প্রস্তাবনায় সেই আইনের উদ্দেশ্য ও নীতির উল্লেখ থাকে এবং কি কি অসুবিধা বা অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য আইনটি প্রণীত হইল তাহার বর্ণনা থাকে। অর্থাৎ কোন আইনের প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট আইনটি প্রণয়ন করিবার পিছনে আইনসভার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। শাসনতন্ত্র হইতেছে একটি দেশের মৌলিক আইন। সুতরাং শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এবং ইহার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রের উৎস, আইনগত এবং নৈতিক ভিত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে কোন আইনের প্রস্তাবনার তাৎপর্য সম্বন্ধে বিচারক ষ্টোরির (Justice Story) অভিমত হইতেছে, "It is an admitted maxim in the ordinary course of administration of justice, that the Preamble of a Statute is a key to open the mind of the makers, as to the mischiefs which are to be remedied and the objects which are to be accomplised by the provisions of Statute."—Justice Story.

শাসনতন্ত্রের কার্যকর অংশের সহিত প্রস্তাবনার সম্পর্ক

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনাকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচার বিভাগের মূল ক্ষমতা, (Substantive Powers) ভাষা অথবা উদ্দেশ্য যদি পরিষ্কারভাবে বিধিবদ্ধ থাকে তবে শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা ইহার অর্থকে পরিবর্তিত করিতে পারে না।[৪] তবে শাসনতন্ত্রের কার্যকরী অংশে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে—তাহা হইলে ইহার ব্যাখ্যা শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার মাধ্যমে করা যায়। কিন্তু যদি প্রস্তাবনার সহিত কার্যকরী অংশের অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তবে প্রস্তাবনার পরিবর্তে কার্যকরী অংশই বলবৎ হয়।[৫]

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার তাৎপর্য

প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেরই একটি প্রস্তাবনা থাকা উচিত যাহাতে ইহার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায়।

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে *Jacobson vs. Massachussets* এবং ভারতবর্ষে ১৯৫০ সালে *Gopalan vs. State of Madras* মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বলিয়াছে যে শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং ব্যাখ্যা মুখ্যতঃ শাসনতন্ত্রের কার্যকর অংশে ব্যবহৃত শব্দের স্বাভাবিক অর্থের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

কোন কোন দেশের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় অনেক বড় বড় আদর্শের কথা বলা হয়—এবং আবার কোন কোন দেশের শাসনতন্ত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৭ সালে ভারতের গণপরিষদ যখন শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব (Objectives Resolution) গ্রহণ করে, তখন ভারতকে "স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র" (Independent Sovereign Republic) বলিয়া অভিহিত না করিয়া "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শাসনতন্ত্রের মূল দার্শনিক তাৎপর্যও ক্ষুন্ন হয় নাই, স্বাধীনতাও নষ্ট হয় নাই। গণপরিষদে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুমোদন করিবার সময় জওহরলাল নেহেরু বলেন, "We say that it is our firm and solemn resolve to have an Independent Sovereign Republic. India is bound to be Sovereign, it is bound to be independent and it is bound to be a Republic."

প্রস্তাবনায় "স্বাধীন" শব্দটি বাদ দেওয়া উচিত হইয়াছে কিনা

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা (Preamble to the Indian Constitution) : ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনাটি এইরূপ, "আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে এবং ইহার সকল নাগরিকই যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং চিন্তার, মত প্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধার ক্ষমতা লাভ করে, এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অনুকূল ভ্রাতৃভাব রচিত হয়, তাহার জন্য আমরা সত্যনিষ্ঠার সহিত দৃঢ় সংকল্প হইয়া আমাদের এই গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং নিজেদের প্রদান করিতেছি।"

("We THE PEOPL OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens

---

৫। ...."as it (the Preamble......) states, or professes to state the general object and intention of the legislature in passing the enactment, it may legitimately be consulted to solve any ambiguity, or to fix the meaning of words which may have more than one, or to keep the effect of the Act within its real scope, whenever the enaeting part is in any of these respects open to doubt".—Maxwell. Interpretation of Statutes.

JUSTICE, social, economic and political ; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship, EQUALITY of status and of opportunity ; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the nation ; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twentysixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT and GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION".)

প্রস্তাবনা কখনই শাসনতন্ত্রের কার্যকরী অংশের অন্তর্গত নয়। প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্র গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধ করিয়াছে "ভারতের জনগণ"। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতের মাত্র শতকরা ১৪ জন লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিকের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা "ভারতের জনগণের" পক্ষে কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে এবং বিধিবদ্ধ করিতে পারেন কিনা। কিন্তু ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, যেহেতু গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী দেশে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান হইতেছে এবং এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার পরিচালনার ববস্থা ও জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে জনগণ সম্পূর্ণভাবে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত মানিয়া চলিয়াছে, সেইজন্য এই শাসনতন্ত্রকে আমরা "ভারতের জনগণের" শাসনতন্ত্র বলিতে পারি। মুখবন্ধ অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আইনগত এবং নৈতিক ভিত্তি হইল ভারতের জনগণ। সুতরাং জনগণ সরকারের সমালোচনা করিতে পারিলেও সংবিধানের অমর্যাদা করিতে পারে না।

'ভারতের জনগণ' কথাটির তাৎপর্য

ভারতের জনগণ নিজেরাই নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে ; সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত সরকার হইতেছে জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে ; এবং মর্যাদা ও সুযোগের সমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। দেখা যাইতেছে, মুখবন্ধের প্রথমেই ভারতীয় শাসনতন্ত্র যে সম্পূর্ণভাবে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র তাহা সূচিত হইয়াছে।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। "সার্বভৌম" কথাটির তাৎপর্য হইল ভারতবর্ষ সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। ভারত সরকারের বিভিন্ন কাজে কোন বিদেশী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ইহার ফলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতিবন্ধক কিনা।

কমনওয়েলথের সদস্যগণকে পূর্বে ইংলণ্ডের রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইত। কিন্তু ভারতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে কিনা সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠায় ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির করা হয় যে ভারত প্রজাতন্ত্র হইলেও ইচ্ছা করিলে কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্যাদার সহিত থাকিতে পারে। ভারতকে রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে না; স্বেচ্ছামূলকভাবে রাজশক্তিকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইবে। কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে থাকিবার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ভারত সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে যে কোন সময়েই কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। সুতরাং ভারতের কমনওয়েলথে থাকিবার সিদ্ধান্ত হইতেছে আইনের বাধ্যবাধকতামুক্ত (extra-legal) সিদ্ধান্ত। ভারতের নিকট হইতে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী আনুগত্য পাইবেন না; তিনি শুধু কমনওয়েলথের প্রতীক হিসাবেই থাকিবেন। ভারত নিজেই ইহার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবে এবং সরকার গঠন করিবে। সরকারের নীতি যে বৃটিশ সরকারের নীতির অনুসরণে গঠিত হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রকৃতপক্ষে বিগত কয়েক বৎসরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এবং ইংলণ্ড ও কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যদের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ, ইংলণ্ড কর্তৃক ফ্রান্সের সহযোগিতায় সুয়েজখাল আক্রান্ত হইলে গ্রেটবৃটেনের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গিয়াছিল। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে না, অথবা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে না। সুতরাং কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় ভারতের সার্বভৌমত্ব মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমাদের শাসনতন্ত্রটি শুধু একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রই গঠন করে নাই, এই সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রটিকে গণতান্ত্রিকও করিয়াছে।

"সার্বভৌম" কথাটির তাৎপর্য

কমনওয়েলথের সদস্য থাকায় ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা

ভারতীয় জনগণ এই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি জনগণের হাতেই ন্যস্ত। প্রস্তাবনায় প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়, এবং চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে জনগণকে কতিপয় মৌলিক অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। জনগণের এই অধিকারগুলিই শাসনতন্ত্রটিকে গণতান্ত্রিক করিয়াছে।

ভারতীয় গণতন্ত্র পার্লামেন্টের শাসন ব্যবস্থার উপর ভিত্তিশীল। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের দেশে মন্ত্রিসভাচালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সরকার জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকে এবং জনসাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনা করিয়া থাকে।

ভারতে যে ধরণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় করা হইয়াছে তাহার স্বরূপ অনুধাবন করা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক সরকারের তাৎপর্য

গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে; কোনও সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেলা করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারে সকলেরই সমান সুযোগ সুবিধা থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক জনগণের মধ্যে যে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকিবে না, তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকার সকলকেই সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে নাগরিকদের কর্মনৈপুণ্যের বৈষম্য যথাযথক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। বার্ণসের (Burns) মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লইয়া গঠিত সমাজ নয়,—গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া যাহারা সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী—যাহাদের প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ।[৬] সমাজজীবন, জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে সব লোকেরই সমান অধিকার অর্থ নৈতিক থাকে।

বার্ণস্ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও তাৎপর্য বুঝিতে পারি। রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেই যথেষ্ট মনে করিলে চলিবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সব নাগরিকেরই সমান অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রেও সেই প্রকার জন্ম এবং অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকদের

৬। "...a Society, not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole" Burns —Political Ideals (Chapter on 'Democracy'),

প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না, অথবা তাহাদের মধ্যে সেইজন্য সুযোগ-সুবিধার তারতম্য থাকে না। ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ধনী-নির্ধনের মধ্যেও বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার তারতম্য হইতেছে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাধারণতঃ নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সমান স্বাধীনতা, এবং সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার,—ইত্যাদি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে। ভারতীয় নাগরিকগণ এই অধিকারগুলি লাভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে সকলেরই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার সমান অধিকার থাকে। গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলির হাতেই শিল্প পরিচালনার ভার থাকে যাহাতে স্বাধীন, বেসরকারী শিল্প প্রয়াসে (free private enterprise) কোনপ্রকার গোলযোগ না হয় অথবা শিল্প বিরোধের (industrial disputes) কারণগুলি দূর করা যায়। কোন কোন চিন্তানায়কের মতে অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning) পরস্পর-বিরোধী কর্মসূচী। অষ্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক হায়েক (Prof. Hayek) বলেন "Economic planning is a road to serfdom." কিন্তু ভারতবর্ষে গণতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) চালু করা হইয়াছে এবং আশা করা যায়, ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ হইবে না। এই দুই প্রকার গণতন্ত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও অপরিহার্য

আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের ৩২৬ নম্বর ধারায় ২১ বৎসর বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। নাগরিকগণ যে রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থায় আস্থা রাখেন, সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচন শেষ হইলে যে রাজনৈতিক দল আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভাকে ইহার কাজের জন্য আইন সভার সদস্যদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোনও রাষ্ট্র প্রকৃতই গণতান্ত্রিক কিনা তাহা বিচার করিবার উপায় আছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীন মত প্রচার করিবার অধিকার স্বীকার করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ যে কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিস্বাধীনতা

সুরক্ষিত থাকে। শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণকে মৌলিক অধিকার প্রদান করিয়া আমাদের শাসনতন্ত্রটি গণতান্ত্রিক হইয়াছে।

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক পদ (a political status), একটি নৈতিক ধারণা (an ethical concept) এবং একটি সামাজিক অবস্থা (a social condition)। তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রের একটি নৈতিক মূল্য আছে। জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয়া সরকারের কাজ করিতে হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য "সকলের তরে সকলে আমরা" এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নাগরিকদের কাজ করিতে হয়। সরকার যদি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক হয়, তবে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।[৭]

কিন্তু শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর অনেক বছর কাটিয়া গেলেও এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা করা হইলেও ভারতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধিই পাইয়া চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন লেখক মন্তব্য করিয়া থাকেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কিছুটা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বহুলাংশে বজায় থাকায় সমাজে সমষ্টিগত কল্যাণ স্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানার যথাযথ পরিবর্তন ও উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানা প্রবর্তন করা ছাড়া প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের প্রকৃত সার্থকতা তখন যখন যখন ইহা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করে, যদি দেশে অর্থ নৈতিক বৈষম্য থাকে, তবে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কোনটাই প্রকৃত গণতন্ত্রের সৃষ্টি করিতে পারে না।[৮]

সর্বশেষে প্রস্তাবনা অনুযায়ী আমাদের শাসনতন্ত্রটি একটি "প্রজাতন্ত্র" গঠন করিয়াছে। প্রজাতন্ত্রে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন চিহ্ন থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতও একটি প্রজাতন্ত্র। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের প্রধান। মূল রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠন করিয়া পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির রাজপরিবার হইতে রাজপ্রমুখ

"প্রজাতন্ত্র"

৭। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন "আমরা যে নূতন ভারত তৈয়ারী করিব, তার প্রতিষ্ঠা হবে মানুষজাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর" জওহরলাল নেহেরুর ভাষায় :—

৮। "If it is to have meaning, Political democracy must gradually or if you like, rapidly lead to economic democracy. If there is economic quality in the country, all the political democracy and all the adult suffrage in the world cannot bring about real democracy." Nehru.

নিযুক্ত করার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করা হইয়াছে। পূর্বের জম্মু ও কাশ্মীরের যিনি 'সদর-ই-রিয়াসৎ' অর্থাৎ রাজ্যের শাসনকর্তা, তিনিও রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন এবং সেই নির্বাচন ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত হইতেন। বর্তমানে কাশ্মীরে সদর-ই-রিয়াসৎ পদটি তুলিয়া দিয়া রাজ্যপালের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারত প্রকৃতই একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে (Sovereign Democratic Republic) গড়িয়া তুলিবার কথা বলা হইয়াছে।

যে কোন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও নীতির বর্ণনা এবং ইহার আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে একটি ইংগিত দেওয়া হয়। প্রস্তাবনাই শাসনতন্ত্রের কার্যকরী অংশের অন্তর্গত নয়। প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধ করিয়াছে "ভারতের জনগণ।" যেহেতু গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী দেশে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা জনগণ সম্পূর্ণভাবে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত মানিয়া চলিয়াছে, সেইজন্য এই শাসনতন্ত্রকে আমরা "ভারতের জনগণের" শাসনতন্ত্র বলিতে পারি। প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আইনগত এবং নৈতিক ভিত্তি হইল ভারতের জনগণ। সুতরাং জনগণ সরকারের সমালোচনা করিতে পারিলেও সংবিধানের অমর্যাদা করিতে পারে না।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। "সার্বভৌম" কথাটির তাৎপর্য হইল, দেশ সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। ভারত সরকারের বিভিন্ন কাজে কোন বিদেশী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ইহার ফলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতিবন্ধক কিনা। কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে থাকিবার জন্য ভারতের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ভারত সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে যে কোন সময়েই কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। ভারতের নিকট ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী আনুগত্য পাইবেন না; তিনি শুধু কমনওয়েলথের প্রতীক হিসাবেই থাকিবেন। কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় ভারতের সার্বভৌমত্ব মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমাদের শাসনতন্ত্রটি শুধু একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রই গঠন করে নাই; এই সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রটিকে গণতান্ত্রিকও করিয়াছে। ভারতীয় জনগণ এই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি জনগণের হাতেই ন্যস্ত। প্রস্তাবনায় প্রত্যেক নাগরিককে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য ইহা গণতান্ত্রিক। প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি প্রজাতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ভারতে প্রজাতন্ত্র গঠিত হইয়াছে।

Exercise

1. The preamble to the Constitution of India states that India "shall be a Sovereign, Democratic Republic." Explain the statement. (C. U. B. A. Part. II, 1964.)

[ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে "ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হইবে" ;—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।]

(৪১-৪৭ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by the Philosophy of the Indian constitution ? How far has it been established in the preamble to the constitution ?

[ভারতীয় শাসনতন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ? এই দার্শনিক তাৎপর্য শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার মধ্যে কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।]

(৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা ; ৪১-৪৭ পৃষ্ঠা)

3, How far is the Indian constitution democratic ? Give your answer with reference to the Preamble to the Constitution.

[ভারতীয় শাসনতন্ত্র কতটা গণতান্ত্রিক ? শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা অবলম্বনে প্রশ্নটির উত্তর দাও।]

(৪১-৪৭ পৃষ্ঠা ; ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা)

পরিশিষ্ট

ভারত ও কমনওয়েলথ্ অফ্ নেশন্স্
(India and the Commonwealth of Nations)

কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে কিনা এই প্রশ্নের অবতারণা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে করিয়াছি। এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জানিতে হইবে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সদস্য দেশগুলি (যেমন ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা) কি মর্যাদা ভোগ করে। পূর্বে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ছিল। ক্রমশঃ এই দেশগুলি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করে এবং চূড়ান্তভাবে এই দেশগুলি বৃটিশ ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করে। বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে এই দেশগুলি যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করে। রাজশক্তির প্রতি এই দেশগুলির আনুগত্য একান্তই মামুলি (formal); এই আনুগত্যে পিছনে নীতিগতভাবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির কোন বাধ্যবাধকতা নাই।[১]

কমনওয়েলথের বৈশিষ্ট্য

১। ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনিস্টার আইনে বলা হয়, 'They (Great Britain and the Dominion) are autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations."

বর্তমানে বৃটিশ কমনওয়েলথ্ অফ নেশন্‌স্ কথাটির পরিবর্তে "কমনওয়েল্‌থ্ অফ নেশন্‌স্" কথাটি ব্যবহার করা হয়। পূর্বে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে গভর্নর জেনারেল বলা হইত এবং তাহাদের নিয়োগ করিবার সময়ে গ্রেটবৃটেনের রাজার সম্মতির দরকার হইত। ভারত এবং পাকিস্তান প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারত এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে গ্রেটবৃটেনের রাজার সম্মতির প্রয়োজন হইত। এখনও ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেলের নিয়োগ করিবার সময় ইংলণ্ডের রাণীর মামুলি সম্মতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পর ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার সময়ে গ্রেটবৃটেনের রাজার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। শুধু তাহাই নহে, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পর ভারত যে কোন সময়েই কমনওয়েল্‌থ অফ্ নেশন্‌স্ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। শুধু ভারতকে কমনওয়েল্‌থ্ অফ্ নেশন্‌সের অন্তর্ভুক্ত রাখিবার স্বার্থেই এই নিয়মের প্রবর্তন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়।[১]

"বৃটিশ" কমনওয়েলথের পরিবর্তে শুধু "কমনওয়েলথ"

ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পর কমনওয়েলথের পরিবর্তন

এই ঘোষণার পর হইতে ভারতকে কমনওয়েলথের সদস্য হইয়াও রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হইবে না। গ্রেটবৃটেনের রাজশক্তি শুধু কমনওয়েলথের প্রতীক হিসাবে প্রধান থাকিবেন। ইংলণ্ডের রাণীকে কমনওয়েলথের নিছক প্রতীক হিসাবে মানিয়া লইলে কোন সদস্যরাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

রাজশক্তির প্রতি এই সাধারণ আনুগত্যের বন্ধন চলিয়া যাওয়ার পর কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য কমনওয়েলথ্ নাগরিকতার (Commonwealth citizenship) প্রবর্তন হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকগণ কমনওয়েল্‌থ্ নাগরিকের মর্যাদা ভোগ করে এবং কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথ্ নাগরিকতা

১। "The Government of India have informed the other Governments of the Commonwealth of the intention of the Indian people that under the new constitution which is about to be adopted, India shal become a Sovereign Independent Republic. The Government of India have declared and affirmed India's desire to continue her full membership of the Commonwealth of Nations and her acceptance of the king as the symbol of free association of its independent member-nations and as such the Head of the Commonwealth.

The Government of the other countries of the Commonwealth, the basis

নাগরিক হিসাবে একটি সদস্য রাষ্ট্রের অধিবাসী অপর সদস্যরাষ্ট্রের নিকট বিদেশী নয়। বিখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ জেনিংস (Jennings) বলেন, "The British Commonwealth of Nations is founded partly on sentiment and partly on mutual self-interest. In some of the Dominions the one predominates ; in others more importance is attached to the second."

ভারত কেন কমনওয়েলথের সদস্য রহিয়া গেল ?

ভারত স্বাধীন, সার্বভৌম এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াও কেন কমনওয়েলথের সদস্য রহিয়া গেল এই বিষয়ে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন উঠে। আমরা উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখিতে পাই কমনওয়েলথের সদস্য থাকিবার ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং কমনওয়েলথের সদস্য হইবার দরুণ অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত উপকৃত হইয়াছে। কমনওয়েল্থ্ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে কলম্বো পরিকল্পনার (Colombo Plan) চুক্তি হইয়াছে, ইহাতে ভারত লাভবান হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কমনওয়েল্থ্ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সাংস্কৃতিক এবং কারিগরি সহযোগিতা বিদ্যমান, তাহার সম্পূর্ণ সুফল ভারত লাভ করিয়াছে। অথচ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় ভারতের বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই ক্ষেত্রে আমরা কতিপয় উদাহরণ দিতে পারি ; বৃটেন এবং ফ্রান্স সুয়েজখাল আক্রমণ করিলে ভারত মুক্তকণ্ঠে ইহার নিন্দা করিয়াছিল। বৃটিশ নীতির দ্বারা তখন ভারত প্রভাবিত হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের কঠোরতম নিন্দা ভারত করিয়াছে, এবং ইহার ফলেই ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিয়াও ভারত সর্বদা জোট নিরপেক্ষ রহিয়াছে। কমনওয়েলথের মধ্যেই একটি সদস্যরাষ্ট্র অপর একটি সদস্যরাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে পারে। ভারত এবং পাকিস্থানের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ইহা প্রায়ই দেখা যায়। সুতরাং কমনওয়েলথের সদস্য থাকায় প্রজাতন্ত্রী ভারতের মর্যাদা কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং ভারত যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী বজায় রাখিতে চায় ইহা তাহারই নিদর্শন।

---

of whose membership of the Commonwealth is not hereby changed accept and recognise India's continuing membership in accordance with the terms of this declaration. Accordingly the United Kingdom, Canada, Australia, Newzealand, South Africa, India, Pakistan and Ceylon hereby declare that they remain united as free and equal members of the Commonwealth of Nations, freely co-operating in the pursuit of peace, liberty and progress." (The Commonwealth Declaration of April, 1949.)

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ
(Nature of the Indian Federation)

[যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি—যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ; কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সহাবস্থান, কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, লিখিত শাসনতন্ত্র, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন—রাজ্যসরকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না,—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন সর্ত, ভারতে ইহা কতটা পূরণ হইয়াছে,—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি।]

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of a Federal State) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে আমরা জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ("A federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconcilable claims of national sovereignty and state sovereignty.") ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং জাতীয়তাবোধ হয়ত কয়েকটি রাষ্ট্রকে সংঘবদ্ধ করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার পক্ষে অনুকূল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে রাজী নাও থাকিতে পারে। এই রকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৃহত্তর সংঘ (Union) গঠন করিবার প্রেরণা আসিতে পারে। এই বৃহত্তর সংঘে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যেই (যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে) নিজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি লিখিত এবং সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে এই লিখিত শাসনতন্ত্র। সেইজন্য এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে প্রদান করায় একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে, অপরদিকে তেমন সমগ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও জাতীয় ঐক্য দৃঢ় ও সংহত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা লিখিত শাসনতন্ত্রই নির্ধারণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর ভিত্তি

দেশের সামগ্রিক ঐক্য এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট থাকে। প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণতঃ (ভারতের ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রথমত, তিনি নিজের স্থানীয় রাজ্যের নাগরিক এবং দ্বিতীয়ত, তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। প্রত্যেক নাগরিকই (তিনি যে কোন রাজ্যের অধিবাসী হউন না কেন) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার উচ্চতর কক্ষে (আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) সমান প্রতিনিধিত্ব থাকায় জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে। যদিও ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব নাই, তবুও ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের পথ মোটেই সংকুচিত হয় নাই, বরং প্রশস্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবোধ প্রসারিত হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনও বাঁটোয়ারা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অটুট থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে ইহার সার্বভৌমত্ব সবগুলি রাজ্যসরকারই স্বীকার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে মিলন ঘটাইবার প্রয়াসে একটি রাজনৈতিক কৌশল।[১] যদি কখনও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Federal State):
যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই :—

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সহাবস্থান

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকারগুলি সহাবস্থান (co-existence of governments) থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়। স্থানীয়

১। "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights".

শাসন ব্যাপারে এবং স্থানীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা রাজ্যসরকারগুলিকে প্রদান করা হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্র

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় থাকে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্যসরকার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সহজে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নিজের কর্ম পরিধির পরিবর্তন করিতে না পারে।

স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা (existence of an independent and impartial judiciary) থাকে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরণের বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ আইনবিভাগের বিভিন্ন নির্দেশ বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক (Guardian of the Constitution) বলা হয়।

দ্বি-নাগরিকতা

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা (Double citizenship) থাকে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েরই আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা চালু করা হয় না। ভারতের নাগরিকগণ শুধু ভারতেরই নাগরিক। রাজ্যসরকারের নিকট হইতে কাহাকেও নাগরিকতা লাভ করিতে হয় না।

কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন

ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হয়। রাজ্যসরকার-গুলি ইহাদের নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে দেশের মোট রাজস্বের একটি অংশ পাইয়া থাকে।

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজ্যসরকারকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কোনও রাজ্যসরকার (সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হইতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক

ছেদ করিয়া আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মূল রাষ্ট্র আলাদাভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ইহারা যে কোন সময়েই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে আলাদা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবে এইপ্রকার ব্যবচ্ছেদের (secession) কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একই রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি পরিচালনা করিয়া থাকে। সেই দেশে দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে মূলরাজ্যগুলির বাহির হইয়া আসার কোনও সম্ভাবনা নাই।

রাজ্যসরকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে ব্যতিক্রম আছে

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত (condition essential to the formation of a federal union):

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয়। ইহার মধ্যে একটি ভাব যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মূল রাষ্ট্রকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। এই ভাবকে আমরা কেন্দ্রমুখীন ভাব (centripetal tendency) বলিতে পারি। অপর ভাবটি বিভিন্ন মূল রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ টিকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। উহাকে আমরা বিকেন্দ্রী ভাব (centrifugal tendency) বলিতে পারি। পরস্পর বিরোধী এই দুইটি ভাবের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কয়েকটি সর্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কেন্দ্রমুখীন ভাব এবং বিকেন্দ্রী ভাবের সমন্বয়

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (Geographical contiguity)। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকিলেই বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবোধ আসে। যদি ইহাদের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র না থাকে, তবে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাবের আদানপ্রদান হইতে পারে না এবং তাহা জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটি বৃহৎ অংশের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র নাই। ইহার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শাসনব্যবস্থায় অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভৌগোলিক যোগসূত্র

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের

অধিবাসিগণের জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে; কিন্তু, তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। যদি মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিকৃত জাতীয়তাবোধ (perverted nationalism) দেখা দেয় এবং যদি ইহাদের পারস্পরিক সংঘাত সর্বদা লাগিয়াই থাকে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সেইজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে, মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যের।

জাতীয়তাবোধ

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আয়তন, সঙ্গতি ও সম্পদ এবং প্রধানতঃ রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সফল হয় না। মূলরাষ্ট্রগুলির আয়র্তন এবং সম্পদের বৈষম্য কিছু না কিছু থাকিবেই। কিন্তু যাহা একেবারে অপরিহার্য, তাহা হইতেছে ইহাদের রাজনৈতিক সমতা। জাতীয় ব্যাপারে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রের সমান ভূমিকা থাকা চাই যাহাতে একটি রাষ্ট্র বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে না পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে প্রত্যেকটি মূল রাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক সমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ক্যানাডার সিনেট সভাও প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। ইহার ফলে কোনও মূলরাষ্ট্র সংখ্যাধিক্যের সুযোগ লইয়া অন্যান্য রাষ্ট্রকে নিজের অধীনে আনিতে পারে না।

মূলরাজ্যগুলির মধ্যে সমতা

চতুর্থত, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক স্বার্থও সাফল্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য বিশেষ সহায়তা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে আঞ্চলিক বৈষম্য (regional disparities) দূর করার প্রচেষ্টা।

আঞ্চলিক স্বার্থের সংরক্ষণ

পঞ্চমত, একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, এই আদর্শ হইতেছে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। জাতীয় ঐক্যবোধ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মকুশলতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হয় না। সদাসচেতন জনমতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

উচ্চতর আদর্শের প্রেরণা

যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকা একেবারে অপরিহার্য। তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে

শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশ করে। ইহার পর সমুদয় ক্ষমতা (residuary powers) বিভিন্ন মূলরাষ্ট্র অথবা রাজ্যসরকারের হাতে আসে।

লিখিত শাসনতন্ত্র

যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারের পরস্পরের মধ্যে শাসনক্ষমতা সম্পর্কে কোনও প্রকার বিরোধ অথবা সংঘাতের সৃষ্টি না হয় সেজন্য শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি সরকারেরই বিভিন্ন ক্ষমতা লিখিত থাকে। এই ব্যবস্থা না থাকিলে মূলরাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেইজন্যই একটি লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারণ করে ইহার শাসনতন্ত্র। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে শাসনতন্ত্রটিকে লিখিত হইতেই হইবে। তাহা না হইলে শাসনব্যবস্থায় ইহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বর্তমানে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই লিখিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের অন্যতম উপাদান ভৌগোলিক যোগসূত্র ভারতে আছে। অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু, ইহা খুবই উপেক্ষণীয়। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকায় ভারতে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের অধিবাসিগণ একই জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ। ধর্ম, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের অধিবাসিগণের মধ্য হইতেএকজাতীয়তাবোধের বিলুপ্তি ঘটে নাই। ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং রাজ্য যদিও মিলন চায়, তবুও তাহারা সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি চায় না। সাধারণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের

ভারতের এই সর্ত কতটা পূরণ হইয়াছে

জন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলি পরস্পর মিলিত হইয়াই থাকিতে চায়। তৃতীয়ত, ভারতে বিভিন্ন মূল রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় একই প্রকার। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য নাই, তাহা নহে। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমুদয় সর্তই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইন সভায় বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব লোকসংখ্যার ভিত্তিতে হইয়াছে,—রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে নহে। ভারতে দ্বি-নাগরিকতা প্রথাও নাই এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ক্রমশঃই এককেন্দ্রিক সরকারের (Unitary Government) দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the Indian Federation):

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মোট ২২টি রাজ্য (নাগারাজ্য ও হরিয়ানা সমেত) এবং ৯টি (নেফা সমেত) কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই

আলাদা সরকার আছে এবং সেইগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে, ক্ষমতার বণ্টন, লিখিত শাসনতন্ত্র, অনমনীয় শাসনতন্ত্র, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য, স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলি বৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে (পরিপূর্ণভাবে না হইলেও) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অনুসৃত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Union), রাজ্য (State) এবং যুগ্ম (Concurrent) তালিকার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলির সংখ্যা হইতেছে ৯৭টি। রাজ্য তালিকায় ৬৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং যুগ্মতালিকায় ৪৭টি বিষয় স্থান পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় আইন-প্রণয়ন সম্পর্কিত সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে।

ক্ষমতার বণ্টন

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে মূল রাষ্ট্রগুলি যে মর্যাদা ভোগ করে, ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূলরাজ্য সেই মর্যাদা পায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে "মূলরাষ্ট্রের অধিকার" (State rights) হিসাবে যে বিধান আছে, ভারতের শাসনতন্ত্রে তাহা নাই। কারণ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে ভারতের মূল রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব ছিল না; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে মূল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম সত্তা ছিল। তাহা ছাড়া, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৪৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কিত ক্ষমতাগুলি (Residuary powers) কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা মূল রাষ্ট্রগুলি ভোগ করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত; রাজ্যসরকারগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। কিন্তু ভারতে শুধু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আলাদা শাসনতন্ত্র গঠন করিবার ব্যবস্থা আছে; অন্যান্য মূল রাজ্যগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র নাই।

Residuary power কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে

তৃতীয়ত, ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে (১৫৫-১৫৬ নম্বর ধারা)। আবার যখন রাজ্যপাল ইচ্ছা করেন (২০১ নম্বর ধারা), তখনই রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাইতে পারেন। কেরালায় কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভা থাকাকালে সেই রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাবিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিধানগুলি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলির বিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা এই বিধান দেখিতে পাই না।

রাজ্যপালের নিয়োগ রাষ্ট্রপতির অধীন

ইহা হইতেই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রিকতা প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা দেখা যায় না।

চতুর্থত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের অভিমত অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে "কতিপয় অবিনশ্বর রাজ্যের দ্বারা গঠিত একটি অবিনশ্বর যুক্তরাষ্ট্র" ("...an indestructible Union composed of indestructible States")। অমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে কোন মূল রাষ্ট্রের আইনসভার সম্মতি ব্যতিরেকে ইহার সীমানা বা আয়তনের পরিবর্তন করা যায় না। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে শুধু পার্লামেণ্টই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কোন মূল রাজ্যের সীমানা বা আয়তন পরিবর্তন করিতে পারে, (৪ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ), এবং এইজন্য মূল রাজ্যের আইনসভার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিলটি পার্লামেণ্টে সুপারিশ করিবার পূর্বে শুধু রাজ্য সরকারের আইনসভার অভিমত জানিয়া লইবেন। কিন্তু, শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর ধারার সংশোধন অনুযায়ী ইহাও রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রগুলির ন্যায় ভারতের রাজ্যগুলি অবিনশ্বর নহে। রাজ্য পুনর্গঠন আইন (১৯৫৬) অনুযায়ী রাজ্যের সংখ্যা ২৭ হইতে ২২ পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

রাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারণে পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ

পঞ্চমত, রাজ্যগুলির অধিকারের সমতা সম্পর্কিত কোন প্রতিশ্রুতি ভারতের শাসনতন্ত্র দেয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ৫০টি মূল রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব আছে। ভারতীয় পার্লামেণ্টের রাজ্যসভায় ইহা নাই। ইহা হইতেই ভারতীয় মূলরাজ্যগুলির মর্যাদার অসমতা এবং সমগ্রদেশের শাসনব্যবস্থার এককেন্দ্রিকতা প্রমাণিত হয়।

ভারতে রাজ্যগুলির অধিকারের সমতা নাই

ষষ্ঠত, ভারতের নাগরিকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের ন্যায় দ্বি-নাগরিকতা ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্রের ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই নাগরিক, কোন রাজ্য সরকারের নাগরিক নহেন।

ভারতে একনাগরিকতা দেখিতে পাওয়া যায়

সপ্তমত, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ যে শুধু রাজ্যসরকারের আইন বা বিধান অনুযায়ীই কাজ করেন তাহা নহে,—তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত আইনগুলিকেও কার্যকর করার চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া, রাজ্যসরকারের উচ্চপদস্থ সচিবগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের ৩১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সর্বভারতীয় সরকারী কাজেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ

কর্মচারীগণও অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যসরকারের কিছু কাজ করিয়া দিয়া থাকেন।

শাসনসংক্রান্ত কাজে রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ

শাসনতন্ত্রের ২৫৬ নং ধারা অনুযায়ী যে কোন রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা এমনভাবে নির্বাহ করিতে হইবে যেন ইহা পার্লামেণ্টের প্রণীত আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ থাকে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ রাজ্যের সরকারকে যে কোন প্রকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের ২৫৭নং ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্যসরকারই সংশ্লিষ্ট রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারিবে না। দেশের যানবাহন ব্যবস্থা, রেলপথ, জাতীয় সড়ক এবং জলপথের ক্ষেত্রে রাজ্য-সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৬৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম-চারীদের সারা ভারত ব্যাপী যে প্রতীক ধর্মঘট হয়, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অর্ডিন্যান্স কেরলের যুক্তফ্রণ্ট সরকার ঠিকভাবে কার্যকর করেন নাই বলিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তর অভিযোগ আনেন এবং কেরল সরকার এই প্রশ্ন করেন যে রাজ্য সরকারের সহিত পরামর্শ না করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোনও অর্ডিন্যান্স রাজ্যসরকারের উপর চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা। কিন্তু, শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার শাসনবিভাগের কাজে যে কোন প্রকার নির্দেশ রাজ্যসরকারের নিকট পাঠাইতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ২৫৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্যকে কিছু শাসনসংক্রান্ত কাজের ভার দিতে পারে, এবং ২৫৮(ক) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যসরকারও শাসনবিভাগ সম্পর্কিত কতিপয় কাজের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে পারে। যদিও শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন আছে, তবুও শাসনকার্য সম্পর্কিত ব্যাপারে উভয় সরকারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। সম্ভবতঃ শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ত্রুটিগুলি এইভাবে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।

অষ্টমত, দেশে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন, তাহা শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র-প্রবণ করিয়াছে। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে কোন রাজ্যের শাসন পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। যদি কোন রাজ্য সরকার কখনও গুরুতর আর্থিক সংকটের অথবা শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন হয়, তবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া সেই রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ রাজ্য সরকারগুলিকে কতিপয় ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু, জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত সমুদয় বিষয়ে আইন

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা

প্রণয়ন করিতে পারে (শাসনতন্ত্রের ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭ নম্বর ধারা)। শুধু তাহাই নহে, জরুরী অবস্থা ছাড়াও পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় লইয়া পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা উচিত, তবে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের ২৪৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান এইটুকু আছে যে রাজ্যসভার সম্মতি ব্যতীত রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত হইতে পারে না।

নবমত, অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও রাজ্য সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আয়কর, মূলধন মুনাফা কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য করিবার এবং সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যদিও বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণই এই কর প্রদান করে। তাহা ছাড়া, আবগারী শুল্ক এবং অন্যান্য বিভিন্ন কর ধার্যের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। রাজ্য সরকারের লেন-দেন ও আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যে একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল (Accountant General) থাকেন, তিনিও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। একাউন্‌টেণ্ট জেনারেলের উপর যিনি কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল (Comptroller and Auditor General) থাকেন, তাঁহাকেও রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। রাজ্য সরকারগুলি আর্থিক সাহায্যের জন্য সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকে, এবং রাজ্য সরকারগুলি কতটা আর্থিক সাহায্য পাইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশন (Finance Commission) নিযুক্ত করেন। ফিনান্স কমিশনের বিধানগুলি রাজ্য সরকারগুলিকে মানিয়া চলিতে হয়।

অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

দশমত, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষাগুলির যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হইলেও সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সরকারী ভাষা প্রবর্তিত করার চেষ্টা হইতেছে। ইহাও আমাদের শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রিকতার ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয় নাগরিকদেরও বর্তমানে একই জাতীয়সমষ্টির (nationality) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল আছে। যদিও শাসনতন্ত্রের সাম্প্রতিক সংশোধন অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের জুলাই মাস হইতে সেই রাজ্যগুলিতে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে, তবুও সেইগুলি মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। শাসনতন্ত্রের এই

ভাষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রিকতা

বিধানগুলি আমাদের শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক প্রমাণিত করে।

সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক সন্ধির সর্তাদি পালনের জন্য পার্লামেণ্ট যে কোন বিষয়ে যে কোন রাজ্যের জন্য আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, তুই বা আরও বেশী রাজ্যসরকার অনুরোধ করিলে পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার নিয়মকানুন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিতে একই প্রকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও মূল রাষ্ট্রগুলির বিচার বিভাগ পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্ট একক-ভাবে আইন-প্রণয়ন করিয়া মূল রাজ্যগুলির সীমানার পরিবর্তন করিতে পারে। এই কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে যদিও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের মতামত জানিতে হয়, তবুও সে ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের মতামত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নহেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আইন রাজ্যসরকারগুলি পালন করিতে বাধ্য হয়। তাহা না হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের কর্তৃত্ব জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে।

রাজ্য সরকারের তরফে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন

তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি শাসন বিভাগের সর্বত্রই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য। সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, বিশেষতঃ পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অক্লান্ত প্রয়াস, ইত্যাদি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাজ্যসরকারগুলির ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা সূচিত করে। এইজন্যই বলা হয়, ভারতীয় শাসনতন্ত্র কাঠামোর দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও প্রকৃতির দিক হইতে এককেন্দ্রিক। সেইজন্য অধ্যাপক হোয়ের (Prof. Wheare) ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে এই শাসনতন্ত্র হইতেছে "অর্ধ-পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় "।[১]

কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অন্যতম বিশেষজ্ঞ শ্রীদুর্গাদাস বসু এই যুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয়ও নয় আবার এককেন্দ্রিকও নয়, ইহা উভয়েরই সংমিশ্রণে গঠিত।[২]

১। "A system of government which is quasifederal...a Unitary State with subsidiary federal features rather than a Federal State with subsidiary unitary forces." Wheare—Federal Government (1951) P. 18

২। "The constitution of India is neither purely federal nor purely unitary but is a combination of both. It is a union or composite state of a novel type. It enshrines the principle that inspite of federation the national interest ought to be paramount." D. Basu—Commentary on the Constitution of India, vol. I.

আমাদের শাসনব্যবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিক নয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার নীতিগুলি যে বেশ কিছু পরিমাণে অনুসৃত হয় তাহার প্রমাণ হইতেছে এই যে দুই বৎসরেরও অধিককাল কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস এবং কেরালায় সরকার গঠনকারী কমিউনিস্ট দল পরস্পরের আদর্শগত বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও একসংগে শাসন কার্য চালাইয়াছে। গত চতুর্থ নির্বাচনের পর যদিও কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিবার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে, তবুও প্রায় অর্দ্ধেক রাজ্যে সরকার গঠন করার মত শক্তি তাহারা সঞ্চয় করিতে পারে নাই, এবং সেই সমস্ত রাজ্যগুলিতে সম্মিলিত বিরোধী দলগুলির নিকট ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত পরস্পরের ক্ষমতানুযায়ী শাসনকার্য চালাইয়া যাইতে বিশেষ অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে স্বাভাবিক সময়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হইবার চেষ্টা করে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে শাসনতন্ত্রের মধ্যেই এমন বিধান আছে যাহাতে প্রয়োজন হইলে শাসনব্যবস্থাটি এককেন্দ্রিক করা যাইতে পারে। তবে ইহাও মনে রাখা উচিত যে আমাদের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা ৫৫২টি দেশীয় রাজ্যকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করিয়াছে। এই সংহতি বজায় রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রটি কিছু পরিমাণে এককেন্দ্রিক না করিয়াও উপায় ছিল না।

সংক্ষিপ্তসার

কোন দেশের শাসনব্যবস্থা প্রকৃতই যুক্তরাষ্ট্রীয় কিনা তাহা জানিবার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের মনে রাখা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে আমরা জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমশক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ("A federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconcilable claims of national sovereignty and state sovereignty".) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই কতিপয় মূলরাজ্য নিজেদের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে সমর্পণ করে। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির সহাবস্থান (Co-existence of Government) দেখিতে পাই। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় এবং রাজ্য সরকারকে নিজ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ক্ষমতা দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং ক্ষমতার বণ্টন এই দুইটি হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; তাহা ছাড়া, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ জনগণের দ্বি-নাগরিকতা (double citizenship) দেখা যায়।

শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত ক্ষমতাগুলিও (Residuary Powers) সাধারণতঃ রাজ্য সরকারগুলি ভোগ করে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। (১) ভারতের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ কর্তৃত্ব দেখা যায়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাই, এই প্রকারের কোন ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই ভোগ করে। (২) ভারতীয় নাগরিকগণ দ্বি-নাগরিকত্ব ভোগ করে না, এবং তাহারা একই জাতীয় জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া শাসনতন্ত্র স্বীকার করে। (৩) দেশে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন, তাহা শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রপ্রবণ করিয়াছে। (৪) রাজ্য সরকারের যিনি প্রধান অর্থাৎ রাজ্যপাল এবং রাজ্যের শাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয় (৫) রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে চূড়ান্ত সম্মতির জন্য বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করিতে পারেন। (৬) কেন্দ্রীয় রাজ্য-সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হইলে, ভারতীয় পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় লইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (৭) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। (৮) রাজ্য হাইকোর্টের বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। (৯) রাজ্যগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র নাই; যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলি পালন করিয়া তাহাদের শাসন কাজ চালাইতে হয়। (১০) অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও রাজ্যসরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

Exercise

1. Discuss the nature of the Indian federation and state whether it strictly conforms to the principles of federation. Give your answer with reference to the American constitution. (৫৬-৬২ পৃষ্ঠা)

[ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ আলোচনা কর এবং ইহা প্রকৃতই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সহিত একরূপ কিনা বল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইতে উদাহরণ দেখাইয়া তোমার উত্তর দাও।]

2. "The constitution of India is neither purely federal nor purely unitary but is a combination of both. It is a union or composite state of a novel type."—Discuss. (৫৬-৬২ পৃষ্ঠা)

["ভারতের শাসনতন্ত্র প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয়ও নয়, প্রকৃত এককেন্দ্রিকও নয়; ইহা উভয়েরই একটি সংমিশ্রণ। ইহা একটি নূতন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র।" আলোচনা কর।]

3. "The Indian constitution is federal in structure, but unitary in substance." Elucidate. (৫৬-৬২ পৃষ্ঠা) (C. U, B. A. Part 1. 1965)

[ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এককেন্দ্রিক।]

4. Point out the distinguishing features of the Indian Federation.

[ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও।] (C. U. B. A. Part I, 1968)

(৫৬-৬২ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের এলাকা এবং ভারতীয়দের নাগরিকতা
(Territory of India and the Citizenship of the Indians)

[রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন—রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে পার্লামেন্টের ক্ষমতা—ভারতের বর্তমান এলাকা—ভারতীয় নাগরিকতা। ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন—ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান ব্যবস্থার প্রকৃতি।]

ভারতের এলাকা (Territory of India)ঃ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাম হইতেছে "ভারত"। রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম তপশীলে রাজ্যগুলি তিনভাগে বিভক্ত ছিল। 'ক' শ্রেণীতে নয়টি রাজ্য ছিল। ১৯৫৩ সালে অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইবার পর মূল রাজ্যের সংখ্যা ৯ হইতে ১০-এ দাঁড়ায়। 'খ' শ্রেণীতে ছিল আগেকার কতিপয় বৃহৎ দেশীয় রাজ্য (Native States), যেমন, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের মত দেশীয় রাজ্যসংঘ। 'গ' শ্রেণীতে ছিল অংশতঃ চীফ্ কমিশনার শাসিত অঞ্চল এবং অংশতঃ দেশীয় রাজ্য। তাহা ছাড়া, প্রথম তপশীলের 'ঘ' শ্রেণীতে ছিল আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতের এলাকা-ভুক্ত হইলেও ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য ছিল না। 'ক' শ্রেণীর রাজ্যগুলি ছিল পরাধীন ভারতের গভর্নর শাসিত প্রদেশ।

রাজ্য পুনর্গঠনের ভারতীয় এলাকা

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে মুখ্যতঃ ভাষার ভিত্তিতে এবং গৌণতঃ শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন, আর্থিক সুবিধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী রাজ্য পুনর্গঠন করা হয়। এই পুনর্গঠনের পর সব মূলরাষ্ট্রগুলিই একই মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। রাজপ্রমুখের পদ তুলিয়া দিয়া সর্বত্র রাজ্যপাল বা গভর্নরের পদ প্রবর্তিত হয় এবং শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধানকে সদর-ই-রিয়াসৎ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালের এক সংশোধনী দ্বারা সদর-ই-রিয়াসৎকেও রাজ্যপাল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিধানসভার সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত হন। ভারতের মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরেই আলাদা শাসনতন্ত্র বজায় রাখা হইয়াছে। তবে যদি সেই শাসনতন্ত্রের কোন বিধান ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কোন বিধানের সহিত সংঘাতের সৃষ্টি করে, তবে সেক্ষেত্রে ভারতীয় শাসনতন্ত্রই বলবৎ হয়।

১৯৫৬ সালের রাজ্য-পুনর্গঠন

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্ট কোন রাজ্য হইতে একটি এলাকা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যকে একত্রিত করিতে পারে, কোন রাজ্যের আয়তন বাড়াইতে পারে, কোন রাজ্যের আয়তন কমাইতে পারে, কোন রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করিতে পারে।[১] অবশ্য এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা যায় না। অর্থাৎ পার্লামেন্টের কোন বেসরকারী সদস্য নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই জাতীয় কোন বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করিতে পারেন না। ১৯৫৫ সালের শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধন অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের বিল কোন রাজ্যের আয়তন, সীমানা এবং নাম পরিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে, সেইক্ষেত্রে পার্লামেন্টে বিল উত্থাপন করিবার আগে রাষ্ট্রপতিকে এই বিলটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমণ্ডলীর মতামতের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামত অনুযায়ী চলিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য নহেন কিংবা বিলটি সংশোধিত হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করিলে মতামতের জন্য পুনরায় উহা রাজ্যটির নিকট প্রেরণ করার প্রয়োজনও নাই। সুতরাং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামতের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর ধারা প্রযুক্ত হইবে না। কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে এই নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যগুলির আইন পরিষদের সম্মতি ব্যতীত এবং কংগ্রেসের সম্মতি ব্যতীত রাজ্য পুনর্গঠন করা যায় না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেও ইউনিয়ন রিপাবলিকের সম্মতি ব্যতীত ইহার এলাকার পরিবর্তন করা যায় না। অষ্ট্রেলিয়ায় রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন তো হইবেই, উপরন্তু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গণভোটের প্রয়োজন হইবে।

রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তিন নম্বর ধারাটি পার্লামেন্টকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছে। ইহার পক্ষে একটি যুক্তি হইল এই যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল রাজ্যগুলির সীমানা বৃটিশ শাসকদের শাসন পরিচালনার প্রয়োজন অনুযায়ী চিহ্নিত হইয়াছিল। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এবং তাহা অনুযায়ী পার্লামেন্টের হাতে এমন

১। Parliament may by law—

(a) Form a new State by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any State; (b) Increase the area of any State; (c) Diminish the area of any State; (d) Alter the boundaries of any State; alter the name of any State. (Art. 3)

ক্ষমতা থাকা দরকার যাহার ফলে রাজ্য পুনর্গঠন এমনভাবে সম্পাদিত হয় যাহাতে দেশের ভৌগোলিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু ভাষা এবং অর্থনৈতিক কারণে এই যুক্তি মানিয়া লইলেও ইহা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গ হইতে বেরুবাড়ী বিচ্ছিন্ন করা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে সংবিধানের ৩নং ধারার একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা বেরুবাড়ী হস্তান্তরের মামলাটি বিবেচনা করার সময় সুপ্রীম কোর্ট প্রদান করিয়াছে। উক্ত সংবিধানের ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট সাধারণ আইনের মারফৎ ভারতের কোন অংশ অন্য কোন দেশকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে কিনা এই প্রসঙ্গে রায় দেওয়ার সময় সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করে যে অঙ্গ-রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আয়তনের পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারেই উক্ত ধারাটি প্রযোজ্য। অন্য দেশে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে সংবিধানকে উপযুক্তরূপে সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক।

১৯৫৩ সালে অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইবার পর ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে এবং ভারত সরকার একটি রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন গঠন করেন। ১৯৫৫ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করেন। (১) মোট রাজ্যসংখ্যা ২৭ হইতে ১৬-তে দাঁড় করাইতে হইবে এবং এই ১৬টি রাজ্য হইবে অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবংগ, (২) 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলিকে বিলোপ করিতে হইবে এবং 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলিকে 'ক' শ্রেণীর রাজ্যগুলির সহিত সমান মর্যাদাসম্পন্ন করিতে হইবে। (৩) মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় শাসনে থাকিবে। হিমাচল প্রদেশকেও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে হইবে। এই সুপারিশ প্রকাশিত হইবার পর কমিশনের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রবল হইয়া উঠে। সরকারও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন—দ্বিভাষাভিত্তিক বোম্বাই রাজ্য গঠন করিয়া। ১৯৫৬ সালে রাজ্যপুনর্গঠন আইন অনুযায়ী ১৪টি মূলরাজ্য এবং ৬টি ইউনিয়ন অঞ্চল (Union Territories) গঠিত হইয়াছিল। ১৪টি মূলরাজ্য হইল, অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু এবং কাশ্মীর। কেন্দ্র শাসিত ইউনিয়ন অঞ্চলগুলি হইল :—দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীনদ্বীপ। নূতন ব্যবস্থায় 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলিকে বিলুপ্ত করা হয়, আগেকার 'ক' এবং 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলিকে সমান মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং 'রাজপ্রমুখের' পদকে 'রাজ্যপালের' পদে পরিবর্তিত করা হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ

রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং মাদ্রাজ রাজ্যের সীমানার কিছু অংশ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই রাজ্য পুনর্গঠন প্রথমে বোম্বাইয়ে তীব্র অশান্তির সৃষ্টি করে এবং পরে ১৯৬০ সালের মে মাসে বোম্বাইকে দ্বিধা বিভক্ত করা হয় ও গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র ক্রমে আলাদাভাবে দুইটি রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব রাজ্যও দ্বিধাবিভক্ত হয়; ইহার ফলে সৃষ্টি হয় হরিয়ানা ও পাঞ্জাব রাজ্যের।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে সরকারের দৃঢ়তার অভাব

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে ভারত সরকার দৃঢ়তার পরিচয় দিতে না পারায় ভারতীয়দের ঐক্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও বাংলা ভাষাভাষী। স্বতন্ত্র বিদর্ভ রাজ্য গঠিত না হওয়ায় মহারাষ্ট্রের একটি অংশ এখনও ক্ষুব্ধ। নাগারাজ্য লইয়া যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে ভারত সরকার ইহার কোনই নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য

বর্তমানে নাগারাজ্য সমেত ভারতের মোট রাজ্যের সংখ্যা হইতেছে ১৭টি এবং সেইগুলি হইতেছে, ১। অন্ধ্রপ্রদেশ, ২। আসাম, ৩। বিহার, ৪। মহারাষ্ট্র, ৫। গুজরাট, ৬। কেরালা, ৭। মধ্যপ্রদেশ, ৮। মাদ্রাজ, ৯। মহীশূর, ১০। উড়িষ্যা, ১১। পাঞ্জাব, ১২। হরিয়ানা, ১৩। রাজস্থান, ১৪। উত্তরপ্রদেশ, ১৫। পশ্চিমবঙ্গ, ১৬। জম্মু ও কাশ্মীর এবং ১৭। নাগারাজ্য। যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের এলাকার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে সেই রাজ্যগুলি, যেগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কিছু ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। কিন্তু, ভারতের এলাকা বলিতে বুঝায় কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এই প্রকার অঞ্চল। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকের (administrator) দ্বারা শাসিত হইত। কিন্তু, ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে এই অঞ্চলগুলিতেও মন্ত্রিসভা চালিত সরকারের প্রবর্তন করা হইয়াছে। পূর্বেকার ফরাসী সরকার কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলগুলি (পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি) ১৯৫৪ সালে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ সালের মে মাসে উক্ত উপনিবেশগুলিকে ভারতের অধীনে সম্পূর্ণরূপে আনয়ন করিবার জন্য ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদন লাভ করিবার পর (১৯৬২ সালের জুলাই মাসে) এই চুক্তি অনুযায়ী পণ্ডিচেরী সম্পূর্ণভাবে ভারতের ইউনিয়ন অঞ্চলে পরিণত হয়। বর্তমানে নেফা সমেত ভারতে ১১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় (যেমন, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র অথবা স্বয়ংশাসিত নহে।

একটি সাম্প্রতিক বিধান অনুযায়ী মূলরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য দাবী করিতে পারে না।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতকে একটি 'রাজ্যসংঘ' বা Union of States বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশ একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও ইহাকে একটি 'ইউনিয়ন' হিসাবে অভিহিত করা হয়। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি The British North America Act, 1867-এর প্রস্তাবনা অনুসরণ করিয়া ভারতকে 'ইউনিয়ন' হিসাবে বর্ণনা করেন। এইক্ষেত্রে ডক্টর আম্বেদকরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ডক্টর আম্বেদকর বলিয়াছিলেন, "The committee considered that there are advantages in describing India as a Union, although its constitution may be federal in structure." ডক্টর আম্বেদকরের মতে দুইটি জিনিসের সরল ব্যাখ্যার জন্যই ইচ্ছা করিয়া 'যুক্তরাষ্ট্রের' পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মূল রাজ্যগুলির মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী গঠিত হয় নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ, চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় নাই বলিয়া কোন মূলরাষ্ট্রের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অবিনশ্বর।[১] দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রিক এবং সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে "ইউনিয়ন" বলা হয়; আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং ইহা ১৩টি স্বাধীন উপনিবেশের মধ্যে চুক্তির ফলে সৃষ্ট হইলেও শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় আমেরিকাকে "ইউনিয়ন" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হিসাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রে দেশকে "The Union of the Soviet Socialist Republics" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতেই বুঝা যায় যে কোন দেশের ক্ষেত্রে "ইউনিয়ন" শব্দটির ব্যবহার যে একটি নির্দিষ্ট ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় তাহা নহে।

জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা (The Constitutional position of the State of Jammu and Kashmir): ভারতে জম্মু এবং কাশ্মীরই হইতেছে একমাত্র রাজ্য যেখানে একটি আলাদা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সংবিধানের "সাময়িক এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিধান" (Temporary and transitional provisions) সংক্রান্ত অংশে এই

১। "...though India was to be a Federation, the Federation was not the result of an agreement by the States to join in a Federation and that the Federation not being the result of an agreement, no State has the right to secede from it. The Federation is a union because it is indestructible." (Dr. Ambedkar's speech—Constituent Assembly's debates.)

ব্যবস্থা উল্লিখিত হয়। এই অংশে বলা হয় যে শাসনতন্ত্রের ১নং এবং ৩৭০ নং ধারা জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। শাসনতন্ত্রের ১নং ধারা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় ভূখণ্ডের (Indian territory) একটি অংশ এবং ৩৭০নং ধারা অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত সেই সকল বিষয়গুলি লইয়াই পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে যেগুলি ভারতের সহিত যোগদানের চুক্তিতে (Instrument of Accession) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইউনিয়ন তালিকা এবং যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যদি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সরকারের সম্মতিতে (concurrence) রাষ্ট্রপতি নির্দেশ (order) প্রদান করেন, তবে পার্লামেণ্ট সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের ১নং এবং ৩৭০নং ধারা ছাড়া অন্যান্য সমুদয় বিধান জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। শাসনতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা ততদিনই চলিবে যতদিন না জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আহূত গণপরিষদ ঐ সম্পর্কে আপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গণপরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৭০ নং ধারা আর জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। শাসনতন্ত্রের এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতির প্রথম নির্দেশ [The Constitutional (Application to Jammu and Kashmir) order, 1950] অনুযায়ী স্থির হয় যে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোন কোন বিষয়ের উপর পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে। ১৯৫৪ সালে কাশ্মীরের গণপরিষদ ভারতের সহিত ঐ রাজ্যের যোগদান এবং ভারতের সহিত ঐ রাজ্যের উপরোক্ত চুক্তিটি অনুমোদন করে।

বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থা হইতে ইহা অনেক বিষয়ে পৃথক। প্রথমত, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয় এবং সীমাবদ্ধ ভাবে যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) পার্লামেণ্টের হস্তে নাই এবং রাজ্যসভা ইহার উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিতে পারে না। ইহা উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সম্প্রসারিত করিতে পারে।

আইন প্রণয়নে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সীমিত

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা আছে যে কেন্দ্রীয় সরকার শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে-সকল নির্দেশ প্রদান করে তাহা অমান্য করা হইলে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন ; কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে এই প্রকার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নাই। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি আর্থিক সঙ্কটের অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন ; কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা নাই।

জরুরী অবস্থা সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সীমিত

তৃতীয়ত, শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি (Directive Principles of State Policy) জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শাসনতন্ত্রের ১৯নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির উপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে বাধানিষেধ আরোপ করা যাইতে পারে। আবার, এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন তোলা যায় না। নিরাপত্তামূলক আইন (Preventive Detention) সম্পর্কে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিলেও জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে পারে না।

মৌলিক অধিকারের সীমিত প্রয়োগ

চতুর্থত, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত লোকসভায় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সেই রাজ্যের বিধান সভার অনুমোদন ক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইতেন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনেই প্রথম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে লোকসভায় ছয়জন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

লোকসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা

পঞ্চমত, জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলির আলাদা শাসনতন্ত্র থাকা অস্বাভাবিক নহে ; অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ইহা একটু অস্বাভাবিক। কারণ, ভারতের অন্য কোন রাজ্যের আলাদা শাসনতন্ত্র নাই ; শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের ষষ্ঠ অংশে এই ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই অংশের সংশোধন করিবার ক্ষমতা ভারতীয় পার্লামেণ্টের আছে (৩৬৮ নং ধারা)। জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে সেই রাজ্যের গণপরিষদ এবং ইহা ১৯৫৭ সাল হইতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র সংশোধন করার ক্ষমতা

রাজ্যের গণপরিষদ কর্তৃক রাজ্যের সংবিধান প্রণীত হইয়াছে

রাজ্যবিধানসভার হস্তে অর্পিত হইয়াছে ; এই শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার কোন ক্ষমতা ভারতীয় পার্লামেণ্টের নাই।

ষষ্ঠত, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আয়তন ও সীমানার পরিবর্তন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ভারতীয় পার্লামেণ্টের আছে। কিন্তু পার্লামেণ্ট যদি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চাহে, তবে রাজ্যবিধানসভার সম্মতি লইতে হইবে।

নাগাভূমি (Nagaland)—নাগাজাতি ফিজোর নেতৃত্বে অনেকদিন যাবৎ আলাদা রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন করিতেছিল। কিন্তু ফিজোর দেশদ্রোহী কার্যকলাপ সরকার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তবে ১৯৫৭ সালে নাগা পাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চলকে (The Naga Hills Tuensang Area) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। পরে ১৯৬১ সালে Nagaland (Transitional Provisions) Regulations, 1961, অনুযায়ী ঐ অঞ্চলকে 'নাগাভূমি' নামে অভিহিত করিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা (Status of a seperate state) প্রদান করা হয়। ১৯৬২ সালের একটি বিল অনুযায়ী নাগাভূমিকে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হয়। এই বিল অনুযায়ী নাগারাজ্যে এক পরিষদ সম্পন্ন বিধানমণ্ডল (বিধানসভা) গঠিত হইবে ; প্রথম ১০ বৎসরের জন্য ইহার সদস্য সংখ্যা হইবে ৪৬ জন এবং পরে ইহার সদস্য সংখ্যা হইবে ৬০ জন। বর্তমানে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি শাসন পরিষদ রাজ্যপালকে কাজে সাহায্য করিয়া থাকে। নাগাভূমিতে প্রত্যেক গ্রামের জন্য গ্রাম-পরিষদ (Village Council) ও প্রত্যেক এলাকার জন্য এলাকা-পরিষদ এবং প্রত্যেক উপজাতির জন্য উপজাতীয়-পরিষদ (Tribal Council) গঠন করা হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে নির্বাচন কার্য সমাপ্ত হয় ও প্রথমে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইয়া নাগাভূমির শাসনকার্য মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ন্যস্ত করা হয়।

ত্রিপুরা, হিমাচল ও মণিপুর (Tripura, Himachal and Manipur)—১৯৬৩ সালের ১০ই মে তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত একটি আইন অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে ত্রিপুরা, হিমাচল-প্রদেশ ও মণিপুরে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের ২৩৯ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক (Administrator) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি বিধানসভা থাকিবে। হিমাচল প্রদেশে বিধানসভায় আসনসংখ্যা হইবে ৪৩, (দুইজন মনোনীত সদস্য সহ) এবং ত্রিপুরা ও মণিপুরে আসনসংখ্যা হইতেছে ৩০। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৩ জন পর্যন্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

বিধান সভায় তপশীলী সম্প্রদায় এবং খণ্ডজাতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। অ-ভারতীয় এবং ২৫ বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তি বিধানসভায় নির্বাচনের যোগ্য বিবেচিত হইবেন না। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা প্রথম অধিবেশনের পর হইতে ৫ বৎসর স্থায়ী হইবে। ভারতীয় পার্লামেণ্টের লোকসভার সদস্যগণ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, আঞ্চলিক বিধানসভার সদস্যগণও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

আঞ্চলিক বিধানসভার ক্ষমতা

শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত রাজ্যতালিকা (State list) ও যুগ্ম তালিকা (Concurrent list) অনুযায়ী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিধানসভা সমগ্র অঞ্চল অথবা যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। অবশ্য কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বিল উত্থাপন অথবা কোন সংশোধনের জন্য প্রশাসকের অনুমতি প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি হইতেছে :

(১) জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালত গঠন ;

(২) জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালতের ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার ;

(৩) যে কোন কর প্রবর্তন, রদ, সংশোধন অথবা পরিবর্তন ;

(৪) আঞ্চলিক সরকারের আর্থিক দায় সংশ্লিষ্ট যে কোন আইনের সংশোধন।

বিধান সভায় যে বিল পাশ হইবে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে প্রশাসকের কাছে। তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সেই বিল গ্রহণ করিবেন।

আঞ্চলিক সরকার পরিচালনা করিবেন একটি মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভা বিধান সভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন। রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রিসভার যে সম্পর্ক, প্রশাসকের সঙ্গেও আঞ্চলিক মন্ত্রিসভার সেই সম্পর্ক থাকিবে।

মন্ত্রিসভা

ভারতীয়দের নাগরিকতা (Citizenship of the Indians) : কোন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে নাগরিক এবং বিদেশী, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। নাগরিকগণ সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীগণ সব রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না। তাহা ছাড়া, একজন বিদেশী ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভারতের শাসনতন্ত্রে কতিপয় অধিকারের বিধান আছে ; সেই অধিকারগুলি মূলতঃ শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলিয়া পরিচিত। এই অধিকারের মধ্যে কতিপয় অধিকার আছে যেগুলি বিদেশীগণও এই দেশে ভোগ করিতে পারে ; কিন্তু আবার কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে যেগুলি

শুধু ভারতীয় নাগরিকই ভোগ করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্ম, বংশ, বর্ণ, জন্মস্থান ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের তারতম্য করা হইবে না। শাসনতন্ত্রের ১৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে নাগরিকদের সুযোগের সমান অধিকার আছে। শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী নাগরিকগণ বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, সভা-সমিতি করিবার অধিকার, আন্দোলন করিবার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার এবং বৃত্তির অধিকার ভোগ করে। শুধু ভারতীয় নাগরিকদেরই রাষ্ট্রপতি (৫৮ নং ধারা ১ (ক) অনুচ্ছেদ), উপরাষ্ট্রপতি (৬৬ নং ধারা, ৩ (ক) অনুচ্ছেদ), সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি (১২৪ নং ধারা ৩নং অনুচ্ছেদ), হাইকোর্টের বিচারপতি (২১৭ নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ)। এ্যাটর্নী জেনারেল, (৭৬ নং ধারা, ১নং অনুচ্ছেদ) রাজ্যপাল (১৫৭ নং ধারা) এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল (১৬৫ নং ধারা) হইবার অধিকার আছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দ্বি-নাগরিকতার কোন ব্যবস্থা নাই। যে কোন ভারতবাসী শুধু ভারতেরই নাগরিক, কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিক নহে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১১নং ধারা অনুযায়ী নাগরিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে নাগরিকতা সম্পর্কে বিবিধ নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় নাগরিকতা সম্বন্ধে পার্লামেন্ট একটি আইন প্রণয়ন করে এবং ইহাতে ভারতীয় নাগরিকতার বিবিধ বিধানগুলি সুসম্বদ্ধভাবে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনটির বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার পরি-প্রেক্ষিতে করা হইলে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন, বিলোপ প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৫নং ধারার 'ক' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে ব্যক্তি ভারতীয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাহার পিতামাতার জাতীয়তা যেখানেই হোক না কেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক। যদি কোন ব্যক্তি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং তাহার পিতামাতার মধ্যে যে কেহ একজন যদি ভারতীয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন, এবং তাহার পিতামাতার জাতীয়তা যেখানেই হোক না কেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক (৫নং ধারা 'খ' অনুচ্ছেদ)। যদি কোন ব্যক্তির পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ না করিয়াও ভারতীয় শাসনতন্ত্র চালু হইবার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে বসবাস করেন, তবে সেখানেও সেই ব্যক্তির নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁহার পিতামাতার জাতীয়তার প্রশ্ন উঠিবে না।

পাকিস্তান হইতে ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পূর্বে যাহারা ভারতে

আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন তাহাদের ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই তারিখের পরে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন তাহারা যদি বর্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য আবেদন করিয়া থাকেন, তবে তাহারাও ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, পাকিস্তান হইতে আগত কোন ব্যক্তি অথবা তাহার পিতামাতা অথবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে কেহ যদি ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ভারতে' জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহাকে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা হইয়াছে।

পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিদের জন্য নাগরিকতার বিধান

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইনে রেজেষ্ট্রীকরণের দ্বারা বিদেশীদের ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি কেহ ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিতে চাহেন তবে তাহাকে নাগরিকতার জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং সরকার তাহাদের রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিতে পারেন।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর ভারতে কোন ব্যক্তির নিজের জন্মের ভিত্তিতে এবং পিতা অথবা মাতার জন্মের ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কেহ যদি ছয় মাস একাদিক্রমে ভারতে বসবাস করিবার পর এই দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য আবেদন করেন, তবে তিনি ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে পারেন। অন্য দেশের নাগরিক এই রকম কোন মহিলা যদি কোন ভারতীয়কে বিবাহ করেন, তবে তিনি ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে পারেন। যদি কোন নূতন অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় (যেমন, ১৯৬১ সালে গোয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে), তবে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদেরও ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা হইবে। তাহা ছাড়া, ভারতীয় নাগরিকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক নাগরিকগণকে রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়া ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। রেজেষ্ট্রীভুক্ত নাগরিককে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হয়। কমনওয়েলথের বাহিরে কোন বিদেশীকে দেশীয়করণের মাধ্যমেও নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য এবং বিশ্বশান্তির প্রসার, প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি কাহারও বিশেষ অবদান থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করিবার কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়। যেমন, অধ্যাপক হ্যালসেনের ক্ষেত্রে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদানে কড়াকড়ি করা হয় নাই।

১৯৫১ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর ব্যবস্থা এবং রেজেষ্ট্রীকরণের মাধ্যমে নাগরিকতা

রেজেষ্ট্রীকরণ এবং দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদান

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইনে নাগরিকতার বিলোপসাধনেরও বিধান রাখা হয়। প্রথমতঃ, যদি কখনও দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে ভারতের এবং অপর একটি দেশের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে তবে তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি দেশের নাগরিকতা ছাড়িয়া দিতে হইবে ; নতুবা তাহার ভারতীয় নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্য কোন দেশের নাগরিকতা অর্জন করে, তবে তাহার ভারতীয় নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, যদি কখনও দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি জাল করিয়া এবং মিথ্যা প্রমাণ দাখিল করিয়া ভারতের নাগরিক হইয়াছেন, অথবা তিনি শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত নহেন, তবে তাহার ভারতীয় নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

নাগরিকতার বিলুপ্তি

অসদুপায়ে নাগরিকতা অর্জিত হইলে, শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা অসন্তুষ্টি অনুভূত হইলে, যুদ্ধের সময় ভারতের শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিলে এবং দেশের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কাজ করিলে, দেশীয়করণ কিংবা রেজেষ্ট্রীকরণ হইবার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন দেশে দুই বৎসর কিংবা ইহার বেশী সময়ের জন্য কারাভোগ করিলে নাগরিকতার বিলুপ্তি হইতে পারে, অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সরকার নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, কোন ভারতীয় নাগরিক যদি একাদিক্রমে সাত বৎসরের জন্য বিদেশে ভারত সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি না করিয়া অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র না থাকিয়া ভারতীয় অফিসের সহিত যোগাযোগ না রাখেন, তবে ভারত সরকার তাহাকে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৬৭ নম্বর ধারার তিন নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারত ব্যতীত যে কোন রাষ্ট্রই বিদেশী রাষ্ট্র,—তবে রাষ্ট্রপতি কোন রাষ্ট্রকে "বিদেশী রাষ্ট্র নয়" বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কিত ঘোষণায় বলা হয় যে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্যে ভারতের নিকট বিদেশী রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কমনওয়েলথের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নাগরিকগণ ভারতে কমনওয়েলথ্ নাগরিকের মর্যাদা (Status of Commonwealth Citizen) ভোগ করিবে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "Every person who is a citizen of a Commonwealth country specified in the First Schedule shall, by virtue of that citizenship, have the status of a Commonwealth citizen of India."

কমনওয়েলথ নাগরিকতা

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাম ভারত। রাজ্য পুনর্গঠনের পর ভারতে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৭টি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের এলাকার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে সেই রাজ্যগুলি, যেগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কিছু ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। কিন্তু, ভারতের এলাকা বলিতে বুঝায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এই প্রকার অঞ্চল। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকের দ্বারা শাসিত হইত। কিন্তু ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে এই অঞ্চলগুলিতেও মন্ত্রিসভা চালিত সরকারের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া একটি রাজ্যের কিছু অংশ আলাদা করিয়া অন্য রাজ্যের সহিত যুক্ত করিতে পারে অথবা একটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাছাড়া, পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া কোন রাজ্যের এলাকা বাড়াইতে পারে, কমাইতে পারে অথবা কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তনও করিতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকতা নাই। শাসনতন্ত্রের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের তারতম্য করা হইবে না। শুধু ভারতীর নাগরিকগণের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্ট কিংবা, হাইকোর্টের বিচারপতি, রাজ্যপাল, এটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল হইবার অধিকার আছে। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় নাগরিকতা আইন বিধিবদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি ভারতীয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাহার পিতামাতার জাতীয়তা যেখানেই হোক না কেন তিনি ভারতীয় নাগরিক। যদি কোন ব্যক্তির পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ না করিয়াও ভারতীয় শাসনতন্ত্র চালু হইবার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে বসবাস করেন, তবে সেখানেও সেই ব্যক্তির নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে না। ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাইয়ের পূর্বে যাহারা পাকিস্তান হইতে আসিয়া ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাহারা ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিবেন। তাহা ছাড়া, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দেশের লোক কতিপয় নিয়মসাপেক্ষে রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়া ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিতে পারেন। দেশীয়করণের মাধ্যমে বিদেশীদের নাগরিকতা প্রদান করিবার ব্যবস্থাও ভারতে করা হইয়াছে। আবার বিদেশী মহিলা ভারতীয় নাগরিককে বিবাহ করিয়া ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে পারেন। যদি কোন নূতন অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সেই অঞ্চলের অধিবাসিগণ ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিবেন। ১৯৫৫ সালের আইনে নাগরিকতার বিলোপসাধনের ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে।

Exercise

1. Write a note on the territory of India.
[ভারতের এলাকার উপর একটি টীকা লিখ] (৬৩-৬৮ পৃষ্ঠা)

2. How can Indian citizenship be acquired? When is Indian citizenship lost? (৭২-৭৫ পৃষ্ঠা)
[ভারতীয় নাগরিকতা কিভাবে অর্জিত হয়? ভারতীয় নাগরিকতা কখন বিলুপ্ত হয়?]
(৭২-৭৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the major provisions of the Indian citizenship Act of 1955.

[১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইনের প্রধান বিধানগুলি আলোচনা কর।]

(৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা)

4. How can a person migrating from Pakistan or from any other country become an Indian citizen ? (৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)

[পাকিস্তান হইতে অথবা অন্য কোন দেশ হইতে আগত কোন ব্যক্তি কিভাবে ভারতীয় নাগরিক হইতে পারে ?] (৭৬-৭৫ পৃষ্ঠা)

5. Write short notes on the status of (a) Jammu and Kashmir, (b) Nagaland and (c) Tripura, Himachal Pradesh and Manipur.

[টীকা লিখ : (ক) জম্মু ও কাশ্মীর, (খ) নাগারাজ্য, (গ) ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ এবং মণিপুর।] (৬৮-৭২ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the provisions of the constitution of India regarding citizenship. (C. U. B. A. P. I, 1966) (৭২-৭৫ পৃষ্ঠা)

[নাগরিকতা সম্পর্কে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি আলোচনা কর।]

(৭২-৭৫ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি

(Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution)

[রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির উদ্দেশ্য—নীতিগুলির উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা—এই নীতিগুলির মাধ্যমে একটি কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনের এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা—এই নীতিগুলির প্রয়োজনীয়তা, —এই নীতিগুলি আইনসিদ্ধ না হইলেও গুরুত্বপূর্ণ—মৌলিক অধিকারগুলি মূলতঃ গণতান্ত্রিক অধিকার—রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক।]

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অনুধাবন করিতে হইবে। আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রে কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এইগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হইতেছে দেশের জনগণকে এমন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাহাতে আমাদের রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে (welfare state) পরিণত হইতে পারে। এই নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইলে দেশ সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবে। আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি যেমন আইনবিভাগ কর্তৃক প্রযোজ্য নয়, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলিও সেইপ্রকার আদালতের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির অর্থ

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অংশে (৩৬—৫১ নম্বর ধারা) রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির বিধান রাখা হইয়াছে। এই নীতিগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমত, এমন কতিপয় নীতি আছে যেগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, এবং শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের মতে যেগুলি কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয়ত, আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের কাজের পরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি আছে। তৃতীয়ত, নাগরিকদের কতিপয় অধিকারের বিধানযুক্ত করা হইয়াছে। যদিও এই অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারের ন্যায় আদালত-গ্রাহ্য নহে, তবুও রাষ্ট্র তাহার আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের কাজের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চেষ্টা করিবে যেন নাগরিকগণ এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে।

রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। এই নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইলেই একটি প্রকৃত 'কল্যাণ রাষ্ট্র' ('Welfare State') প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হইয়াছে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি তাহাই প্রতিষ্ঠা করার কথা বলিয়াছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি[১] (Directive Principles of State Policy) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট হইতেছে ইহার কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি, যেগুলি রাষ্ট্রপরিচালনায় অনুসরণ করা হয়। এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য নয়। কিন্তু এইগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার এমন কতিপয় নীতি যেগুলিকে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতে পারে না। শাসনতন্ত্রের ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই নীতিগুলি কোন আদালত কর্তৃক কার্যকরী হইবে না; কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা। রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য হইল এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার পাইবে (৩৮ নং ধারা)। রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি পরিচালনা করিবে যেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার ভোগ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, জনগণের স্বার্থে সমাজের সমুদয় আর্থিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, সকলের জন্যই সমান কাজের ক্ষেত্রে সমান মজুরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে (৩৯ নং ধারা)। তাহা ছাড়া, দেশের সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া সামাজিক স্বার্থের হানি না করে এবং যাহাতে ইহা ন্যায়সঙ্গতভাবে ও সমানভাবে বণ্টিত হয় সেদিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশু এবং যুবক-যুবতীগণকে সর্বপ্রকার শোষণ হইতে এবং নৈতিক ও পার্থিব দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শাসনতন্ত্রের ৪০ নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সেইগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েৎ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-বিচার

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমগ্র দেশকে একটি "কল্যাণ রাষ্ট্রে" (Welfare state) পরিণত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের উচিত পঞ্চায়েৎ সংগঠন করা (৪০ নং ধারা) এবং চৌদ্দ বৎসরের নীচের সকল শিশুদের জন্য বিনা বেতনে এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা (৪৫ নং ধারা)। কর্ম, শিক্ষা, বেকার ভাতা, কাজের ন্যায়সংসগত সর্তাবলী,

১। ভারতের রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা-গুলি এই অধ্যায়ের পর (পরিশিষ্টে) দেওয়া হইয়াছে।

শ্রমিকদের বার্ধক্য এবং দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতার জন্য সরকারী ভাতা (৪১ নং ধারা), প্রসূতিদের কল্যাণের জন্য অর্থসাহায্য (৪২ নং ধারা) প্রভৃতি জীবনধারণের উপযোগী সবরকম ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হইবে রাষ্ট্রের। গ্রামাঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের, বিশেষতঃ, কুটিরশিল্পগুলির উন্নতির চেষ্টা করিয়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে (৪৩ নং ধারা)। তপশীল শ্রেণীভুক্ত জনসাধারণের এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত-সম্প্রদায়ের জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা (৪৬ নং ধারা), জনস্বার্থের সংরক্ষণ করা (৪৭ নং ধারা) এবং মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন করা এবং গরু প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গৃহপালিত জন্তু বধ রহিত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলির অন্যতম। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যতদূর সম্ভব এই নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারত সরকার শিল্প-শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করিয়াছেন।

একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রের সংগঠন

শিল্প-শ্রমিকের নিরাপত্তা

তাহা ছাড়া, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন অথবা চারুকলার দিক হইতে উন্নত এবং পর্লামেণ্টে প্রণীত আইন কর্তৃক জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত স্মারক স্থান ও বিভিন্ন বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অপর একটি বিধান (৫০ নম্বর ধারা) অনুযায়ী রাষ্ট্রের উচিত শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে ক্রমশঃ পৃথক করা। এই কাজে ভারত সরকার এখনও সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারেন নাই। ভারতের বিচার বিভাগ এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে নাই। সর্বশেষে, ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়েও নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে কিছুটা ইংগিত করা হইয়াছে। নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মানজনক, ন্যায়সংগত এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো এবং পারস্পরিক মীমাংসার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহের সমাধানে উৎসাহ প্রদান করিতে ভারতবর্ষের চেষ্টা করা উচিত।

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সংরক্ষণ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বশান্তির প্রয়াস

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক। রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থ নৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, বেকার ভাতা প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতীগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থ নৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু নির্দেশাত্মক

অর্থ নৈতিক সাম্য, বেকার ভাতা, শোষণ-মুক্তি

নীতিতে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ, সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত, ইহা করিতে রাষ্ট্র আইনগতভাবে বাধ্য নহে। যদি জনগণের অর্থনৈতিক সাম্যের মৌলিক অধিকার (Fundamental right to economic equality) থাকিত তবে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেশ হইতে আয় ও ধনের বৈষম্য দূর করিতে হইত। ভারতে বর্তমানে বেকারসমস্যা খুবই তীব্র; কিন্তু এই পর্যন্ত ভারত সরকার কাহাকেও বেকার ভাতা প্রদান করে নাই। সুতরাং রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে উল্লিখিত কর্তব্য যে রাষ্ট্র সর্বদাই পালন করে, তাহা নহে; কিন্তু যদি এই নীতিগুলিকে জনগণের মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য করা হইত, তবে দেশে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গঠিত হইত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকগণকে কাজের অধিকার, অর্থনৈতিক সাম্যের এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার দেওয়া হইয়াছে; সেইজন্যই সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছে।

মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে অর্থনৈতিক সাম্যের ব্যবস্থা নাই, অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যবস্থা আছে

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উপযোগিতা (Utility of the Directive Principles) : প্রখ্যাত শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যাকর্তা হোয়ের (Wheare)-এর মতে ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী প্রভৃতি আদর্শ অর্জনের প্রচেষ্টাকে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করিবার ঝোঁক আজকাল কোন কোন রাষ্ট্রে দেখা যায়; এই কথাগুলি পুরাতন ধরণের এবং উনবিংশ শতাব্দীর ধারণা হইলেও ইহাদের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন বর্তমানে আছে। ["There is something heroic these days in people declaring publicly that they have established their government in order to secure... justice, liberty, equality and fraternity. These words have an old-fashioned, nineteenth century ring about them. Yet they need reassertion in these days."—K. C. Wheare]

যখন ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি যেহেতু আদালত-গ্রাহ্য নহে, সেইজন্য সেইগুলি শাসনতন্ত্রে বজায় রাখার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু এই ধারণা যে সুবিবেচনাপ্রসূত নহে তাহা পরে প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও আমাদের দেশের আদালত নির্দেশাত্মক নীতির বিরোধী বলিয়া কোনও আইনকে বাতিল করিতে পারে না, তবুও অনেক আইনের শাসনতান্ত্রিক কার্যকারিতা বজায় রাখা হইয়াছে, যেহেতু সেইগুলি নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন আইন শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী আমাদের মৌলিক অধিকারের উপর 'অকারণ নিয়ন্ত্রণ' চাপাইয়া দেয় বলিয়া কেহ অভিযোগ করে, এবং যদি

সেইআইন শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মকনীতিগুলির কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় তবে আদালত সেই আইনটি অকারণে জনগণের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবে। ১৯৫১ সালে 'বোম্বাই রাজ্য বনাম বালসারা'[১] মামলায় আদালত অনুরূপ রায় প্রদান করে। অনুরূপভাবে ১৯৫২ সালে 'বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর'[২] মামলায় আদালত রায় প্রদান করে যে, শাসনতন্ত্রের ৩৯নং ধারার 'খ' ও 'গ' অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্র যদি কোন জমি সংগ্রহ করে, তবে, শাসনতন্ত্রের ৩১নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা 'জনস্বার্থে' (Public Purpose) সংগৃহীত জমি বলিয়া গৃহীত হইবে। যদিও শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কখনও মৌলিক অধিকারগুলিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, তবুও মৌলিক অধিকারের ভূমিকা এবং এক্তিয়ার বিবেচনা করিবার সময় আদালত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বরং দেখা গিয়াছে যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্যও কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের সংশোধন (প্রথম ও চতুর্থ সংশোধন) করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে ৩৯ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে দেশের বিভিন্ন সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টন করিতে হইবে যেন ইহাতে সকলের কল্যাণ হয়। এই নীতি অনুযায়ী কৃষি এবং অর্থনৈতিক সংস্কার করিবার জন্য ভারত সরকার দুইবার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু যদি কখনও রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নহে; কিন্তু ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি আদালতগ্রাহ্য; সুতরাং কোন অবস্থায়ই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

যদিও নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালতগ্রাহ্য নহে, তবুও আমাদের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে এই নীতিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন গণতান্ত্রিক দেশই এই নীতিগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। এই নীতিগুলির পিছনে কোন আইনগ্রাহ্য অনুমোদন নাই সত্য, কিন্তু এইগুলির অনুমোদন (sanction) হইতেছে রাজনৈতিক। রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে সরকারের প্রতি শাসনতন্ত্রের সাধারণ নির্দেশ। রাষ্ট্র যদি এই নীতিগুলি অনুযায়ী পরিচালিত না হয়, তবে সরকারকে এইজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

১। Bombay State vs. Balsara.

২। Bihar State vs. Kameswar.

গণপরিষদে এই শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লইয়া আলোচনা কালে ডক্টর আম্বেদকর অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।[১] যদি সরকার এই নীতিগুলি অনুযায়ী নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত না করেন, তবে পার্লামেণ্টের বিরোধী পক্ষ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহার ভিত্তিতে সরকারের সমালোচনা করিতে পারে। এখানেই রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সার্থকতা। প্রখ্যাত আইনবিদ্ স্যার বেনেগল নরসিং রাও (Sir. B. N. Rau)-এর মতে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের জন্য কতিপয় নৈতিক উপদেশ। যদিও বলা হয় শাসনতন্ত্র উপদেশ প্রদানের প্রকৃষ্ট স্থান নহে তবুও এই ধরণের শাসনতান্ত্রিক নীতি ঘোষণা আজকাল খুবই দেখা যায়। এইগুলির অন্ততঃ একটি শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে।[২]

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত গ্রাহ্য না হইলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ

ভারত সরকার এই নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার (৪৭ নম্বর ধারা) এবং জাতীয় আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশের আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দিয়া অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টন করিবার প্রচেষ্টা নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই নীতিগুলি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক। অপরদিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক। এইভাবে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক সংমিশ্রণ হইয়াছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য—(Differences between the Directive Principles of State Policy and the Fundamental Rights): রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে নিম্নরূপ: (১) এই নীতিগুলি আদালতগ্রাহ্য নহে; সুতরাং আদালত কর্তৃক এইগুলিকে কার্যকরী করা যায় না। (২) এই নীতিগুলি যদিও রাষ্ট্রের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তবুও ইহারা রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়নের

১। "If any Government ignores them, they will certainly have to answer for them before the *electorate* at the election time." (Ambedkar)

২। "They (Directive Principles) are really in the nature of moral precepts for the authorities of the State. Although it may be contended that the constitution is not the proper place for moral precepts, nevertheless, constitutional declarations of policy of this kind are now becoming increasingly frequent. They have at best an educative value." —Sir B. N, Rau.

ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। (৩) নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের সংঘাতের সৃষ্টি হইলে মৌলিক অধিকারগুলিই বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নহে। ১৯৫১ সালে মাদ্রাজ রাষ্ট্র বনাম চম্পকম্ মামলায় সংশ্লিষ্ট বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছিলেন :

"The Chapter on Fundamental Rights is sacrosanct and not liable to be abridged by any legislative or executive act, or order except to the extent provided in appropriate Articles in Part III. The Directive Principles of State Policy have to conform to and run Subsidiary to the chapter on Fundamental Rights."

শাসনতন্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে নাগরিকদের উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির কতিপয় পার্থক্য আছে।

মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের উপর সীমা আরোপ করে, নির্দেশাত্মক নীতি দায়িত্ব আরোপ করে

প্রথমত, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের কতিপয় কাজের উপর সীমা আরোপ করে। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্র কিভাবে কাজ করিবে অথবা কিভাবে নিজেদের দ্বারা কতিপয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, সেই ব্যাপারে দায়িত্ব আরোপ করে এবং নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করার অজুহাতে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় না

দ্বিতীয়তঃ নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে সেই মর্মে আইন প্রণয়ন করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য কোন আইন প্রণীত না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নীতিগুলি অনুসরণ করিবার অজুহাতে আইন অমান্য করিবার অধিকার নাই। কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ শাসনতন্ত্রই নাগরিকদের এই অধিকারগুলি দিয়াছে এবং এইজন্যই এইগুলি হইতেছে "মৌলিক" অধিকার।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালতে গ্রাহ্য নহে মৌলিক অধিকারগুলি আদালত গ্রাহ্য

তৃতীয়ত, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত গ্রাহ্য নহে। সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি কোন নির্দেশাত্মক নীতির বিরোধী হয় তাহা হইলে আদালত সেই আইনকে বাতিল করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন আইন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করে, তবে আদালত সেই আইন বাতিল করিয়া দিতে পারে। আবার আদালত কোন অবস্থায়ই সরকারকে এই নীতিগুলি অনুসরণে বাধ্য করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, যদি নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে মৌলিক অধিকারটিই বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক নীতিটি নহে।[১] সর্বশেষে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উদ্দেশ্যের দিক হইতে সমাজতান্ত্রিক; কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করিতে পারে না

রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, বেকার ভাতা প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতীগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থ নৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক এবং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে সমাজতান্ত্রিক।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক, মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ন্যায় আদালত গ্রাহ্য নয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। এই নীতিগুলি কার্যকরী হইলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে এবং আমাদের দেশ একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে চালিত করিবার জন্য যে নীতিগুলি অনুসৃত হওয়া দরকার সেইগুলির সবই নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যদি কখনও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের সংঘাত হয়, তবে মৌলিক অধিকারগুলিই বজায় থাকিবে। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মুখ্যতঃ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে গঠিত। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি মুখ্যতঃ গণতান্ত্রিক। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে নাই। কিন্তু এইজন্য এই নীতিগুলির যে উপযোগিতা নাই, তাহা নহে। এই নীতিগুলি সরকারকে ঠিক পথে চলিবার জন্য নৈতিক চাপ দেয়, এবং জনমতও এই নীতিগুলি কতটা সরকার কর্তৃক অনুসৃত হইতেছে সেই মাপকাঠি অনুযায়ী সরকারের বিচার করে।

১। State of Madras vs. Champakan. (1951)

Exercise

1. Discuss the scope and utility of the Directive Principles of State Policy,

[রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির কার্যকারিতা ও উপযোগিতা আলোচনা কর।]

2. Discuss the Directive Principles of State Policy under the Constitution of India. C. U. (P. I.) (P. II.) 1965

[ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বর্ণিত রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আলোচনা কর।]

3. In what respects do the Directive Principles of State Policy differ from the Fundamental Rights ? Have these principles any utility ?

(৮১-৮৫ পৃষ্ঠা)

[মৌলিক অধিকার হইতে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পৃথক ? এই নীতিগুলির কোন উপযোগিতা আছে কি ?] (৮১-৮৫ পৃষ্ঠা)

পরিশিষ্ট

ভারতের রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নীতিগুলি সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারাগুলি এখানে দেওয়া হইল :—

"......the State shall direct its policy towards securing:

(1) (a) adequate means of livelihood to all citizens ; (b) a proper distribution of the material resources of the community for the common good ; (c) the prevention of concentration of wealth to the common detriment ; (d) equal pay for equal work for both men and women ; (e) the protection of the strength and health of workers and avoiding circumstances which force citizens to enter avocations unsuited to their age or strength ; and (f) the protection of childhood and youth against exploitation or moral material abandonment (Art. 39.) ;

(2) To organise village panchayats as units of self and government (Art. 40) ;

(3) To secure the right to work, education (Art 40) ; and public assistance in cases of undeserved want, such as unemployment, old age, sickness, etc. (Art. 41) ;

(4) To secure just and humane conditions of work and maternity relief (Art. 42) ;

(5) To secure worker a living wage, a decent standard of life, leisure and social and cultural opportunities for people, and in particular to promote cottage industries (Art. 43)

(6) To secure a uniform civil code applicable to the entire country (Art. 44) ;

(7) To provide, within ten years from the commencement of the constitution, free and compulsory education to all children upto the age of fourteen years (Art. 45) ;

(8) To promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, especially the scheduled Castes and Tribes (Art. 46) ;

(9) To secure the improvement of public health and the prohibition of intoxicating drinks and drugs (Art 47) ;

(10) To organise agriculture and animal husbandry on scientific lines and preserve and improve the breeds and prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle (Art. 48) ;

(11) To protect all monuments of historic interest and national importance. (Art. 49) ;

(12) To bring about the separation of the judiciary from the executive (Art. 50) ;

(13) To endeavour to secure : (a) the promotion of international peace and security (b) the maintenance of just and honourable relations between nations ; and (c) the settlement of international disputes by arbitration (Art. 51).

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of the Indian Citizens)

[ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার—অধিকার কথাটির তাৎপর্য—মৌলিক অধিকারগুলির বিশ্লেষণ—সাম্যের অধিকারের তাৎপর্য—স্বাধীনতার অধিকার—নিবর্তনমূলক আটকের তাৎপর্য—ধর্মের অধিকার—সম্পত্তির অধিকার—মৌলিক অধিকার কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।]

সাধারণ অর্থে "অধিকার" কথাটির অর্থ হইতেছে কতিপয় কাজ করা অথবা না করার স্বাধীনতা। অধিকার জিনিসটি নিছক দৈহিক শক্তি হইতে অথবা একটি সামাজিক মূল্যের ভিত্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা 'অধিকার' জিনিসটিকে মানুষের সামাজিক চরিত্র হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করি। প্রাকৃতিক অধিকার সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থে অধিকার সব মানুষের থাকে না। যাহারা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ তাহারাই অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। সামাজিক কল্যাণ ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল। সেইজন্য সর্বাধিক ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতিপয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার প্রদান করার দরকার হয়। লাস্কির মতে 'অধিকার' হইতেছে সামাজিক জীবনের এমন কতিপয় সর্ত যেগুলি ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে না।[১] রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকগণের কতিপয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, যেগুলির সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং সামাজিক জীবনেও তাহাদের কল্যাণ হইতে পারে। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটাইবার জন্য রাষ্ট্র যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, তবেই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিবে। তখন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বাধিক সমাজকল্যাণ হয়। গ্রীণের[২] মতে 'অধিকার' হইতেছে এমন একটি শক্তি যাহা সাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধিকারী হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং দাবি করা হয়। অধিকার বলিতে

অধিকারের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন রূপ

১। "Rights are those conditions of social life without which no man can be his best self."—Laski.

২। "Right is a power claimed and recognised as contributory to common good."—Green

সামাজিক জীবনের এমন কতকগুলি সুবিধা বুঝায় যেগুলি জনসাধারণ নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করে এবং সমাজও অনুরূপ স্বীকার করে। এই অধিকারগুলির অস্তিত্বের জন্য চাই একটি সুসংহত সামাজিক জীবন। তাহা ছাড়া, এই অধিকারগুলির যাহাতে অপব্যবহার না হয়, অর্থাৎ এই অধিকারগুলি যেন জনসাধারণকে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত না করে, সেইজন্য কতিপয় রাষ্ট্রীয় আইন থাকে। অধিকার সর্বদাই রাষ্ট্রীয় আইন কর্তৃক স্বীকৃত এবং কার্যকরী হয় এবং হওয়া উচিত। কেননা, প্রত্যেকটি আইনের যেমন একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকটি অধিকারেরও সেইরকম একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে।

অধিকারগুলিকে আমরা প্রথমত নৈতিক অধিকার (Moral Rights), এবং আইনগত অধিকার (Legal Rights), এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। নৈতিক অধিকারগুলি আমাদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয় না। কিন্তু, আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয়। একজন লোক যদি মিথ্যা কথা বলে, তবে সে সত্য কথা বলার নৈতিক অধিকারের অপচয় করিল, রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু, একজন নাগরিক যদি অপর কোন নাগরিকের নামে সাধারণ নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে আইনগত অধিকার ভঙ্গকারী হিসাবে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। আবার আইনগত অধিকারগুলিকে আমরা পৌর অধিকার (Civil Rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। পৌর অধিকার বলিতে সাধারণতঃ এমন কতিপয় অধিকার মনে করা হয় যেগুলি ছাড়া সভ্য নাগরিক জীবন যাপন করা অসম্ভব। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা নাগরিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকারও দেখিতে পাই।

মৌলিক অধিকার কাহাকে বলে?

পৃথিবীর বিভিন্ন লিখিত শাসনতন্ত্রে আমরা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দেখিতে পাই। মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলিতে আমরা এমন কতিপয় অধিকার বুঝি, যেগুলি শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে এবং শাসনতন্ত্র হইতেই যে অধিকারগুলি নাগরিকগণ পাইয়াছেন দেখিতে পাই। মার্কিন যুক্ত-

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে আমরা নাগরিকদের কতিপয় অধিকার দেখিতে পাই। কিন্তু এইগুলিকে অধিকারের বিধি (Bill of Rights) বলা হয়, মৌলিক অধিকার বলা হয় না। কারণ, মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ ছিল না। শাসনতন্ত্রটি প্রবর্তিত হইবার পর ইহার দশটি সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি দেওয়া হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার যেরূপ লিখিত আছে, তাহাদের মৌলিক কর্তব্যও সেইপ্রকার লিখিত আছে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং সেইজন্য নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে কোনও বিধান শাসনতন্ত্রে রাখা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার অথবা সুযোগ-সুবিধা না থাকিলে গণতন্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে, ইংলণ্ডে তাহার অভাব আছে। বরং ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত থাকায় নাগরিকদের একটি সুবিধা হইয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে দেশের বিধিবদ্ধ অথবা প্রচলিত আইনগুলির সহিত যদি কোন সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, তবে নাগরিকগণ যাহা খুশী তাহাই করিতে পারে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা কতটা থাকিবে তাহা অনেক পরিমাণে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। যেহেতু ইংলণ্ডের রাজা-সমেত পার্লামেণ্ট হইতেছে একটি সার্বভৌম আইনসভা সেইজন্য ইংলণ্ডে এমন কোন আইন নাই যাহা ইহা পরিবর্তন না করিতে পারে ; সেইদিক হইতে বিচার করিলে ইংলণ্ডের নাগরিকদের প্রয়োজনীয় অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্পর্কে নিশ্চয়তার সৃষ্টি করিতে কোন অসুবিধা হয় না। ইংলণ্ডে নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন হইতেছে শাসন-বিভাগের স্বৈরাচার অথবা কর্তৃত্বের হাত হইতে নাগরিক স্বাধীনতাকে মুক্ত করা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধু শাসনবিভাগেরই নহে আইনপ্রণয়ন বিভাগের স্বৈরাচার হইতেও নাগরিকদের মুক্ত রাখিবার চেষ্টা শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি

ইংলণ্ডের নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় শুধু শাসনবিভাগের নহে আইন প্রণয়ন বিভাগেরও ক্ষমতাকে সীমিত করিতে পারে। যদিও ভারতের 'মৌলিক অধিকারের' বিধানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের "অধিকারের বিধি"র (Bill of Rights) অনুরূপ তবুও এই অধিকারগুলি কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টারী সার্বভৌমত্ব এবং বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতার মধ্যে একটি আপোষ করা হইয়াছে।[৩] একদিকে যেমন বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকারগুলির

৩ D. Basu—Introduction to the Constitution of India, (1960) p. 64

ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে অথবা সেইগুলিকে কার্যকরী করিতে পারে, অপরদিকে তেমনি পার্লামেণ্টও শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মৌলিক অধিকারগুলির পরিবর্তন করিতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংশোধনের মাধ্যমে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে অকেজো করিয়া দিতে পারে।[৪] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রমেশ থাপর বনাম মাদ্রাজ রাজ্যের মামলা এবং ব্রিজভূষণ বনাম দিল্লী রাজ্যের মামলা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, ১৯৫১ সালে শাসনতন্ত্রের প্রথম সংশোধনের ফলে সেই ব্যাখ্যা অকার্যকরী হইয়া গিয়াছে।[৫] শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে (Part III) ১২ নম্বর হইতে ৩৫ নম্বর ধারা পর্যন্ত মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সর্বত্র, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানী কর্তৃপক্ষ,—প্রযুক্ত হইবে। শাসনতন্ত্রের ১৩ নং ধারার দুইটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রথমত, শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার সময় (অর্থাৎ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী) দেশে যে সকল প্রচলিত আইন ছিল, সেগুলির কোন একটি আইন যদি শাসনতন্ত্রে বর্ণিত কোন মৌলিক অধিকারের বিরোধী হয়, তবে সেই আইন বাতিল হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের ১৩ নং ধারা অনুযায়ী দেশের কোন সরকার এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না যাহা কোন একটি মৌলিক অধিকারের বিরোধী। শাসনতন্ত্রের ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী শুধু সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য মৌলিক অধিকারগুলিকে সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। এইভাবে মৌলিক অধিকার সংশোধিত হইলে ইহার উদ্দেশ্য হইবে সেনাবাহিনীকে ঠিকভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া এবং তাহাদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখা। দেশে সামরিক আইন চালু থাকিলে শাসনতন্ত্রের ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলির কার্যকারিতা সীমিত রাখা চলে, শাসনতন্ত্রের ৩৫ নং ধারা অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের ক্ষমতা সম্পর্কিত অধিকার, চাকুরির ক্ষেত্রে নাগরিকে বসবাস সম্পর্কিত নিয়মের রদবদল করা, সেনাবাহিনী এবং সামরিক আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সংশোধন করিয়া আইন প্রণণন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির বিশ্লেষণ (Analysis of the Fundamental Rights of the citizens in the Indian constitution): এই অধিকারগুলি "মৌলিক"

৪। Ramesh Thappar vs. Madras State.

৫। Brijbhusan ys. Delhi State.

("fundamental"), কেননা নাগরিকগণ শাসনতন্ত্র হইতে এই অধিকারগুলি লাভ করিয়াছে। এই অধিকারগুলি স্বীকার না করিয়া লওয়ার ক্ষমতা সরকারের নাই। তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সরকার এই অধিকারগুলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ সময়ে রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে তবে নাগরিকগণ বিচার বিভাগের নিকট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সাতভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, (১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality), (২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom), (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation), (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right of Freedom of Religion), (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights) (৩) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)।

অধিকারগুলি মৌলিক কেন

এই অধিকারগুলির মধ্যে কতিপয় অধিকার আছে যেগুলি শুধু নাগরিকগণই ভোগ করে। ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, জন্মভূমি প্রভৃতির ভিত্তিতে পারস্পরিক তারতম্যের হাত হইতে সংরক্ষণ (১৫ নম্বর ধারা), সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সুযোগের সমান অধিকার (১৬ নং ধারা), বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং পেশার অধিকার (১৯ নম্বর ধার) এবং সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক অধিকার (৩০ নম্বর ধারা) শুধু নাগরিকগণই ভোগ করিয়া থাকে। আবার কতিপয় অধিকার আছে যেগুলি নাগরিক না হইলেও দেশের যে কোন অধিবাসী ভোগ করিতে পারে ; যেমন আইনের চোখে সমতা এবং আইনের সংরক্ষণের সমতা (১৪ নম্বর ধারা), শাস্তির বিপক্ষে সংরক্ষণ, একই অপরাধে দুইবার শাস্তির বিপক্ষে সংরক্ষণ (২০ নম্বর ধারা), আইন বিবর্জিত কাজের বিপক্ষে জীবনধারণ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ (২১ নম্বর ধারা), শোষণের বিপক্ষে অধিকার (২৩ নম্বর ধারা), ধর্মের অধিকার (২৫ নং ধারা), বিশেষ একটি ধর্মের উন্নতির জন্য কর প্রদান সম্পর্কিত অধিকার (২৭ নম্বর ধারা), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় উপদেশ অথবা পূজার্চনায় যোগদানের অধিকার (২৮ নম্বর ধারা) এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কোন যুক্তিতে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত না হইবার অধিকার (৩১ নম্বর ধারা) প্রভৃতি। ইহা উল্লেখযোগ্য যে শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর, ২১ নম্বর এবং ৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের অধিকারগুলি হইতেছে রাষ্ট্রের কাজের বিপক্ষে অধিকার।

প্রথমতঃ, সাম্যের অধিকার বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, আইনের চোখে সব নাগরিকেরই সমান অধিকার থাকিবে। ধনী-নির্ধন, অথবা ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সব নাগরিকই যাহাতে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, সেইভাবে আইনের প্রয়োগ করিতে হইবে (১৪ নম্বর ধারা)। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার থাকিবে। সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়ন অথবা নির্বাচনে প্রার্থী হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই থাকে (১৬ নম্বর ধারা)। ভোট প্রদান করিবার অধিকারও সব নাগরিকের সমান থাকিবে। তবে ভারতবর্ষে রাজ্যবিধানমণ্ডলের উচ্চকক্ষের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় শিক্ষকগণকে অথবা স্থানীয় পৌরশাসন সংস্থাকে (local municipal bodies) ভোট দিবার এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহা জাতীয় স্বার্থের বিশেষ একটি শ্রেণীর অধিকার মাত্র। কিন্তু, ইহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোট প্রদানের সমান অধিকার ব্যাহত হয় নাই।

সাম্যের অধিকার

দ্বিতীয়ত, **স্বাধীনতার অধিকার** বলিতে আমরা বুঝি, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom of speech, ১৯ নম্বর ধারা), সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (freedom of the press), স্বাধীনভাবে কাজ করিবার এবং চলাফেরা করিবার অধিকার (Right to work, and Right to move freely), স্বাধীনভাবে আইনসংগত চুক্তি করার অধিকার (Right of contract), বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার (Right to protection while staying abroad), স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার (Right to resistance), যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার বা উপজীবিকা গ্রহণ করিবার অধিকার (Right to occupation) এবং বাসস্থানের অধিকার (Right to residence)।

স্বাধীনতার অধিকার

বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের সভা-সমিতি আহ্বান করিবার অধিকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার বলিতে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করিবার অধিকার, সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার এবং নাগরিকদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভের কারণ থাকে, তাহার প্রতিকারকল্পে স্বাধীনভাবে আবেদন করিবার অধিকার বুঝায়। তাহা ছাড়া, ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনভাবে সংঘ, সমিতি অথবা রাজনৈতিক দল গঠন করিবার স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনভাবে কাজ কবিবার অধিকার অর্থাৎ, নিজের বৃত্তি অথবা উপজীবিকা নিজের পক্ষ হইতে নির্বাচন করিবার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার এবং

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকারও ভারতীয় নাগরিকদের আছে। বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় নিজের জীবনরক্ষার জন্য এবং স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার অধিকারও ভারতীয় নাগরিকদের আছে। এক কথায় স্বাধীনতার অধিকার বলিতে আমরা ভারতীয় নাগরিকদের পৌর, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার বুঝি।

স্বাধীনতার অধিকার কখনই নিরংকুশ নহে। প্রয়োজনবোধে সরকার স্বাধীনতার অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে। এই বাধানিষেধগুলি—(১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার কারণ ঘটিলে, (২) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইলে, (৩) জনশৃংখলা বজায় রাখিবার দরকার হইলে, (৪) সদাচার বা শ্লীলতা বজায় রাখিবার স্বার্থে প্রয়োজন হইলে, (৫) বিচার বিভাগের অবমাননার কাজ ঘটিলে, (৬) মানহানির ব্যাপার হইলে এবং (৭) কাহাকেও অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করিবার ব্যাপার হইলে—নাগরিকদের উপর আরোপ করা যাইতে পারে। স্বাধীনতার অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান—যোগ্য। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারার ১নং অনুচ্ছেদটিতে যে সকল অধিকারের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের অযথা হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষে এই অধিকারগুলি ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতিকারের জন্য সাধারণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।[৬] দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। এই বাধানিষেধগুলির পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে কিনা তাহা বিচার করিবার দায়িত্ব হইল আদালতের। তবে দেখিতে হইবে, এই বাধা-নিষেধগুলি যেন অতিরিক্ত মাত্রায় না হয়। "Legislation which arbitrarily or excessively invades the right cannot be said to contain the quality of reasonableness".[৭] নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুযায়ী যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারাটি কার্যকরী হইবে না। শাসনতন্ত্রের ২০ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যে অবস্থার এবং যে সময়ের কাজকে অপরাধজনক বলিয়া ধরা হয়, সেই সময়কার প্রচলিত আইন ভঙ্গের জন্য অপরাধ হইলেই কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ২০ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে একই অপরাধের জন্য একটি নাগরিককে দুইবার শাস্তি দেওয়া চলিবে না। একই অপরাধের জন্য একাধিকবার বিচার সংক্রান্ত অধিকারটি শুধু কোন ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য,

৬। Samdasani vs. Central Bank of India (1952).

৭। Chintamanrao and others vs, State of M. P. (1952)

অন্য বিচারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে।[৮] যেমন, কোন সরকারী কর্মচারী নিজের অপরাধের জন্য আদালতে দণ্ডিত হইতে পারেন ; আবার সেই সঙ্গে সরকার তাহার বিভাগীয় কাজের তদন্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

তৃতীয়ত, ভারতীয় নাগরিকগণ সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ভোগ করে। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরী ও নির্দিষ্ট কার্যকাল পাইবার (Right to reasonable wages and hours of work) অধিকার আছে। এইজন্য ভারত সরকার কারখানা আইন, সর্বনিম্ন মজুরী আইন ইত্যাদি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ কাহাকেও জোরজবরদস্তি করিয়া কোন কাজ করাইতে পারিবে না (২৩ নম্বর ধারা)।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

চতুর্থতঃ নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বলিতে ধর্মাচরণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience) বুঝায়। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular state)। সুতরাং ভারতীয় নাগরিকদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মাচরণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে (২৫-২৮ নম্বর ধারা)।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার

পঞ্চমত, ভারতীয় নাগরিকগণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (cultural and educational Rights) ভোগ করে। নাগরিকগণ যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আছে। তাহা ছাড়া, নিজের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকারও নাগরিকদের আছে।

সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (Right to Property)

ষষ্ঠত, নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার আজকাল সব দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকদেরও নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার পূর্ণ অধিকার আছে। অবশ্য এই অধিকারটি সামাজিক স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যেমন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি জাতীয়করণ করিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সম্পত্তির অধিকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এই হস্তক্ষেপের মাধ্যম হইতেছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা (eminent domain), পুলিশী ক্ষমতা (police power) এবং করস্থাপন ক্ষমতা (power of taxation)। নিকোলাসের (Nicholas) ভাষায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাটি হইতেছে "the power of the sovereign to take

৮। Venkataraman vs. Union of India (1954).

property for public use without the owner's consent." সম্পত্তির মালিকের সম্মতি ব্যতীতই রাষ্ট্র এই ক্ষমতাবলে সম্পত্তি দখল করিতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে তিনটি সর্ত আছে : (১) ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আইনের নির্দেশ থাকা প্রয়োজন ; (২) জনস্বার্থ বর্তমান থাকা প্রয়োজন ; এবং (৩) ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পুলিশী ক্ষমতা হইতেছে সেই ক্ষমতা যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনকল্যাণ এবং জনস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে।[১] পুলিশী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া যদি রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি ধ্বংস করে অথবা দখল করে, তাহার জন্য যে রাষ্ট্র সর্বদা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে তাহা নহে। তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩১ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দেশ ব্যতীত সম্পত্তিচ্যুত করা যায় না এবং ৩১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র যদি কোন সম্পত্তি দখল করিতে চাহে, তবে ইহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ; তাহা ছাড়া, সার্বজনীন উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র কাহারও সম্পত্তি দখল করিতে পারিবে। ১৯৫৫ সালে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী আইন অনুয়ায়ী সার্বজনীন উদ্দেশ্যে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী আইনের ভিত্তি ছাড়া অন্য কোন ভাবে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে দখল করিতে পারিবে না। জনস্বার্থের খাতিরে এবং পরিচালনার উন্নয়নের জন্যও কোনও কোম্পানীর শাসনভার সরকার গ্রহণ করিতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার

সর্বশেষে, নাগরিকগণকে **শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের ক্ষমতা (Right to Constitutional Remedies)** দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী নাগরিকগণ নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করিতে পারে। দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হইলে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে তাহাদের মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে বাধ্য। কিন্তু, আমাদের দেশে সরকার যে কোন সময়েই নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) চালু রাখিতে পারেন। চীনা আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় ভারত সরকার ১৯৬২ সালের ৩০শে অক্টোবর ভারতপ্রতিরক্ষা আইনও (Defence of India Act) প্রবর্তন করিয়াছেন। বিনা বিচারে আটক না থাকিবার অধিকার ভারতীয় নাগরিকগণের আছে। কিন্তু ভারত প্রতিরক্ষা আইনে নাগরিকদের সেই অধিকারকেও নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে কোন নাগরিককে

---

[১] Willis তাঁহার *Constitutional law of the United Statee* বইয়ে বলিয়াছেন, "The police power is the legal capacity of government to control the personal liberty of individuals for the protection of the social interests (or common good) of the people who established such Government."

কি কারণে আটক রাখা হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ জারী করিতে পারে, ইহাকে "Habeas Corpus" বলা হয়। আবার হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট চরম আদেশ বা "Mandamus" জারী করিয়া কোন ব্যক্তি, সংস্থা, অধস্তন আদালত অথবা সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রতিষেধের (Prohibition) সাহায্যে উর্ধ্বতন বিচারালয় নিম্নতন আদালতকে আপন এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করে। ইহা শুধু বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাসন বা আইন সংক্রান্ত কাজের বেলায় প্রযুক্ত হয় না। *Quo warranto* বা অধিকার-পৃচ্ছা অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তি যে-পদ অধিকারে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় সে পদ বা অধিকার দাবি করে তখন তাহার দাবী বৈধ কিনা তাহা অনুসন্ধান করা হয় এবং অবৈধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। (*Certiorari*) বা উৎপ্রেষণ অনুযায়ী নিম্নতন আদালত বা বিচার বিভাগের কিছু ক্ষমতা আছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীমা লংঘন করিলে ঐ বিচারালয় বা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বিচারকে উচ্চতর বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করা যায় কিংবা ক্ষমতা-বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়। শাসনতন্ত্রের ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অধিকারকে উপরোক্ত উপায়গুলির মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা অথবা জননিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত শক্তিসমূহের সদস্যরা কতটা এই মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করিবে তাহা পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া স্থির করিবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দণ্ডমকুব আইন প্রণয়ন করারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক শাসন থাকাকালীন অবস্থায় যদি সশস্ত্র বাহিনী এমন কোন কাজ করে যাহা শাসনতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অবৈধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বৈধ ঘোষণা করিয়া আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে।

সশস্ত্র বাহিনীর অথবা জননিরাপত্তা রক্ষায় নিযুক্ত লোকের মৌলিক অধিকার

ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি যে খুবই গণতান্ত্রিক সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই অধিকারগুলি কখনই সর্তবিহীন (absolute) নহে। জরুরী অবস্থায় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের এই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তবে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় যদি নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) চালু থাকে, তবে শাসকগোষ্ঠী এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন—এই আশংকা অমূলক নহে।

মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক

সাম্যের অধিকার (Right To Equality): "সাম্য" কথাটির প্রকৃত

তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার পথ খোলা রাখিয়া সমান ভাবে সকলেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথের অন্তরায়গুলি দূর করা। সমাজে মুষ্টিমেয় লোক যদি কতিপয় সুবিধা বিশেষভাবে ভোগ করে, তাহাই অসাম্য। এই অসাম্যের প্রতিবাদেই সাম্যনীতির (doctrine of equality) সৃষ্টি হইয়াছে। লাস্কির মতে সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের সোপান। সাম্যের বিভিন্ন রূপ আছে; যথা, পৌরসাম্য (Civil Equality), সামাজিক সাম্য (Social Equality), রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality), অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality), আইনের সাম্য (legal Equality) এবং প্রাকৃতিক সাম্য Natural Equality)। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের যে সাম্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা মূলতঃ পৌরসাম্য, সামাজিক সাম্য, আইনগত সাম্য এবং রাজনৈতিক সাম্য। অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের দেওয়া হয় নাই।

সাম্যের অধিকার ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং ধারা হইতে ১৮ নং ধারায় আলোচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিভাগে সাম্যের অধিকারটি বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমত, আইনের চোখে সকলেই সমান এবং প্রত্যেকেই আইনের সমান সংরক্ষণ লাভ করিবে (১৪ নং ধারা)। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র এবং বিশেষ শ্রেণীর জন্য ছাড়া, রাষ্ট্র বৈষম্য স্থাপন করিতে পারিবে না (১৫ নং ধারা)। তৃতীয়ত, সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। অবশ্য কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সুযোগ সুবিধা দান এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে (১৬ নং ধারা)। চতুর্থত, সামাজিক জীবনে অস্পৃশ্যতার বৈষম্য করা চলিবে না (১৭ নং ধারা)। পরিশেষে, সামরিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্র কোন উপাধি প্রদান করিতে পরিবে না (১৮ নং ধারা)।

সাম্যের অধিকার সম্বলিত মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে ১৪নং ধারাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; এই ধারা গ্রেট-বৃটেনের "আইনের চোখে সবাই সমান" নীতির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "আইনের সমান সংরক্ষণে"র নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আইনের চোখে সমান নীতিটি Dicey'র Rule of Law-র তিনটি নীতির একটি অন্যতম নীতি। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, "The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India." "আইনের চোখে সকলেই সমান" এবং "আইনের সংরক্ষণ সকলের পক্ষে সমান" উক্তি দুইটির তাৎপর্য আপাত-দৃষ্টিতে এক মনে হইলেও, উক্তি দুইটির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। শ্রীদুর্গাদাস বসুর অভিমতে "While equality before the law is a somewhat negative concept implying the absence of any

special privilege……equal protection of the laws is a more positive concept, implying equality of treatment in equal circumstances." অর্থাৎ "আইনের চোখে সকলেই সমান" এই উক্তিটির তাৎপর্য হইতেছে এই যে, কেহ কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাইবে না। অপরদিকে "আইনের সংরক্ষণ সকলের পক্ষে সমান" কথাটির তাৎপর্য হইতেছে এই যে একই রকম অবস্থায় সকলেই সমানভাবে আইনের সংরক্ষণ পাইবে। অর্থাৎ, সমপর্যায়ভুক্ত জনগণের মধ্যে আইন সমতা রক্ষা করিয়া চলিবে। ডাইসি (Dicey) ইংলণ্ডের Rule of law সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, "আইনের চোখে সকলেই সমান" ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এই বিধানটিরও আমরা সেই ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারি।[৫]

চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যে মামলা হয় তাহাতে শাসনতন্ত্রের ১৪নং ধারাটির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেন যে (ক) আইনের সমান সংরক্ষণ হইতেছে সমান অবস্থায় সকলেরই সমান সংরক্ষণ ; (খ) আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত-ভাবে আইনের শ্রেণীবিন্যাস করিতে পারে, এবং (গ) যাহারা কোন আইনের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তাহাদেরই দায়িত্ব হইতেছে নিজেদের যুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

সংবিধানের ১৪নং ধারায় সাম্যের নীতি স্বীকৃত হইলেও বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য সরকার যথোচিত শ্রেণী বিভাগ করিতে পারে। শ্রেণী বিভাগ অবশ্যই যথার্থ এবং প্রকৃত অস্তিত্বপূর্ণ পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়াই করিতে হইবে, শ্রেণী বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত উপায়েও হওয়া উচিত। যদি শ্রেণী বিভাগ বিধিবহির্ভূত বা স্বেচ্ছাচারী আইনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় তবে সেক্ষেত্রে উহা শাসনতন্ত্র বিরোধী এবং বাতিল বলিয়া বিবেচিত হয়। বোম্বাই প্রদেশ বনাম এফ, এন বালসারা এবং চিরঞ্জিৎলাল বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মামলার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মামলার রায়দান কালে সুপ্রীম কোর্ট বলে যে শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই যথার্থ এবং প্রকৃত অস্তিত্বপূর্ণ পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে হইবে এবং যে উদ্দেশ্য সাধনে এই শ্রেণীবিভাগ করা হইবে, সেই উদ্দেশ্য এবং শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকিতে হইবে। এই রায়-এ আরও বলা হয় যে প্রতি শ্রেণীবিভাগই কিছু পরিমাণে বৈষম্য সৃষ্টি করে, কিন্তু কেবলমাত্র বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আইনকে বাতিল করা চলিবে না।

---

৫ ডক্টর জেনিংসের ভাষায় আমরা বলিতে পারি, "Equality before the law means that among equals the law should be equal and should be equally administered that like should be treated alike."

সাম্যের নীতিতে, কতকগুলি ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সংবিধানের ৩৬১ নম্বর ধারার দ্বারা রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালকে সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে তাহাদের কার্যের জন্য কোন আদালতে অভিযুক্ত করা চলিবে না এবং তাহাদের বিপক্ষে কোন ফৌজদারী মামলাও দায়ের করা যাইবে না এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও জারী করা যাইবে না। রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল শাসনতন্ত্রের নিকট হইতে যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে নিজের কোন কাজের জন্য তিনি আদালতের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন।

দ্বিতীয়ত, ২২ নম্বর ধারার দ্বারা বিদেশীদের কতকগুলি অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

তৃতীয়ত বৈদেশিক শাসক এবং রাষ্ট্রদূতগণ কতকগুলি বিচার সংক্রান্ত আইন হইতে মুক্ত (enjoys certain immunity from judicial process)।

সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারার দ্বারা কেবলমাত্র বংশের, বর্ণের, জন্মস্থানের, ধর্মের এবং স্ত্রী-পুরুষের বিভেদের দোহাই দিয়া বৈষম্য স্থাপন নিষিদ্ধকরণ করা হইয়াছে। সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত দোকান, রেস্তোঁরা এবং অন্যান্য প্রমোদ স্থানে উপরি-উক্ত কারণে প্রবেশ নিষিদ্ধকরণও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত কিংবা সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত পুকুর, স্নানঘাট, নলকূপ, কূপ এবং রাস্তা কেবলমাত্র ধর্মের বা জাতের প্রশ্ন তুলিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ বা ব্যবহার দানে অসমর্থতা প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং আইনতঃ অপরাধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য জনস্বার্থে রাষ্ট্র বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে। সরকার কোন ছোঁয়াচে রুগীকে অবশ্যই সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত কোন পুকুর এবং পুকুরঘাট ব্যবহার করিতে না দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উহা ন্যায়সঙ্গতই হইবে।

রাষ্ট্র দুইটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম স্থাপন করিতে পারে। প্রথমত, রাষ্ট্র স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সামাজিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নত জাতির অথবা উপজাতির এবং তপশীলী বর্ণের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

১৯৫১ সালের প্রথম সংশোধনের দ্বারা ১৫ নম্বর ধারার সহিত ৪নং অনুচ্ছেদ সংযোগ করা হয়। এই সংযোজন মাদ্রাজ রাজ্য বনাম চম্পকম এবং মাদ্রাজ রাজ্য বনাম শ্রীনিবাশম মামলার ফলেই সাধিত হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্রাদেশিক সরকারের ১৯৪৮ সালের আদেশ অনুযায়ী মাদ্রাজ Engineering College-এর শূন্যস্থান ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, ইঙ্গ-ভারতীয় এবং হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সুপ্রীম কোর্ট মাদ্রাজ সরকারেরর উক্ত আদেশ সংবিধানের ১৫ (১) এবং ২৯ (২) ধারা ভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া রায়দান করে এবং আদেশটিকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করে।

সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে সমস্ত নাগরিকই সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবে। কেবলমাত্র বংশ, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, বাসস্থান. এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য স্থাপন করা যাইবে না।

রাষ্ট্র তিনটি ক্ষেত্রে বৈষম্য স্থাপন করিতে পারে। প্রথমত, উপযুক্ত আইনের দ্বারা আইনসভা প্রাদেশিক সরকারী চাকুরীতে বসবাসের যোগ্যতা বাধ্যতামূলক করিতে পারে। এই ক্ষমতার যাহাতে অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ না হয় সেইজন্য এই ক্ষমতা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভার হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে—রাজ্য আইনসভার এই ক্ষমতা নাই।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র অনুন্নত জাতির জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ৩৩৫ নম্বর ধারার ফলে রাজ্য সরকারগুলি অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতির জন্য সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কতকগুলি আসন ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারে।

১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণ করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের Untouchability offence আইনের ফলে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই আইনের ফলে সামাজিক বৈষম্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

সংবিধানের ১৮ নম্বর ধারার বলে উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অবশ্য সামরিক এবং শিক্ষাগত উপাধি এই ধারার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয় নাই। ১৮ নম্বর ধারায় আরও বলা হইয়াছে যে ভারতীয় নাগরিক কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কোন উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই ধারায় আরও বলা হইয়াছে যে কোন বিদেশী যদি ভারতে কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকে, তবে সে রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত বিদেশী রাষ্ট্রের কোন উপাধি বা পুরস্কার গ্রহণ করিবে না।[৬]

সাম্যের অধিকারটির পর্যালোচনার পর ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কেবলমাত্র বিশেষ কয়েটি ক্ষেত্র ছাড়া এবং বিশেষ কয়েকটি শ্রেণী ছাড়া আইনের চোখে সকলেই সমান ; সকলেই আইনের, সরকারী চাকুরীর এবং রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করিয়া থাকে।

৬। সংবিধানের ১৮ নম্বর ধারা সম্পর্কে বিতর্কের সময় ডক্টর আম্বেদকর গণপরিষদে মন্তব্য করেন, "The non-acceptance of titles is a condition of continued citizenship, it is not a right, it is a duty imposed upon the individual that if he continues to be the citizen of this country then he must abide by certain conditions. One of the conditions is that he must not accept a title, if he did, it would be open for Parliament to decide by law what should be done to persons who violate the provisions of this article one of the penalties may be that he may lose the right of citizenship."

আমাদের শাসনতন্ত্র যে মৌলিক সাম্যের অধিকার নাগরিকদের প্রদান করিয়াছে তাহাতে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই অথবা ইহা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টাও হয় নাই। নাগরিকগণ অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Right) পাইয়াছে কিন্তু, অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার পায় নাই। রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক ন্যায় (Economic Justice) প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অর্থনৈতিক সাম্যের বিধান থাকা দরকার। তবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত সরকার অর্থনৈতিক অসাম্য কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom): ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারায় নাগরিকদের সাতপ্রকার স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যথা, (ক) কথা বলা ও মতামত প্রকাশের অধিকার (Right to freedom of speech and expression), (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে একত্রিত হইবার অধিকার (Right to assemble peaceably and without arms), (গ) সংঘবদ্ধ হইবার বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার (Right to form association or Unions), (ঘ) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (Right to move freely throughout the territory of India), (ঙ) ভারতের যে কোন অংশে বসবাস করিবার অধিকার (Right to reside and settle in any part of India), (চ) সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তর করিবার অধিকার (Right to acquire, hold and dispose of property), এবং (ছ) যে কোন বৃত্তি, উপজীবিকা ও ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার অধিকার (Right to practise any profession, or carry on any occupation, trade or business)

যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এই অধিকারগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী।* কিন্তু এই অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ নয়। সংবদ্ধ বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের সীমাবদ্ধতা আমরা দেখিতে পাই। জনশৃঙ্খলা বা সদাচারের স্বার্থে (in the interest of Public order or morality) এই অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত সীমা আরোপিত হইতে পারে। নাগরিকগণ যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য মিলিত হয় অথবা নাগরিকগণ মিলিত হইয়া যদি জনশৃঙ্খলা নষ্ট করে এবং এই উদ্দেশ্যে যদি কোন সমিতি বা ইউনিয়ন গঠিত হয় তবে তাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে। যদি কোনও শ্রমিক

সংঘ বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের উপর বাধানিষেধ

* স্বাধীনতার অধিকারগুলির মধ্যে বাকস্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার আলাদাভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

সংঘ বা ইউনিয়ন বে-আইনীভাবে ধর্মঘট করে তবে তাহা নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে। তবে এই ধরণের বাধানিষেধ যুক্তিসঙ্গত (reasonable) কিনা তাহা বিচার করিবার এক্তিয়ার হইতেছে আদালতের। যদি কোন আইন আদালতের বিচারক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া শাসনবিভাগকে মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে বাধানিষেধ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ রাজ্য বনাম রাও মামলায় সুপ্রীম কোর্ট অনুরূপ অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন।*

স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে বাক স্বাধীনতা (Freedom of speech)। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আমাদের শাসনতন্ত্রে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Prees) উল্লিখিত হয় নাই। কারণ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার (Freedom of expression) মধ্যেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিহিত আছে। স্বাধীনতার অধিকার কখনই নিরঙ্কুশ নহে।[৭] প্রয়োজনবোধে স্বাধীনতার অধিকারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) আরোপ করা যাইতে পারে এবং যদি তাহা করা হয় তবে ব্যক্তির বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থেই তাহা করা উচিত।

বাক্ স্বাধীনতার অধিকার (Freedom of speech) ঃ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকগণ বাক্-স্বাধীনতার অধিকার পাইয়াছে। বাক্-স্বাধীনতা বর্তমানে নাগরিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার। এই অধিকার একদিকে পৌর অধিকার এবং অপর দিকে রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।

কিন্তু মূলতঃ ইহা একটি পৌর অধিকার। স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার যদি মানুষ না পায়, তবে তাহার ব্যক্তিগত পূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। নিজের মনের ভাব

বাক্-স্বাধীনতার গুরুত্ব

* "The Foundamental right to associations or Unions guaranted by Article 19 (1) (c) has such a wide and varied scope for its exercise and its curtailment is fraught with such potential reactions in the religious, political and economic fields that the vesting.of the authority in the executive government to impose restrictions on such right without allowing the grounds of such imposition both in their factual and legal aspects to be duly tested in a judicial enquiry, is a strong element which should be taken into account in judging the reasonableness of restriction imposed on the fundamental right under Article 19 (1) (c)."

৭ ১৯৫০-৫১ সালে গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (Gopalan V. State of Madras) মামলায় বিচারপতি শ্রী জি, মুখার্জী মন্তব্য করিয়াছিলেন There cannot be any rich thing as absolute or uncontrolled liberty wholly freed from restraint for that would lead to anarchy and disorder."

সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার সব মানুষেরই থাকা উচিত। সামাজিক জীবনে সংহতি স্থাপনের জন্য যেমন ইহা একান্ত আবশ্যক, সেইপ্রকার গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলেও নাগরিকগণের এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে থাকা দরকার। কোন গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে জনমতের সমর্থনের উপর। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতাই প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে জনমত সংগঠনের জন্য দায়ী। বক্তৃতার সাহায্যে জনমতের উপর যত প্রভাব বিস্তার করা যায়, অন্য কোন উপায়ের সাহায্যে জনমতের উপর তত প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্তু, এই স্বাধীনতা অথবা অধিকারটিও সর্বজনীন নহে। যদি কাহারও কথা বলার স্বাধীনতা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অথবা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার বজায় রাখিবার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট্র সেই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার আছে বলিয়াই যে আমরা যাহা খুশী তাহাই করিব অথবা কাহাকেও অপমান করিব তাহা কখনই রাষ্ট্র সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ যুদ্ধ অথবা আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে দেশগুলিতে একনায়কতন্ত্র দেখা যায় সেই দেশগুলিতে বাক্-স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় না; সেখানে জনমতের কণ্ঠরোধ করা হয়।

বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিশেষ নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ

বাক্-স্বাধীনতার সহিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সভাসমিতি আহ্বান করিবার স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে অথবা সভাসমিতির অধিবেশনেই নাগরিকগণ তাহাদের মতামত স্বাধীনভাবেই এবং অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করিতে পারে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতাও শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রের মারফৎ নাগরিকগণ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে পারে এবং যদি সরকার কখনও অন্যায়ভাবে নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে, তবে সংবাদপত্রের মারফৎ কঠোর সমালোচনা করিয়া তাহা প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ভারতীয় নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা সাধারণ সময়ে সাতটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীন—সেইগুলি হইতেছে, (ক) মানহানিকর কথাবার্তা (defamation), (খ) আদালতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কথাবার্তা (Contempt of Court), (গ) নীতিবিরোধী কথাবার্তা (decency of morality), (ঘ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা (Security of the State) বিঘ্নকারক কথাবার্তা, (ঙ) অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রীতির (Friendly relation with foreign States) বিঘ্নকারক কথাবার্তা,

বাকস্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ

(চ) কোন অন্যায় উদ্রেককারী কথাবার্তা (incitement to an offence) এবং (ছ) জন-শৃঙ্খলা (Public order) ভঙ্গকারী কথাবার্তা। সুতরাং বাক্-স্বাধীনতা কোন অবস্থায়ই নাগরিকগণকে এমন স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে না যাহাতে তাহারা বে-আইনী অথবা নীতিবিরোধী কথা বলিতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এই নিয়ন্ত্রণগুলি প্রযোজ্য। সভা-সমিতির মাধ্যমে যখন নাগরিকগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করিবে, তখনও তাহাদের এই নিয়ন্ত্রণগুলি পালন করিয়া চলিতে হয়।

প্রথম এবং ষোড়শ সংশোধনের ফলে বাক্-স্বাধীনতার অধিকারটির যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫০ সালে রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (Ramesh Thapar vs. State of Madras) এবং ব্রীজভূষণ বনাম দিল্লী রাজ্য (Brij Bhushan and others vs. State of Delhi) মামলার রায় দান কালে সুপ্রীম কোর্ট বলে যে, সংবাদ পত্রের বিষয়াদির প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা (Pre-censorship) বাক্-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং সংবিধান অনুযায়ী কোন বিষয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যাহত বা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন না হইলে কেবলমাত্র জনশৃঙ্খলা (Public order) বা জনসাধারণের নিরাপত্তার অজুহাতে বাক্স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। এই রায়ের ফলেই ১৯৫১ সালের প্রথম সংশোধনের দ্বারা জনশৃঙ্খলা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্প্রীতির বন্ধন এবং কোন অন্যায় উদ্রেককারী কথাবার্তা ইত্যাদি বাধা-নিষেধগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; ১৯৬৩ সালের ষোড়শ সংশোধনের ফলে, আরও দুইটি ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপিত হয়। এই সংশোধনের ফলে সরকার "ভারতের সার্বভৌমিকতার" এবং "ভারতের সংহতি"র স্বার্থে বাক্-স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ স্থাপন করিতে পারিবে। দেখা যাইতেছে শাসনতন্ত্রের প্রথম অবস্থার তুলনায় বর্তমানে বাক্য ও মতামত প্রকাশের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিবার সরকারী ক্ষমতাকে আরও ব্যাপক করা হইয়াছে। অনেকে ইহা গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা মতামত প্রকাশের অধিকারের অঙ্গীভূত। বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময়ে সংবাদপত্রের বিষয়াদি প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা (Pre-censorship) নাই। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধিত ১৯(২) ধারা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও সংবাদ পত্রের বিষয়াদি পূর্বে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। তবে শাসনতন্ত্রের প্রথম সংশোধন অনুযায়ী এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ যুক্তিসঙ্গত (reasonable) হওয়া প্রয়োজন। ১৯৬১ সালের বীরেন্দ্র বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (Virendra vs. State of Punjab) মামলার রায় প্রদান কালেও ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অনুরূপ অভিমত প্রদান করে।

শাসনতন্ত্রের ২০ (১) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, যে অবস্থার এবং যে সময়ের কাজকে অপরাধজনক বলিয়া ধরা হয়, সেই সময়ের প্রচলিত আইন-ভঙ্গের জন্য অপরাধ হইলেই কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

২০ নম্বর. ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে একই অপরাধের জন্য দুইবার একটি নাগরিককে শাস্তি দেওয়া চলিবে না। একই অপরাধের জন্য একাধিকবার বিচারসংক্রান্ত অধিকারটি শুধু কোন ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, কোন সরকারী কর্মচারী নিজের অপরাধের জন্য আদালতে দণ্ডিত হইতে পারেন ; আবার সরকার সেই সঙ্গে তাহার বিভাগীয় কাজের তদন্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

নাগরিকদের কোন্ কোন্ অবস্থায় দোষী সাব্যস্ত করা যায়

২০ নম্বর ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোনমতেই তাহার নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা যাইবে না।

২১ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে কেবলমাত্র আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে জীবন বা স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

সংবিধানের ২২ নম্বর ধারার প্রথম এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে কোন লোককে গ্রেপ্তার করিতে হইলে গ্রেপ্তার করিবার কারণ যতশীঘ্র সম্ভব না জানাইয়া তাহাকে আটক রাখা যাইবে না। গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এমন নাগরিককে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। কোন লোককে গ্রেপ্তার করিবার পর তাহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করাইতে হইবে।

নাগরিকদের কথন গ্রেপ্তার করা যায়

সংবিধানের ২২ নম্বর ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদ বলা হইয়াছে যে শত্রুপক্ষীয় বিদেশী এবং নিবর্তনমূলক আইনে আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে।

নিবর্তনমূলক আটকের তাৎপর্য (Significance of Preventive Detention) : ভবিষ্যতে কোন অপরাধ করিতে পারে এই আশংকায় যদি কাহাকেও বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, তবে ইহাকে নিবর্তনমূলক আটক বলা হয়। নিবর্তনমূলক আটকের (Preventive Detention) জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না,—সন্দেহই ইহার ভিত্তি। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে যুদ্ধের সময় অথবা তদ্রূপ জরুরী অবস্থায় নিবর্তনমূলক আটকের নীতি প্রয়োগ করা হয় ; কিন্তু ভারতে স্বাভাবিক অবস্থায়ও ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। শাসনতন্ত্র আইন-সভাকে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

নিবর্তনমূলক আটক কথাটির তাৎপর্য

যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক জিনিস সরবরাহ ও দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে আটক রাখিতে পারে। এইক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে তিনমাস আটক রাখিতে পারে। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিন মাসেরও অধিককালের জন্য আটক রাখিতে হয়, তবে হাইকোর্টের বিচারকদের দ্বারা গঠিত একটি উপদেষ্টা-মণ্ডলীর দ্বারা ইহা অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিনমাসের বেশী সময়ের জন্য আটক রাখা উচিত। যাহাকে এইভাবে আটক রাখা হইবে তাহাকে অবিলম্বে আটক রাখার কারণ জানইতে হইবে।

নিবর্তনমূলক আটকের অর্থ হইতেছে বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা ; ইহার অর্থ হইতেছে শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে একজন লোককে এমন একটি কারণে আটক করিয়া রাখা যে তাহাকে আটক না করিলে দেশের নিরাপত্তা অথবা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হইতে পারে। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে নিবর্তন মূলক আটক আইন প্রণীত হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে এখানে ভারত প্রতিরক্ষা আইনে (Defence of India Act) অনেককেই বিনা বিচারে বহুবার আটক রাখা হইয়াছে।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং ভারত প্রতিরক্ষা আইনের পুনঃপ্রবর্তন করেন। এই আইনের বলে রাষ্ট্রপতির আদেশে সরকার যে কোন লোককে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনাবিচারে আটক করিয়া রাখিতে পারেন অবশ্য যদি সরকার মনে করেন যে দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য এই গ্রেপ্তারের প্রয়োজন আছে। নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুযায়ী কোন লোককে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হইলেও তাহাকে তিনমাস পরে আদালতে উপস্থিত করাইতে হয় অথবা হাইকোর্টের বিচারকদের দ্বারা ইহা অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয় যে সংশ্লিষ্ট লোককে আটক করিয়া রাখা উচিত। কিন্তু, ভারত প্রতিরক্ষা আইনে অভিযুক্ত লোকদের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার বাধ্য নহেন। বিনাবিচারে যতদিন খুশী সরকার তাঁহাদের আটক রাখিতে পারেন। এই ব্যবস্থা যে গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিপজ্জনক তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি প্রকৃতই কেহ দেশদ্রোহী হইয়া থাকে অথবা যদি কাহারও বিরুদ্ধে প্রকৃতই দেশদ্রোহিতার প্রমাণ অথবা অনুরূপ সন্দেহের কারণ থাকে, তবে সেই বিশ্বাসঘাতকের প্রকাশ্য আদালতে বিচার হওয়া উচিত। যদি বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য একটি লোককে আটক রাখা হয়, তবে অনেক-ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তিকেও শাস্তি পাইতে হইতে পারে। ইহাতে সমাজ জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়। দেশদ্রোহীকে যতটা সম্ভব কঠোর শাস্তি দেওয়া কর্তব্য ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত-রক্ষা আইন

দেশদ্রোহীদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করিয়া তাহাদের মুখোস জনসাধারণের কাছে খুলিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বিনা বিচারে কাহাকেও অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করিয়া রাখা উচিত নহে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights guaranteed in the Indian Constitution)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলিকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার, এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার।

এই অধিকারগুলিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রের ১৩ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে এই অধিকারগুলির সহিত সামঞ্জস্য নাই এমন সকল প্রকার প্রচলিত আইনই বাতিল হইয়া যাইবে। শাসনতন্ত্রের ১৩ (১) নং ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে যে সকল আইন-কানুন প্রবর্তিত ছিল সেগুলি মৌলিক অধিকারের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না হইলে বাতিল হইয়া যাইবে।[৮] তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে যে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকার মৌলিক অধিকারগুলিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না এবং এই জাতীয় আইন প্রনীত হইলেও তাহা বাতিল হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন হইতেছে শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারে কিনা। ১৯৬৭ সালের গোলকনাথের মামলা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের রায় প্রদানের পূর্বে ১৯৫২ সালে শঙ্করীপ্রসাদ বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[৯] মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই রায় দিয়াছিল যে রাষ্ট্র সাধারণ আইন

৮। "All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part shall, to *the* extent of such inconsistency, be void.

The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred bythis part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of that contravention, be void," [Art 13 (1), (2) of the costitution]

৯। "No doubt, our constitution-makers, following American model, have incorporated certain fundamental rights in Part III and made them immune from interference by laws made by the State. We find it, however, difficult in the absence of a clear indication to the contrary, to suppose that they also intended to make those rights immune from unconstitutional amendment. We are of the opinion, that in the context of

প্রণয়ন করিয়া মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না, কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া মৌলিক অধিকারগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ। কারণ, শাসনতন্ত্রের ১৩ (২) ধারা অনুযায়ী যে আইনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে সাধারণ আইন (ordinary law), সংবিধানিক আইন বা সংশোধন (Constitutional amendments) নয়। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার (Golaknath vs. The State of Punjab) মামলার[১০] রায় প্রদানকালে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষনা করিয়াছে যে ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করা চলে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহের সংশোধন করা অথবা সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পার্লামেন্টের নাই। ইতিপূর্বে পার্লামেণ্ট সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া অসঙ্গত কাজ করিয়াছে, ভবিষ্যতে এইরূপ হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। অন্যান্য যুক্তির মধ্যে এই রায়ের সপক্ষে বলা হইয়াছে যে ১৩ (২) ধারায় ব্যবহৃত 'আইন' (Law) শব্দটির দ্বারা সাধারণ আইন এবং শাসনতান্ত্রিক আইন বা সংশোধন উভয়কেই বুঝায়। সুতরাং শাসনতন্ত্রের ১৩ (২) ধারায় যখন নিষেধ করা হইয়াছে যে মৌলিক অধিকার হরণ করিয়া অথবা ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না তখন পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়াও কোন মৌলিক অধিকার হরণ অথবা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না।[১১] সুপ্রীমকোর্টের এই রায় সম্প্রতি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে।

Article 13 'law' must be taken to mean rules and regulations made in exercise of ordinary legislative power and not amendments to the constitution made in exercise of constituent power with the result that Article 13 (2) does not affect amendments made under Article 368."

[The Supreme Court of India in Sankari Prasad v. Union of India (1952)]

১০। "The power of Parliament to amend the constitution is derived from Articles 245, 246 and 248 of the constitution and not from Article 368 which only deals with procedure. Amendment is a legislative power.

Amendment is 'law' within the meaning of Article 13 of the constitution and therefore, if it takes away or abridges the rights conferred by Part III governing Fundamental rights, it is void. Parliament will have no power from the date of this decision to amend any of the provisions of Part III of the constitution so as to take away or abridge the Fundamental Rights." The Supreme Court of India in Golaknath's Case (1967).

১১। "The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this is Part (Part III) and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of contravention, be void". Article 13 (2) of the Indian Constitution.

অনেকে মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্পর্কে ৩৬৮ নং ধারা বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে শাসনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্পর্কিত ধারায় এমন কোন কথা বলা হয় নাই যে পার্লামেণ্ট মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন ধারার সংশোধন করিতে পারিবে না। অনেকে মনে করেন, মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত শাসনতন্ত্রের কোন বিধান যখন খুশী তখনই সংশোধন করা যেমন অনুচিত, সেইপ্রকার এই বিধান-গুলি অপরিবর্তনীয় থাকাও অনুচিত ; কেননা সেইক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীনাথ পাই লোকসভায় একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। এই বিলটি শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নং ধারাটি সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে দিবার জন্য উত্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনাথ পাই চাহেন পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নং ধারাটিকে সংশোধন করিয়া সেখানে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া রাখুক যে দরকার হইলে মৌলিক অধিকারের তালিকায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। তাঁহার মতে সুপ্রীমকোর্টের রায় মানিয়া লইবার অর্থ হইতেছে পার্লামেণ্টের ক্ষমতার বিলোপ সাধন করা। এই বিলটি সম্প্রতি বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সরকার পক্ষের মধ্যেই মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল শ্রীশীতলবাদ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে গোলকনাথ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়াছে তাহা অসঙ্গত। শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। শুধু শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নহে, যাহাকে বলা হয় বিচারবিভাগীয় ত্রুটি বিচ্যুতি (Judicial Errors) তাহা দূর করিবার অধিকারও পার্লামেণ্টের আছে। অবশ্য এই বিতর্কের পরিসমাপ্তি এখনও হয় নাই।

ধর্মের অধিকার (Right to Religion)—ভারতীয় সংবিধানে ভারতবর্ষে বসবাসকারী সমস্ত ভারতবাসীকে ধর্মের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। সমস্ত ভারতীয়ই স্বীয় ধর্ম পালন করিতে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে এবং অব্যাহত রাখিতে পারিবে। সংবিধানে এই কারণেই ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের মানে এই নয় যে ভারতবর্ষ একটি ধর্মবিরোধী রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ হইবে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করা এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রম মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কেবলমাত্র সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না, ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শের পরিচয় সংবিধানের বহু

স্থানেই পাওয়া যায়। শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় এবং নির্দেশাত্মক নীতিতেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কথা বলা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের ১৫ এবং ১৬ নম্বর ধারার দ্বারাও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংরক্ষিত হইয়াছে। এই ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই কোন বৈষম্য করা যাইবে না এবং কাহাকেও সরকারী চাকুরী কিংবা অন্য কোন কিছু হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

ধর্মের অধিকারটিকে ২৫নং হইতে ২৮নং ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে নানাবিধ উপায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি সংরক্ষিত হইয়াছে—ভারতবর্ষে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম (State Religion) নাই, সংবিধানের ২৭নং এবং ২৮নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মকে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান করিতে পারিবে না বা কোন ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষকতাও করিতে পারিবে না কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কোন ধর্মের উন্নতির জন্য বা সুবিধার্থে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারে না। সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মীয় শিক্ষা দান করা চলিবে না, অবশ্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র অথবা তাহাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিতে পারে।

সংবিধানের ২৫নং ধারা অনুযায়ী সকল ব্যক্তিই বিবেকের স্বাধীনতা সমানভাবে ভোগ করিতে পারে, যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হইতে এবং যে কোন ধর্মমত অনুসরণ করিতে ও প্রচার করিতে পারে।[১২] অবশ্য রাষ্ট্র এই অধিকার জন শৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিক কারণে সীমিত করিতে পারে ও তাহার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে যদিও বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ধর্মীয় কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, তবুও কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমন জনস্বার্থে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কোন কোন লোকায়ত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ইহার কিছু নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে রতিলাল বনাম বোম্বাই প্রদেশের মামলার কথা উল্লেখ করা যাইতে। ১৯৫১ সালের Madras Hindu Religious এবং charitable আইনের দ্বারা কমিশনারকে তত্ত্বাবধানের এবং পরিচালনার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট ইহা সংবিধান বিরোধী বলিয়া বে-আইনী ঘোষণা করে।

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিক, অনাগরিক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ২৬নং ধারার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার, ধর্মীয় ব্যাপারে স্বীয় কার্যাবলীর ব্যবস্থা ও পরিচালনা করিবার অধিকার, আইনসম্মত

১২। (Champakam vs. state of Madras)।

উপায়ে সম্পত্তি অর্জন করিবার ও মালিক হইবার এবং ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার এবং ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়ছে। রাষ্ট্র সাহায্যদানকালে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না। পরিশেষে, কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাও রাষ্ট্র করিতে পারিবে না। এই কারণেই মাদ্রাজ সরকারী কলেজে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাটি সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং বাতিল হইয়া যায়।[১৩]

সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) : নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকারটি বর্তমানে সমস্ত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বীকৃত হইয়াছে ও ইহা ভারতীয় সংবিধানে ১৯ (১,ক), ৩১, ৩১(ক) এবং ৩১(খ) ধারার দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে।

সম্পত্তির অধিকারটি অলিখিত শাসনতন্ত্র গ্রেটব্রিটেনেও প্রতীয়মান হয়। পঞ্চম এবং চতুর্দশ সংশোধনের ফলে আমেরিকাতেও সম্পত্তির অধিকারটি স্বীকৃত হইয়াছে। আমেরিকার শাসনতন্ত্রে দুইটি নীতির দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় এবং সম্পত্তির অধিকার হইতে একজন নাগরিককে বঞ্চিত করা যায়। প্রথমত, Eminent Domain বা সর্বোচ্চ ক্ষমতা[১৪] এবং দ্বিতীয়ত, পুলিশী ক্ষমতা বা Police Power.[১৫] Eminent Domain বা সর্বোচ্চ নীতির দ্বারা রাষ্ট্র জনস্বার্থে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারে। Police Power বা পুলিশী ক্ষমতা নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনকল্যাণ এবং জনস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কোন সম্পত্তি ধ্বংস অথবা দখল করিতে

১৩। "Every person has a fundamental right under our constitution, not merely to *entertain* such religious belief as may be approved by his judgment or conscience but to exhibit his belief and ideas in such overt acts as are enjoined or sanctioned by his religion and further to propagate his religious views for the edification of others." *Ratilal* v. *State* of *Bombay* (1954)

১৪। Eminent domain refers to "the power of the sovereign to take property for public use without the owner's consent," Nicholas.

১৫। "The Police power is the legal capacity of government to control the personal liberty of individuals for the protection of the social interest (or Common good) of the people who established such government."—Wills.

পারে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯৩৫ সালের আইনের ২৯৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা সরকার জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে পারিত।

সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকার সমূহ লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ১৯ নম্বর ধারার ফলে নাগরিকগণ সম্পত্তি অর্জন করিতে, দখল বা ভোগ করিতে এবং পরিত্যাগ বা দান করিতে পারে। অবশ্য সরকার জনস্বার্থে এবং অনুসূচিত জনজাতির স্বার্থে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে। অপরদিকে, ৩১ নম্বর ধারাটি কেবলমাত্র সম্পত্তির অধিকারটি লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছে। ১৯ নম্বর ধারায় পুলিশী ক্ষমতার (Police Power) এবং ৩১ নম্বর ধারায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার (Eminent Domain) নীতিটির অংশ-বিশেষ পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার সমুহের মধ্যে সম্পত্তির অধিকার অন্যতম। ভারতীয় সংবিধানে তিনটি সর্তের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সর্তের ফলে নাগরিকগণ কেবল মাত্র সম্পত্তি ভোগই করিতে পারিবে না, প্রয়োজনে বিক্রয় ও দান করিতেও পারিবে।

প্রথমত, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকগণই আইন সম্মত ভাবে অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং ব্যক্তিগত অর্জিত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে এবং ভোগও করিতে পারিবে—ইচ্ছানুসারে বিক্রয় ও দানও করিতে পারিবে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে। উদাহরণস্বরূপ ১৯ নম্বর ধারার ১-এর চ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে জনসাধারণের সুবিধার্থে ও উন্নতির জন্য এবং অনুসূচিত জনজাতির স্বার্থে রাষ্ট্র ইচ্ছানুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ ও দানের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে পারে। সম্পত্তির ব্যবহার নীতিসঙ্গত হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের ৩১ (১) ধারায় বলা হইয়াছে যে আইন সম্মত উপায় ছাড়া কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না বা কোন ব্যক্তির সম্পত্তি গ্রহণ করা চলিবে না। অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকের অনুমোদনের মাধ্যমে গৃহীত হইতে পারে। সেক্ষেত্রে আইনের নির্দেশের কোন প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ৩১ (২) ধারার দ্বারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে। এই ধারা অনুযায়ী সরকার সর্বজনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে অধিকার বা অধিগ্রহণ করিতে পারে; অবশ্য সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বা মূল্যনীতি থাকিতে হইবে; অন্যথায় আইনটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবে।

৩১নং ধারা অনুযায়ী কতকগুলি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়

না। প্রথমত, যদি কোন আইন কর ধার্যের বা দণ্ড বিধান করার জন্য পাস করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে না।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন আইন জনস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য এবং বিপদ প্রতিরোধকল্পে বা সম্পদ রক্ষার্থে পাস করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে আইনটি ক্ষতিপূরণের আওতায় পড়ে না।

তৃতীয়ত, ভারত সরকার এবং কোন বৈদেশিক সরকারের মধ্যে স্থানপরিত্যাগকারীদের সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী যদি সরকার কোন আইন রচনা করে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আইনটি এবং সংবিধান স্বরু হইবার প্রাক্কালে যে সকল আইন আগে হইতেই ছিল তাহাও সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ বা ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া বাতিল হইবে না।

সংবিধানের প্রথম এবং চতুর্থ সংশোধনের ফলে জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের প্রশ্নটির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম সংশোধন সাধিত হয়। জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধনে অর্থাৎ ভূমিসংস্কারমূলক আইন প্রবর্তনে সরকারকে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের আইনের পরিপন্থী হইয়া উঠে। সংস্কারমূলক আইনের বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া কামেশ্বর বিহার রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে অনেকে মামলা দায়ের করেন। ফলে সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তনে বিঘ্ন দেখা দেয়। সরকার তখন ১৯৫১ সালের প্রথম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার আইনটির অর্থাৎ ৩১ নম্বর ধারার সংস্কার করে, এবং ৩১ নম্বর ধারার সহিত ক ও খ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। এই সংযোজনের ফলে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব হয় এবং জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন অব্যাহত রাখাও সম্ভবপর হয়। এই সংশোধন সুপ্রীম কোর্ট এবং পাটনা হাইকোর্টের বিহার Estate Management Act, Tenures Act, 1941, এবং ১৯৬৫ সালের Bihar Land Reforms Act-এর মামলার শুনানীর প্রত্যক্ষ ফলই বলা চলে। এই মামলায় উপরি-উক্ত আইনগুলিকে পাটনা হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানে সংকলিত মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে ১৪, ১৯ এবং ৩১ নম্বর ধারা ভঙ্গ করিাছে এবং শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করে ও বাতিল করিয়া দেয়।

প্রথম সংশোধনের ফলে ৩১ নম্বর ধারার সহিত অনুচ্ছেদ 'খ' সংযোজিত হয় এবং ইহার ফলে ১৪, ১৯ এবং ৩১ নম্বর ধারার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদালতের রায়গুলি আইনের স্বীকৃতি লাভ করে।

এই সংশোধনের ফলে সরকার যদি কোন ভূ-সম্পত্তি বা Estate অধিকারের জন্য কোন আইন অনুমোদন করে তবে তাহা মৌলিক অধিকার সংশ্লিষ্ট কোন

আইন ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং নাকচও হইবে না।

১৯৫১ সালের প্রথম সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের শেষে নবম তপশীল যুক্ত করা হইয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে নবম তপশীলে সন্নিবিষ্ট আইনগুলি কোন মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং বাতিলও হইবে না।

১৯৫৫ সালের চতুর্থ সংশোধনের ফলে ৩১ নম্বর ধারার পুনর্বিন্যাস এবং সম্প্রসারণ হয়। সম্প্রসারণের ফলে আইনসভা জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গ্রহণ কালে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিলেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ লইয়া আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা চলিবে না এবং সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিকমত বা পর্যাপ্ত হয় নাই বলিয়া আদালত আইনটিকে বাতিলও করিতে পারিবে না। বেলা ব্যানার্জী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মামলার ফলেই এই সংশোধন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল এবং সাধিতও হইয়াছিল।

এই সংশোধনের ফলে ৩১ নম্বর ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পুনর্বিন্যাস হয়। "Deprivation" বা 'বঞ্চিত' শব্দের স্থলে Acquisition এবং Requisition অর্থাৎ 'অধিকার' এবং 'অধিগ্রহণ' শব্দ সংযোজিত হয়।

যদি কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নিয়মমাফিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যদি সংশ্লিষ্ট আইন অধিকার এবং অধিগ্রহণ-এর আওতায় না পড়ে তবে সেক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না (৩১) (২ক)। এই সংশোধন সাগির আমেদ বনাম উত্তরপ্রদেশ মামলার ফলেই সাধিত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত এই সংশোধনের ফলে কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকার সম্পত্তিগ্রহণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না এবং এইগুলি মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়াও বিবেচিত হইবে না।

প্রথমতঃ, সরকার জনস্বার্থে সীমিত এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন সম্পত্তির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে আইনটি ক্ষতিপূরণ আইনের বহির্ভূত হয় এবং মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া আইনটি বাতিল করাও চলিবে না।

দ্বিতীয়ত, সরকার জনস্বার্থে একাধিক কোম্পানীকে একত্রীকরণ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, সরকার জনস্বার্থে এবং পরিচালনার উন্নয়নের জন্য ম্যানেজিং এজেন্টদের এবং পরিচালক প্রভৃতির অধিকার এবং কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করিতে পারে ও কোন কোম্পানীর শাসনভার গ্রহণ করিতেও পারে।

সর্বশেষে, জাতীয়করণের কারণে সরকার খনি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় চুক্তি শৈশবেই বা অচিরেই বাতিল করিয়া দিতে পারে। সেক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে না এবং উহা মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে বলা চলে না। এই

সংশোধন "Estate" বা ভূ-সম্পত্তি শব্দের অর্থও সম্প্রসারিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও যদি আইনের দ্বারা কোন মালিকানার স্বত্ব বা ভোগদখলের অধিকার রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত না হইয়া থাকে তবে সেক্ষেত্রে উহা রাষ্ট্র কর্তৃক দখল বা অধিগ্রহণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই উহা ক্ষতিপূরণের আওতায়ও পড়িবে না। সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং দখলের আইনটি রাজ্য আইনসভার দ্বারা রচিত ও অনুমোদিত হইলেও রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে, নতুবা আইনটি কার্যকর হইবে না।

১৯৬৪ সালের সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারটি আরও ব্যাপকভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ৩১ নং ধারার 'ক' অনুচ্ছেদটির সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনের ফলে কেবলমাত্র 'Estate' বা ভূ-সম্পত্তি শব্দটির অর্থ সম্প্রসারিত হয় না, ইহার ফলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটিও নূতন রূপ লাভ করে। ইহার ফলে সরকারকে ব্যক্তিগত জোতের অধীন ঊর্ধ্বতন সীমার অন্তর্ভুক্ত জমির অংশবিশেষ অধিকার করিতে হইলে সরকারকে জমির মালিককে বাজার দরের সমতুল্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

মৌলিক অধিকার কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়? (How are Fundamental Rights enforced?): মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঠিকভাবে কার্যকরী হয় সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কতিপয় বিধান আছে প্রথমত, শাসনতন্ত্র নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দিয়াছে, তাহা শুধু শাসনবিভাগের বিপক্ষেই নহে, তাহা আইন প্রণয়ন বিভাগের বিপক্ষেও বটে। শাসন বিভাগের কোন কাজ অথবা আইন প্রণয়ন বিভাগের কোন আইন যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয়, তবে শাসনবিভাগের সেই কাজকে অথবা আইন প্রণয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সেই আইনকে বাতিল করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের আছে। (১৩ নং ধারা)। দ্বিতীয়ত, যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচার বিভাগের ক্ষমতা আছে Habeas Corpus বা আদেশ-পত্র জারী করিয়া রাষ্ট্রের যে কোন কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে কার্যকরী করার। শাসনতন্ত্রের ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টে এবং হাইকোর্টের এই আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমতা আছে। শাসনতন্ত্রের ২৬৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লমেণ্টেরও ক্ষমতা আছে অন্য যে কেন আদালতকে এই জাতীয় আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়ার। তৃতীয়ত, যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হয় তবে এই মৌলিক অধিকার-গুলির কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া রাখা যায় না। শুধু জরুরী অবস্থায় শাসন-

তন্ত্রের ৩৫৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারগুলির কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন।

মৌলিক অধিকারগুলি কি সর্বজনীন (Are the Fundamental Rights absolute ?) : মৌলিক অধিকারগুলি সর্বজনীন নহে। কোন কোন অবস্থায় এই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। প্রথমত, শাসনতন্ত্রের ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর লোকদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ পার্লামেণ্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের ৩৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী দেশে যদি সামরিক আইন চালু থাকে তবে দেশের নিরাপত্তা অথবা শৃংখলা পুনরুদ্ধারের জন্য কেন্দ্র অথবা রাজ্যের যে কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। তৃতীয়ত, শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী আইন সভাগুলির আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপর যে সীমা আরোপিত আছে তাহা উঠিয়া যায় এবং আইনসভা জরুরী অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যে কোন রকমের আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে এবং শাসনতন্ত্র তাহা অনুমোদন করে। কিন্তু জরুরী অবস্থার অবসান হইলেই শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারাটি পুনরায় কার্যকরী হয়।

মৌলিক অধিকারের নিয়ন্ত্রণ

চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং আদালতে নাগরিকদের নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আবেদন করা সেই সময়ে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন (৩৫৯ নম্বর ধারা)।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকগণ কতিপয় মৌলিক অধিকার ভোগ করে। এই অধিকারগুলি "মৌলিক" (Fundamental) ; কেন না, নাগরিকগণ শাসনতন্ত্র হইতে এই অধিকারগুলি লাভ করিয়াছে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা নাই এইগুলিকে স্বীকার না করিয়া লওয়ার। তবে দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। কিন্তু, স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্র যদি এই অধিকারগুলি না দেয়. তবে নাগরিকগণ বিচার বিভাগের নিকট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে।

প্রথমত, সাম্যের অধিকার বলিতে আমরা বুঝি আইনের চক্ষে সব নাগরিকেরই সমান অধিকার। ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতির মধ্যে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কোন তারতম্য করা হইবে না। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার, ভোটাধিকার লাভ করিবার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারগুলি সকলেই সমান ভাবে ভোগ করিবে।

দ্বিতীয়ত, নাগরিকদের বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার (Freedom of Speech), সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press), স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার, আইনসংগতভাবে

চুক্তি করিবার অধিকার, বিদেশে থাকাকালীন জীবন রক্ষার অধিকার, স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার (Right of resistance), যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার (Right to occupation) এবং বাসস্থানের অধিকার (Right of residence) থাকিবে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় নাগরিকগণ সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ভোগ করে। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরী ও নির্দিষ্ট কার্যকলাপ পাইবার (Right to reasonable wages and hours of work) অধিকার আছে। এইজন্য ভারত সরকার কারখানা আইন, সর্বনিম্ন মজুরী আইন ইত্যাদি প্রণয়ন করিয়াছে।

চতুর্থত, নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বলিতে ধর্মাচরণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience) বুঝায়। ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State)। সুতরাং ভারতীয় নাগরিকদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মাচরণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

পঞ্চমত, ভারতীয় নাগরিকগণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and economic rights) ভোগ করে। নাগরিকগণ যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আছে। তাহা ছাড়া, নিজেদের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকারও নাগরিকদের আছে।

ষষ্ঠত, নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার আজকাল সব দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকদেরও নিজের সম্পত্তি রক্ষার পূর্ণ অধিকার আছে। অবশ্য এই অধিকারটি সামাজিক স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যেমন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি জাতীয়করণ করিতে পারে। কিন্তু, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সম্পত্তির অধিকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। সর্বশেষে, নাগরিকগণকে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের ক্ষমতা (Right to constitutional remedies) দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী নাগরিকগণ নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করিতে পারে। দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হইলে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে তাহাদের মৌলিক অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশে সরকার যে কোন সময়েই নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) চালু রাখিতে পারে। কোন নাগরিককে কি কারণে আটক রাখা হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ জারী করিতে পারে। ইহাকে হেবিয়াস কর্পাস (Habeas corpus) বলে; অথবা হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট চরম আদেশ বা "Mandamus" জারী করিয়া কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অধস্তন আদালত অথবা সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ দিতে পারে।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি কখনই সর্বজনীন (Absolute) নয়। জরুরী অবস্থায় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। ভারতে বর্তমানে নিবর্তনমূলক আটক আইন চালু আছে; তাহা অনেক পরিমাণে নাগরিকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

Exercise

1. Discuss the Fundamental Rights that an Indian citizen enjoys. Are these rights absolute ? [একজন ভারতীয় নাগরিক যে মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করেন, সেইগুলি আলোচনা কর। এই অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ ?]
(৯১-৯৭ ; ১১০ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the significance of the Right to Equality of an Indian citizen. (৯৭-১০২ পৃষ্ঠা)
[ভারতীয় নাগরিকের সাম্যের অধিকারের তাৎপর্য আলোচনা কর।]

3. Discuss the implication of the Right to Freedom as enjoyed by an Indian citizen. [ভারতীয় নাগরিক যে স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করেন তাহার তাৎপর্য আলোচনা কর।] (১০২-১০৬ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on the provisions of Preventive Detention.
[নিবর্তনমূলক আটকের তাৎপর্যের উপর একটি টীকা লিখ।] (১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা)

5. How are Fundamental Rights enforced ? Are these Rights absolute ? [মৌলিক অধিকারগুলি কিভাবে কার্যকর হয় ? এই অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ ?]
(১১৬-১১৭ ; ১০৮-১১০ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the Right to Property as guaranteed by the constitution of India. [ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে আলোচনা কর।]
(১১২১১৬ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. 1967)

7. Explain fully the right to freedom of religion under the constitution of India. [ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ধর্মের অধিকার ব্যাখ্যা কর।]
(১১০-১১২ পৃষ্ঠা) (C. U. B. A. 1966)

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক
(Relation between the Union and the States under the Indian Constitution)

[যে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং রাজ্যগুলির ক্ষমতার বণ্টন দেখিতে পাই। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ ক্ষমতার বণ্টন দেখা যায় ;—আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনে কেন্দ্র প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়—রাজ্য তালিকায় পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ ; কেন্দ্র এবং মূলরাজ্য সমূহের মধ্যে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার বণ্টন এবং শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ—ভারতের শাসনতন্ত্রটি কাঠামোয় যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও ক্ষমতাবণ্টনের দিক হইতে বিশেষভাবে কেন্দ্রপ্রবণ।]

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্ব এবং বিভিন্ন দেশে ইহার প্রয়োগ (Theory of Distribution of Powers and its application in different countries) : যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার সমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রেও আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং মূল রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন দেখিতে পাই। কিন্তু বিভিন্ন দেশে ক্ষমতার বণ্টন বিভিন্নরূপ। যদিও কেন্দ্র এবং মূলরাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন যে কোন যুক্তরাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য, ইহা একটি সমস্যাও বটে। অনেক দেশেই কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন সংক্রান্ত কতিপয় ক্ষমতার উল্লেখ করা হয় যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র অথবা রাজ্যসরকারগুলির আওতার মধ্যে থাকে। কিন্তু উল্লিখিত ক্ষমতার তালিকাভুক্ত নহে এমন কোন বিষয়েও আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। তখন এই ধরণের ক্ষমতাকে *residuary power* বা অবশিষ্ট ক্ষমতা বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতে থাকে। উড্রো উইলসন (Woodro Wilson) তাঁহার "*Constitutional Government*" বইয়ে বলিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আর রাজ্যসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন তত্ত্ব

অবর্ণিত অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি সাধারণ সরকার হিসাবে প্রয়োগ করে। ("The State Governments are the ordinary governments of the country ; the federal government is its instrument only for particular purpose."—Woodro Wilson.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির শাসনতন্ত্রে যে ক্ষমতা বিভাজন হইয়াছে তাহাতে শাসনতন্ত্রে অবর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার রাজ্যসরকারগুলির উপর অর্পিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে যে ক্ষমতাগুলি বর্ণিত হয়, সেইগুলির মধ্যে কতিপয় বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা কিংবা শাসন পরিচালনা করিবার অনন্য (exclusive) ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের থাকে ; আবার কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার থাকে রাজ্য সরকারের হাতে ; আবার এমন কতিপয় বিষয়ও কোন কোন শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত থাকে যেগুলি সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং মূলরাজ্যগুলির উভয়েরই থাকে। সেই জাতীয় ক্ষমতার তালিকাকে যুগ্ম তালিকা বা *Concurrent List* বলা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনেকটা একরূপ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমিত করা হইলেও সেই দেশের সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে আইন এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যে ভাষ্য প্রদান করিয়াছেন তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অনেকটা ব্যাপক এবং সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই সম্প্রসারণ সম্ভবপর হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রবর্তিত অনুমিত ক্ষমতাতত্ত্ব বা *Doctrine of Implied Powers*-এর মাধ্যমে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অনুমিত ক্ষমতা হইতেছে সেই ক্ষমতা যাহা লিখিত না থাকিলেও লিখিত ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত থাকে।[১] অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ। অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের ১০৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বহির্ভূত সমুদয় ক্ষমতা (Residuary powers) রাজ্যসরকারগুলির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় ক্ষমতা ক্যাণ্টনগুলির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১৪ নম্বর ধারায় কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সুপ্রীম সোভিয়েটের (Supreme Soviet)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রবর্তিত অনুমিত ক্ষমতা তত্ত্ব

১। "An implied power is a power that is deducable from an express power." Dimock and Dimock, "*American Government in Actioni.*"

ক্ষমতাগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। সুপ্রীম সোভিয়েটের বিভিন্ন ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলি নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ।

ক্ষমতা বণ্টনের আরও একটি নীতি আছে। তাহা হইতেছে রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং অবশিষ্ট সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে প্রদান করা। ক্যানাডায় অনুরূপভাবে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতার বহির্ভূত সমুদয় বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। অবশ্য প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের উপর ভেটো প্রয়োগ করার অথবা ইহা বাতিল করিবার অধিকার ক্যানাডা সরকারের আছে; কিন্তু এই ক্ষমতা খুব অল্পই প্রয়োগ করা হইয়াছে।[১]

ক্যানাডার শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বিভাজনের বিকল্পনীতি অনুসৃত হইয়াছে

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে একাধিক তালিকা উল্লিখিত থাকা উচিত কিনা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য-সরকারগুলির ক্ষমতা যে পরিষ্কার ভাবে লিখিত থাকা উচিত এই বিষয়ে সকলেই একমত। সমস্যা হইতেছে, যুগ্ম বিষয়ের তালিকা (Concurrent List) সম্পর্কে, কারণ এই তালিকা অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অবস্থা বিশেষে যুগ্ম ক্ষমতার ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার বণ্টনে তিনটি তালিকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে; যথা, কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। এই তালিকার বহির্ভূত যদি কোন বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন উঠে তবে তাহা রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে উপরোক্ত দুইটি নীতির কোনটিই সম্পূর্ণ-ভাবে অনুসৃত হয় নাই। তবে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির দিক হইতে ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের সহিত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও রাজ্যসরকারগুলির এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনন্য ক্ষমতাগুলির (exclusive powers) উল্লেখ করা হইয়াছে; অনুরূপভাবে ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের

১। "Although the powers of veto and disallowance have been exercised by the Government of Canada over provincial legislation, they have been used sparingly." (Wheare)

শাসনতন্ত্রেও অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (residuary powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। তবে ভারতীয় যুগ্ম তালিকায় (Concurrent List) যে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলির সহিত ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের যুগ্ম তালিকায় বর্ণিত বিষয়গুলির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। ক্যানাডার শাসনতন্ত্রে যুগ্ম তালিকায় মাত্র দুইটি বিষয় স্থান পাইয়াছে; সেই বিষয় দুইটি হইতেছে কৃষি (*Agriculture*) এবং অভিবাসন (*Immigration*)। যুগ্ম তালিকার দিক হইতে চিন্তা করিলে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এবং অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্রেও যুগ্ম ক্ষমতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে তাহা মীমাংসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনে তিনটি তালিকা

শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট আছে এই প্রকার ক্ষমতাগুলিকে প্রয়োগ করিতে হইলে যে অনুপূরক এবং আনুষংগিক ক্ষমতাগুলির প্রয়োজন হয় সেইগুলিকে বলা হয় "*incidental and ancillary Powers.*" ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আনুষঙ্গিক ক্ষমতার নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List) এবং রাজ্যতালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকার উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কতিপয় আনুষংগিক ক্ষমতা ভোগ করে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যতগুলি বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন শাসনতন্ত্রে এতগুলি বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতা বিভাজনের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু ইহার একটি অসুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে শাসনতন্ত্রটি অনর্থক জটিল হইয়া যাইতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতা সংক্রান্ত বিরোধ লাগিয়া থাকিতে পারে। এইজন্য হোয়ের (Wheare) তাঁহার "Modern Constitutions" বইয়ে বলিয়াছেন, "It is indeed difficult enough to interpret one list of subjects consistently. When a second or even a third is added the task of the courts becomes most *complicated* and *confused*."

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Legislative powers between the Union and the States under the Constitution of India): ভারতের শাসনতন্ত্রে আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা,—কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম

তালিকা (Concurrent List)। ইউনিয়ন তালিকায় দেশরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, রেলওয়ে, সরকারী ঋণ, ডাক ও তার, ব্যাংক-ব্যবসায়, জীবনবীমা. পররাষ্ট্র ব্যাপার, নাগরিকতা প্রভৃতি ৯৭টি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে; এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অনন্য ক্ষমতা পার্লামেণ্ট ভোগ করে। দ্বিতীয় তালিকাটি হইতেছে রাজ্য তালিকা এবং ইহাতে কৃষি, শিক্ষা, কারাবিভাগ, জনস্বাস্থ্য, সমবায় প্রভৃতি ৬৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয় সমূহের উপর আইন প্রণয়ন করার অনন্য ক্ষমতা রাজ্য-সরকারের। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ৪৭টি বিষয়—যেমন বিবাহ, চুক্তি, ভূমি রাজস্ব, সমাজ বীমা, রাজ্যের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার উভয়েই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলিকে (residuary powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে (সংবিধানের ২৪৮নং ধারা)[২]।

তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

শাসনতন্ত্রের কোন বিধান ক্ষুণ্ণ না করিয়া পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারত এবং ইহার যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যের বা উহার অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইন অঞ্চল-বহির্ভূত (extra-territorial) বা ভারতের বাহিরে কোন অঞ্চলের প্রতি প্রযোজ্য এই অজুহাতে বাতিল করা যায় না (সংবিধানের ২৪৫ নং ধারা)। শাসনতন্ত্রের সীমার মধ্যে পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলি যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে তাহাকে বলা হয় পূর্ণক্ষমতা বা *Plenary Powers.* সুতরাং শাসনতন্ত্রের নির্দেশ ছাড়া রাজ্য কেন্দ্রের নিকট এবং কেন্দ্র রাজ্যের নিকট কোন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারে না।

ক্ষমতা বিভাজনের কেন্দ্র প্রবণতা

শাসনতন্ত্রের ২৪৬নং ধারার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে কেন্দ্র এবং রাজ্যের আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। ২৪৬ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা হইতেছে পার্লামেণ্টের। যদিও রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতে, তবুও ২৪৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যের এই ক্ষমতা ইউনিয়ন তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত যে

২। "Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent List or State List.

Such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those Lists." [Art 248 (1). & (2)]

কোন আইনের দ্বারা সীমিত। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার রাজ্যসরকারেরও আছে। তবে ইউনিয়ন তালিকা সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করিয়াছে তাহার দ্বারা রাজ্যসরকারের এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে রাজ-সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের সহিত যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিরোধ হয়, তবে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনই কার্যকর হইবে। তবে যদি এইক্ষেত্রে বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়টি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় এবং যদি রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তবে রাজ্য আইন সভাকর্তৃক প্রণীত আইনই কার্যকর হইবে।

যুগ্ম তালিকা সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন নীতিতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য : আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা পার্লামেণ্টের প্রাধান্য দেখিতে পাই তিনটি অবস্থায়। প্রথমত, যদি কোন বিষয় ইউনিয়ন তালিকা এবং রাজ্য তালিকা উভয়েরই সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকে, তবে সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের থাকে। দ্বিতীয়ত, যদি কোন বিষয় ইউনিয়ন তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে ইহা ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের হাতে থাকিবে আইন প্রণয়নের অধিকার। তৃতীয়ত, যদি কোন বিষয় রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা উভয়ের আওতার মধ্যে পড়ে তবে ইহা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে ঐ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেণ্টের থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের এই বিশেষ প্রাধান্য শাসনতন্ত্রটিকে কেন্দ্রপ্রবণ করিয়া তুলিয়াছে।

আইন প্রণয়নে পার্লামেণ্টের প্রাধান্য

যদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত আইন এবং রাজ্য সরকার প্রণীত আইনের বিষয়বস্তু কোন্ তালিকার অন্তর্ভুক্ত তাহা লইয়া বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে প্রথমে চেষ্টা করা হয় সেই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে। সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়বস্তুর নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে এবং সমস্যাটির আগাগোড়া বিচার বিবেচনা করিতে হইবে। যদি দেখা যায়, রাজ্য তালিকা অনুযায়ী সেই বিষয়টি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যটির আছে, তাহা হইলে সেই আইনটি অবৈধ হইবে না। তবে যদি প্রমাণিত হয় যে আইনটি প্রকৃতই রাজ্য বিধান মণ্ডলের অধীনস্থ বিষয়গুলির কোনটির সম্পর্কে নয়, তবে সেইক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের আধিপত্য স্বীকার করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় তালিকা এবং রাজ্য তালিকার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে পার্লামেণ্টের আধিপত্য

তাহা ছাড়া, কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কেও পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের ২৪৯ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে রাজ্য সভা (Council of States) যদি উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব রাজ্যসরকারের হাতে না রাখিয়া পার্লামেণ্টের নিজের হাতে আনা উচিত, তবে সেই ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যসভার এই ধরণের প্রস্তাবের মেয়াদ এক বৎসর, তবে রাজ্যসভা এই মেয়াদ বাড়াইতে পারে। যতদিন রাজ্যসভার প্রস্তাবটি কার্যকর থাকে তাহার পর ছয়মাস পর্যন্ত পার্লামেণ্টের আইন কার্যকর থাকে।

আইন প্রণয়নে রাজ্যসভার প্রস্তাবের গুরুত্ব (সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা)

এই ধারাটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্যগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তারের যে সুযোগ রহিয়াছে তাহার জন্য গণপরিষদের (Constituent Assembly) সদস্য সহ বহু লোকই ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত রাজ্যসভার হস্তে এই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় রাজ্যগুলির সম্মতির ফলে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় বলিয়া এই ক্ষমতাকে সমর্থন করার চেষ্টা কোন কোন মহল করে। তবুও অনস্বীকার্য যে এককভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই ক্ষমতা অর্পণ করিয়া আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে কেন্দ্রের প্রাধান্য বজায় রাখার প্রচেষ্টাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অনুকূল বলা চলে না—বিশেষতঃ যখন পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষে প্রত্যেক রাজ্য হইতে সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সদস্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে করা হয় নাই ; রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে রাজ্য হইতে সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা এখানে করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রে ২৪৯ নম্বর ধারা ছাড়াও অপর একটি কারণে পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্য সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণার দ্বারা (৩৫২ নম্বর ধারা) রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেইক্ষেত্রে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে (সংবিধানের ২৫০ নম্বর ধারা)। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে মূলরাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের উপর কেন্দ্রীয় সরকার এতটা প্রাধান্য ভোগ করে না। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে (যেমন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া) ভারতের মত ক্ষমতার বণ্টনকে এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। কেন্দ্রীয়

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার ঘোষণার ফলে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য

সরকার ঐ সব রাজ্যে রাজ্য তালিকার অন্তভুক্ত আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ভোগ করে তখনই যখন আদালত জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপকে প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া তাহার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করে। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতির এইরূপ প্রতীতি হইলেই হয় যে জরুরী অবস্থা দেখা দিয়াছে কিংবা শীঘ্রই ইহা দেখা দিতে পারে; তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা সম্ভবপর হয় ও সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উপর আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত একক ক্ষমতা উপভোগ করে।

যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তবে তিনি সেই রাজ্যে সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিয়া রাজ্য বিধানমণ্ডলীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও রাজ্যের আইনসভাগুলিকে বাতিল করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্য তালিকায় আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সরকারী দলগুলি ভিন্ন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের সাহায্যে রাজ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে। সেইজন্যই এই ধারাটিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী ("unfederal") বলিয়া সমালোচনা করা হয়।

যদি রাজ্যপাল রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত বিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির মতামত জানিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করেন তাহা হইলেও রাজ্যের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক সন্ধি প্রভৃতি সর্তপালনের ক্ষেত্রেও পার্লামেণ্ট রাজ্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে (সংবিধানের ২৫৩ নম্বর ধারা)।

তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের ২৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী দুই বা ততোধিক রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অনুরোধে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এইরূপ আইনের পরিবর্তন কিংবা রদবদল করার ক্ষমতা একমাত্র পার্লামেণ্টই উপভোগ করে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্য বিধানমণ্ডলের অনুরোধক্রমে উক্ত আইনের রদবদল কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই (পার্লামেণ্ট) করিতে পারে, কোন রাজ্য সরকার পারে না। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উপর পার্লামেণ্টের এই প্রাধান্য আমাদের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রপ্রবণতা সূচিত করে।

শাসন বিভাগের ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্পর্ক (Distribution of Executive Powers and the administrative relations between the Union and the States): আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেমন

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সমস্যার সৃষ্টি করে, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই দুইটি সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে। আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে যে ক্ষমতার বণ্টন হয়, তাহার সহিত শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ণের অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে ইহা শাসন ক্ষমতাও পরিচালনা করে। রাজ্যসরকারের শাসন ক্ষমতাও রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ার সব সময় আলাদা করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। দেশের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালিত করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতার ভাব বজায় থাকে। কিন্তু সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অজুহাতে আমাদের দেশে রাজ্যসরকারগুলির শাসন পরিচালন নীতির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য এত ব্যাপক হইয়াছে যে দেশের শাসনব্যবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে একক হইয়াছে। পার্লামেণ্ট যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নে সমর্থ সেই বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা তো থাকিবেই, তাহা ছাড়াও শাসনতন্ত্রের ৭৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা সন্ধির ব্যাপারে ভারত সরকারের যে সকল অধিকার এবং ক্ষমতা থাকিবে, সেই সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শাসন পরিচালনা নীতি প্রয়োগ করিবেন। আবার শাসনতন্ত্রের ১৬২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসন নীতি পরিচালনার ক্ষমতা থাকিবে রাজ্যসরকারের হাতে।

শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা

যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে শাসন বিভাগীয় সম্পর্ক অনেকটা অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের মত। এই ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিস্তর ক্ষমতা আছে।

যুগ্ম বিষয়ক ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে সংবিধানের নির্দেশ হইল, যে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার যুগ্ম বিষয়ে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা পরিচালনা না করিবে সেই পর্যন্ত রাজ্যসরকারগুলি শাসনকার্য সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ রাজ্যসরকারের উপর শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব করিবার বিধান সংবিধানে সংযোজিত হইয়াছে। শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নির্দেশ পাঠাইতে পারে এবং রাজ্যসরকার সেই নির্দেশ গ্রহণ করে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৬৫ নম্বর ধারায় পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে কোন মূল রাজ্য যদি ইউনিয়ন সরকারের সহিত সহযোগিতা না করে তবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন।

শাসন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে মূলরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ, এবং এই সহযোগিতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়ে রাজ্যসরকারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে:—(ক) জাতীয় স্বার্থ অথবা দেশ রক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে এইরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য, এবং (খ) রাজ্যের ভিতরে রেলপথের সংরক্ষণের জন্য (সংবিধানের ২৫৭ (২) ও (৩) নম্বর ধারা)। তাহা ছাড়া, ডাক ও তার, মুদ্রা ব্যবস্থা, দেশ রক্ষার প্রস্তুতি, ব্যাংক ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে সমগ্র দেশে যাহাতে একই ধরণের নীতি অনুসৃত হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকিবে বিভিন্ন রাজ্যের শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধ

এই উদ্দেশ্যে রাজ্য পুনর্গঠনের পর সমগ্র ভারতে পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Councils) গঠন করা হইয়াছে। ইহাদের কাজ হইতেছে কেন্দ্রীয় শাসন এবং রাজ্য শাসনের মধ্যে সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসন বিভাগীয় সম্পর্ক অনুধাবন করিলে দেখা যায় এই বিশেষ ক্ষেত্রেও শাসনতন্ত্রটি খুবই কেন্দ্রপ্রবণ হইয়াছে। রাজ্যসরকারের শাসনকাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেইজন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থাপনার ভার কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে। রাজ্যকে অর্থনৈতিক সাহায্য (Grants-in-aid) প্রদানের মাধমেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কর আদায় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিবার যৌথ প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য: ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে রাজ্যসরকারের শাসনক্ষমতা রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালিত করিবার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতার ভাব বজায় রাখা প্রয়োজন। তবে এই সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অজুহাতে আমাদের দেশের রাজ্যসরকারগুলির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কিছু বাধা নিষেধ যে অবধারিতভাবে আসিয়া পড়ে তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে স্পষ্ট হইবে।

রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ দান

রাজ্যসরকারের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাকে এইরূপভাবে পরিচালিত করিতে হয় যে উহা যেন পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। এইরূপ সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার

জাতীয় স্বার্থ অথবা দেশরক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে এইরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য ও রাজ্যের ভিতর রেলপথের সংরক্ষণের জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে [সংবিধানের ২৫৭ (২) ও (৩) নং ধারা]।

আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তির সর্ত পালনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য

আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক সন্ধির সর্তপালন প্রভৃতি সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রয়োগের দায়িত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের— সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ইউনিয়ন, রাজ্য অথবা যুগ্ম তালিকা সংক্রান্ত হইলেও এই বিষয়ে ক্ষমতা পরিচালন করিবার একক দায়িত্ব সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করিয়াছে (সংবিধানের ৭৩ (১) (খ) ধারা)।

জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থা থাকা কালীন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা পরিচালনার জন্য যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারে এবং রাজ্য সরকারকে বাতিল না করিয়াও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের অধীনে পরিচালিত করিতে পারে (সংবিধানের ৩৫৩ নং ধারা।

আন্তঃরাজ্য পরিষদ

রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকার্যে সংহতি স্থাপন অথবা বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করিলে একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ (সংবিধানের ২৬৩ নং ধারা) গঠন করিতে পারেন (Inter-state Council)। এই পরিষদের কাজ হইবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ ইত্যাদির কারণ আবিষ্কার করা, তাহাদের সকলের সাধারণ স্বার্থ লইয়া বিশ্লেষণ করা এবং বিরোধের মীমাংসার পথ নির্দেশ করিয়া সুপারিশ প্রদান করা।

আন্তঃ রাজ্য নদী ও নদী উপত্যকা সম্বন্ধে বিরোধ

সংবিধানের ২৬২ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট আন্তঃরাজ্য নদী এবং নদী উপত্যকাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিবাদের মীমাংসার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে, এই সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতাকেও সীমিত করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে যে পার্লামেণ্ট আইনের মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য নদী এবং নদী উপত্যকা সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য যে কোন আদালতের ক্ষমতা ব্যবহারের পথ বন্ধ করিতে পারে।

ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির স্বার্থ সমন্বিত কতিপয় বিষয়ে পরোক্ষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে। বিভিন্ন রাজ্যে যে নির্বাচন কার্য সমাধা হয় সেই নির্বাচন কার্য পরিচালনাকারী নির্বাচক কমিশনকে (Election Commission) রাষ্ট্রপতি (সংবিধানের ৩২৪ নং ধারা অনুযায়ী) নিয়োগ করেন। যে কোন রাজ্যের হিসাব প্রণয়ন ও পরীক্ষা করেন যে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারল তিনিও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন

(সংবিধানের ১৫১ নং ধারা)। বিভিন্ন রাজ্যের অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত জনজাতির উন্নতির জন্য রাষ্ট্রপতি একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন এবং বিভিন্ন রাজ্যকে এই বিষয়ে যথোচিত নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন (সংবিধানের ৩৩৯ ও ৩৪০ নং ধারা)। আবার রাজ্যসভার উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত একটি প্রস্তাবানুসারে পার্লামেণ্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য একটি অথবা একাধিক সর্বভারতীয় সার্ভিস (All India Services) গঠনের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে (সংবিধানের ৩১২ নং ধারা)।

কয়েকটি বিষয়ে রাজ্যগুলির শাসন কার্যের উপর কেন্দ্রের প্রভাব

সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যসরকারগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সমূহের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিতে হইবে এবং এই বিষষে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে কোন প্রকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে (সংবিধানের ২৫৬ নং ধারা); আবার কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটাইয়া যাহাতে আঞ্চলিক সরকার (রাজ্য সরকার) তাহাদের শাসনকার্যের পরিধি বিস্তার না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে যথোচিত নির্দেশ প্রদান করিতে পারে (সংবিধানের ১৫৭ (১) নং ধারা)। ইহা ছাড়া সংবিধানের ৩৬৫ নং ধারায় একথা স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ আছে যে কোন রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য অথবা অমান্য করে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনভার নিজে হাতে তুলিয়া লইতে পারেন।

রাজ্যসরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ প্রদান

উপরের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারকে অধস্তন সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করিবার ব্যাপারে ক্ষমতা সংবিধান হইতে লাভ করিয়াছে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনোত্তর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যগুলির উপর আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও শাসন বিয়ক ক্ষমতার প্রাধান্যকে তীব্রভাবে সমালোচন করা হইয়াছে। অর্ধেক রাজ্যগুলিতে অকংগ্রেসী সরকার গঠন করায় কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কোন মহল ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ সুরু করিয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনেতা, চিন্তাশীল ব্যক্তি সংবিধানের যথোপযুক্ত সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ককে একদিকে সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপরদিকে রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকে অপসারিত করার জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক লইয়া সাম্প্রতিক বিতর্কঃ অধিকাংশ রাজ্যগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একই

দলভুক্ত থাকায় এতকাল পারস্পরিক সম্পর্ক লইয়া কেন্দ্র ও রাজগুলির মধ্যে কোনরূপ বিরোধই দেখা দেয় নাই। কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের পর প্রায় অর্ধেক রাজ্যের সরকার গঠনকারী দল ও কেন্দ্রের সরকারী দল ভিন্ন হওয়ায় এই সম্পর্কে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি কেরালায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেখানে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ প্রেরণ লইয়া যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য দলভুক্ত নেতৃবৃন্দ কেরালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপকে অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান-বিরোধী কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেরালা সরকারকে ১৯৬৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীবৃন্দের প্রতীক ধর্মঘটের সময় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেওয়া নির্দেশ ও কেরালা সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া সেখানে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ মারফৎ আইন রক্ষা করার প্রয়াসকেও অনেকে অযথা রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন।

সংবিধানের ২৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিতে পারে সত্য, কিন্তু এইরূপ নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় এককেন্দ্রিকতায় পরিণত করার ইচ্ছা সংবিধান প্রণেতাগণের ছিল কিনা সন্দেহ। রাজ্যে কেন্দ্রীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হইলে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহায়তা (রাজ্যসরকার দাবি করিলে) কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই কর্তৃপক্ষকে রাজ্য সরকারের পরামর্শ ছাড়া রাজ্যে প্রেরণ করা চলে কিনা সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে যথেষ্ট। গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্কের বিতর্ককালে পার্লামেণ্টের লোকসভায় এই সমস্যা লইয়া যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাহার অবসান হয় নাই।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই সম্পর্কে নিবিড়তর সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য কতিপয় প্রথার উপর নির্ভর করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহশীল। কিন্তু এইরূপ প্রথাগত বিধান বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী ও কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার বর্তমান থাকিলে কিভাবে গড়িয়া উঠিবে সে সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করেন নাই। বস্তুতঃ, এইরূপ প্রথা গড়িয়া উঠা খুবই কষ্টকর বিশেষতঃ চতুর্থ নির্বাচনোত্তর সময়ে যখন বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলীয় নেতৃত্বের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

যাহাহোক, কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক লইয়া এই বিতর্কের অবসান না হইয়া ক্রমশই যাহাতে আর জটিলতার রূপ ধারণ করিতে না পারে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া বোধ হয় এখন আশু প্রয়োজন। সংবিধানের ২৬৩ নং ধারাকে অনুসরণ করিয়া একটি আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল (Inter-State Council)

গঠন করা উচিত যাহা কেন্দ্র ও রাজ্যের উভয়েরই যুগ্মভাবে স্বার্থ আছে এইরূপ বিষয়ে আলোচনা ও বিবেচনা করিতে পারে। ইহা ছাড়াও এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় অথচ বিতর্কমূলক বিষয়ের সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের জন্য এখনই একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির গঠন আশু কর্তব্য যাহাতে সেই কমিটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্পর্কের বিষয়টি লইয়া সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করিতে পারে এবং এইরূপ জটিল বিষয়টির চিরস্থায়ী সমাধানের একটি গ্রহণযোগ্য সূত্র—যাহা রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন, আবিষ্কার করিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন : ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। তবে ক্ষমতা বণ্টনের মধ্যে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রপ্রবণতা খুব বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিবার সময় ক্যানাডার শাসনতন্ত্রের অনুকরণ করা হইয়াছে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে তিনটি তালিকার (Lists) মাধ্যমে, যথ(যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্যসমূহের তালিকা (State Lists) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। যে বিষয়গুলি সম্পর্কে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই আইন প্রণয়ন করে সেই বিষয়গুলি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা গঠন করা হইয়াছে। এইরূপ ৯৭টি বিষয় আছে। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটির নাম উল্লেখ করিতে পারি, যেমন, (ক) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, (খ) পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক, (গ) ধর্মসংক্রান্ত ব্যপার, (ঘ) ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থা, (ঙ) সরকারী ঋণ (চ) ডাক ও তার বিভাগ, (ছ) যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলপথ, (জ) বিভিন্ন বড় বড় বন্দর, (ঝ) বিমান বাহিনী ইত্যাদি।

যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে শুধু রাজ্যররকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে সেই প্রকার ৬৬টি বিষয় লইয়া রাজ্যসমূহের তালিকা (State List) গঠিত। আমরা তালিকাভুক্ত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিতে পারি ; যেমন (ক) আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পুলিশ বাহিনীর তদারক করা, (খ) শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা, (গ) ভূমি রাজস্ব, (ঘ) সমবায় সমিতি এবং (ঙ) সিনেমা ও থিয়েটার সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা। শাসনতন্ত্রে এই প্রকার ৬৬টি বিষয় আছে।

যুগ্ম তালিকায় ৪৭টি বিষয় স্থান লাভ করিয়াছে। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে, যেমন, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও দত্তক পুত্র বা কন্যা গ্রহণ, পুস্তক এবং পুস্তক মুদ্রণ, পানীয় দ্রব্য ইত্যাদি।

রাজ্য-তালিকার অন্তভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন রকম বিশেষ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চতর কক্ষ বা রাজ্যসভা যদি দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে রাজ্যতালিকার বিষয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে, তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি বা সন্ধির সর্ত পালনের জন্য যে কোন রাজ্যের যে কোন বিষয় সম্পর্কে

কেন্দ্রীয় আইন সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়ত, যদি কখনও দুইটি অথবা দুইটির বেশী রাজ্য পার্লামেন্টকে অনুরোধ করে, তবে পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। সর্বশেষে রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থা অথবা শাসনতন্ত্রের অচল অবস্থা ঘোষিত হইলে কোন রাজ্যের আইন প্রণয়নের ভার রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার বণ্টন—কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে :— সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে, সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে ইহা শাসনক্ষমতাও পরিচালনা করে। রাজ্যসরকারের শাসনক্ষমতাও রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যুগ্ম বিষয়ক ক্ষমতা বন্টন ব্যাপারে সংবিধানের নির্দেশ হইল যে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার যুগ্ম বিষয়ে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা পরিচালনা না করিবে সেই পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলি শাসনকার্য সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ সংবিধানে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত মূলরাজ্যগুলি সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ, এবং এই সহযোগিতার ভিত্তিতে কেন্দ্র কতিপয় বিষয়ে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

জাতীয় স্বার্থ অথবা দেশরক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে এইরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজ্যের ভিতর রেল পথের সংরক্ষণের জন্য, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধির সর্ত পালনের ক্ষেত্রে, জরুরী অবস্থার ঘোষণা থাকাকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

রাজ্য সরকারের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাকে এইরূপে পরিচালিত করিতে হয় যেন উহা পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

Exercise

1. Discuss the scheme of distribution of Powers in relation to legislation between the Union Government and the State Government.

(C. U. B. A. Part II., 1964)

(১২৩-১২৫ পৃষ্ঠা)

[আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।]

2. Write a a note on the predominant role of the Union Government of India in the field of distribution of Legislative Powers.

[ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বন্টনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সম্পর্কে একটি টীকা লিখ।]

(১২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

3. Give an account of the administrative relation between the Union Government and the State Government.

[C. U B. A. 1965, 1966, 1968]

[কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্কের একটি বিবরণী দাও।]

(১২৭-১২৯ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on the predominant role of the Union Government in administrative affairs and throw some light on the recent centroversy regarding the relationship between the Centre and the States.

[শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের উপর একটি টীকা লিখ, এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক লইয়া সাম্প্রতিক বিতর্কের উপর আলোকপাত কর।

(১৩১-১৩৩ পৃষ্ঠা)

———

নবম অধ্যায়

কেন্দ্র ও অঞ্চলগুলির মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

(Distribution of Financial Powers between the Union and the States)

পূর্বের অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন ও শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন সরকারকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকায় কাজ করিতে হইলে তাহাদের আয়ের পথও সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকা বিধেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই একমাত্র আয়ের সংগ্রহের ও উহার বণ্টন ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত থাকিলে রাজ্যের উপর স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দিকে দৃষ্টি দিলে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে আধুনিককালে প্রায় সর্বত্রই রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থায় কিছুটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য রহিয়াছে। এই প্রাধান্যের সমর্থনে বলা হয় যে সমস্ত রাজ্যে কর আদায়ের ব্যাপারে ব্যয় সংক্ষেপ, রাজ্যব্যাপী কর স্থাপন সম্বন্ধীয় সমতা, পর্যাপ্ত ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার নীতির জন্য এই প্রকার কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের প্রয়োজন আছে।

কর স্থাপন ব্যাপারে ভারত বিভিন্ন তালিকাকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইলেও ইহার বণ্টন নীতির ব্যাপারে তাহার পক্ষে সেই নীতিকে পরিপূর্ণ-ভাবে অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় না। ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে কর স্থাপন সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করে, রাজ্যতালিকার বিষয়ে অনুরূপভাবে রাজগুলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং রাজস্ব বিষয়ক অবশিষ্ট ক্ষমতা ইউনিয়ন সরকারের হস্তে ন্যস্ত। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে যে সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে সেই সরকার সবক্ষেত্রে উক্ত রাজস্ব ভোগ করে না কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে যে সরকার রাজস্ব ভোগ করে সেই সরকার উহা আদায় করে না। ভারতে রাজস্ব আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কার্যকরী করা হয়।

প্রথমত, সেই সকল করগুলির উল্লেখ করা যায় যেগুলি এককভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের, অর্থাৎ উহা কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করে, সংগ্রহ করে ও ভোগ করে। এইরূপ করের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কোম্পানী কর (Corporation Tax), ব্যক্তি ও কোম্পানীর পরিসম্পদের মূলধন মূল্যের উপর কর (Taxes on Capital value of assets of individuals and Companies), বাণিজ্য শুল্ক (Customs duties) ইত্যাদি। [পূর্ণ তালিকার জন্য "ইউনিয়ন তালিকা" (Seventh Schedule) দ্রষ্টব্য]।

দ্বিতীয়ত, সেই সকল কর রাজস্ব আছে যেগুলি এককভাবে রাজ্য-সরকারগুলির। অর্থাৎ এই কর স্থাপন, গ্রহণ ও ভোগ করে রাজ্যগুলি। এই রাজস্বের মধ্যে আছে কৃষি-আয়ের উপর কর (Taxes on agricultural income), কৃষি জমির উপর সম্পত্তি কর (Estate duty in respect of agricultural land), জমি ও বাড়ীর উপর কর (Taxes on land and buildings), ভূমি রাজস্ব (land revenue) খনিজ অধিকারের উপর কর (Taxes on mineral rights), ইত্যাদি। [বিশেষ বিবরণের জন্য সংবিধানের (Seventh Schedule) দ্রষ্টব্য]।

তৃতীয়ত, কতকগুলি কর আছে যাহা কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করে। কিন্তু রাজ্যগুলি উহা সংগ্রহ ও ভোগ করে (Collected and appropriated)। ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত ষ্ট্যাম্প কর এবং ঔষধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রীর উপর অন্তঃ শুল্ক এই প্রকার রাজস্বের অন্তর্গত (সংবিধানের ২৬৮নং ধারা)।

চতুর্থত, কিছু কর আছে যাহা কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও সংগ্রহ করে কিন্তু উহা হইতে সংগৃহীত কর রাজ্যগুলিকে প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ে আছে অ-কৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর ও সম্পত্তি কর, রেলযাত্রীর উপর কর ইত্যাদি (সংবিধানের ২৬৯ নং ধারা)।

পঞ্চমত, কতকগুলি কর আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন ও সংগ্রহ করে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে আছে কৃষি-আয় ছাড়া অন্যান্য আয়ের উপর কর (সংবিধানের ২৭০নং ধারা)। এই আয়কর ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করা হয়।

ষষ্ঠত, উপরে (৪) ও (৫) নম্বরে বর্ণিত বিষয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত শুল্ক (Surcharge) ধার্য করিতে পারে। সেই কর পরিপূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে (সংবিধানের ২৭১নং ধারা)।

সপ্তমত, কিছু রাজস্ব আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করে ও সংগ্রহ করে এবং পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা উহা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইয়া থাকে। এই ধরণের করের মধ্যে আছে ঔষধ ও প্রসাধনী সামগ্রী ছাড়া অন্যান্য সামগ্রীর উপর উৎপাদন শুল্ক। (সংবিধানের ২৭২নং ধারা)।

এইরূপ বিস্তৃত তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হইলেও কাহারও কাহারও ভাগ্যে প্রয়োজনের তুলনায় রাজস্বের পরিমাণ কমও হইতে পারে। এই ব্যবস্থার প্রতিবিধানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যগুলিকে অনুদান (Grants) ও সাহায্য (Contributions) দান করার ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে (সংবিধানের

২৭৫নং ধারা)। ইউনিয়ন সাধারণতঃ পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যকে নির্দেশানুযায়ী প্রদান করে।

অর্থ সাহায্য কিংবা রাজস্ব বণ্টন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হইয়া থাকে। তবে কোন কোন মহলে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, যেহেতু ফিনান্স কমিশন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত সেইজন্য এই কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রতিনিধিত্ব করে ও রাজগুলির স্বাতন্ত্র্য এই বিষয়ে কতখানি বজায় থাকে তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আবার একথাও বলা হয় যে ফিনান্স কমিশনে সুপারিশ গ্রহণ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য নহেন। সুতরাং রাজস্ব বণ্টন বিষয়ে আঞ্চলিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট আছে।

ফিনান্স কমিশনের সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা, মর্যাদা ও নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনা কবিয়া তাহাদের সুপারিশ সম্বন্ধে যদিও বলার কিছুই থাকে না তবুও একথা আজ কাহারও অজানা নয় যে এই কমিশনের সুপারিশের দ্বারা সমস্ত রাজ্যগুলি প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সাহায্য লাভ করে নাই, এবং রাজস্ব সম্বন্ধে কিছু অসন্তোষ বহু রাজ্যেরই আছে। তাহা হইলেও বলিতে হয় যে রাজ্যগুলির রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য বিধানের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হইল ফিনান্স কমিশন।

যাহা হউক, রাজ্যগুলির রাজস্ব সংক্রান্ত উৎস সম্বন্ধে উপরিউক্ত আলোচনা হইতে একথা সম্যক উপলব্ধি করা যায় যে রাজ্যগুলিকে অর্থের ব্যাপারে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেই হয় ও তাহাদের উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল হইতে হয়। বিশেষতঃ, বর্তমান কালে পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যে অবতীর্ণ হইবার সময় রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। রাজ্যগুলির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতাকেও ১৯৩৫ সালের আইনের তুলনায় অনেক সীমিত করা হইয়াছে। বর্তমানে রাজ্যগুলির পক্ষে ঋণ গ্রহণ ভারতের বাহিরে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন রাজ্য সরকার ধার করিতে পারেন, অথবা দেশের অভ্যন্তরে ধার করিতে পারেন—রাজ্য বিধানমণ্ডলের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন ঋণ থাকিলে এবং উহা পরিশোধ না হইলে অথবা এমন কোন ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে যাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী আছে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে পুনরায় ঋণ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয় (সংবিধানের ২৯৩নং ধারা)। এই সমস্ত আলোচনা ইহাই সূচীত করে যে রাজ্যগুলির অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ। জরুরী অবস্থার ঘোষণার সময়ও রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা রাজস্ব সংক্রান্ত বণ্টন নীতির পরিপূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব-

পর। সে ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলির রাজস্ব বিষয়ক স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুন্ন করা অসম্ভব নয়। একথা অনস্বীকার্য যে ভারত আজ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সামাজিক কল্যাণের পথে তাহার এই পদক্ষেপকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ইউনিয়ন সরকারের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সে কথাও অনস্বীকার্য। তবে সেই আর্থিক স্বচ্ছলতার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বাড়াইবার প্রয়াসকে অভিনন্দিত করা চলে তখনই যখন সেই শক্তিকে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিয়া দেশকে সামগ্রিক ভাবে ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর করার জন্য একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে ভারত খাদ্য, অর্থ ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তাহাছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে চতুর্থ নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনে আজ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্বের সেই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সূত্র বজায় আছে বলিয়াও মনে হয় না। এই অবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কে যে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হইয়াছে তাহার আশু মীমাংসা জাতীয় স্বার্থে হওয়া বিধেয় মনে হয়।

Exercise

1. Discuss the scheme of distribution of financial powers between the Union Government and the State Governments.

[কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের পরিকল্পনা আলোচনা কর।]

[১৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা]

দশম অধ্যায় — ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ
(The Union Executive of India)

[কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি—রাষ্ট্রপতির নির্বাচন—তাহার ক্ষমতাসমূহ ও কার্যাবলী—শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা—সামরিক ক্ষমতা—আইন প্রণয়ন ক্ষমতা—অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা - ভেটো প্রদান করার ক্ষমতা—বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা— জরুরী-অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক—ভারতের প্রধানমন্ত্রী—রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী—উপরাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার গঠন ও ক্রিয়াকলাপ—এ্যাটর্নী জেনারেল]

ভারতের শাসনতন্ত্রে দায়িত্বশীল সরকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অথচ সরকারের কাঠামো রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের ন্যায়। বস্তুতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার এবং মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইন সভার সদস্য, ও আইনসভার নিকট তাঁহারা নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্র এইখানে বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে অনুকরণ করিয়াছে বলা যায়। রাষ্ট্রপতি যদিও রাষ্ট্রের প্রধান, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনবিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি (The President): ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা ও সরকারী কর্মচারী লইয়া গঠিত। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে রহিয়াছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধানের ৫৪নং ধারা অনুসারে—(১) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং (২) রাজ্য বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক গঠিত নির্বাচক মণ্ডলী একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে (single transferable proportional voting system) রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। শাসনতন্ত্রে পরিষ্কার ভাবেই নির্দেশ দেওয়া আছে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যার পরিমাণ বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা ও সেই সব রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ বৈসাদৃশ্য রাখা চলিবে না। আবার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে রাজ্যগুলির সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রের সহিত বিশেষ মিলও থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন

সংসদ ও রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেকটি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি স্থির হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট

রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। ভাগফলকে আবার এক হাজার দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। এই ভাগের দ্বারা যে ভাগফল পাওয়া যাইবে উক্ত রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেকটি নির্বাচিত সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ততগুলি করিয়াই ভোটপ্রদান করিতে পরিবেন। তবে এই ভাগের পর যে ভাগশেষ থাকিবে তাহা যদি ৫০০ অথবা পাঁচ শতের অধিক হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটি সদস্যের ভোট সংখ্যা একটি করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। যদি ভাগশেষ পাঁচ শতর কম হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। একটি কাল্পনিক উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝানো হইতেছে। ধরা গেল একটি রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ২,৫০,০০০০০ এবং উক্ত রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হইল ২৫০। জনসংখ্যাকে সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হইবে (২৫০০০০০০ ÷ ২৫০) ১০০০০০। উক্ত ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে প্রত্যেকটি সদস্যের ভোটের পরিমাণ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সদস্য (১০০০০০ ÷ ১০০০) ১০০টি করিয়া ভোট দান করিতে পারিবে। উক্ত পদ্ধতি দ্বারা ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির বিবরণ

সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইলে রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে। ঐ সংখ্যাকে উভয় কক্ষের নির্বাচিত মোট সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই হইল সংসদের প্রত্যেকটি সভ্যের (রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার জন্য) ভোট সংখ্যা। ভাগশেষ থাকিলে যদি তাহা ভাজকের অর্ধেকের বেশী হয় তবে সদস্যগণের একটি করিয়া ভোট বাড়িয়া যায়, আর যদি ভাগশেষ ভাজকের অর্ধেকের কম হয় তবে পূর্বের ভাগফলের সংখ্যাই প্রত্যেকটি সভ্যের ভোটসংখ্যা হয়।

রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার ব্যাপারে ভারতীয় শাসনতন্ত্র আয়ারল্যাণ্ডকে অনুসরণ করিয়াছে বলা যায়। স্থির হয় যে রাষ্ট্রপতি সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। এই নিয়ম অনুসারে নির্বাচিত হইতে হইলে রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে মোট ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশী ভোট পাইতে হয়। সমস্ত প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোটসংখ্যাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে "কোটা" (Quota) বলা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য উক্ত 'কোটা' পাইতেই হয়। যদি নির্বাচন প্রার্থী মাত্র একজন হয় তো তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক ভোটদাতার নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যার সমান পছন্দ থাকিবে; অর্থাৎ যতজন প্রার্থী, ভোটদাতার ভোটদানের ব্যাপারে ততগুলি করিয়া "পছন্দ" থাকিবে। একজন ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন ব্যালট কাগজে তাঁহার নামের পাশে "১" সংখ্যাটিকে বসাইবেন; এইরূপে যতজন নির্বাচন প্রার্থী আছেন তাঁহাদেরও নামের পাশে পরবর্তী পছন্দানুসারে ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি বসাইতে পারেন। এ বিষয়ে লক্ষ্যণীয় যে ভোটদাতাকে ব্যালটে প্রথম পছন্দ ("First Preference") জানাইতেই হইবে—পরবর্তী পছন্দ তিনি না-ও জানাইতে পারেন। প্রথম পছন্দ না জানানো হইলে ব্যালট কাগজটি বাতিল হইয়া যায়। উপরে যে 'কোটা'র কথা বলা হইয়াছে নির্বাচিত হইতে হইলে উক্ত সংখ্যক ভোট পাওয়া দরকার। যদি গণনায় দেখা যায় যে কেহই "কোটা'র উপযুক্ত ভোট পান নাই, তাহা হইলে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক "প্রথম পছন্দের" ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে নির্বাচন হইতে বাদ দিয়া তাঁহার ব্যলেট কাগজগুলিকে ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি পরবর্তী চিহ্নিত পছন্দানুসারে অন্যান্য প্রার্থীদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। যদি এরূপ হয় যে সর্বনিম্ন প্রথম পছন্দের ভোটের সংখ্যা কয়েকজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে সমান, সেক্ষেত্রে লটারীর সাহায্যে স্থির করিতে হয় কাহাকে নির্বাচন হইতে বাদ দেওয়া হইবে। এইভাবে ভোট হস্তান্তরিত কার্য ততক্ষণ চলিতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন প্রার্থী 'কোটার' উপযুক্ত ভোট পাইয়া নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতির এইরূপ পরোক্ষ নির্বাচনকে অগণতান্ত্রিক বলিয়া অনেকে ইহার সমালোচনা করেন। তবে এই নির্বাচন-পদ্ধতির সমর্থনে সংবিধান নির্মাতাগণ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, (ক) ভারতের ন্যায় বিশাল রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রভূত সময়, বিপুল অর্থ ও অপরিমিত শক্তির অনাবশ্যক অপচয় ঘটাইবে এবং (খ) এখানে দায়িত্বশীল সরকারের গঠন ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পরিস্ফুট, এবং ফলে রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষভাবে নির্বাচন করিয়া তাঁহার পরিবর্তে মন্ত্রিসভার নিকটই সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত প্রার্থীকে নিম্নের যোগ্যতা সম্পন্ন হইতেই হইবে। তিনি অবশ্যই (ক) ভারতের নাগরিক হইবেন, (খ) ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন, (গ) তাঁহাকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে; (ঘ) তিনি কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে অথবা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে লাভজনক কোন পদাধিকারে থাকিতে পারিবেন না। (ঙ) তিনি পার্লামেণ্টের অথবা রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সদস্য থাকিতে পারিবেন না, তবে উক্ত পরিষদের কোনটির সদস্য

রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

থাকিলে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করার মুহূর্ত হইতে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন ধরা হইবে; এবং (চ) তিনি অন্য কোনরূপ লাভজনক ব্যবসার সহিত জড়িত থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে পুনর্নির্বাচনের জন্য তিনি প্রার্থী হইতে পারেন [সংবিধানের ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ধারা]। সংবিধানের ৫৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী বর্তমান রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যের যে কোন মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি পদের জন্য পার্থী হতে পারেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসরের পূর্বেই সমাপ্ত হয়।

রাষ্ট্রপতির কার্যসময়

(১) যদি তিনি উপরাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, অথবা (২) যদি তিনি শাসনতন্ত্র লংঘন করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অপসারিত হন (সংবিধানের ৫৬ নং অনুচ্ছেদ)।

সংবিধানের ৬১ নম্বর ধারা অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করিতে ও পদচ্যুত করিতে পারা যায়। পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র লংঘন করার অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। পার্লামেণ্টের অপর কক্ষ তাহার পর অভিযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান করিবে অথবা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবে। তবে অভিযোগ করিতে হইলে (ক) যে কক্ষে উক্ত অভিযোগের প্রস্তাব আনীত হয় সেই কক্ষের মোট সভ্যসংখ্যার অন্যূন $\frac{1}{4}$ অংশের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ১৪ দিন পর উক্ত প্রস্তাব অনুসন্ধান ও আলোচনার্থে পেশ করিতে হয়; এবং তাহার পর (খ) প্রস্তাবটি পার্লামেণ্টের উক্ত কক্ষের মোট সভ্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষ হইতে হয়।

রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার পদ্ধতি

৬১ নং ধারা অনুযায়ী যদি উক্ত অভিযোগটি অপরকক্ষে অনুসন্ধান হওয়ার পর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সেই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন পাওয়া গেলেই উহা কার্যকর করা হয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখ হইতেই রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ হইতে অপসারিত বলিয়া বিবেচিত হন। তবে অনুসন্ধানকালে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি মারফৎ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় নিজের বাসের জন্য সরকারী আবাস ব্যবহার করিতে পারিবেন, এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইনানুযায়ী স্থিরীকৃত অর্থ বেতন হিসাবে গ্রহণ করিবেন। বর্তমানে তিনি ভাতা ইত্যাদি ছাড়া বেতন হিসাবেই মাসে ১০ হাজার টাকা গ্রহণ করিতে পারেন এবং ইহা আয়কর হইতে মুক্ত। উক্ত বেতনের পরিমাণ তাঁহার কার্যে বহাল থাকা অবস্থায় পরিবর্তন করা যায় না। অবশ্য ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত

বেতন অপেক্ষা কম বেতন গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া "President's Pension Act, 1951" অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল সমাপ্ত হইলে অথবা তাঁহার কার্যকলাপ সমাপ্ত হইবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে বাৎসরিক ১৫০০০ টাকা অবসরকালীন বেতন (Pension) হিসাবে পাইয়া থাকেন। তবে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইলে সেই সময়ে উক্ত অবসরকালীন ভাতা তিনি পাইবেন না।

রাষ্ট্রপতির কার্যে অবস্থান কালীন বেতন ভাতা এবং অবসরকালীন বেতন

রাষ্ট্রপতির পদ নিম্নের যে কোন একটি কারণে শূন্য হইতে পারে—

রাষ্ট্রপতির পদ খালি হওয়া

(১) রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে, (২) রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে, (৩) রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে, (৪) অভিযুক্ত হইয়া অপসারিত হইলে এবং (৫) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বাতিল হইলে।

যখন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার দরুণ তাঁহার পদ খালি হইবার প্রশ্ন দেখা দেয় তখন সংবিধানের ৬২ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী নূতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন কার্য দ্রুত সম্পাদন করা বিধেয়। তবে সংবিধানের ৫৬ নম্বর ধারার (১) (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন বিশেষ কারণবশতঃ নূতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে বিলম্ব হইলে বর্তমান রাষ্ট্রপতিই তাঁহার কার্যকাল সমাপ্ত হইলেও, তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত নূতন রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করা অবধি উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিধান সংবিধানে নাই।

উপরোক্ত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ খালি হইলে (যেমন,—রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে অথবা রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে) ঘটনাটি ঘটিবার পর অবশ্যই নির্বাচন কার্য সমাধা হইবে। উক্ত ঘটনা হইতে ছয় মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ পূর্ণ করিতে হইবে। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদ এইরূপে শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্য নির্বাহ করিবেন। নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কার্যভার গ্রহণ করা হইতে পূর্ণ পাঁচ বৎসরকাল কর্মে নিযুক্ত থাকিবেন।

সংবিধানের ৬৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা কোন কারণে রাষ্ট্রপতি কাজ করিতে না পারিলে রাষ্ট্রপতি কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইয়া যাইবেন। ইতিপূর্বে ১৯৬০ সালের জুন মাসে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্বর্গত ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন রাশিয়ায় গিয়াছিলেন, এবং ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে যখন অসুস্থতার দরুণ তিনি কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়াছিলেন, তখন ডঃ রাধাকৃষ্ণ রাষ্ট্রপতির কর্মভার গ্রহণ করেন। আবার ১৯৬৫ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ যখন

অসুস্থতার দরুণ ভারতের বাহিরে যান তখনও তাঁহার কার্যভার তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি (বর্তমান রাষ্ট্রপতি) ডাঃ জাকির হোসেন গ্রহণ করেন।

পদত্যাগ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে যখন রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয় তখন উপরাষ্ট্রপতি নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন। তবে অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যনির্বাহে অপারগ হইলে তাঁহার স্থলে যদি উপরাষ্ট্রপতি কাজ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলা চলিবে না। সংবিধানে এই পার্থক্য বজায় রাখার জন্য বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করিবেন ("Shall act as President") এবং অন্য ক্ষেত্রে তিনি ("shall discharge the functions of the President") রাষ্ট্রপতির কাজগুলি সম্পন্ন করিবেন। এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য উপরাষ্ট্রপতি শপথ-গ্রহণ ব্যাপারেও পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শপথের ধরণ—"I will faithfully execute the office of the President." এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে,—"I will faithfully discharge the function of the President."

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ অথবা গোলযোগ দেখা দিলে সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া চরম সিদ্ধান্ত দান করিবে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তই এই ব্যাপারে চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সুপ্রীম কোর্ট কোন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বাতিল করিলে, উক্ত মর্মে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত কার্য রাষ্ট্রপতির পদাধিকারী ব্যক্তি সম্পাদন করেন উহা বাতিল হইবে না (সংবিধানের ৭১ নম্বর ধারা)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্বন্ধীয় গোলযোগ

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যাপার পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (সংবিধানের ৭১ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ)। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে কোনরূপ আবেদন পত্র গ্রহণ যোগ্য না-ও হইতে পারে, যদি এইরূপ আবেদন পত্র নির্বাচনকার্য সমাধা হইবার পূর্বেই পেশ করা হয়। এইরূপ আবেদন-পত্র রাষ্ট্রপতির নির্বাচন কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর এবং তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করার পরই বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the President) : সংবিধানের ৫৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে যাবতীয় শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করিবেন। ব্যাপকভাবে আইন প্রণয়ন এবং বিচার ছাড়া সরকারের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সরকারের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা শাসন বিভাগের কাজের পর্যায়ে পড়ে। তবে কোন কোন কাজ সংবিধান

অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির শাসন সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষমতার আলোচনার পূর্বে শাসনতান্ত্রিক যে বাধানিষেধের মাধ্যমে তাঁহাকে কাজ করিতে হয় সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়াও বিধেয়।

রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা

সংবিধানের ৫৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টরূপে বলা আছে যে রাষ্ট্রপতির হাতেই সমস্ত শাসনবিষয়ক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে সংবিধান অনুযায়ী এই কার্য পরিচালনা করিবেন।[১] সংবিধানের ৭৫ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরমর্শানুযায়ী তিনি অন্যান্য মন্ত্রিদের নির্বাচন করিবেন। এইজন্যই দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত সভ্যের তালিকা বহির্ভূত নাম নির্বাচন করিলে সংবিধান বিরোধী কাজের দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং সেইজন্য অভিযুক্ত হইয়া তিনি অপসারিতও হইতে পারেন।

আবার সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে তাঁহার শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। যদিও ৭৪ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন এবং উক্ত ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রাষ্ট্রপতির কোন আইন মন্ত্রিসভার বিনা পরামর্শে প্রণীত হইলেও তাহার জন্য তাঁহাকে কোন বিচারালয়ে জবাবদিহি করিতে হয় না, তবুও শাসনতান্ত্রিক রীতি এইরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে যে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই রাষ্ট্রপতি সমুদয় কাজ নির্বাহ করিবেন।[২] ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর উক্তি হইতেও এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় যে রাষ্ট্রপতিকে শাসন সম্বন্ধীয় প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই—"We have not given our President any real powers, but we have made his position one of great authority and dignity."

বস্তুতঃ, কয়েকটি বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বিষয়েই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতা হিসাবেই গণ্য করা যায়।

১। Art. 53 (i) "The Executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution."

২। "Although there is no specific provision in the constitution itself making it binding on the President to accept the advice of his ministers, it is hoped that the convention under which in England the king always acted on the advice of his ministers, would be established in this country also and the President would become constitutional President in all matters," Dr. Rajendra Prasad

বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতাগুলিকে নিম্নলিখিত অংশে বিভক্ত করেন:

(ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) সেনা-বিভাগ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা, (গ) কূটনৈতিক ক্ষমতা, (ঘ) আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (ঙ) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা। ভারতীয় শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসমূহ উপরোক্ত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া উহা রাষ্ট্রপতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Administrative or Executive powers): ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নামেই প্রধান। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ন্যায় শাসনবিভাগের বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে তিনি প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন না। বিভিন্ন বিভাগের উপরও তাঁহার কর্তৃত্ব বিশেষ থাকে না। তবে মন্ত্রিমণ্ডলী পরিচালিত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় সমুদয় কাজই ভারতে রাষ্ট্রপতির নামে[৩] সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন একটি কাজ ভারত সরকার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে কিনা ইহা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে উহা রাষ্ট্রপতির নামেই নির্বাহ হইয়াছে কিনা (সংবিধানের ৭৭নং ধারা)। ভারত সরকার কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ইত্যাদিও অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতির নাম গৃহীত হইয়া থাকে—(সংবিধানের ২৯৯নং ধারা)। তবে কার্যতঃ শাসনবিভাগের প্রধান না হইলেও রাষ্ট্রপতি সমগ্র রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে যথেষ্ট পদমর্যাদা ভোগ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁহার অধীন, [সংবিধানের ৫৩ (১) ধারা], এবং তাঁহারা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সমুদয় তথ্যাদি তাঁহাকে অবহিত করিতে বাধ্য থাকেন (সংবিধানের ৭৮নং ধারা)।

রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার ভিতর রাষ্ট্রের বিশিষ্ট পদাধিকারী ব্যক্তি ও উচ্চ-কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ ও অপসারণও অন্তর্ভুক্ত। ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নিম্নলিখিত নিয়োগ-সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেন রাষ্ট্রপতি—

কর্মচারী নিয়োগ-সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

(১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী, (২) কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রী, (৩) ভারতের এটর্নী জেনারেল, (৪) ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, (৫) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, (৬) মূলরাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, (৭) মূলরাজ্যের রাজ্যপাল, (৮) ফাইনান্স কমিশন, (৯) আন্তঃরাজ্য পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ, (১০) প্রধান নির্বাচনী কমিশনার। (১১) রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধীয় সংস্থা, (১২) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চপদস্থ বিশেষ কর্মচারী ইত্যাদি।

৩। Art. 77(1) "All executive action of the Govt. of India shall be expressed to be taken in the name of President".

রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে কোন মন্ত্রীকে, এটর্নী জেনারেল, মূলরাজ্যের রাজ্যপাল প্রভৃতিকে অপসারণ করিতে পারেন। অবশ্য এই অপসারণের কাজ করিবার সময় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশের দ্বারা পরিচালিত হন। সুপ্রীম কোর্টের বিবৃতি অনুযায়ী পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা অন্যান্য কোন সদস্যকেও তিনি পদচ্যুত করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে শাসনতন্ত্র অধস্তন কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে না। কয়েকটি নির্ধারিত বিষয় ছাড়া সংবিধানের ৩২০ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেকটি নিয়োগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যে নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন না, সেই সমস্ত বিষয়েই সরকারকে পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট উপরোক্ত নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এইরূপ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপদেশ গ্রহণ করার ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র আমেরিকার শাসনতন্ত্রের “spoils system”-এর দোষ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি “সিভিল সার্ভিস কমিশনের” পরামর্শ ছাড়াই শতকরা ২০ জনকে নিজের ক্ষমতায় এবং দলের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ কর্মে নিয়োগ করিতে পারেন। ভারতের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে আমেরিকার ন্যায় এইরূপ কোন ক্ষমতা প্রদান করে নাই।

রষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত তাঁহার সামরিক, কূটনৈতিক এবং অপরাধীর দণ্ডাদেশ লাঘব, মকুব প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় কিছু ক্ষমতাও আছে।

সামরিক ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং পদাধিকার বলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন। তবে সংবিধানের ৫৩নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে রাষ্ট্রপতির উক্ত ক্ষমতার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব পার্লামেণ্টের রহিয়াছে। প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপারেই আইন প্রণয়ন করিবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেণ্টের রহিয়াছে বলিয়াই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইয়াও ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অথবা জরুরী অবস্থার ক্ষমতাসমূহ কার্যকর করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতির কূটনৈতিক ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানগণের ন্যায়ই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিদেশে দূত প্রেরণ করা বা বিদেশ হইতে আগত দূতগণকে গ্রহণ করাও ভারতের রাষ্ট্রপতির অন্যতম কাজ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি অথবা চুক্তি সম্পাদনও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অন্তর্গত। তবে উক্ত ক্ষমতা মন্ত্রি-

মণ্ডলীর পরামর্শ ও পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যেই নির্দিষ্ট রাখিয়া রাষ্ট্রপতিকে পরিচালিত করিতে হয়।

রাষ্ট্রপতি বিচার-বিভাগীয় কতিপয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমাপ্রদর্শন করিবার ক্ষমতাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইরূপ কিছু কিছু ক্ষমতা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানেরই হাতে কম-বেশী পরিমাণে ন্যস্ত থাকে। সংবিধানের ৭২নং ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিগণের দণ্ড মকুব করা, দণ্ডের মাত্রা কমাইয়া দেওয়া, ক্ষমা করা প্রভৃতি বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন। সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত অপরাধীগণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত আইন ভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীগণকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করিতে অথবা তাহাদের দণ্ড লঘু করিতে পারেন। যুগ্মবিষয়ক আইন ভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অনুরূপ অপরাধীর দণ্ড তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সহিত যুগ্মভাবে মুকুব করিতে অথবা কমাইতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীকে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ক্ষমা করিতে অথবা তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া অন্য দণ্ড দান করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি হ্রাস অথবা একজাতীয় দণ্ডের পরিবর্তে অন্য জাতীয় দণ্ডের আদেশ দান করিতে পারেন; তবে এইরূপ অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতিরই আছে। রাজ্য সরকারগুলির আইন লংঘন জনিত দণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য দণ্ডে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত নাই।

বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাসমূহ

রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers of the President): রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতাও তাঁহার অন্যান্য ক্ষমতা সমূহের অন্যতম—তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে ও বজায় রাখিতে পারেন। তিনি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ বা মতভেদের ফলে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে সংবিধানের ১০০নং ধারা অনুযায়ী উভয় পরিষদের মধ্যে এক যুক্ত বৈঠকও তিনি আহ্বান করিতে পারেন।

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানের ৮৭নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক অধিবেশন আরম্ভের পূর্বে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করেন এবং অধিবেশনের কর্ম-সূচী কি হইবে তাহা ব্যক্ত করেন। সংবিধানের ৮৬নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে আলাদাভাবে ও সংযুক্তভাবে উভয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং অধিবেশনের সভ্যগণের উপস্থিতি

ঘটাইতে পারেন।[৪] তিনি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারেন। সংবিধানের উক্ত ধারার ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অধিবেশন আহ্বান অথবা অন্য কোন ব্যাপারে যে কোন পরিষদের নিকট বাণী পাঠাইতে পারেন।[৫] এইরূপ বাণী সম্বন্ধে পরিষদে দ্রুত আলোচনা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে রাষ্ট্রপতি অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে অথবা নির্বাচনের পর নূতন পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা করা ছাড়া সাধারণতঃ পার্লামেণ্টে বাণী প্রেরণ করেন না। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় কোন বাণী প্রেরণ তিনি তখনই করিতে পারেন যখন মন্ত্রিসভার কোন নীতির সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটে, অথচ মন্ত্রিসভার কোন নীতির সহিত মতবিরোধ হওয়ার ফলে তাহাকে সমালোচনা করিয়া কোনরূপ বাণী প্রেরণ করিয়া তাঁহার পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হইয়া টিকিয়া থাকা খুবই কঠিন হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ভারতে এখন পর্যন্ত হয় নাই।

পার্লামেণ্টে বক্তৃতা প্রদান অথবা বাণী প্রেরণ

সংবিধানের ৩৩১নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই কতিপয় সভ্যকে মনোনয়ন করিতে পারেন। এই মনোনয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে ইহা সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। ইহা বিবেচনা করিয়াই রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সব সম্প্রদায়ের লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও নির্বাচিত হইতে সক্ষম না হইলেও রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সত্যই প্রভূত সহায়তা করে।

পার্লামেণ্টে সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি কতিপয় সংস্থার হিসাব ও বিবরণী পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নিকট এমন ভাবে উত্থাপন করাইবেন যাহাতে পার্লামেণ্ট সেইগুলিকে আলোচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে যথাযথ কার্যপদ্ধতি স্থির করিবার সুযোগ পায়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসংক্রান্ত হিসাব, সরকারী হিসাবের উপর কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য সম্বলিত বিবরণ, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিবৃতি ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত।

৪। Art 86 (1) "The President may address either House of parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require attendance of members".

৫। Art 86 (2) "The President may send message to either House of Parliament, whether with respect to a Bill then pending in Parliament or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration".

কতিপয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন

কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হয়। নূতন কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা অথবা পুরাতন রাজ্যের সীমা পরিবর্তন করিবার প্রস্তাবের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দরকার (সংবিধানের ৩নং ধারা)। সংবিধানের ১১৭ (১) নম্বর ধারা এবং ১১৭ (৩) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত অর্থ দাবি সংক্রান্ত কোন বিল অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের Consolidated Fund হইতে খরচ সম্বন্ধীয় অন্য যে কোন বিলও (অর্থ দাবি ছাড়া) পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না। তাহা ছাড়া, আয়কর হইতে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়। রাজ্য সরকারের কর সম্বন্ধীয় রদবদলের কোন বিল অথবা তাহাদের মধ্যে অর্থবণ্টনের নীতির পরিবর্তন সম্বলিত কোন বিলের প্রস্তাবনাও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া করা যায় না। সংবিধানের ৩৪৯নং ধারা অনুযায়ী ২৫শে জানুয়ারী ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সংবিধানের ৩৪৮ (১)নং ধারা অনুযায়ী প্রচলিত ভাষা পরিবর্তনের জন্য কোন বিল অথবা সংশোধনী প্রস্তাব করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি দরকার হইত। উপরোক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির অগ্রানুমতি প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া প্রণীত উক্ত আইন কোন আদালতই বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন না, যদি আইনটি প্রণীত হওয়ার পরও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

রাষ্ট্রপতির আরও কতিপয় আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। অনুমোদিত বিলটি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি সম্মতি দান করিয়া উহা আইনে পরিণত করিতে পারেন অথবা সম্মতি প্রদান না করিতে পারেন; অথবা উহা কিছু সংশোধনসহ অথবা সংশোধন ছাড়াই পুনর্বিবেচনার্থে পার্লামেণ্টে প্রেরণ করিতে পারেন। যদি বিলটি দ্বিতীয়বার পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পুনরায় তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হয় তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধন বিলটিতে গৃহীত হউক বা না হউক সংবিধানের ১১১নং ধারা অনুযায়ী উহাতে সম্মতি প্রদান করিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকেন। সমুদয় অর্থবিল (money bills) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় বলিয়া উহা পুনর্বিবেচনার্থে পার্লামেণ্টে ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত তাঁহার জরুরী আইন জারী করিবার ক্ষমতা (ordinance-making power)। পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে সংবিধানের ১২৩নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি

অর্ডিন্যান্স (ordinance) বা জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের মতই অর্ডিন্যান্স কার্যকরী হইয়া থাকে (সংবিধানের ১২৩নং ধারা)। কিন্তু যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন পুনরায় সুরু হয়, তখন এই অর্ডিন্যান্স লইয়া আলোচনা করিবার, ইহা অনুমোদন করিবার অথবা ইহা বাতিল করিবার পূর্ণ অধিকার পার্লামেণ্টের থাকে। পার্লামেণ্টের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইবার পর, ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই অর্ডিন্যান্স কার্যকর থাকে ; অবশ্য পার্লামেণ্ট অধিবেশন চালু হওয়ার পর ইহা বাতিল করিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের পূর্বেই সেইগুলির কার্যকাল সমাপ্ত হইবে।

অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ক্ষমতাকে অনেকে সমালোচনা করিয়া বলেন যে, শাসন-পরিচালকের হাতে আইন প্রণয়নের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা জনস্বার্থ পরিপন্থী ও গণতন্ত্র বিরোধী। ইহা সরকারের ইচ্ছামত এবং তাহাদেরই মতামত সম্বলিত আইন ; জনমত দ্বারা ইহা মোটেই প্রভাবিত নহে। "When a piece of legislation flows from an ordinance it is just an embodiment of the viewpoint of the Government uninfluenced by public criticism." অর্ডিন্যান্সের যথার্থতা বিবেচনার জন্য একটি গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাবের উত্তরে বলা হয় যে সংবিধান সংশোধন ব্যতিরেকে এইরূপ প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় না। তবে এখানে এমন একটি প্রথাগত বিধান গড়িয়া তোলা যায় যাহার ফলে পার্লামেণ্টের অল্পসংখ্যক সদস্যবৃন্দ লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্র কমিটির পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কার্যকর করিতে পারেন। ইহাতে শাসন পরিচালকবৃন্দের সম্ভাব্য যথেচ্ছাচার বন্ধ থাকিবে আশা করা যায়। তবে একথা ভোলা উচিত নয় যে জাতীয় স্বার্থে অনেক সময় সরকার এমন সমস্ত জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারেন যেগুলির সমাধান আশু কর্তব্য অথচ পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকার দরুণ সেই সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির হস্তে অর্পিত অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের ক্ষমতা খুব অযৌক্তিক হইয়াছে মনে হয় না। বর্তমানের নিয়ম অনুযায়ী সন্দেহজনক অবস্থায় অর্ডিন্যান্স জারী করিবার কারণ ও সেই সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আলোচনা হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। অর্ডিন্যান্স সংক্রান্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বন্ধই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ক্ষমতার যৌক্তিকতা

আবার এইরূপ যুক্তিও অনেকে প্রদর্শন করেন যে যেহেতু রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে সমস্ত কাজ করেন সেজন্য তাঁহার পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলীকে অতিক্রম করিয়া কোনরূপ জনস্বার্থ পরিপন্থী অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করা অসম্ভব হইবে। কিন্তু এল্যান গ্লেডহিলের (Allan Gledhill)

মতে একজন ক্ষমতালিপ্সু রাষ্ট্রপতির পক্ষে জরুরী অবস্থার ঘোষণা ও অর্ডিন্যান্সের ন্যায় হাতিয়ার সহযোগে একজন একনায়ক রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পথে খুব বেশী বাধা থাকে না। এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়তো কল্পনা করা যায় না, তবে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে হিটলার কতকটা এইরূপভাবেই ওয়াইমার সংবিধান (Weimar Constitution) ধ্বংস করিয়া একনায়ক হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব এখনও ভারতে হয় নাই।

রাজ্য বিধানমণ্ডলীর প্রণীত আইন বাতিল করার ক্ষমতা

রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইন রাজ্যপাল যদি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি তাহাতে সম্মতি প্রদান না করেন তবে তাহা আইনে পরিণত হইবে না। তবে রাষ্ট্রপতি সরাসরি এই ক্ষমতা ভোগ করেন না; কেবলমাত্র সেই সমস্ত বিলই তিনি অনুমোদন অথবা নাকচ করিতে পারেন যেগুলি বিশেষভাবে তাঁহার অনুমোদনের জন্য রাজ্যপাল তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্যপালের মাধ্যমে উক্ত বিলটি পুনর্বিবেচনার্থে রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত বিলটি যদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে পুনরায় অনুমোদিত হইয়া রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য ফিরিয়া আসে এবং রাষ্ট্রপতি তাহাতে সম্মতি দান না করেন তবে বিলটি নাকচ হইয়া যায়। রাজ্যগুলিতে প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না করিলে সেগুলি কখনই আইনে পরিণত হইতে পারে না। রাজ্য বিধানমণ্ডলীর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে রাষ্ট্রপতি চরম ভেটো প্রয়োগ করিবার অধিকারী।

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial powers of the President) শাসনতন্ত্রের ১১৭ (১) নম্বর ধারা এবং ১১৭ (৩) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত অর্থদাবী সংক্রান্ত কোন বিল অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের Consolidated Fund হইতে খরচ সম্বন্ধীয় অন্য যে কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না। তাহা ছাড়া, আয়কর হইতে সংগৃহীত অর্থও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়। রাজ্যসরকারের কর সম্বন্ধীয় রদবদলের বিল অথবা তাহাদের মধ্যে অর্থ বণ্টনের নীতির পরিবর্তন সম্বলিত কোন বিলের প্রস্তাবনাও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া করা যায় না। তাহা ছাড়া, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গকে তাহাদের পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি আর্থিক সাহায্য (Grant-in-aid) প্রদান করিতে পারেন কিংবা এই রাজ্যগুলিকে বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রদান করার ক্ষমতা (Veto Power of the President) : যদি আইন সভা দ্রুত এবং অবিবেচনা-প্রসূত কোন কাজ করে, তবে আইনসভাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগের থাকা উচিত এবং সেইজন্যই শাসনবিভাগকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগই আইন প্রণয়নের প্রস্তাবগুলি আইন সভায় উত্থাপন করে বলিয়া ভেটো ক্ষমতার গুরুত্ব অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ইংলণ্ডে রাজশক্তির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রানী এ্যানির (Queen Anne) সময় হইতে আজ পর্যন্ত কখনই রাজশক্তির পক্ষ হইতে ভেটো প্রয়োগ করা হয় নাই। যে দেশে সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় সেই দেশে শাসন বিভাগের যিনি প্রধান, তাঁহার পক্ষে আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতি প্রদান না করিয়া ভেটো প্রয়োগ করার গুরুত্ব খুবই বেশী। কারণ ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমেই শাসনবিভাগ আইন প্রণয়ন বিভাগের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।

ভেটো প্রয়োগের গুরুত্ব

শাসনবিভাগ আইনসভার কাজের উপর যে ভেটোপ্রয়োগ করিয়া থাকে তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা,—চূড়ান্ত ভেটো (Absolute Veto), সীমিত ভেটো (Qualified Veto), সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো (Suspensive Veto) এবং পকেট ভেটো (Pocket Veto)। চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার বিশেষ অধিকার ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভোগ করিয়া থাকে। চূড়ান্ত ভেটো অনুযায়ী যদি রাজা কখনও পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে সম্মতি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন, তবে সেই বিল কখনও আইনে পরিণত হইতে পারে না। ১৭০০ সাল হইতে রাজশক্তির এই চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা অকেজো হইয়া পড়ে; ইহার কারণ হইতেছে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার ক্রম-বিকাশ। এখনও ইংলণ্ডের রাজশক্তি কোন বিলে সম্মতি প্রদান করিবেন কিনা তাহা মন্ত্রিদের উপদেশ ও পরামর্শের উপর নির্ভর করে, এবং যেহেতু সরকার পক্ষের সম্মতি না থাকিলে এই শাসনব্যবস্থায় আইনসভার পক্ষে কোন বিল অনুমোদন করা সম্ভবপর নয়, সেইজন্য শাসনবিভাগের পক্ষে চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

চূড়ান্ত ভেটো

সীমিত ভেটো (Qualified Veto) বলিতে এই বুঝায় যে শাসন-বিভাগের প্রধান যদি আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন বিলে ভেটো প্রয়োগ করে, তবুও আইনসভার সদস্যগণ বিশেষ সংখ্যাধিক্যের সমর্থনের জোরে

(extraordinary majority) শাসনবিভাগ কর্তৃক প্রযুক্ত ভেটো উপেক্ষা করিয়া পুনরায় বিলটি অনুমোদন করিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে বিলটি আইনে পরিণত হইবে।

সীমিত ভেটো—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির সীমিত ভেটো প্রয়োগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির এইপ্রকার সীমিত ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি যদি মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতি প্রদান না করেন, তবে দশ দিনের মধ্যে তিনি বিলটি কংগ্রেসে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। কিন্তু, কংগ্রেসের উভয় কক্ষই যদি উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে বিলটি পুনরায় অনুমোদন করে, তবে রাষ্ট্রপতির অমতেও বিলটি আইনে পরিণত হয়।

সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো

শাসনবিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো প্রয়োগ (Suspensive Veto) করিতে পারে; সেই ক্ষেত্রে আইনসভা শুধু সংখ্যাধিক্যের সমর্থনের জোরে সেই ভেটোকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। ফ্রান্সের পূর্বতন শাসনতন্ত্রে ইহা দেখা যাইত। শাসনবিভাগ ভেটো প্রয়োগ করিবার পরেও যদি আইনসভা পুনরায় সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে কোন বিল অনুমোদন করে, তবে শাসনবিভাগের ভেটো কার্যকরী হয় না। আর এক ধরণের ভেটো প্রয়োগ দেখা যায়; তাহা হইতেছে পকেট ভেটো (Pocket Veto) প্রয়োগ।

পকেট ভেটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি নাও দিতে পারেন এবং দশ দিনের মধ্যে বিলটি কংগ্রেসে ফেরৎ নাও দিতে পারেন। সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সহি ছাড়াই বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু ইত্যবসরে যদি কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ হইয়া যায় তবে বিলটি আর আইনে পরিণত হইতে পারে না। ইহাকে পকেট ভেটো (Pocket Veto) বলা হয়; কারণ, শুধু সম্মতি প্রদান হইতে বিরত থাকিয়াই রাষ্ট্রপতি একটি বিলকে আইনে পরিণত হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা; তিনটি ভেটো ক্ষমতার সংমিশ্রণ

ভারতের রাষ্ট্রপতি যে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করেন তাহাতে তিনটি ভেটো ক্ষমতার সংমিশ্রণ হইয়াছে, যথা, চূড়ান্ত ভেটো, সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো এবং পকেট ভেটো। প্রথমত, ইংলণ্ডের রাজশক্তির মত ভারতের রাষ্ট্রপতি যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে সম্মতি প্রদান না করেন, তবে তাহা আইনে পরিণত হইবে না। যদিও আমাদের দেশে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, তবুও আমাদের দেশে এই ভেটো ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। তবে মনে হয় শুধু

বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিলেই হয়ত রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিতে পারেন। যদি এমন হয় যে পার্লামেণ্ট কোন বিল অনুমোদন করিবার পর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে অথচ বিলটি তখনও রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় নাই, তখন পরবর্তী মন্ত্রিসভা ইচ্ছা করিলে এই বিলটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার জন্য উপদেশ দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিলে চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি যদি ইহার কোন অংশ অথবা সম্পূর্ণ বিলটিকে-ই পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্ট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন এবং পার্লামেণ্ট যদি সাধারণ সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে পুনরায় বিলটিকে অনুমোদন করে তবে বিলটি আইনে পরিণত হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির সীমিত ভেটো প্রয়োগ হইতে এই সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো একটু পৃথক্। সীমিত ভেটো প্রয়োগ করা হইলে পার্লামেণ্টের সদস্যদের শুধু বিশেষ সংখ্যাধিক্যের (extra-ordinary majority) জোরেই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো প্রয়োগ করা হইলে পার্লমেণ্টের সাধারণ সংখ্যাধিক্যের (ordinary majority) জোরেই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো (Suspensive Veto) প্রয়োগ করিতে পারেন। তৃতীয়ত, পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে সম্মতি প্রদান করা হইতে রাষ্ট্রপতি কতদিনের জন্য বিরত থাকিতে পারেন, সেই বিষয়ে আমাদের শাসনতন্ত্রে কোন সময়ের সীমারেখা নাই। শাসনতন্ত্রের ১১১ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি ফেরৎ পাঠাইতে চাহেন তবে যতশীঘ্র সম্ভব তিনি বিলটি ফেরৎ পাঠাইবেন। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যতদিন খুশী নিজের কাছে বিলটি রাখিয়া দিতে পারেন। বিশেষত যদি রাষ্ট্রপতি দেখেন যে মন্ত্রিসভার পতনের আশু সম্ভাবনা আছে তবে তিনি সংশ্লিষ্ট বলে সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভেটো প্রদান করা ছাড়াও শাসনতন্ত্রের ২০০ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল যদি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠান তবে রাষ্ট্রপতি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য তাহা রাজ্য আইনসভায় ফেরৎ পাঠাইতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন? (Can the President become a Dictator?): ভারতের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। বিশেষতঃ, জরুরী অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি যত ক্ষমতা ভোগ করেন, পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রধান শাসক এত ক্ষমতা ভোগ করেন না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা আলোচনা করিলে

যে প্রশ্ন মনে জাগে, তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতি কখনও একনায়কে পরিণত হইতে পারেন কি না। শাসনতন্ত্রের ৭৪ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions." শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের মতে ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বদাই মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া চলিবেন এবং একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রান হিসাবে কাজ করিবেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৺জওহরলাল নেহেরুর মতে "We have not given our President any real powers, but we have made his position one of great authority and dignity." গণপরিষদের সভাপতি থাকা কালে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Although there is no specific provision in the Constitution itself making it binding on the President to accept the advice of his Ministers, it is hoped that the convention under which in England the King always acted on the advice of his Ministers, would be established in this country also and the President would become a constitutional President in all matters." কিন্তু রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে আমাদের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটুকু তাহা সঠিকভাবে বিধিবদ্ধ করা উচিত। এই একটি দিকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবেন, কারণ আইনতঃ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য নহেন। তবে শাসনতন্ত্রের ৫৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কার্য করিতে নীতিগত ভাবে বাধ্য। কিন্তু অনেকের মতে রাষ্ট্রপতি দেশের একমাত্র শাসকে পরিণত হইতে পারেন না, এরকম কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়, রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আহ্বান জানাইতে হইবে। অথচ যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মানিয়া চলেন, তবে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে আর একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতেই হইবে। কারণ শাসনতন্ত্রের ৭৪ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা থাকিতেই হইবে। কিন্তু, পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন, তবে বুঝিতে হইবে, প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। রাষ্ট্রপতি বড় জোর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ

রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক

নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রীর দল যদি পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে তবে বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার দলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে এবং রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইবার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সৃষ্টি করিতেছেন। সেই অভিযোগে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত (Impeached) করিতে পারে (৬১ নম্বর ধারা)। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলেই একনায়ক হইতে পারেন না। লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ব্যতীত, ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধু নামে মাত্র রাষ্ট্রের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রিসভার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিগণকে সম্মিলিতভাবে নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। শাসনবিভাগের প্রকৃত প্রধান হইতেছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভা। দেখা যাইতেছে ভারতের রাষ্ট্রপতি হইতেছেন রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি কখনও একনায়কে পরিণত হইতে পারেন না। ১৯৫০ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর হইতে এখন পর্যন্ত এমন একটি প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন এবং তিনি যাহা কিছু করিবেন তাহার জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভাকে লোকসভার নিকট (৭৫ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ) দায়ী থাকিতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ, ভারতের অবস্থা এখনও পর্যন্ত এইরূপ রহিয়াছে যাহাতে রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কাজ করা অসুবিধাজনক হয় নাই। তবে এইরূপ পরিস্থিতি বেশীদিন স্থায়ী না-ও হইতে পারে। যদি কখনও মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেণ্টের আস্থা হারায় অথবা যদি অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত শাসনব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। মন্ত্রিসভার সহিত পার্লামেণ্টের ও মন্ত্রিসভার সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক কিরূপ তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া রাষ্ট্রপতির স্থির করিতে হইবে পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইয়া যে মন্ত্রিসভা লোকসভা বাতিল করার পরামর্শ দান করে সেই মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা। রাষ্ট্রপতি যদি ক্ষমতালিপ্সু হন তবে তিনি মন্ত্রিসভার গঠন ও পদচ্যুতিতে এই অবস্থায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। তবে মনে হয় এই অবস্থায় ক্যাবিনেট সরকারের সহিত খাপ খাওয়াইয়া রাষ্ট্রপতি কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তাহার জন্য প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিবে। রাষ্ট্রপতি সেই অবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহা সমকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিবে বলিয়া মনে হয়। তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পক্ষে একনায়ক হইয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করার পথে বাধা থাকে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির তুলনা (The American President and the Indian President,—a comparativ study) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, উভয়ই হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। শুধু কাঠামোর দিক হইতেই নহে, বাস্তবেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে একটি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা কাঠামোর দিক হইতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেখিতে পাই ; বাস্তবে এই দেশে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি প্রবণতা দেখিতে পাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র-প্রধান হইলেও আমরা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। সুতরাং উভয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরক্ষমতা এবং কার্যাবলীর মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি, উভয়ই একটি নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) কর্তৃক নির্বাচিত হন। কিন্তু, এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠনে উভয় দেশের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত করা হয় এবং প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ, নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইলেই বুঝা যায় কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। কারণ, দলগত ভিত্তিতেই প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য আলাদাভাবে নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত করিতে হয় না। ভারতে পার্লামেণ্টর উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে জন্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং অন্ততঃ চৌদ্দবৎসর একাদিক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হয়, কিন্তু, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক, ভারতের নাগরিক এবং লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইলেই চলে। ভারতে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করিতে হইলে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেরই একটা ভূমিকা থাকে। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করিতে হইলে বিচারের কাজ সম্পন্ন করে সিনেট সভা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের প্রধান, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেই দেশে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হওয়ায় রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না ; কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা, বজায় রাখা এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। কিন্তু ভারতে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ না হওয়ায় রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারেন এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা, বজায় রাখা এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান ; ভারতের রাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রের প্রধান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

ভারতে মন্ত্রিসভা সরকারের শাসনবিভাগের সমুদয় কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী, সুতরাং রাষ্ট্রপতি সর্বদাই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারী কাজ করেন। কিন্তু, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিজের পছন্দ অনুযায়ী মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন এবং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাদের বরখাস্ত করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচিবগণ শুধু রাষ্ট্রপতির কাছেই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী, কংগ্রেসের কাছে নহে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে শাসনবিভাগের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং সবকিছুর তত্ত্বাবধান করেন। অপরপক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। ভারতে রাষ্ট্রপতি নিজের খুসীমত মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বিলের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিরূপিত হইয়াছে। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির মধ্যে পার্থক্য আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সীমিত ভেটো এবং পকেট ভেটো উভয়ই প্রয়োগ করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যদি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতি প্রদান না করেন তবে দশ দিনের মধ্যে বিলটি কংগ্রেসে ফেরৎ পাঠাইতে পারেন, অথবা তিনি বিলটিতে সম্মতি দেওয়া হইতে বিরত থাকিতে পারেন। প্রথম ক্ষেত্রে যদি কংগ্রেসের উভয় কক্ষই উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে বিলটি পুনরায় অনুমোদন করে, তবে বিলটি আইনে পরিণত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি তিন প্রকার ভেটো প্রয়োগ করিতে পারেন; যথা চূড়ান্ত ভেটো, সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো (Suspensive veto) এবং পকেট ভেটো (Pocket veto)।

ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন অথবা আন্তর্জাতিক সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনেটের সম্মতি না লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করা অথবা আন্তর্জাতিক সন্ধি অথবা চুক্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি যে সকল ক্ষমতা ভোগ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সেই ক্ষমতা ভোগ করেন না। স্বাভাবিক অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হয়ত ভারতের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন; কিন্তু জরুরী অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন।

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা সর্বদাই অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ থাকে; কেননা সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সরকার থাকে বলিয়া মন্ত্রিসভার ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আইন

সভার নিকট মন্ত্রিসভাকে দায়ী থাকিতে হয় না বলিয়া রাষ্ট্রপতি নিজেই দেশের শাসনব্যপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হয় বলিয়া এবং ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়াই ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে আমরা উপরোক্ত পার্থক্য দেখিতে পাই।

রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক (The President in relation to the Council of Ministers): রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করেন এবং ইহার তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন।[৬] ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সরকারের সমুদয় কাজ পরিচালনা করিবেন। সরকারের কাজ কিভাবে সম্পন্ন হইতেছে সেই সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সর্বদাই রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন কোনও বিধান নাই যাহার ফলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া চলিতে বাধ্য।[৭] কিন্তু, রাষ্ট্রপতির পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলার ব্যাপারে একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে। যেহেতু শাসনবিভাগের জন্য মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট দায়ী থাকে, বিশৃংখলা এড়াইবার জন্য রাষ্ট্রপতির উচিত মন্ত্রিদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা। আমাদের দেশে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় মন্ত্রিসভাকে ইহার সমুদয় ক্রিয়াকলাপের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ইংলণ্ডে যেরূপ রাজা বা রাণী নিজের উদ্যোগে কোন কাজ না করিয়া ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী সব কাজ করেন, ভারতেও রাষ্ট্রপতি সেইরূপ মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করেন; এবং এই কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট জবাহদিহি করিতে হয় মন্ত্রিসভাকে, রাষ্ট্রপতিকে নয়। যদি রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করেন, তবে তাঁহাকে শাসনতন্ত্র লংঘনের অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য নহেন, অথবা মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী যদি তিনি না চলেন, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহার কোন উল্লেখ শাসনতন্ত্রে নাই। এক্ষেত্রে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, রাষ্ট্রপতি কখনও একনায়ক হইতে পারেন কিনা। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন না। কারণ

৬। "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his function".

৭। "The question whether any, and if so, what advice is tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court."

রাষ্ট্রপতি যদি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করেন, তবে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলেই শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অপর একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। তখন পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান জানান হইবে। কিন্তু, পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন, তবে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার কাজের পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। সেইক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতি পুনরায় মন্ত্রিসভার মতের বিরুদ্ধে কাজ করেন তবে বুঝিতে হইবে তিনি ইচ্ছা করিয়াই শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছেন। তখন শাসনতন্ত্রের ৬১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা চলে।

রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদার পার্থক্য (Distinction between the position of the President and that of the Prime Minister) :

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসনবিভাগেরও নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শাসনবিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান না হইলেও সরকারের প্রকৃত প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের কাজ পরিচালনা করেন। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ করেন না, কেন না, সরকারের সব কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয় মন্ত্রিসভাকে। সেইজন্য ইংলণ্ডে "রাজা কোনও অন্যায় করিতে পারেন না" ("The king can do no wrong") এই উক্তিটি প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণই দেশের শাসন সংক্রান্ত সমুদয় কাজ করেন। সরকার যাহা কিছু করে, তাহার জন্য মন্ত্রিসভাকেই দায়ী থাকিতে হয় [৭৫ (৩) নম্বর ধারা], এবং মন্ত্রিসভার সমস্ত দায়িত্বের বোঝা প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর উপরই পড়ে। সুতরাং, রাষ্ট্রপতি শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবেই কাজ করেন, সরকারের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রপতি সমগ্র রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শুধু শাসনবিভাগের প্রকৃত পরিচালক।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা অনেকটা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ন্যায়। তবে জরুরী অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজে সরকারের ক্রিয়া-কলাপে কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যে সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলিবেন সেইরকম কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু, ইংলণ্ডের কথা স্বতন্ত্র। ইংলণ্ডে এইরূপ প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে যে জরুরী অবস্থায়ও রাজা বা রাণী প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ বা পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন। তাহা ছাড়া, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই

আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হন। ভারতেও পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি পাঁচবৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং এই সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র লংঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগ ব্যতীত তাঁহাকে অপসারণ করা যায় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কার্যে বহাল থাকেন ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যগণের আস্থাভাজন থাকেন; পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যদি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার সমুদয় সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। আবার রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে (এক নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক) জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী (যদি তিনি লোকসভার সদস্য হন) প্রত্যক্ষভাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা রাষ্ট্রপতির বেশী হইলেও শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বেশী। রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগের প্রকৃত প্রধান। কিন্তু, শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির অধীন।

রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা ও মন্ত্রিপরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক (Constitutional position of the Indian President and his relation to the Council of Ministers) :

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও কার্যাবলীর আলোচনা ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানগণের পদ-মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে করা হইলে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার প্রকৃতি অনুধাবন করা সহজ হইবে। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় কমন্সসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। তত্ত্বগতভাবে শাসন সংক্রান্ত সমুদয় শক্তির আধার ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী হইলেও কার্যক্ষেত্রে ক্ষমতার পরিপূর্ণ প্রয়োগ মন্ত্রিগণই করিয়া থাকেন। রাজা বা রাণী রাষ্ট্র শাসন না করিয়াও রাষ্ট্রের প্রধান ও জাতির প্রতীক হিসাবে এক অপূর্ব পদমর্যাদা ভোগ করেন। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শুধু সমগ্র জাতি ও রাষ্ট্রের কর্তা নন, শাসনকার্যের প্রকৃত কর্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত। যে মন্ত্রিমণ্ডলীর উল্লেখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রহিয়াছে তাঁহাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কার্যাবলী দ্বারা সীমিত। তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়িত্বশীল ও রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। শাসনক্ষমতার পরিচালনা তাঁহাদের মারফৎ করা হইলেও প্রকৃত শাসনকার্য তাঁহাদের হাতে নাই। ইহা রাষ্ট্রপতির হস্তে সমর্পিত।

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণের পদমর্যাদা

সংবিধান রচয়িতাগণ নির্দিষ্ট কালের জন্য জনগণ কর্তৃক একজন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যবস্থা ভারতে গ্রহণ করার প্রস্তাব করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা

রাষ্ট্রপতিকে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই মর্যাদা দান করিবার পক্ষপাতী—মার্কিন রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রকৃত শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের পদমর্যাদা একই যোগে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া সংবিধানের লক্ষ্য নয়। তবে রাষ্ট্রপতিকে শাসন ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে তাঁহাকে আপাতদৃষ্টিতে নামেমাত্র নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গণ্য করা কঠিন।

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি ইউনিয়নের সমগ্র শাসনক্ষতা প্রত্যক্ষভাবে অথবা অধস্তন কর্মচারীর মাধ্যমে প্রয়োগ ও পরিচালনা করিবেন। অথচ সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন এবং তিনি কোন কাজ মন্ত্রিসভার বিনা পরামর্শে করিলেও তাহার জন্য তাঁহাকে কোন বিচারালয়ে জবাবদিহি করিতে হয় না। রাষ্ট্রপতি কোন কাজ করার পূর্বে মন্ত্রিসভা কোন পরামর্শ দিয়াছেন কিনা কিংবা দিয়া থাকিলে কি পরামর্শ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার কোন এক্তিয়ার সংবিধান আদালতকে দান করে নাই। ইংলণ্ডে যেরূপ রাজা বা রাণীর কোন কাজ তখনই আইনসম্মত হয় যখন উহাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর থাকে। ভারতের ক্ষেত্রে সেরূপ সংবিধানগত কোন নিয়মের প্রবর্তন করা হয় নাই, যাহার ফলে রাষ্ট্রপতির কোন কাজ আইনসম্মত হইতে হইলে উহাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। আবার রাষ্ট্রপতির দেওয়া আদেশ কিভাবে কার্যকর করা হইবে ও প্রমাণসিদ্ধ হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। এগুলিকে প্রমাণসিদ্ধ ও প্রচার করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবগণ—মন্ত্রিগণ নহে। সুতরাং একথা বলা ঠিক নহে যে সংবিধানগত পন্থা অনুযায়ী তিনি জনস্বার্থে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কোন সিদ্ধান্তকে কার্যকর করিতে পারেন না।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় ইচ্ছায় কার্য পরিচালনা করার সুযোগ দান করিয়াছে

আবার যেহেতু মন্ত্রিমণ্ডলী রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর স্বীয়পদে অধিষ্ঠিত থাকেন [সংবিধানের ৭৫ (২) ধারা] সেইজন্য তাঁহাদের নিয়োগের ব্যাপারেও তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। যেমন, রাষ্ট্রপতি স্বীয় ক্ষমতাবলে কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে ছয়মাসের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন এবং রাজ্যসভার মনোনয়ন দ্বারা সেই ব্যক্তিকে ছয়মাসের ভিতর পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়ার যে ধারা সংবিধানে উল্লিখিত আছে তাহাকে আইনসম্মত করিয়াও লইতে পারেন। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাড়াও রাষ্ট্রপতি স্বীয় মনোনীত কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বদান করিতে পারেন। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি ইউনিয়নের কার্যাবলী জাতীয় স্বার্থে মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে প্রদান করিবার জন্য

নিজেই নিয়মকানুন স্থির করিতে পারেন অথবা শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি জানিতে চাহিলে প্রধানমন্ত্রীকে ঐ সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হয়। উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া দেশের শাসনকার্যে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, এবং সেজন্য তাঁহাকে আইনতঃ সংবিধান ভঙ্গজনিত অপরাধে অপরাধী করা চলে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি সংবিধানের মধ্যেই তাঁহার কার্যাবলীকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াও দেশের মধ্যে একচ্ছত্র নায়কে পরিণত হইতে পারেন।

তত্ত্বগতভাবে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নহেন

তবে উপরোক্ত আলোচনার বিপক্ষে বলা যায় যে রাষ্ট্রপতির একনায়ক হওয়ার অবকাশ তখনই থাকে বা তখনই সে সম্পর্কে ধারণা করা হয় যখন সংকীর্ণ আইনগত ব্যাখ্যা দ্বারা সংবিধানের বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার যে রীতিনীতি আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইংলণ্ডের অনুকরণে যে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রচলন আমাদের শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে সেখানে প্রভূত ক্ষমতা রাষ্ট্রনায়কের হস্তে সমর্পণ করা হইলেও সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার রাষ্ট্রনায়কগণ নিজেদের বিপক্ষেই কেবলমাত্র নিজেদের দায়িত্বে করিবেন—শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ এড়াইতে হইলে অথবা দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করিলে স্বাভাবিক সময়ে তাঁহাকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে সংবিধানের ধারার ব্যাখ্যা ঠিকভাবে করিলে রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারে যে কতকটা বাধ্যবাধকতা আছে তাহা বোঝা যায়। ৫৩নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বে সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং সংবিধানের ৬০নং ধারা অনুযায়ী তিনি সংবিধানকে পরিরক্ষণ, সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষণ করিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করেন। সংবিধানের ৭৪নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকিতেই হইবে। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আহ্বান জানাইতেই হইবে। অথচ তিনি যদি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মানিয়া না চলেন তবে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে আর একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতেই হইবে। কিন্তু পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন তবে বুঝিতে হইবে যে প্রধানমন্ত্রীর পিছনে

কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন

জনগণের সম্মতি আছে। রাষ্ট্রপতি সেক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া বড়জোর পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দান করিতে পারেন। কিন্তু পদত্যাগ-কারী প্রধানমন্ত্রীর দল যদি পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার দলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে এবং রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইবার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। রাষ্ট্রপতির এইরূপ কার্য ৫৩নং ও ৬০নং ধারায় বর্ণিত কার্যাবলীর পরিপন্থী। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করিবার অভিযোগে পার্লামেণ্ট সংবিধানের ৬১নং ধারার অনুসরণ দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত (impeach) করিতে পারেন।

আবার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন বা পরামর্শ ছাড়া কোন সদস্য বা ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে নিয়োগ করেন না। কোন মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিতে হইলেও তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই চলিতে হয়।

মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করার পশ্চাতে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার নীতিও দায়িত্ব

শাসনতন্ত্রে তাঁহাকে নিজের মতামত অনুযায়ী এই ব্যাপারে কার্যপরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে পার্লামেণ্টের উপর যৌথভাবে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাই কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার শাসনক্ষমতার পরিচালনা দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং মন্ত্রিদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। এমন কি, প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যক্ষেত্রের মাত্রার মধ্যে থাকিয়া এমনভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করিতে হইবে যেন উক্ত ব্যক্তি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন পাইতে সক্ষম হন।

রাষ্ট্রপতি আড়ম্বর পূর্ণ অপদার্থ অথবা জাঁকজমক সম্পন্ন সাক্ষীগোপাল নহেন

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা অথবা রাণীর ন্যায় রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবেই পদমর্যাদা ভোগ করিবেন। তবে তাঁহাকে "আড়ম্বরপূর্ণ অপদার্থ" অথবা "জাঁকজমক-সম্পন্ন সাক্ষীগোপাল" হিসাবে অভিহিত করা চলে না। কেননা মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরামর্শ দান করিবার, উৎসাহ প্রদান করিবার এবং সতর্ক করিয়া দিবার যে ক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী ভোগ করেন আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও সেই ক্ষমতার অধিকারী।

ইহা ছাড়া, ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে শাসনকার্য ও আইনের প্রস্তাব ও সেই বিষয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি জানিতে চাহিলে প্রধানমন্ত্রীকে সেই মর্মে তাঁহার নিকট বিবরণ পেশ করিতে হয়। আবার তিনি ইচ্ছা করিলে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলীর

নিকট উপস্থিত করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দান করিতে পারেন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তিনি মন্ত্রিপরিষদের নিকট স্বীয় বক্তব্য পেশ করিতে পারেন এবং উহা গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রিপরিষদকে চাপ দিতে পারেন। কোন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর পর অপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের সময় অথবা যখন কোন দলই পার্লামেণ্টে পূর্ণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে না তখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়াও কাজ করিতে পারেন, কেননা এইসব ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ তিনি লাভ নাও করিতে পারেন। আবার কোন প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের আস্থা হারাইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে এবং পদত্যাগের পূর্বে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরামর্শ দান করিলে রাষ্ট্রপতি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং উক্ত পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারেন যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে অন্যায় ও অসঙ্গতভাবে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়ার দেওয়া জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রপতির কিছু ক্ষমতা আছে যেগুলি অনুসরণ করা হইলে তাঁহাকে কেবলমাত্র আড়ম্বরপূর্ণ শাসক হিসাবে অভিহিত করা চলে না।

১৯৫০ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর হইতে এখনও পর্যন্ত ভারতে এমন একটি প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবেন এবং তিনি যাহা কিছু করিবেন তাহার জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভাকে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রথার সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়কও শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তবুও অনেক সময়ই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সমূহের একটি সুস্পষ্ট ব্যাখা দাবী করিয়াছেন। এমন কি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্বর্গতঃ ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ একবার মন্তব্য করেন, "A close study should be made of the powers of the President of India under the Constitution."[১] কিন্তু ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে—আইনের ব্যাপক ব্যাখ্যা দ্বারা সংবিধানের বিভিন্ন ধারা আলোচনা করা হইলে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার বিশদ ও সুস্পষ্ট উল্লেখ সংবিধানে না থাকিলেও তাঁহার শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা কি হইবে তাহা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়। ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি মামলার বিচার প্রসঙ্গে ভারতের সুপ্রীমকোর্টের বিবৃতির উল্লেখ এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সুপ্রীম-কোর্টের মতে ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার অনুকরণে গৃহীত, এবং রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ভারতে বিরাজ করিবেন এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তেই

১। The Statesman. 29. 11. 60. Calcutta.

ন্যস্ত থাকিবে।[৮] এমন কি স্বর্গতঃ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের সভাপতিরূপে ভারতের ক্ষেত্রে এমন এক শাসনতান্ত্রিক প্রথার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যাহাতে, রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই ভারতের শাসনব্যবস্থায় পদমর্যাদা ভোগ করিবেন।—"……it is hoped that the convention under which in England the King always acted on the advice of his ministers, would be established in this country also and the President would become a constitutional President in all matters."

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার আরও ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রয়োজন নাই। তাঁহার পদ-মর্যাদা লইয়া আর বিভ্রান্তিকর বিতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

সুতরাং উপরোক্ত বিভিন্ন উদ্ধৃতি হইতে এবং শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর হইতে গত ১৯ বছরের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসমূহ আরও ব্যাপক-ভাবে অথবা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা না হইলেও তাঁহার পদমর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা করা কষ্টকর ব্যাপার হইবে না। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারাকে একযোগে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার যে পদমর্যাদা আমরা দেখি তাহা ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর পদমর্যাদারই অনুরূপ। সুতরাং এইরূপ মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলি লইয়া বিভ্রান্তিকর বিতর্কের উদ্ভব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক ডি. এন. ব্যানার্জীর মন্তব্যটির সহিত একমত হইয়া বলা চলে যে এইরূপ প্রসঙ্গ লইয়া যদি ক্রমাগতই বিতর্ক চলে তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা ও দেশের উন্নত ব্যাহত হইতে পারে।[৯]

৮। "Under Art 53(1) of our constitution, the executive powers of the Union is vested in the President ; but under Art 75 there is to be a Council of Ministers, with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions. The President has thus been made a formal or a constitutional head of the executive and the real executive powers are vested in the Ministers of the Cabinet .....In the Indian constitution, therefore, we have the same system of Parliamentary executive as in England and the Council of Ministers consisting, as it does, of the members of the legislature is, like the British cabinet, a hyphen which joins, a buckle which fastens the legislative part of the state to the executive part"

Rai Sahib Ram Jawaya Kapur and others vs. the state of Punjab. 12. 4. 55.

৯। If the fundamental principles relating to our constitutional system are challenged and re-opened from time to time by people in highly responsible positions there would be no finality to anything and everything would be in a state of flux. This would not augur well either for the stability and vigour of our system of Government or for the future progress of our country. "Some Aspects of the Indian Constitution P 71 (1962) D. N. Banerjee.

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the President of India and the Governor of a State) :

রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত, রাজ্যের শাসনবিভাগের কর্তৃত্ব রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত।

রাষ্ট্রপতি ভারতীয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং পদাধিকার বলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন প্রভৃতি করিতে পারেন। এই ধরণের ক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত করা হয় নাই।

যুগ্ম বিষয়ক আইন ভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীর দণ্ড রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত যুগ্মভাবে মকুব করিতে অথবা কমাইতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ক্ষমা করিতে অথবা তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া অন্য দণ্ড দান করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি হ্রাস অথবা একজাতীয় দণ্ডের পরিবর্তে অন্য জাতীয় দণ্ডের আদেশ দান করিতে পারেন, তবে এইরূপ অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতিরই আছে।

রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত বিল রাজ্যপাল যদি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি এইরূপ বিলে সম্মতি প্রদান না করেন তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এই ক্ষমতা রাজ্যপাল ভোগ করেন, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনার্থে প্রেরিত এই ধরণের বিলের উপর রাষ্ট্রপতি মারফৎ চরম ভেটো প্রয়োগ করার বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত করিয়া রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্যের আইন প্রণয়নের উপর কেন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থায় এই ধরণের ঘোষণার মাধ্যমে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, এই ক্ষমতা রাজ্যপালগণের নাই। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হইলে তাহার মীমাংসা কল্পেও রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু করা যায়। যদিও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপাল সেই সময় সাধারণতঃ শাসনকার্য পরিচালনায় মুখ্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন, তবুও এই ক্ষমতা সরাসরি তিনি উপভোগ করেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিসভার অবর্তমানেই কেবল রাজ্যপালের পক্ষে এই ধরনের ক্ষমতা পরিচালনা করা সম্ভব।

রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রাজ্যপালগণকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, অথচ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক। শুধু রাজ্যপালগণকে নিয়োগ নহে, তাহাদের

পদচ্যুতও করিতে পারেন রাষ্ট্রপতি। এসম্পর্কে সংবিধানের বিধান হইল রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর রাজ্যপালের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ["The Governor shall hold office during the pleasure of the President"—Art 156 (1)]। হাইকোর্টের জজ্ সমেত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিয়োগের ও পদচ্যুতির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত, অথচ রাজ্যপালগণকে এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নাই।

রাজ্যপালগণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুসারে কতিপয় কার্য সম্পাদনে সক্ষম, অথচ রাষ্ট্রপতিকে এইরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় কাজ করিবার গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংবিধান প্রদান করে নাই। আসামের রাজ্যপাল সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের (খ) বিভাগে বর্ণিত উপজাতি এলাকার শাসন পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি বা "এজেন্ট" হিসাবে এবং আসামে স্বশাসিত জিলায় খনিজ সমূহের "রয়ালটি" লইয়া বিবাদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। আবার সংবিধানের ২৩৯নং ধারা অনুসারে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালকে প্রদান করিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত উক্ত ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালন করিতে পারেন। আবার নাগা বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের ফলে নাগারাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলাকালে উক্ত রাজ্যে সংবিধানের ৩৭১ এ, নং ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজ্যপাল আইন ও শৃংখলা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজের বিশেষ দায়িত্বে কাজ করিবেন। নিজের "স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা"য় কাজ করিবার অর্থ রাজ্যপালগণ মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়া কাজ করিতে পারেন। যেহেতু রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক তাই রাজ্যপালগণের সম্পর্কে কার্যাবলী তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করেন। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার শিখরে অধিষ্ঠিত রাজ্যপালগণকে সেইজন্য রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে অভিহিত করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের নিজের "সন্তুষ্টি" অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। রাজ্যপালগণও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া অন্য সময়ে জনসাধারণের নির্বাচিত আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভার মতামত অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করেন। তবে পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৭ সালে রাজ্যবিধানসভায় মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিনা তাহা যাচাই না করিয়া রাজ্যপাল কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করার পর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে যে যদি রাজ্যপাল নিজের "সন্তুষ্টি" অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে করিবার নিরঙ্কুশ পদচ্যুত ও নিঃশর্ত ক্ষমতা ভোগ করেন তবে কি অনুরূপ অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে নিজের "সন্তুষ্টি" অনুযায়ী যে

কোন সময়ে পদচ্যুত করিবার নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত ক্ষমতা ভোগ করেন? শাসনতন্ত্রে রাজ্যপালের সহিত রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে বিধান সংযোজিত হইয়াছে একই ভাষায় অনুরূপ বিধান সংযোজিত হইয়াছে রাষ্ট্রপতির সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্পর্ক সম্বন্ধে। যদিও কলিকাতা হাইকোর্ট পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালের কাজ সংবিধান সম্মত বলিয়া রায় দিয়াছেন, তবুও অনেকের অভিমত হইল শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা যেহেতু সুপ্রীম কোর্ট সেইজন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্রের বিধান সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত বিতর্কের অবসান হইবে না।

যাহা হোক, একথা বলা চলে যে স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল শাসনতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। তবে রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণকে অনেক সময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় নির্দেশের প্রতি যতটা লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে দেখা গিয়াছে ততটা রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কার্য পরিচালনা করিতে দেখা যায় নাই। অর্থাৎ স্বীয় বিচার বুদ্ধি মত অনেক সময় রাজ্যপালগণ কাজ করিয়াছেন এবং ফলে সেক্ষেত্রে তাঁহাদের মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরামর্শ করিবার প্রশ্নই উঠে নাই। তবে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় এখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই যাহাতে রাষ্ট্রপতির পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়া কাজ করিবার প্রশ্ন দেখা দেয়। ফলে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপতির একনায়ক হইবার মত কতিপয় বিধান সংবিধানে সংযোজিত থাকিলেও সৌভাগ্যবশতঃ এইরূপ জটিল শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতির সৃষ্টি ভারতে এখনও হয় নাই। তবে রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়া কাজ করিয়া বহুলাংশে নিজেদের প্রকৃত শাসক হিসাবে পরিগণিত করিয়াছেন।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President)—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় একজন উপরাষ্ট্রপতিও নির্বাচিত করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনপ্রার্থীর যে যোগাতা ও সর্ত থাকা উচিত, সাধারণভাবে উপরাষ্ট্রপতিরও সেই যোগ্যতা ও সর্ত থাকা উচিত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার জন্য যেখানে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকা উচিত উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার জন্য সেখানে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকা উচিত। উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্যগণ লইয়া গঠিত এক নির্বাচকমণ্ডলী (an electoral college) দ্বারা একক হস্তান্তর যোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টের মনোনীত সদস্যও এই নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য হন। রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতিও পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইনসভার সদস্যের পক্ষে উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে বাধা নাই।

তবে একই সঙ্গে দুইটি পদে অধিষ্ঠিত থাকা যায় না; উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট আইনসভার সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। শাসনতন্ত্র লংঘনের অপরাধে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে হইলে সাধারণ পর্যায়ে অপসারণ পদ্ধতির (Process of impeachment) আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও চলে। রাজ্যসভার সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা চলে অবশ্য যদি লোকসভা ইহাতে সম্মত থাকে (৬৭ নম্বর ধারার 'খ' বিধান)। শাসন বিভাগের দ্বিতীয় প্রধান হইয়াও তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ কক্ষের কাজ পরিচালনা করেন। উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। শাসনতন্ত্রের ৬৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি কাজ না করিতে পারিলে রাষ্ট্রপতি কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইয়া যাইবেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৬০ সালের জুন মাসে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি স্বর্গত ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন রাশিয়ায় গিয়াছিলেন, এবং ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে যখন অসুস্থতার দরুণ তিনি কার্যসম্পাদনে অক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কর্মভার গ্রহণ করেন। আবার ১৯৬৫ সালের প্রথম দিকে চোখে অস্ত্রোপচারের জন্য যখন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বিদেশে যান তখন তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। পদত্যাগ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে যখন রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয় তখন উপরাষ্ট্রপতি নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন। তবে অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যনির্বাহে অপারগ হইলে তাঁহার স্থলে যদি উপরাষ্ট্রপতি কাজ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলা যায় না। শাসনতন্ত্রে এই পার্থক্য বজায় রাখার জন্য বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করিবেন ("shall act as President") এবং অন্য ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রপতির কাজগুলি সম্পন্ন করিবেন ("shall discharge the functions of the President")। এই সকল ক্ষেত্রে এই পার্থক্য উপরাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ ব্যাপারেও পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শপথের ধরণ,—"I will faithfully *execute the office* of the President", এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে "I will faithfully *discharge the functions* of the President," উপরাষ্ট্রপতি যখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করিবেন, তখন তিনি আর রাজ্যসভার সভাপতি

রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতির কাজ করার বিধান

হিসাবে কাজ করিবেন না। সেইক্ষেত্রে রাজ্যসভার উপ-সভাপতি সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতিও পদাধিকারবলে সিনেটের সভাপতি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি ও ভারতের উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু, পদচ্যুতি প্রভৃতি কারণে যদি রাষ্ট্রপতির পদ খালি হয় তবে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হন, অস্থায়ীভাবে ভারতের উপরাষ্ট্রপতির ন্যায় উক্ত পদ অলংকৃত করিয়া কেবল মাত্র রাষ্ট্রপতির কাজ সাময়িক ভাবে পরিচালনা করেন না। ট্রুম্যান, রুজভেল্ট, লিনডন জনসন এইরূপে রাষ্ট্রপতি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি এবং ভারতের উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে পার্থক্য

উপরাষ্ট্রপতি কয়েকদিন আগেও পদমর্যাদার তালিকায় প্রধানমন্ত্রীর নীচে ছিলেন। পদমর্যাদার তালিকায় (Warrant of precedence) বর্তমানে তাঁহার স্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির পর এবং প্রধানমন্ত্রীর উপর। কিন্তু পদমর্যাদার তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও উপরাষ্ট্রপতির পদটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করা হয় নাই। গুরুত্বের দিক হইতে কেবলমাত্র উচ্চ কক্ষের সভায় সভাপতিত্ব করার কাজই তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতিরই বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন না। সুতরাং অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করিয়া উপরাষ্ট্রপতির পক্ষে কতখানি ক্ষমতা উপভোগ করা সম্ভব অথবা পদমর্যাদার দিক হইতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাঁহার পদটি হওয়া সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা সত্ত্বেও বর্তমানে আমরা উপরাষ্ট্রপতির উপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত দেখিতে পাই। বিদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ ও ভাববিনিময়ের ব্যাপারে তাঁহাকে ভারতের একজন অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে আজকাল প্রত্যক্ষ করা যায়।

উপরাষ্ট্রপতির পদমর্যদা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গঠন ও ক্রিয়াকলাপ (**Composition and Functions of the Union Council of Ministers**)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ৭৪ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions." রাষ্ট্রপতি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করেন। শাসনতন্ত্রের ৭৫ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন।[১০] কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী রাষ্ট্রপতির

১০। "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister." (Art. 75 (1))

সন্তুষ্টির উপর স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[১১] মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন। তাঁহাদের উভয় কক্ষেরই বিতর্কে অংশ গ্রহণের অধিকার আছে; কিন্তু কোন মন্ত্রী যে কক্ষের সদস্য শুধু সেই কক্ষেই ভোট প্রদান করিবার অধিকারী। ১৯৫২ সালের Salaries and Allowances of Ministers Act অনুযায়ী একজন মন্ত্রী ২২৫০ টাকা এবং একজন উপমন্ত্রী ১৭৫০ টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা যে সকল কাজ করে, ভারত সরকারের মন্ত্রিসভাও সেই কাজগুলি করে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে মন্ত্রী হইবার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়।[১২] এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বৃটেনের শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াছে। ভারতে আমরা তিন প্রকারের মন্ত্রী দেখিতে পাই। যথা, ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers।) রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণ ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন। এই তিন প্রকার মন্ত্রী ছাড়াও কতিপয় পার্লামেণ্টের সেক্রেটারী (Parliamentary Secretaries) আছেন। ভারতে অবশ্য কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভার সদস্য কতজন থাকিবেন সেই সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রে কিছু বলা হয় নাই। ক্যাবিনেটের অধিবেশনে রাষ্ট্রমন্ত্রিগণ নিমন্ত্রিত না হইলে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। উপমন্ত্রিগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রিকে কাজে সাহায্য করেন।

মন্ত্রিদের বেতন

মন্ত্রিসভার গঠন

ভারতে তিন প্রকার মন্ত্রী

মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই একটি না একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভার অর্পিত হয় ক্যাবিনেট সদস্যগণের হাতে। শাসন-পরিচালনা, আইন প্রণয়ন এবং সরকারের আয়-ব্যয় ব্যপারে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করা এবং সেই নীতি কার্যকরী করা মন্ত্রিসভার কাজ। সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ, বিল তৈয়ারী ও উত্থাপন, মন্ত্রিসভাকেই করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসনবিভাগের কাজ চালিত হয় বটে, কিন্তু সব কাজের দায়িত্ব মন্ত্রিসভাকেই বহন করিতে হয়। পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্বও

সরকারের সব কাজের দায়িত্ব মন্ত্রিদের, রাষ্ট্রপতির নহে

১১। "The Ministers shall hold office during the pleasure of the President." Art 75 (2)

১২। "A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister." [Art 75 (5) of the Constitution.]

মন্ত্রিসভার। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যে সকল দপ্তরেরর ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহারা যে বিশেষজ্ঞ তাহা নহে। সেইজন্য মন্ত্রিদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের (Permanent civil servants) উপর নির্ভর করিতে হয়। শাসনতন্ত্রের ৭৫ (৩) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the people." সুতরাং যে মুহূর্তে মন্ত্রিসভা লোকসভার আস্থা হারাইবে সেই মুহূর্তেই মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবেও যদি কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। সেইজন্য ভারতবর্ষে এই প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে লোকসভায় কোন বিশেষ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পূর্বেই সেই মন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন। ষন্মুখম চেট্টি. ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন, কে. ডি. মালব্য প্রভৃতি মন্ত্রিদের পদত্যাগ এই প্রথাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে। এই মন্ত্রিগণ যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করিতেন, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে হয়তো অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় উত্থাপিত হইত।

মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব

মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব

মন্ত্রিসভার সমুদয় কাজের জন্য মন্ত্রিদের যৌথ দায়িত্ব থাকে বলিয়া সরকারের কোন নীতি গৃহীত হইবার পূর্বে ক্যাবিনেটের বৈঠকে তাহা অধিকসংখ্যক সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। নিজ নিজ দপ্তরের কাজ সম্বন্ধে মন্ত্রিদের সম্পূর্ণভাবে গোপনীয়তা (secrecy) বজায় রাখিতে হয়। যদি মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে কোন নীতির ক্ষেত্রে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা মিটাইয়া ফেলার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীকে গ্রহণ করিতে হয়। ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। লর্ড মর্লি (Lord Morley) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে "First among equals" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও আমরা এইভাবে অভিহিত করিতে পারি; কারণ ক্যাবিনেটের সদস্যদের সকলেরই মর্যাদা সমান। তবুও দলীয় নেতা এবং মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কতিপয় কাজ আছে যেগুলি তাঁহাকে ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন করে। মন্ত্রিদের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব হইতেছে ক্যাবিনেটের। সমগ্র মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট সদস্যগণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

পার্লামেন্টের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক (Relation between the Parliament and the Council of Ministers): পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে পার্লামেণ্টের মহিত মন্ত্রিসভার যে সম্পর্ক থাকে, ভারতেও তাহা

অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন। মন্ত্রী হওয়া কালে তাঁহারা যদি পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাদের পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীই পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যদি সরকারের নীতি অথবা কাজকর্ম সম্বন্ধে মন্ত্রিদের কোন প্রশ্ন করেন তবে মন্ত্রিগণ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য। তবে তিনি যে কক্ষের সদস্য, শুধু সেই কক্ষেই ভোট প্রদানকালে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য কক্ষে তিনি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলেও ভোট প্রদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

মন্ত্রিদের পক্ষে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ অপরিহার্য

মন্ত্রিগণ লোকসভার নিকট সরকারের কাজের জন্য যুক্তভাবে দায়ী। রাষ্ট্রপতি কখনও এজন্য দায়ী থাকেন না। এই ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা যাহা কিছু করেন, তাহার জন্য পার্লামেণ্টের কাছে মন্ত্রিসভা দায়ী থাকেন। ভারতবর্ষেও আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব আছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার বিভিন্ন কাজে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে যে নীতি গ্রহণ করেন, সেই নীতি সব মন্ত্রিকেই গ্রহণ করিতে হয় এবং অনুসরণ করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী ইহার বিরোধিতা করে, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। অবশ্য তিনি লোকসভায় স্পীকারের সম্মতি লইয়া পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন। নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর যখন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডক্টর সি. ডি. দেশমুখ অন্যান্য ক্যাবিনেট সদস্যগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন, তখন তিনি পার্লামেণ্টে তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনুকরণেই আমাদের দেশে মন্ত্রিদের লোকসভার নিকট যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থা প্রচলিত প্রথার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ভারতে ইহা শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকসভার অন্ততঃ ত্রিশ জন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব আনিতে পারেন এবং যদি এই প্রস্তাব লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মন্ত্রিদের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এবং মন্ত্রিগণও সেইগুলির জবাব দিতে বাধ্য। যদি কোন বেসরকারী বিল মন্ত্রিদের আপত্তি সত্ত্বেও লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, অথবা মন্ত্রিদের প্রস্তাবিত কোন বিল যদি পার্লামেণ্ট অনুমোদন না করে, অথবা মন্ত্রিদের সম্মতি ব্যতীত যদি লোকসভা মন্ত্রিদের

যৌথ দায়িত্ব

লোকসভার অনাস্থা প্রস্তাবের প্রভাব

বেতন কমাইয়া দেয় তবে মন্ত্রিগণ তাহা নিজেদের উপর আইনসভার অনাস্থা বলিয়া মনে করেন এবং সেইক্ষেত্রে তাঁহারা পদত্যাগ করেন। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ইহাই প্রথা। সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য শুধু প্রভাবই নয় এই ব্যাপারে যে মন্ত্রিমণ্ডলী অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী সেকথা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সরকার কোন ব্যয় অথবা কর ধার্য করিতে পারে তখনই যখন এই বিষয়ে পার্লামেণ্টের অনুমোদন লাভ করেন। অর্থসংক্রান্ত বিলে রাজ্যসভার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, কারণ লোকসভার অনুমোদনকে তাহারা বাতিল করিতে অথবা সংশোধন করিতে পারে না।

আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার প্রাধান্য ও তাহার কারণ

অর্থাৎ এই ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা লোকসভার। অন্যভাবে বলা যায় লোকসভাই আয়-ব্যয় নির্ধারণের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদকে পরিচালিত করে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে লোকসভা পরোক্ষভাবে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃকই এই বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন অর্থসংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া লোকসভায় উত্থাপিত হয় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই কোন অর্থসংক্রান্ত বিলের উত্থাপনে অনুমতি দান করেন। আবার মন্ত্রিপরিষদের দলীয় সদস্য-সংখ্যার জোরেই উক্ত বিলটি লোকসভায় অনুমোদন করাইতে তাহাদের মোটেই অসুবিধা হয় না। আবার এমন কতিপয় সরকারী ব্যয় আছে যাহা লোকসভার ভোটে রদবদল হয় না।

যদি কখনও এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে লোকসভায় উক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী অগ্রাহ্য হইল তাহা হইলে তাহা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের অনাস্থা সূচনা করে। অবশ্য ভারতে ইহা এখনও বাস্তব রূপ লইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতেও আইনসভা অপেক্ষা মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। দলীয় শৃংখলা বজায় থাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষে গত ১৯বৎসরে পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করা মোটেই অসুবিধাজনক ব্যাপার হয় নাই। লোক সভায় সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার পক্ষে সরকার পক্ষের প্রস্তাবিত বিল পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে অনুমোদিত করাইতে কোন অসুবিধা হয় নাই। পার্লামেণ্টে সরকার গঠন—কারী দলের শৃংখলা ও সংহতিও দলের সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী বা দলীয় নেতার নির্দেশ পালন করিতে অনুপ্রাণিত করে। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ জানেন যে মন্ত্রিসভা যদি চরম সংকটের সম্মুখীন হয়, তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার উপদেশ নিতে পারেন। সেইক্ষেত্রে যদি পুনরায় সাধারণ নির্বাচন হয় তবে বর্তমান সদস্যগণ পুনরায় নির্বাচিত না-ও হইতে পারেন। সেইজন্য তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করিতে চাহেন না।

যদি মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে কখনও সংকটের সম্মুখীন হয়, তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। ইহা হইতেছে পার্লামেণ্টের উপর মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত ক্ষমতা। জেনিংস (Jennings) ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্কের আলোচনাকালে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রেও আমরা তাহা প্রয়োগ করিতে পারি,—"The House of the people (The House of Commons in England) makes the Ministry, the Ministry also can unmake the House."

সরকার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পার্লামেণ্টের মাধ্যমে জনগণকে দেয় তাহা ঠিক ঠিক পালন করার দায়িত্ব সরকার অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের। এই প্রতিশ্রুতি তাহারা পালন না করিলে লোকসভায় বিরোধী পক্ষ নানারূপ সমালোচনার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করিতে পারে। বিভিন্ন সদস্য সরকার গঠনকারী দলের বিভিন্ন ত্রুটি নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিয়া পরবর্তী নির্বাচনে তাহাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে বিদ্বেষভাব আনয়ন করিতে পারে। সুতরাং পার্লামেণ্টের সদস্যগণের এইরূপ সমালোচনার অধিকার একথা স্পষ্টই সূচিত করে যে সরকার পক্ষ তাহাদের খেয়াল খুশীমত সরকারী কাজ পরিচালনা করিতে পারে না। আবার সরকারী প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কমিটির (The Committee on Government Assurance) গঠন ও পার্লামেণ্টকে মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণে কিছুটা ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। এই কমিটির মুখ্য কাজ হইতেছে মন্ত্রিগণ তাঁহাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মত কাজ করিতেছেন বা করিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে পার্লামেণ্টের নিকট একটি বিবরণী পেশ করা। সুতরাং মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কার্যতঃ অনন্য ক্ষমতার অধিকারী হইলেও পার্লামেণ্ট যে একেবারেই পরোক্ষভাবেও মন্ত্রিসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না সে কথা ঠিক নহে।

পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী (**Prime Minister of India**)**ঃ** ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৪(১) নম্বর ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কাজে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবে ("There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions.") ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় যে মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ মর্যদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীও *"keystone*

of the cabinet arch." ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া এ্যাসকুইথ (Asquith) বলিয়াছিলেন, "The office of the Prime Minister in England is what its holder chooses to make it." ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমরা অনুরূপ মন্তব্য করিতে পারি।

রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। অবশ্য সংবিধানে এইরূপ কোন বিধান নাই যে রাজ্যসভার কোন সদস্য প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের যে শাসনতান্ত্রিক রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে উচ্চকক্ষ বা লর্ডসভার কোন সদস্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হওয়ার পথে কিছু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়। লর্ডসভার সদস্য লর্ড স্যালিসবেরী যখন প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন হইতে আজ পর্যন্ত কমন্সসভার সদস্য হইতেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন—লর্ডসভার নয়। এমন কি স্যার এলেক ডগলাস্ হিউম যখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উইলসনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নির্বচিত হন তখনও তিনি লর্ডসভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়া উপনির্বাচনে কমন্সসভার একটি আসন অধিকার করেন।

দলীয় নেতা হিসাবে নিজের দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

শাসনতন্ত্রের ৭৫(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের নিযুক্তির জন্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রপতিও প্রধানমন্ত্রীর উপদেশানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তখন অন্যান্য মন্ত্রিদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সময় প্রধানমন্ত্রী এমন কতিপয় সহকর্মী নিয়োগ করেন যাঁহাদের নিয়োগ করিলে আইনসভায় তাঁহার নেতৃত্ব এবং তিনি যে দলের সভাপতি সেই দলের ঐক্য সংহতি ও শৃংখলা বজায় থাকে। আইনসভার ভিতরে প্রধানমন্ত্রীই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। দলের মর্যাদা এবং দলীয় নেতার মর্যাদা অংগাঙ্গীভাবে জড়িত। আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃংখলা বজায় রাখা, সরকারের পক্ষে সর্বদা দলীয় সমর্থন অর্জন করা এবং নির্বাচনের সময় যাহাতে নিজের দল জয়যুক্ত হয় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। যদি কখনও দলের ভিতরে উপদলের সৃষ্টি হয়, তবে সেই উপদলগুলি যাহাতে দলের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়, সেইদিকে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী সরকার-গঠনকারী পার্লামেণ্টারী রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে প্রায়ই দলীয় সদস্যদের সভা আহ্বান করেন এবং দলের নীতিগুলিকেই সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন নীতির মধ্যে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের

দলের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যদি প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা হন, তবে তিনি দলীয় শৃংখলা অনায়াসে বজায় রাখিতে পারেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

লর্ড মর্লি (Lord Morley) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে "*First among Equals*" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও আমরা অনুরূপভাবে অভিহিত করিতে পারি। কারণ, ক্যাবিনেট সদস্যদের সকলেরই মর্যাদা সমান। তবুও দলীয় নেতা এবং মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর এমন কতিপয় কাজ আছে যেগুলি তাঁহাকে ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন করে। মন্ত্রিসভার সভায় প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ সমগ্র মন্ত্রিসভার জন্য সরকারী নীতি কি হইবে তাহা বিবেচনা করেন এবং মন্ত্রিসভার সব সদস্যদেরই সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী সরকারের গৃহীত নীতি অনুসরণ না করেন অথবা ইহার বিরোধিতা করেন, তবে সেই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দিতে পারেন। আমাদের শাসনতন্ত্রের ৭৫(২) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে "The Ministers shall hold office during the pleasure of the President." এই বিধানের তাৎপর্য হইতেছে এই যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ক্রমে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। যদি ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সরকারী নীতি লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হয়, তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর, কেননা তিনিই ক্যাবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ দপ্তরের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মসূচীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ক্যাবিনেটকে সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর পরিচালনাধীন থাকিতে হয়। ইংলণ্ডের ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে লর্ড মর্লির (Lord Morley) নিম্নলিখিত মন্তব্যটি ভারতের ক্যাবিনেটের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য,—"Although in cabinet, all its members stand on the equal footing, speak with equal voice and on the rare occasions when a division is taken are counted on the fraternal principle of one man, one vote, yet head of the cabinet is Prime Minister who occupies a position which, so long as it lasts, is one of exceptional and peculiar authority."

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রি-সভার মধ্যে সম্পর্ক

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারায়[১] বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন এবং আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার কতব্য হইতেছে প্রধানমন্ত্রীর। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন এবং আইন-প্রণয়নের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যখন যাহা জানিতে চাহিবেন, তাহা জানাইবার কর্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর। তাহা ছাড়া, যদি কোন মন্ত্রী কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচিত না হয় তবে রাষ্ট্রপতির জানা দরকার হইলে তাহা রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার কর্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর। শাসনতন্ত্রের ৭৪(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সাহায্য ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেই সাহায্য এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া শাসনতন্ত্রে কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রপতি যদি প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ না করেন তবে শেষ পর্যন্ত হয়ত তিনি নিজেই শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ ডাকিয়া আনিবেন। কারণ, সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন তবেই বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। সেইক্ষেত্রেও যদি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ না করেন তবে বুঝিতে হইবে যে শাসনতন্ত্রের ৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। এই যুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৬১ নং ধারা অনুযায়ী অপসারণ (impeached) করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরিচালিত করেন, এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রধান পরিচালক।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। লোকসভার অধিবেশন কখন

১। শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারাটি নিম্নরূপ :—

"It shall be the duty of the Prime Minister—(a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation ; (b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for ; and (c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council."

আহ্বান করা হইবে, কতদিন ইহার অধিবেশন বজায় রাখা হইবে এবং কখন ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং প্রধান-মন্ত্রী যে প্রকার পরামর্শ প্রদান করেন, তাহাই এই ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। প্রধানমন্ত্রী দলীয় শৃংখলা বজায় রাখিয়া নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে পার্লামেণ্টের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেন। বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া যাহাতে পার্লামেণ্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেইদিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন। পার্লামেণ্টকে কোন ব্যাপারে স্বমতে আনিতে না পারিলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র-পতিকে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন।

লোকসভার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ক্ষমতা আলোচনা করিলে ইহা পরিষ্কার হয় যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নিজের দেশে যে মর্যাদা এবং নিজের সরকারে যে ক্ষমতা ভোগ করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও তাহা ভোগ করেন। জরুরী অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। কিন্তু জরুরী অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয় না। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতাগুলি ভোগ করেন, সেইগুলি প্রয়োগ করিবার সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হন। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের রাজার সহিত ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর যে সম্পর্ক বর্তমান আছে, ভারতের রাষ্ট্রপতির সহিতও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সেই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। নিজের দলের সহিত সম্পর্ক, মন্ত্রিসভার সহিত সম্পর্ক, এবং পার্লামেণ্টের সহিত সম্পর্ক, এই তিনটি ক্ষেত্রে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর যে ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও সেই ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টকে হাতে রাখিতে পারিলে এবং রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে হাতে রাখিতে পারিলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় যাহা খুসী তাহাই করিতে পারেন। গত ১৯ বৎসর ধরিয়া যে প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বর্তমানে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অনুরূপ এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বর্তমানে ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতারই অনুরূপ।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা প্রায় একরূপ

ভারতের এ্যাটর্নী-জেনারেল (Attorney General for India) : ভারতের শাসনতন্ত্রে এ্যাটর্নী-জেনারেলের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হইতেছেন ভারত সরকারের সর্বপ্রধান আইন উপদেষ্টা। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন। ভারতের

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, এটর্নী জেনারেলেরও সেই যোগ্যতা থাকিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য করিতে হইবে অথবা দশ বৎসর কাল হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট থাকিতে হইবে অথবা রাষ্ট্রপতির মতে তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হইতে হইবে। নিয়োগের ব্যাপারে অথবা তাঁহার কার্যকালের ক্ষেত্রে কোনরূপ বয়সের সীমারেখা টানা হয় নাই। এ্যাটর্নী জেনারেলের মাসিক বেতন কত হইবে রাষ্ট্রপতি তাহা নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রপতি বর্তমান এ্যাটর্নী জেনারেলের মাসিক বেতন ৪০০০ টাকা নির্ধারিত করিয়াছেন।

এ্যাটর্নী জেনারেলের নিয়োগ ও যোগ্যতা

এ্যাটর্নী জেনারেলের কাজ হইতেছে, রাষ্ট্রপতি যদি তাঁহার নিকট আইন-সংক্রান্ত কোন বিষয় প্রেরণ করেন তবে তিনি সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন এবং আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রয়োজনবোধে তিনি ভারত সরকারের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করিতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ৭৬ নং ধারা তাঁহাকে যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে এবং দেশের প্রচলিত আইন তাঁহাকে যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে তিনি সেইগুলি সম্পাদন করিয়া থাকেন। আবার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরিত আইন ঘটিত প্রশ্নের বিবেচনার ক্ষেত্রে এ্যাটর্নী-জেনারেল ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য নহেন। তাই তাঁহার ভোটদানের কোন অধিকার নাই। তবে তিনি আদালতে সরকারের পক্ষে বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে পার্লামেণ্ট অথবা পার্লামেণ্টের কোন কমিটির অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করিতে পারেন (সংবিধানের ৮৮নং ধারা)। আবার রাজ্যগুলির সকল আদালতেই তাঁহার শ্রবণাধিকার আছে।

এ্যাটর্নী জেনারেলের কার্য ও ক্ষমতা

ভারতের এ্যাটর্নী জেনারেল কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা নিযুক্ত হইয়া কোন আদালতে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন। তবে এমন কোন মামলায় তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষকে সমর্থন করিতে পারেন না যেখানে অপরপক্ষে ভারত সরকার থাকে। আবার কোন ফৌজদারী সংক্রান্ত মামলায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁহাকে ভারত সরকারের অনুমতি লাভ করিতে হয়।

নিয়োগের দিক দিয়া ইংলণ্ড ও ভারতের এ্যাটর্নী জেনারেলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হইল ইংলণ্ডের এ্যাটর্নী-জেনারেলের নিয়োগ কতকটা রাজনৈতিক, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তাহা নয়। অর্থাৎ ক্ষমতাশালী দলের সমর্থকদের মধ্যে অন্যতম আইনজীবী হইতেই ইংলণ্ডে উক্ত পদে লোক

নিযুক্ত করা হয়। কাজে কাজেই সরকারদল ক্ষমতাচ্যুত হইলেই এ্যাটর্নী-জেনারেলেরও পরিবর্তন হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এ্যাটর্নী-জেনারেলের নিয়োগ ও স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতির খুশির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথেই এ্যাটর্নী-জেনারেলের পরিবর্তন না-ও হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের এ্যাটর্নী-জেনারেল ক্যাবিনেটের সদস্য হইতে পারেন না, কিন্তু ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তিনি ক্যাবিনেটের সদস্য হইতে পারেন। ইংলণ্ডে এ্যাটর্নী-জেনারেল কমন্সসভার সদস্য; সুতরাং তিনি কমন্সসভার আলোচনায় যোগদান ও ভোট দান করিতে পারেন। কিন্তু লোকসভার সদস্য নহেন বলিয়া ভারতীয় এ্যাটর্নী-জেনারেলের ভোটাধিকার নাই, তবে পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে তিনি যোগদান ও তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের এ্যাটর্নী-জেনারেলের ব্যক্তিগতভাবে আইন-ব্যবসা পরিচালনা করা নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু ভারতের সংবিধান এ্যাটর্নী জেনারেলের উপর এইরূপ কোন বাধা নিষেধ আরোপ করে নাই। শুধুমাত্র ভারত সরকারের স্বার্থবিরোধী কোন মামলায় ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কোন ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না।

ইংলণ্ডের ও ভারতের এ্যাটর্নী-জেনারেলের মধ্যে পার্থক্য

এই মর্মে কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব করা হয় যে এ্যাটর্নী জেনারেল এবং আইনমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু দেশের আইনজীবীগণ এই ব্যাপারে আপত্তি করায় এবং দেশের শিক্ষিত জনমত এই প্রস্তাবের বিপক্ষে যাওয়ার ভারত সরকার এই প্রস্তাব কার্যকরী করেন নাই। এ্যাটর্নী জেনারেল এবং আইনমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইলে অনেকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। প্রথমত, এ্যাটর্নী জেনারেল এবং আইনমন্ত্রী এক ব্যক্তি হইলে শাসন বিভাগের কাজে তাঁহাকে বিশেষভাবে জড়িত থাকিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে সরকারের কাজে বিভিন্ন আইন ঠিকভাবে প্রযুক্ত হইতেছে কিনা তাহার খুঁটিনাটি তত্ত্বাবধান করা তাঁহার পক্ষে সব সময় সম্ভবপর হইবে না। দ্বিতীয়ত, এ্যাটর্নী জেনারেল নিজেই যদি আইনমন্ত্রী হন তবে আইন উপদেষ্টা হিসাবে এ্যাটর্নী জেনারেল নিরপেক্ষভাবে যে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সব সময়ে সম্ভবপর হইবে না। তৃতীয়ত, এ্যাটর্নী জেনারেল হইবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় আইনমন্ত্রীর সেই যোগ্যতা থাকিবার প্রয়োজন নাই। যদি এ্যাটর্নী জেনারেল সম্পূর্ণভাবে শাসন-বিভাগের লোক হইয়া যান তবে বিচারবিভাগ বিভিন্ন আইন সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের ব্যাখ্যা হইতে আংশিকভাবে বঞ্চিত হইবে, কারণ সেই ক্ষেত্রে সরকারের কাজ ব্যতীত এ্যাটর্নী জেনারেল আর আদালতে উপস্থিত হইবেন না।

আইনমন্ত্রী এবং এ্যাটর্নী জেনারেল একই ব্যক্তি হওয়া উচিত কিনা

সংক্ষিপ্তসার

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনবিভাগের প্রধান হইতেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির পর হইতেছেন উপরাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে শাসনকাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা আছে। সরকারের অনেক স্থায়ী কর্মচারী থাকেন যাঁহারা দৈনন্দিন কাজে মন্ত্রিসভাকে সাহায্য করেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্যবিধান সভায় এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এবং লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা-সম্পন্ন নাগরিক হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কোন লাভজনক ব্যবসায়ের সহিত জড়িত থাকিতে পারিবেন না, এবং কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনস্থ কর্মচারী থাকিতে পারিবেন না। তিনি পার্লামেন্টের অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য হইতে পারেন না। পদমর্যাদার সহিত সংগতি রাখিয়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির জন্য মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য ভাতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ: রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু, তিনি যদি অসদাচরণের অভিযোগে অথবা শাসনতন্ত্র লংঘন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তবে তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্যগণ পদচ্যুত (Impeach) করিতে পারেন। পার্লামেন্টের কোন কক্ষ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি অপসারণের প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষ ইহা লইয়া বিস্তৃত অনুসন্ধান করে। যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি প্রকৃত পক্ষে দোষী, তবে উক্ত কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন পাওয়া গেলে অপসারণ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতি অপসারিত হন। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিতে চাহিলে উপরাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে হয়। যদি পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার আগে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হয় অথবা তিনি পদত্যাগ করেন, তবে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইয়া যান নূতন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত।

রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও ক্ষমতা: রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান, শাসনবিভাগেরও তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান; শাসনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী তিনি পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। মন্ত্রিদের পরামর্শ অনুযায়ীই তিনি স্বাভাবিক সময়ে সমুদয় কাজ নির্বাহ করেন। কিন্তু জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থায় যে ক্ষমতা ভোগ করেন, পৃথিবীতে অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধান এত ক্ষমতা ভোগ করেন না। রাষ্ট্রপতির পদ খুবই মর্যাদাসম্পন্ন সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে থাকেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে আমরা কতিপয় অংশে বিভক্ত করিতে পারি।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers): শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি যাবতীয় শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সব কাজই রাষ্ট্রপতির নামে নির্বাহ করা হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন মূলরাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের, এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, তাঁহাদের সকলকেই রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া, আন্তঃরাজ্য পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণকে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের খুব উচ্চপদস্থ কিছু সরকারী কর্মচারীদেরও রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন।

রাষ্ট্রপতি দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, এবং পদাধিকার বলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা অথবা

শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন। বিভিন্ন দেশের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা, বিদেশে দূত প্রেরণ করা এবং বিদেশ হইতে দূতগণকে গ্রহণ করাও রাষ্ট্রপতির অন্যতম কাজ।

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers): রাষ্ট্রপতির কতিপয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত বিলকে আইনে পরিণত হইতে হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি সেই বিলটিকে আইনে পরিণত করিতে সম্মতি প্রদান না করেন এবং বিলটি যদি দ্বিতীয়বার পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াও বিলটি আইনে পরিণত হয়। সমুদয় অর্থবিল (Money Bills) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া পার্লামেন্টে উথাপিত হয়। কোন রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত, এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত বিলেও তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে এবং ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে অথবা আলাদা অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ প্রদান করিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার সময় রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অধিবেশনের কার্যসূচী কি হইবে, তাহা বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স (Ordinance) জারী করিতে পারেন। কিন্তু যখন পার্লামেন্টের পুনরায় অধিবেশন বসে, তখন এই অর্ডিন্যান্স লইয়া আলোচনা করিবার, ইহা অনুমোদন করিবার অথবা ইহা অনুমোদন না করিবার অধিকার পার্লামেন্টের থাকে। পার্লামেন্টের পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহ পার হইয়া গেলে এই অর্ডিন্যান্স কার্যকরী হইবে না।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers): রাষ্ট্রপতি কতিপয় অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও (Financial Powers) ভোগ করেন। আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার সময় রাষ্ট্রপতি প্রথমেই সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয় হিসাব বাজেট আকারে পার্লামেন্টে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থিত করান। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত অর্থদাবি সংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেন্টে উথাপিত হয় না। তাহা ছাড়া, আয়কর হইতে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবংগকে তাহাদের রপ্তানি-শুল্কের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি আথিক সাহায্য (Grant-in-aid) প্রদান করেন।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers): রাষ্ট্রপতির বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাই প্রধান। তাহা ছাড়া, সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত অপরাধীগণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীগণকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করিতে পারেন, অথবা তাহাদের দণ্ডাদেশ কমাইয়া দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীগণকেও রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করিতে পারেন অথবা তাহাদের দণ্ডাদেশ কমাইয়া দিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতি-গণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন।

রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন? (Can the President become a Dictator?): রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা আলোচনা করিলে যে প্রশ্ন মনে জাগে তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতি কখনও একনায়কে পরিণত হইতে পারেন কি না। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবেন। কিন্তু, আইনতঃ, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং অনেকের মতে রাষ্ট্রপতি দেশের একমাত্র শাসকে পরিণত

হইতে পারেন না, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়, রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আহ্বান জানাইতে হইবে। যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মানিয়া চলেন তবে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে আর একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন, তবে বুঝিতে হইবে, প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। রাষ্ট্রপতি বড় জোর পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু, পদত্যাগ-কারী প্রধানমন্ত্রীর দল যদি পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে, তবে বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার দলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে এবং রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইবার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। সেই অভিযোগে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত (Impeached) করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলেই একনায়ক হইতে পারেন না। লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ব্যতীত, ভারতীয় রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিগণকে সম্মিলিতভাবে নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। শাসন বিভাগের প্রকৃত প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রপতি শুধু রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান।

প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister): মন্ত্রিপরিষদের যিনি প্রধান, তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রী বলা হয়। ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁহাকেই প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার দলের সদস্যদের মধ্য হইতে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্য দলের সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী একাধারে মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেন্টের নেতা। মন্ত্রিপরিষদের নেতা হিসাবে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রিদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন, মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, মন্ত্রিসভার সাধারণ নীতির মূলসূত্র নির্ধারণ করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভাও ভাঙ্গিয়া যায়। যতদিন তিনি পার্লামেন্টের নেতা থাকিবেন, ততদিন তাঁহার প্রধানমন্ত্রীত্ব বজায় থাকিবে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সম্মিলিত নীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার বিভিন্ন কাজে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সহিত রাষ্ট্রপতির যোগসূত্র প্রধানমন্ত্রী বজায় রাখেন।

এ্যাটর্নী জেনারেল (Attorney General for India): এ্যাটর্নী জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি ভারত সরকারের সর্বপ্রধান আইন উপদেষ্টা। তিনি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করেন। আবার পার্লামেন্টে যে কোন সময় বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নহেন, তাই তিনি ভোটদান করিতে পারেন না।

Exercise

1. How is the Indian President elected ?
(ভারতের রাষ্ট্রপতি কিরূপে নির্বাচিত হন ?) (১৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)
2. Describe the position and Powers of the President of India.
(ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর) (১৪৪-৫৫ পৃষ্ঠা)
3. Can the Indian President ever become a dictator ?
(রাষ্ট্রপতি কি কখনও একনায়ক হইতে পারেন ?) (১৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)

4. Compare and contrast the powers of the President of India with those of the American President. (১৫৮-৬০ পৃষ্ঠা)

(ভারত ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার তুলনা কর)

5. Discuss the constitutional position of the President of India in relation to his Council of Ministers. (১৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

(মন্ত্রিসভার সহিত রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা আলোচনা কর)

6. Distinguish carefully between the position of the President and that of the Prime Minister of India. (১৭৭-৮১ পৃষ্ঠা)

(রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদার তুলনামূলক আলোচনা কর)

7. Discuss the Legislative Powers of the President of India.

(রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।) (১৪৮-৫২ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the position and powers of the Prime Minister of India.

(প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর) (১৭৭-৮১ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the position, powers and functions of the Vice-President of India. (১৭০-৭২ পৃষ্ঠ)

(উপরাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও ক্ষমতা, এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর)

10. Write a note on the veto powers of the President of India.

(রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা বর্ণনা কর) (১৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the functions of the Council of Ministers of the Government of India. What is its relation with the Parliament?

(মন্ত্রিসভার কার্যাবলী ও পার্লামেন্টের সহিত সম্পর্ক আলোচনা কর) (১৭২-৭৭ পৃষ্ঠা)

12. Discuss the composition and functions of the Attorney General for India. Should the Attorney General and the Law Minister be one and the same person? Give reasons for your argument,

(ভারতে এ্যাটর্নী জেনারেলের কার্যাবলী লইয়া আলোচনা কর। এ্যাটর্নী জেনারেল ও আইন মন্ত্রী কি এক ব্যক্তি হওয়া উচিত?) (১৮১-৮৩ পৃষ্ঠা)

13. Discuss the position and powers of the President in relation to the Governor of a State. (১৬৮-৬৯)

(রাজ্যপাল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।)

একাদশ অধ্যায়

সংবিধানের জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার ধারা
(Emergency provisions of the Constitution)

(রাষ্ট্রপতির হস্তে তিন প্রকারের জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—আপৎ-কালীন বা জরুরী ঘোষণা—রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা—আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা—এইরূপ ঘোষণার ফলাফল—সমালোচনা)

রাষ্ট্রপতির জরুরী-অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা (Emergency powers of the President)ঃ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থায় কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন সেইগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, (২) রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা এবং (৩) আর্থিক জরুরী অবস্থায় ঘোষণা।

জরুরী অবস্থার ঘোষণা

সংবিধানের ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি কখনও মনে করেন যে ভারত অথবা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ কিংবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে বিপন্ন হইয়াছে অথবা বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে, তাহা হইলে তিনি এই মর্মে রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা উক্ত গোলযোগ ঘটিবার পূর্বেও রাষ্ট্রপতি জারী করিতে পারেন। অর্থাৎ কোন যুদ্ধ অথবা যুদ্ধাবস্থা না ঘটিলেও রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার উপর এই ধরণের জরুরী ঘোষণা জারী করা নির্ভর করে। বস্তুতঃ, এইরূপ জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় আমাদের আপাত দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী কাঠামো এককেন্দ্রিকপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই ঘোষণা কার্যকরী থাকে দুই মাস

এইরূপ প্রত্যেকটি জরুরী ঘোষণাকে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। পার্লামেণ্টে উভয় কক্ষের সম্মতি না থাকিলে জরুরী ঘোষণা দুই মাসের বেশী কার্যকরী হয় না। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ এইরূপ জরুরী ঘোষণাকে সমর্থন করিলে ইহা দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিতে পারে। তবে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকিবার নির্দিষ্ট সর্বাধিক সময়ের কোন সীমা সংবিধানে উল্লেখ করা নাই। সম্প্রতি পার্লামেণ্টে একটি বেসরকারী বিলের মাধ্যমে এইরূপ জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণাকে বলবৎ রাখার সর্বাধিক সময়ের সীমা নির্দিষ্ট করার প্রয়াসকে নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। যদি পার্লামেণ্টের অধিবেশন

বন্ধ থাকাকালীন সময়ে এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করা হয় অথবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পর উল্লিখিত দুইমাসের ভিতর অধিবেশন বন্ধ হয় তাহা হইলে পার্লামেন্টের পুনরায় অধিবেশন সুরু হইবার ৩০ দিনের পর উক্ত ঘোষণাটি বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে উভয়কক্ষ কর্তৃক যদি ইহা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে ঘোষণাটি যথারীতি কার্যকরী থাকিবে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলাফল (Effects of Proclamation of Emergency): (ক) সংবিধানের ৩৫৩নং ধারা অনুযায়ী এইরূপ জরুরী অবস্থা থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন রাজ্যকে উক্ত রাজ্যে শাসনতন্ত্রগত ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে যথাবিহিত নির্দেশ দান করিতে পারে।[১] সাধারণ সময়ে এইরূপ নির্দেশ কেবলমাত্র সংবিধানের ২৫৬-৫৭ ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলির উপর নির্দিষ্ট থাকে। কোন রাজ্য এইরূপ নির্দেশকে অমান্য করিলে উহা রাজ্যের শাসনব্যবস্থার অচল অবস্থা সূচীত করে ও সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৬৫নং ধারাকে অনুসরণ করিয়া অপর এক আদেশবলে রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারী করিতে পারেন।

শাসন বিষয়ক

(খ) জরুরী অবস্থা বজায় থাকাকালীন সময়ে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা লোকসভার নির্দিষ্ট ৫ বৎসরের মেয়াদকে এক বার এক বৎসর বাড়াইতে পারেন। তবে ঘোষণাটি অকার্যকরী হওয়ার পরে ৬ মাসের বেশী লোকসভার মেয়াদকে বাড়ানো চলিবে না। (সংবিধানের ৮৩নং ধারা)।[২] সংবিধানের ২৫০ (১) ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় লইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

আইন বিষয়ক

(গ) এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা বরাবর প্রচলিত থাকে তাহারও রদবদল রাষ্ট্রপতির আদেশানুযায়ী হইতে পারে (সংবিধানের ৩৫৪নং ধারা)। এইরূপ আদেশকে পালামেণ্ট কর্তৃক সমর্থিত হইতে হয় এবং জরুরী ঘোষণাটি বাতিল হইয়া যাইবার পরবর্তী আর্থিকবৎসর (Financial year) পর্যন্ত ইহার মেয়াদ বাড়ানো যায় না।

জাতীয় রাজস্ব সম্পর্কিত

(ঘ) এইরূপ জরুরী অবস্থা বর্তমান থাকাকালে নাগরিকদের ১৯ নম্বর ধারায়

১ "......the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any state as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised." Art 353(a).

২ "...the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate." Art 83.

বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ দ্বারা আদালত মারফৎ বলবৎ রাখিবার অধিকারকে বাতিল করিতে পারেন। ইহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয় যে সংবিধানের ১৯নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি ব্যতিরেকে অন্য কোন অধিকারকে সাময়িকভাবে অকার্যকরী করা যায় না; তবে কতিপয় মৌলিক অধিকারকে জরুরী ঘোষণা কার্যকরী থাকাকালীন অথবা আরও স্বল্প সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা আদালত মারফৎ বলবৎ রাখার অধিকারকে বাতিল করিয়া রাখা যায়। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে যখন চীন ভারতকে অতর্কিত আক্রমণ করে তখন রাষ্ট্রপতি এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেন। উহা পার্লামেন্ট কর্তৃক সমর্থিত হইয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকে। এইজরুরী অবস্থার ঘোষণা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে তুলিয়া লওয়া হয়।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা (Failure of Constitutional machinery in a state) :

রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পান অথবা অন্য কোন ভাবে যদি তাঁহার এইরূপ প্রতীতি হয় যে, উক্ত রাজ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে তিনি সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী উক্ত মর্মে একটি ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি রাজ্যটির শাসন-সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা এবং মহাধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট) ছাড়া রাজ্যপাল অথবা অন্য যে কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সমুদয় কার্য স্বহস্তে তুলিয়া লইতে পারেন। এই ঘোষণার বলে রাষ্ট্রপতি এইরূপ আদেশ দান করিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য-বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা পালামেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইবে। রাজ্য-বিধানমণ্ডলীর কার্যাবলী এইরূপ ভাবে পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইলে সংবিধানের ৩৫৬নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে এবং ঐ ক্ষমতা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান করিতে পারে। লোকসভার অধিবেশন বন্ধ থাকিলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে রাজ্যের "সঞ্চিত তহবিল" (The Consolidated Fund of the State) হইতে অর্থব্যয়ের অনুমতি দান করিতে পারেন।

রাজ্যেরশাসন ব্যবস্থার অচলাবস্থা-সংক্রান্ত জরুরী ঘোষণা

এইরূপ ঘোষণার স্থায়িত্বকালও সাধারণতঃ দুইমাস। পার্লামেণ্টের

উভয়কক্ষ যদি প্রস্তাব পাশ করিয়া ঘোষণাটিকে অনুমোদন করে তাহা হইলে উহা আরও ৬ মাস বলবৎ থাকিতে পারে।

সংবিধানের ৩৬৫নং ধারার ৩ ও ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে বারংবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া রাজ্যের শাসনতন্ত্রের অচলাবস্থার ঘোষণাকে ৬ মাস করিয়া বাড়াইয়া উহাকে অনধিক ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত বলবৎ রাখা যাইতে পারে। কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা (deadlock) দেখা দিলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে তাহার অবসান করা হয়। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবাংলায় এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রপতির শাসন (President Rule) প্রবর্তন করা হয় ও ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাহার অবসান ঘটে নূতন নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কার্যভার গ্রহণ করার পর।

এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা কতকগুলি রাজ্যে প্রবর্তন এবং তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯৫১ সালে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি প্রথম এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেন। ১৯৫১ সালের ২০শে জুন রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী পাঞ্জাবের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ঘোষণাটি প্রথম পর্যায়ে ২ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে কিন্তু ইহার কার্যকাল পার্লামেণ্টের প্রস্তাব অনুযায়ী ২ বার বাড়ানো হয়। ঘোষণাটি ১৯৫২ সালের মে মাসে বাতিল হয়; অনুরূপ একটি ঘোষণার দ্বারা ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ রাষ্ট্রপতি পেপ্সুর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ১৯৫৪ সালে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ১৯৫৯ সালের ৩১শে জুলাই কেরালার শাসনভার রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে গ্রহণ করেন। নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিমণ্ডলীকে ক্ষমতায় আসীন থাকাকালীন অবস্থাতেই বাতিল করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরে নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় নূতন সরকার গঠিত হইলে রাষ্ট্রপতির শাসন বাতিল হয়। ১৯৬৫ সালেও কেরালায় সাধারন নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়। চতুর্থ নির্বাচনের পর কংগ্রেসদল যখন রাজস্থানে ক্ষমতালাভ করিয়া সরকার গঠন করে ও পরে যখন বিরোধী দলের চাহিদায় কংগ্রেস দল পদত্যাগ করে কিন্তু বিরোধী দলের সরকার গঠন করার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না, সেই সময় রাজ্য বিধানমণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল না করিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন সাময়িক কালের জন্য চালু করা হইয়াছিল। চতুর্থ নির্বাচনের পর পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেও রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা বলবৎ করা হয়।

জরুরী অবস্থার ঘোষণা ও শাসনব্যবস্থার অচলাবস্থা সংক্রান্ত

ঘোষণার পার্থক্যঃ রাষ্ট্রপতি ভারতের নিরাপত্তা যুদ্ধ অথবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বা হইতে পারে এইরূপ আশংকা করিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা করিতে হইলে, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যসরকারের শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছে না এই মর্মে তাঁহাকে সংবাদ পাইতে হইবে অথবা তাঁহার এইরূপ প্রতীতি হইতে হইবে। এইরূপ অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারী করিবার জন্য কোনরূপ যুদ্ধ অথবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন নাই।

জরুরী অবস্থায় রাজ্যসরকারের শাসনব্যবস্থা বা আইন বিভাগের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব শুধুমাত্র রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতার মধ্যে নিদিষ্ট থাকে, অথচ শাসনব্যবস্থার অচলাবস্থা সংক্রান্ত জরুরী অবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভাকে বাতিল করিয়া সেখানে ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করিতে পারে।

ইহা ছাড়া, স্থায়িত্বের দিক হইতেও উপরোক্ত জরুরী ঘোষণাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। জরুরী অবস্থায় মেয়াদ কতদিন পর্যন্ত বাড়ানো যায় সেই সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু বলা নাই, অর্থাৎ পার্লামেন্টের ইচ্ছানুযায়ী ইহা অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বলবৎ রাখা যায়। কিন্তু শাসনব্যবস্থার অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার মেয়াদ ঊর্ধ্বসংখ্যায় ৩ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণাঃ সংবিধানের ৩৬০ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি রাষ্ট্রপতি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে ভারত অথবা ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে তাহা হইলে সেই মর্মে তিনি একটি ঘোষণা করিতে পারিবেন। এইরূপ আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে আর্থিক সংকটের প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কতিপয় আথিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সংবিধানের এই বিশেষ ধারাটির সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "জাতীয় সংকটত্রাণ আইনের" বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উক্ত আইন আর্থিক সংকটে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনয়ন করিবার জন্য কতিপয় অর্থ-সম্পর্কীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে।[৩]

আর্থিক জরুরী
অবস্থার ঘোষণা

আর্থিক জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশ রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে পালন করিতে হয়। এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে কেন্দ্রের অথবা ভারতের যে কোন রাজ্যের

৩। "Tbis article more or less follows the pattern of what is called the National Recovery Act of the United States passed in 1933 which gave the President power to make similar provisions in order to remove the difficulties, both economical and financial that had overtaken the American people, as a result of the great depression." Ambedkar.

যে কোন কর্মচারীর বেতন এবং ভাতা হ্রাস করা যাইতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারকদের উপর পর্যন্ত সংবিধানের ৩৬০ (৩) ও (৪) নম্বর ধারা অনুযায়ী এইরূপ আদেশ কার্যকরী হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি এইরূপ জরুরী অবস্থায় একটি নির্দেশ দ্বারা রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত সমস্ত আর্থিক বিল তাঁহার বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ৩৫২ নং ধারার ন্যায় এইরূপ আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণার কার্যকাল ও প্রথমে ২ মাস, তবে পার্লামেণ্ট দ্বারা সমর্থিত হইলে ইহা অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকে।

আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণার ফলাফল

মেয়াদের দিক হইতে এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা প্রথম পর্যায়ের জরুরী অবস্থার ঘোষণারই অনুরূপ। অর্থাৎ, সাধারণভাবে এইরূপ ঘোষণার মেয়াদ দুই মাস কাল বলবৎ থাকিবে ; পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দ্বারা পূর্বেই গৃহীত হইলে ইহার মেয়াদও বৃদ্ধি পাইবে।

জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতার যৌক্তিকতা : জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হস্তে দেওয়া উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহের যৌক্তিকতা অনেকেই স্বীকার করেন। তাহাদের মতে এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই প্রয়োগ করিবেন। মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের মাধ্যমে জনগণের নিকট সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির এইরূপ জরুরী ঘোষণা মন্ত্রিসভার মারফৎ পার্লামেণ্ট তথা জনসাধারণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে সমর্থিত। সেইজন্য এই বিশেষ ক্ষমতাগুলির অপপ্রয়োগ খুব কম ক্ষেত্রেই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পক্ষে যুক্তি

তবে কার্যক্ষেত্রে এইরূপ অপপ্রয়োগের আশংকা এতই প্রবল যে জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ঘোষণাকে সকলে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাইতে পারেন না। সরকারের স্বৈরাচারী হওয়া ও জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা থাকে বলিয়াই অনেকে ইহার তীব্র সমালোচনা করেন। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ঘোষণা করেন তাহার বৈধতা বিচার করার অধিকার আদালতের নাই। ন্যায় ও নীতির দিক হইতে অযৌক্তিক বিবেচিত হইলেও রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইলে জরুরী অবস্থার ঘোষণা ও উক্ত ঘোষণার ফলে গৃহীত আইনগুলির যৌক্তিকতা বিবেচনা করিবার অধিকার আদালতকে দেওয়া হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত আইনের "যথাবিহিত পদ্ধতি" (due process of law) অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের কোন আইন ন্যায়সংগত কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার আছে। জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে আদালতের

জরুরী অবস্থার বিপক্ষে যুক্তি

জরুরী অবস্থার বৈধতা বিচারের অধিকার অদালতের নাই

ভূমিকাকে যদি প্রাধান্য দিতে হয় তাহা হইলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জরুরী অবস্থার ঘোষণার দ্বারা ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। ফলে জনসাধারণের স্বার্থ অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকাও নিতান্ত অমূলক নয়। এই ক্ষমতায় রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিণত করা সম্ভবপর।

২। জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার বাতিল

জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকাকালে সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বর্ণিত জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিকে লংঘন করিবার কিংবা উপেক্ষা করিবার অধিকার পার্লামেন্টের আছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রত্যেক-টিরই মেয়াদ অন্যূন ২ মাস কাল। উক্ত সময়ের মধ্যে এই ঘোষণাটি পার্লা-মেন্টে উপস্থাপিত করার উল্লেখ সংবিধানে আছে। অথচ নিম্নতম কোন সময়ের নির্দেশ সেখানে দেওয়া হয় নাই। ফলে এই ঘোষণা থাকাকালীন অবস্থায় জন সাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিকে দুই মাস কাল পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে বাতিল রাখা সম্ভবপর হয়। তাই এইরূপ ঘোষণাকে অগণতান্ত্রিক বলিয়া অনেকে ইহার তীব্র সমালোচনা করেন।

৩। যুদ্ধের সময়ের জরুরী অবস্থা এবং শান্তির সময়ের জরুরী অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই

অনেকে এইরূপ সমালোচনাও করেন যে, ভারতের সংবিধান যুদ্ধের সময়ের জরুরী অবস্থার এবং শান্তির সময়ের জরুরী অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে যুদ্ধের অথবা বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা হইলে এইরূপ ঘোষণার দ্বারা তিনি প্রভূত ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। গত ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের অব্যবহিত পরে রাষ্ট্রপতি সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়া ভারত রক্ষার অর্ডিনান্স জারি করেন। শত্রুর আক্রমণের মুখে রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে গৃহীত এই ক্ষমতার যৌক্তিকতা লইয়া কেহই প্রশ্ন তুলিবেন না। কিন্তু যুদ্ধের আশংকায় যুদ্ধাবস্থা না থাকিলেও জরুরী আইনকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অব্যাহত রাখিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিকে বাতিল করিয়া রাখাকে অনেকেই চরম অগণতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করেন। অনেকে এইরূপ আশংকাও করেন যে, জরুরী অবস্থার ঘোষণার দ্বারা অবাঞ্ছিতভাবে রাষ্ট্রপতির হাতে অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে যাহার ফলে শাসকবর্গ উক্ত সময়ে জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন করিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকার অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী রাখেন। উক্ত জরুরী অবস্থায় ভারত রক্ষা আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার যে ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করেন তাহার কোন কোন ধারার বৈধতা সম্পর্কে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে; তাঁহাদের মতে

জরুরী অবস্থায় সংবিধানের একমাত্র ১৯ নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার সমূহ নিয়ন্ত্রণ বা সাময়িকভাবে প্রত্যাহারের অধিকার পার্লামেণ্টের নাই। অথচ সংবিধানের ২২ নং ধারায় বর্ণিত অধিকারসমূহকে আপৎকালীন অবস্থায় ভারত রক্ষা আইনের মাধ্যমে ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। কতিপয় বিশিষ্ট আইনবিদের মতে ভারত রক্ষা আইনের বলে সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ৩ মাস পর্যন্ত আটক রাখিতে পারেন। তবে সংবিধানের ২২ নং ধারা অনুযায়ী কোন নাগরিককেই ৩ মাসের বেশী আটক রাখা চলিবে না; আটক ব্যক্তি আদালতের নিকট জামিনের আবেদন অথবা "হেবিয়াস কর্পাসের" জন্য হাইকোর্টের শরণাপন্ন হইতে পারেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবতঃ উক্ত অধিকার সমূহ ভারতীয় জনসাধারণকে দেওয়া হয় নাই। সেইজন্য এইরূপ আইনকে সংবিধান-বিরোধী বলিয়া অনেকে ইহার সমালোচনা করেন।

রাজ্যে শাসন ব্যবস্থার অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার যে ব্যাপক ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে তাহারও যথেষ্ট নিন্দা কোন কোন সমালোচক করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাগুরু দলের সহিত রাজ্যের সরকারী দলের মতানৈক্য ঘটিলেই উক্ত রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণার দ্বারা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের সুমীমাংসা কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সম্ভবপর হইয়াছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধ দল কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত কেরল রাজ্যের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৫৯ সালে উক্ত জরুরী ঘোষণা দ্বারা গ্রহণ করাকে অনেকেই তীব্র সমালোচনা করেন। কেরলে কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভা আইনসভার আস্থাভাজন থাকিয়াও পতনের সম্মুখীন হয় ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইহার শাসনভার গৃহীত হয়। সেইজন্য ইহা দায়িত্বশীল পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রহসন বলিয়া কোন কোন রাজনৈতিক মহলে নিন্দিত হয়। আবার এই ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে অত্যধিক স্বেচ্ছাচারী করা হইয়াছে বলিয়া অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন। কেননা ১৯৬০ সালে আসামে যখন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকারে দেখা দেয় যাহার ফলে একটি সম্প্রদায়ের লোকের তীব্র নিপীড়ন সহ্য করিতে হয় এবং রাজ্যের সরকারী শাসনতন্ত্রের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা যখন পরিস্ফুট হয় তখন সংবিধানের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতার পরিচালনের প্রয়োজন নিপীড়িত সম্প্রদায়টির পক্ষে বিশেষ ভাবে এবং রাজ্যটির স্বার্থে সাধারণ ভাবে খুবই অনুভূত হইয়াছিল। অথচ রাজ্যের সুশাসনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারী দল এবং আসামের সরকারী দল একই ছিল। কিন্তু কেরলের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির শাসন

৪। অঞ্চলগুলির স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হইতে পারে

প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেইজন্য এই জরুরী ক্ষমতা শাসকবর্গের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অপপ্রয়োগ হয় বলিয়া অনেকেই সমালোচনা করেন। আবার ১৯৬৫ সালে কেরলের নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর দেখা যায় যে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। এক্ষেত্রেও কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য যে দলের মোটামুটি সংখ্যাধিক্য ছিল এবং যে দলের অন্য দল এবং নির্দলীয় সদস্যদের সহায়তা লাভের সুযোগ ছিল সেই দলের নেতাকে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিতে না দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থাকে জনগণ কখনই পরিপূর্ণ সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। গত ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিম বাংলার অকংগ্রেসী যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সংখ্যালঘিষ্ঠের সরকার মনে করিয়া রাজ্যপালের মারফৎ তাহাদের পদচ্যুত করা হয় ও সেস্থলে কংগ্রেস দলভুক্ত আইনসভার সদস্যগণের সহায়তায় শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীত্বে বরণ করা হয়। পশ্চিম বাংলার বিধান সভার অধ্যক্ষ বিধান সভায় যুক্তফ্রণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কি নাই তাহা পরীক্ষা না হওয়া অবধি শ্রীঅজয় মুখার্জির মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যপাল অন্য কোন মন্ত্রিসভাকে বহাল করিতে পারেন কিনা এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলিয়া বিধান সভাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রাখেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বহু কর্তৃপক্ষ রাজ্যপালের এই আচরণকে বৈধ বলিয়া দাবি করিলেও আইন সংগতভাবে পশ্চিম বাংলার সাংবিধানিক সংকটকে দূর করার কোন সূত্রই তাঁহারা দিতে পারেন নাই; যাহার ফলে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এইরূপ সংকট হইতে পশ্চিম বাংলাকে মুক্ত করা হয়। এখানে হরিয়ানার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা চলে। গত ডিসেম্বর (১৯৬৮ সালে) মাসে হরিয়ানার সরকারী দলের মধ্যে রাজ্য বিধান সভার ১৬ জন কংগ্রেস সদস্য সরকারের নিকট হইতে নিজেদের সমর্থন তুলিয়া লন, এবং বিরোধীদলের সহায়তায় নূতন সরকার গঠন করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অথচ সেখানে যেহেতু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার একই দলভুক্ত সেইজন্য রাজ্যের বিধান সভার সরকারী দল আপাতদৃষ্টিতেসংখ্যালঘু সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও সেই দলকে সরকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতে থাকে। কিন্তু আইন সভাকে সত্বর আহ্বান করিয়া আইন সভায় দলীয় প্রাধান্যকে অব্যাহত রাখার কোনরূপ পরীক্ষাই করা হয় নাই। অথচ পশ্চিম বাংলায় আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারের দাবিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয় যেহেতু যুক্তফ্রণ্ট সরকারের দেওয়া সময় ও রাজ্যপালের আইনসভাকে আহ্বান করার সময়ের মধ্যে তিন সপ্তাহের মত ব্যবধান ছিল। এই সমস্ত কারণেই রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া রাজ্যের উপর এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা প্রয়োগ ও বলবৎ রাখার প্রথাকে সাধারণ সময়েও রাজ্যের উপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব করার অযথা সুযোগ থাকে বলিয়া অনেকে ইহার তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেন।

আবার ইহাও অনেকে মনে করেন যে এইরূপ জরুরী অবস্থায় রাজ্য গুলির আর্থিক স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী হইতে পারে। যেহেতু যে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থার উপর রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে এইরূপ জরুরী ঘোষণা সেই অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের উপর কুঠারাঘাত করিবে, তাই এইরূপ ঘোষণার মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করিয়া কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার পরোক্ষ হাতিয়ার সংবিধানের মাধ্যমে ইউনিয়নের হাতে রাখা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সমালোচনা করা হয়।

৫। রাজ্যের আর্থিক স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ

Exercise

1. Indicate the circumstances under which there can be 'Presidential Rule' in the States of India. Is it subject to any restrictions ?
[C. U. B. A. 1968]

(কোন্ অবস্থায় ভারতের রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু করা যায়? ইহা কি কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের অধীন ?) (১৯০-৯৩ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the powers exerciseable by the President in emergencies.
(C. U. B. A. 1966)

(রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার আলোচনা কর) (১৮৮-৯০ পৃষ্ঠা ; ১৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)

3. Critically examine the emergency powers of the President of India.

(ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরীকালীন অবস্থায় ক্ষমতাসমূহ আলোচনা কর।)
(১৮৮-৯০ পৃষ্ঠা ; ১৯২-১৯৭ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় আইন-প্রণয়ন বিভাগ
(The Union Legislature)

[পালামেন্টের গঠন—সদস্যদের স্থায়িত্ব—পালামেন্টের কাজ—দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক—কেন্দ্রে দ্বি-পরিষদ আইনসভার যৌক্তিকতা—স্পীকার—আইন প্রণয়ন পদ্ধতি—পালামেন্ট ও ইহার সদস্যদের অধিকার—বাজেট—কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল—পাবলিক একাউন্টস কমিটি—এষ্টিমেট কমিটি।]

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা পালামেন্টের গঠন (Composition of the Union Legislature or the Indian Parliament): ভারতের কেন্দ্রীয় আইন-প্রণয়ন বিভাগ হইতেছে রাষ্ট্রপতি-সহ পার্লামেণ্ট (President-in-Parliament)। রাষ্ট্রপতি আইনসভার একটি অংশ কিন্তু তিনি ইহার সদস্য নহেন, অথবা আইনসভার অধিবেশনেও তিনি বসেন না। শাসনতন্ত্রের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ আছে। নিম্ন কক্ষটির নাম লোকসভা (House of the People)। ইহার সদস্য-সংখ্যা ৫২৫ জনের বেশী হয় না, এবং ভোটাধিকার আছে এই রকম নাগরিকদের ভোটে (ভোটারের অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স হওয়া চাই) ইহার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। অনধিক ৫০০ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন বিভিন্ন মূলরাজ্য হইতে এবং অনধিক ২৫ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল হইতে। নির্বাচিত সদস্যগণের ভিতর তপশীলীবর্ণ এবং তপশীলী জনজাতির (Scheduled Caste and Scheduled Tribe) জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আছে। (এইরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা আগামী ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে—সংবিধানের অষ্টম সংশোধন দ্বারা স্থির হইয়াছে।) আবার রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্য হইতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই তাহা হইলেও তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে দুইজন সদস্যকে মনোনীত করিতে পারেন (সংবিধানের ৩৩১নং ধারা)।

ইউনিয়ন আইনপ্রণয়ন বিভাগের দুইটি কক্ষ

লোকসভা ও রাজ্যসভার গঠন

পার্লামেণ্টের উচ্চ কক্ষের নাম রাজ্যসভা (Council of States)। ইহার সদস্যসংখ্যা ২৫০ জনের বেশী হয় না। তন্মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। শাসনতন্ত্রের ৮০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অবশিষ্ট সদস্যগণ (অর্থাৎ, ২৩৮ জন) পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন মূল রাজ্য এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিত্ব করিবেন। রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

পদ্ধতিতে রাজ্যসভার সদস্যগণকে নির্বাচন করেন। ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে লোকসংখ্যার অনুপাতে সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমেরিকা বা সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় সমস্ত রাজ্যগুলির সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা ভারতে নাই। যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হইতে হয়। লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত স্পীকার। রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। স্পীকারকে লোকসভার সদস্য হিসাবে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হয়। কিন্তু, উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য নহেন। তিনি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী পদাধিকার বলে (Ex-officio) রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন।

পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য হইতে হইলে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। মন্ত্রী অথবা পার্লামেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত কোন পদাধিকার ব্যতীত পার্লামেণ্টের সদস্যপদ প্রার্থীর ভারত সরকার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাভজনক কাজ গ্রহণ করা চলিবে না। কোন আদালত কর্তৃক কেহ বিকৃত-মস্তিষ্ক ঘোষিত হইলে অথবা কেউ দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন না। যদি কেহ দুইটি কেন্দ্র হইতে পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন তবে তাঁহাকে একটি কেন্দ্রের সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতে হয়।

পার্লামেণ্টের সদস্য পদের যোগ্যতা

পার্লামেণ্টের অধিবেশন এবং স্থায়িত্বকাল (Session of the Parliament and the duration of the Parliament): রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ৮৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, ইহার অধিবেশন স্থগিত (adjourn) রাখিতে পারেন, ইহার অধিবেশন শেষ করিয়া দিতে পারেন এবং ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ৮৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এবং কেন পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকা হইল সেই কথা সদস্যদের জানান। শাসনতন্ত্রের ৮৫ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন এমনভাবে আহ্বান করিতে হইবে যেন গত অধিবেশনের শেষ বৈঠক এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছয় মাসের বেশী না হয়। পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষকেই অর্থাৎ শুধু লোকসভাকেই রাষ্ট্রপতি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন; উচ্চকক্ষ অথবা রাজ্য-সভাকে নহে। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সভা। প্রত্যেক দুই বৎসর পর পর

ইহার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। শাসনতন্ত্রের ৮৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুইটি কারণে লোকসভার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, প্রথমতঃ, পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে অথবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা অনুযায়ী সময়ের মেয়াদ-বৃদ্ধি অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, এবং দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ৮৫ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে।

পার্লামেন্টের সদস্যদের স্থায়িত্ব ও তাহাদের বেতন ঃ সাধারণতঃ, যতদিন লোকসভার অস্তিত্ব থাকে, ততদিন লোকসভার সদস্যগণও নিজপদে আসীন থাকেন। কিন্তু পূর্বে পার্লামেন্টের প্রার্থীদের যোগ্যতার যে সর্তগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির কোন একটির অভাব দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্য ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু সভার অনুমতি না লইয়া দুই মাসের জন্য যদি কোন সদস্য পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগদান করা হইতে বিরত থাকেন, তবে তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্যপদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ আবর্তনের মাধ্যমে (by rotation) নির্দিষ্ট সময়ান্তর অবসর গ্রহণ করেন। লোকসভার সাধারণ স্থায়িত্বকাল হইতেছে পাঁচ বৎসর ; তবে জরুরী অবস্থায় ইহার মেয়াদ বাড়ানো যাইতে পারে ; একবারে একবৎসরের বেশী এই মেয়াদ বাড়ানো যায় না এবং শাসনতন্ত্রের ৮৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা শেষ হইয়া গেলে ছয় মাসের বেশী ইহার মেয়াদ অতিরিক্ত বাড়ানো যায় না।

পার্লামেন্টের সদস্যগণ ৪০০ টাকা মাসিক বেতন লইয়া থাকেন এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালে দৈনিক কিছু টাকা ভাতা পাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিনা ভাড়ায় রেল ভ্রমণের সুযোগ এবং পার্লামেন্ট সম্পর্কিত কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করিতে হইলে ভ্রমণ-খরচ ইত্যাদির সুযোগ পাইয়া থাকেন।

পার্লামেন্টের কাজ (Functions of the Parliament) ঃ ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, যেহেতু আইনসভায় নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তাই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রথম কাজ হইতেছে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ভারতে লোকসভাতে প্রথম অধিবেশনেই একজন নেতা নির্বাচন করিতে হয়। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই সেই পদে নির্বাচিত হন এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

পার্লামেণ্টের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা। মন্ত্রিসভার কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য সাহায্য করা এবং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার কাজের তীব্র সমালোচনা করিয়া সরকারের কাজ বা নীতির সংস্কার করাও পার্লামেণ্টের কাজ। মন্ত্রিসভাকে সব সময়েই লোকসভার আস্থাভাজন থাকিতে হয়। মন্ত্রিসভাই মুখ্যতঃ সরকারী নীতি ইত্যাদি নির্ধারণ করেন, এবং সেইজন্যই মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে মন্ত্রিসভার এইরূপ কর্তৃত্বের ফলে শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের যাবতীয় ক্ষমতা মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে অধুনা পার্লামেণ্টের কাজ অনেকাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সদস্যগণের সমালোচনা ও নিন্দার মাধ্যমে পার্লামেণ্ট মন্ত্রিসভাকে কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

তৃতীয়ত, পার্লামেণ্ট হইতেছে সংবাদ পরিবেশনের বাহন (an organ of information)। সমগ্র দেশে কি হইতেছে না হইতেছে ইত্যাদি সব ব্যাপারে পার্লামেণ্ট খোঁজ খবর রাখিতে পারে এবং পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মন্ত্রিদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন।

চতুর্থত, আইন-প্রণয়ন করা হইতেছে পার্লামেণ্টের মুখ্য কাজ। মূলতঃ পার্লামেণ্ট হইতেছে আইন-প্রণয়ন বিভাগ। সর্বশেষে, সরকারের আর্থিক ব্যাপারেও পার্লামেণ্টের অনেক কর্তৃত্ব থাকে।

আইন প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেণ্টের কাজ (Functions of the Parliament regarding Law-making): পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। ইহার অধিবেশন বজায় রাখা এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। অবশ্য এই কাজে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হন।

পার্লামেণ্টের মুখ্য কাজ হইতেছে আইন-প্রণয়ন করা। সরকারী এবং বে-সরকারী বিলগুলি লইয়া বিতর্কের অনুষ্ঠান করিয়া ও সেইগুলি অনুমোদন করিয়া রাজ্যসভার নিকট প্রেরণ করাই লোকসভার মুখ্য কাজ। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত বিল শুধু লোকসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে, শুধু লোকসভাই ইহার সংশোধন করিতে পারে। অর্থসংক্রান্ত বিল লইয়া রাজ্যসভা বিতর্ক করিতে পারে বটে কিন্তু ইহার সংশোধন করিতে পারে না। সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় তালিকার (Union List) এবং যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেই পার্লামেণ্ট আইন-প্রণয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, অথবা আন্তর্জাতিক সন্ধির বিভিন্ন সর্ত পালন করিবার জন্য প্রয়োজন হয়, অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য কর্তৃক পার্লামেণ্ট অনুরুদ্ধ হয়, তবে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আইন-প্রণয়ন

করিতে পারে। যদি রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কখনও এইরকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন-প্রণয়ন করা উচিত, তবে পার্লামেণ্ট সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় লইয়া রাজ্য বিধানমণ্ডলী এবং পার্লামেণ্টের প্রণীত আইনের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায়, তবে পার্লামেণ্টের আইনটিই কার্যকরী হইবে এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইনটি যতদূর পর্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত তালিকায় নাই এইরূপ যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে (সংবিধানের ২৪৮নং ধারা)। অর্থাৎ "অবশিষ্ট বিষয়গুলি" (Residuary Powers) সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনয়ন করিয়া তাহার উপর পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব রাখা হইয়াছে। তবে বলাই বাহুল্য যে বর্তমানে ক্যাবিনেটের প্রাধান্য পার্লামেণ্টের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতাকে একটি তত্ত্বগত ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। আইনের খসড়া হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাকে পাস করানো অবধি সকল কাজেই ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তই প্রকৃত-পক্ষে অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে, এবং দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে যে কোন আইনকে অনুমোদন করাইতে তাহাদের পক্ষে অসুবিধা হয় না।

কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব (Parliament's control over Union finances)ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ। কেননা, সরকারের সুপারিশ ব্যতীত কোন নূতন কর ধার্যের দাবী অথবা ব্যয় মঞ্জুরের দাবী করা যায় না। লোকসভার ক্ষমতা হইল ব্যয় হ্রাস বা নামঞ্জুর করার অথবা কর হ্রাস বা বিলোপ করার,—ইহা ছাড়া সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার অন্য কোন ক্ষমতা নাই। অবশ্য সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সমালোচনা করিবার এবং কৈফিয়ৎ তলব করিবার অধিকার লোকসভার আছে। তবে বর্তমানে কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যাপারে লোকসভার যাহা কিছু ক্ষমতা, তাহা মন্ত্রিগণই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। সরকারের আয়-ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্যসভার সিদ্ধান্ত লোকসভার সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সরকারের কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে। যেমন রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি। এইগুলি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India) হইতে খরচ করা হয় (ইহাদের ধার্য ব্যয় বা charged expenditure বলা হয়।)। এইগুলি পার্লামেণ্টের অনু-মোদন-সাপেক্ষ ব্যয় (votable expenditure) নহে; কিন্তু, পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষগুলি লইয়া সমালোচনা করিতে পারে।

পার্লামেন্টের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক ও শাসন বিভাগের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (Relation between the Parliament and the Council of Ministers and the powers of the Parliament to Control the Executive) : তত্ত্বের দিক হইতে চিন্তা করিলে পার্লামেন্ট সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কেননা, মন্ত্রিগণকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণ মন্ত্রিগণকে সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণও সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। তাহা ছাড়া, মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা অথবা মন্ত্রিদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকার লোকসভার আছে এবং তাহা কার্যকরী হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং মন্ত্রিসভা যে একেবারে নিজের খেয়ালখুশীমত কোন কাজ করিয়া যাইবেন সেইরূপ সুবিধা নাই। আবার পার্লামেন্টের যে কোন সদস্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন। এইরূপ প্রস্তাব জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই আনয়ন করা হয়, এবং ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়া অনুমোদিত হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট উহা কার্যকর করার জন্য পাঠানো হয়। সদস্যগণ অপেক্ষাকৃত কম জরুরী বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে পারেন (Calling attention)। সরকারী প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি মারফং ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত আছে। মন্ত্রিগণ প্রতিশ্রুতি মত কার্য করিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে রিপোর্ট দান করাই এই কমিটির কাজ। সুতরাং সরকারের উপর পার্লামেন্টের কিছু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। তবে বাস্তবে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই যে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা সহজেই অনুমেয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক গঠিত সরকার যে কোন বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করিয়া স্বীয় দলীয় জোরে তাহা অনুমোদন করাইয়া লইতে পারে। তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত কোন প্রস্তাবকে অকার্যকরী করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

পার্লামেন্টের দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses of the Parliament) : যেহেতু লোকসভার সদস্যগণ জনগণদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত এবং রাজ্যসভার সভ্যগণ অঙ্গ রাজ্যগুলির বিধানসভার দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত—তাই উভয়ের মধ্যে লোকসভা বা জনপ্রতিনিধি সভাকে একটু অধিক ক্ষমতাশালী করার দিকে সংবিধানের যে স্বাভাবিক ঝোঁক থাকিবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। তাহা হইলেও দুইটি কক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইবে যে ভারতের

পার্লামেণ্টের উচ্চ সভা ইংলণ্ডের উচ্চকক্ষ বা হাউস অফ লর্ডসের ন্যায় একেবারে ক্ষমতাহীন বা গৌণকক্ষ (Secondary) নহে।

অর্থসম্বন্ধীয় বিলের সম্পর্কে দেখা যায় যে এইরূপ বিল কেবলমাত্র লোকসভায়ই উত্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। তবে রাজ্যসভা অর্থসংক্রান্ত বিল লইয়া আলোচনা করিতে পারে, এবং সংশোধনের সুপারিশ করিতে পারে। ইহাদের অর্থসংক্রান্ত বিলকে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করার অধিকার নাই। এইরূপ কোন বিল লোকসভায় অনুমোদিত হইলে তাহাকে রাজ্যসভার নিকট সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা হয়। রাজ্যসভাকে ১৪ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ বিলটি লোকসভায় ফেরৎ পাঠাইতে হয়। উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করার পরিপূর্ণ দায়িত্ব লোকসভার। যদি সুপারিশ লোকসভা না গ্রহণ করে তাহা হইলে সুপারিশগুলি ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর পাস হইয়া যায়। আবার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা এইরূপ বিল লোকসভায় ফেরৎ না পাঠাইলে উহা ১৪ দিন পর উভয় সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। ইংলণ্ডের লর্ডসভা অর্থবিলকে কেবল মাত্র ১ মাস বিলম্ব করাইতে পারে। এই সভার অর্থবিলকে সংশোধন, ইহার সংশোধনের সুপারিশ অথবা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা নাই। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এইরূপ অর্থসংক্রান্ত বিল নিম্নকক্ষ বা জন-প্রতিনিধি-সভায় (The House of Representatives) উত্থাপিত হইতে পারে। তবে উহাকে সংশোধন করার পূর্ণ ক্ষমতা উচ্চতর কক্ষ বা সিনেটের রহিয়াছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিলটির শিরোনামা বা Title টুকু ছাড়া অন্যসমস্ত অংশের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করার ক্ষমতা আমেরিকার উচ্চকক্ষ বা সিনেটের আছে।

অর্থবিলের ব্যাপারে দুই কক্ষের ক্ষমতা ও সম্পর্ক

অর্থবিল ভিন্ন অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে দুই কক্ষের ক্ষমতা সমান। দুই কক্ষেই এই বিল উত্থাপিত হইতে পারে। দুই কক্ষেই বিল পাস করাইতে হইলে বিলটির তিনটি পাঠ হয় (Three Readings) এবং দুইটি কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া ইহা আইনে পরিণত হয়। অর্থাৎ সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে লোকসভা ভোগ করে না।

অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে

যদি একটি কক্ষ কোন সাধারণ বিল অনুমোদন করে অথচ অপর কক্ষ ইহা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা বিলটির সংশোধন সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় অথবা একটি কক্ষ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর অপর কক্ষ ৬ মাসের মধ্যেও বিলটি সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, এবং সেই

সাধারণ বিল লইয়া দুই কক্ষের মতভেদ হইলে

অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সভ্যদের ভোটাধিক্যে বিলটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। এবিষয়ে লক্ষণীয় যে লোকসভার সদস্যসংখ্যার আধিক্য হেতু যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভায় গৃহীত প্রস্তাবটিই সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কার্যতঃ লোকসভার পরোক্ষ প্রাধান্য এই বিলের ক্ষেত্রেও রহিয়াছে।

শাসন বিভাগের উপর কর্তৃত্বের দিক হইতে লোকসভার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিগণ লোকসভার নিকট দায়ী থাকেন—উভয় পরিষদের নিকট নহে।

সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে দুই কক্ষের কাজ ও সম্পর্ক

রাজ্যসভার সদস্য হইতে মন্ত্রিমণ্ডলীর সভ্য গ্রহণ করা হইলেও রাজ্যসভার মন্ত্রিপরিষদকে সমালোচনা ও নিন্দা করা ছাড়া অন্য ক্ষমতা নাই। মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করা যায় যদি তাঁহারা লোকসভার আস্থা হারান। রাজ্যসভার অনাস্থা প্রস্তাব মন্ত্রিমণ্ডলীকে স্পর্শ করে না। সুতরাং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে উভয় পরিষদের মধ্যে লোকসভাই অধিক ক্ষমতাশালী।

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় উভয় কক্ষই (রাজ্যসভা ও লোকসভা) সমান ক্ষমতা ভোগ করে। কেননা সাধারণ বিলের আকারে

সংবিধান সংশোধন ক্ষেত্রে উভয় কক্ষ

সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব যে কোন কক্ষে আনয়ন করা যায়, এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই কেবলমাত্র সাধারণ সংশোধনগুলি কার্যকরী হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় অঞ্চলগুলির স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে অবশ্য দুই কক্ষের অনুমোদন দ্বারাই শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যায় না। ইহার জন্য রাজগুলির অর্ধেক আইনসভার সম্মতিও প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, সাধারণ ক্ষেত্রে সংবিধানকে সংশোধন করার জন্য উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী।

ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং পদচ্যুতির ব্যাপারেও উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা সম্পন্ন। দুই কক্ষের সদস্যই রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে নির্বাচনী-

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও পদচ্যুতির ব্যাপারে উভয় কক্ষ

সংস্থার সভ্য। আবার তাঁহার পদচ্যুতির পদ্ধতি (৬১ নং ধারা) যে কোন কক্ষেই অনুসৃত হইতে পারে। তবে অপর কক্ষদ্বারা তাহা অনুমোদন করাইতে হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রেও দুইটি কক্ষকেই সমান ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে।

একটি ব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা লোকসভার ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক করা হইয়াছে। সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুযায়ী যদি রাজ্যসভা উপস্থিত ও

রাজ্যসভার অনুরোধে কোন অঞ্চলের উপর পার্লামেণ্টের আইন পাশ

ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এইরূপ প্রস্তাব পাস করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বিষয়ে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তাহা হইলে পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যসভার হস্তে ন্যস্ত এই ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-বণ্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করিবার একটি বিশেষ পন্থা। রাজ্যসভাকে লোকসভা হইতে এই ব্যাপারে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

রাজ্যসভার হস্তে এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ায় অনেকে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতের রাজ্যসভা আলাদাভাবে আঞ্চলিক রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে না বা তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে না। কারণ ভারতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশ রাজ্য হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া রাজ্যসভা গঠিত হয় নাই—ইহা রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে গঠিত হয়। সুতরাং ইহাদের পক্ষে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় না। তাই এইরূপ পরিষদের হাতে ক্ষমতা অধিক দেওয়া হইয়াছে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় কক্ষ হিসাবে কাজ করিতে হইলে তাহার গঠন প্রণালী যেরূপ হওয়া প্রয়োজন ভারতের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই।

উচ্চ কক্ষে ক্ষমতা অধিক দেওয়া সম্পর্কে

কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bi-Cameralism at the Centre) : ভারতে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন বিভাগ যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট তাহা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং জার্মান সাম্রাজ্যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ জাতীয় স্বার্থে এবং রাষ্ট্র-সমবায় স্বার্থের সমন্বয় ঘটাইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল। বর্তমানকালে অবশ্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিদ্‌গণ বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। ভারতীয় আইন পরিষদকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক মতবাদ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।

ভারতীয় আইন সভায় উচ্চকক্ষের প্রবর্তনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা জোরালো যে যুক্তি গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা হইল, উচ্চতর কক্ষ নিম্নকক্ষ কর্তৃক দ্রুত প্রণীত আইনগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে। ইহার ফলে উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে পারে। নিম্নকক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ষে বিল প্রেরণ করা এবং অনুমোদিত হওয়া সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে কোন বিল আলোচনা করা এবং খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে তত্ত্বগত ভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে লেকি (Lecky) যে যুক্তিটি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ভারতের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজসভার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে

তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে—"The necessity of a second chamber to exercise a controlling, modifying, retarding influence, has acquired almost the position of an axiom." বস্তুতঃ, নিম্নকক্ষ বা লোকসভার সদস্যদের ভাবাবেগ ও অবিবেচনাপ্রসূত আইন জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত করিতে পারে। দ্বিতীয় পরিষদ বা রাজ্যসভা এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ দ্বারা বিলটির সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

নিম্নকক্ষের অবিবেচনা-প্রসূত আইনপ্রতিরোধ করে রাজ্যসভা

এইরূপ দ্বিতীয় পরিষদের সম্পর্কে বলা হয় যে ইহা ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক। আইন পরিষদের নিম্নকক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া উচ্চকক্ষ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পায়। ব্রাইসের মতে কোন একটি পরিষদ থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির দিকে, সেইজন্য সমক্ষমতাসম্পন্ন অপর কোন পরিষদ থাকা উচিত যাহা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে।[১] এই যুক্তির দ্বারাও পরিচালিত হইয়া অনেকে ভারতের ক্ষেত্রে আইনসভার উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

নিম্নকক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করে উচ্চকক্ষ

ভারতের ক্ষেত্রে অপর যে যুক্তিটি প্রদর্শন করা হয় তাহা হইল এই যে, বিভিন্ন যোগ্য ও প্রতিভাবান ব্যক্তিকে আইন প্রণয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভবপর হয়—উচ্চতর কক্ষের মাধ্যমে। কেননা, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের সহায়তা লাভ করিলে আইন প্রণয়ন বিভাগ উপকৃত হয়। পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে এইরূপ ব্যক্তিগণের রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানদ্বারা দেশ লাভবান হইতে পারে। বস্তুতঃ ভারতীয় পার্লামেণ্ট এইরূপ অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সেবা রাজ্যসভার মাধ্যমে পাইয়াছে ও পাইতেছে। উচ্চতর কক্ষের ব্যবস্থা না থাকিলে হয়তো এইসব ব্যক্তির সহায়তা লাভ নাও করা যাইতে পারিত।

যোগ্য ব্যক্তির উচ্চ—কক্ষের মাধ্যমে আইন সভায় প্রবেশ

তবে উচ্চকক্ষের বিপক্ষে বর্তমানে কম যুক্তি প্রদর্শন করা হয় না। ভারতের রাজ্যসভার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহা নিম্নপরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে খুব বেশী সংশোধন অথবা আংশিক বাতিলও করিতে পারে

১। "The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly is to become hateful, tyrannical and corrupt and needs to be checked by the existence of another House of equal authority"—Bryce.

না। নিম্নপরিষদ বা লোকসভা যে আইন প্রণয়ন করিবার সময় খুব দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহাও ঠিক নহে। বরং লোকসভা বিভিন্ন কমিটির সাহায্যে যে কোন আইন প্রণয়নের জন্য যে কোন প্রস্তাবেরই খুঁটিনাটি বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া থাকে এবং সেইগুলির উপর লোকসভায় যথেষ্ট বিতর্ক হয়। অর্থাৎ লোকসভা যথাসম্ভব বিতর্ক এবং বিচার বিবেচনার পরই আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং অবিবেচনা প্রসূত বলিয়া লোকসভার প্রণীত আইনকে আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক।

নিম্নকক্ষই প্রচুর বিচার বিবেচনার পর আইন প্রণয়ন করে

রাজ্যসভার সদস্যগণ কিছু রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা গঠিত এবং কিছু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। বিধানসভার সদস্যগণ কার্যতঃ দলীয় ভিত্তিতে নিজেদের দলের সদস্যদের পক্ষে ভোটদান করেন। আবার রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাহাদের নির্বাচিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেন। দুইটি পদ্ধতিই পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষে মনোনয়ন ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে। এইরূপ ব্যবস্থার মোটামুটি ফল হিসাবে বলা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যে সমস্ত সদস্য সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে নির্বাচিত হইতে পারেন না অথবা নির্বাচনের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না, সেই সমস্ত ব্যক্তির উচ্চকক্ষের আসন অলংকৃত করার একটা স্বাভাবিক সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাকে অনেকেই গণতান্ত্রিকতার মর্যাদা দান করিতে রাজী নহেন।

উচ্চকক্ষে মনোনয়ন পদ্ধতি থাকায় ইহার প্রকৃতি অগণতান্ত্রিক

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উচ্চতর কক্ষের প্রয়োজনীয়তা রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয়। এইরূপ উচ্চকক্ষ প্রত্যেক রাজ্য হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাজ্যে দ্বিতীয় পরিষদ বা উচ্চকক্ষের সম-প্রতিনিধিত্বের এই নীতি গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় পরিষদ প্রত্যেক রাজ্য হইতে ১০ জন সদস্য লইয়া গঠিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পরিষদ প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের দুইজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত। আবার সুইজারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় কক্ষ দুইজন করিয়া ক্যান্টন এবং একজন করিয়া অর্ধক্যান্টনের সদস্য লইয়া গঠিত। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন বৃহৎ রাজ্যের পক্ষে জনসংখ্যার বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ থাকে না। ভারতীয় পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সম—প্রতিনিধিত্বের নীতিকে গ্রহণ করা হয় নাই। যেহেতু জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যসভার

অংশ রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণে ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ অসমর্থ

আসনগুলি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, সেইজন্য রাজ্যসভার যে রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা বেশি তাহাদের আসন সংখ্যা ক্ষুদ্র রাজ্যের তুলনায় অধিক হয়। সুতরাং রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাপারে ভারতের কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন বিভাগের উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভার ভূমিকা খুবই নগণ্য বলা যায়।

উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভার অবস্থানের পক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা ভারতের ক্ষেত্রে খুবই কম। কিন্তু সেইজন্যই ইহার পরিপূর্ণ বিলুপ্তি বাঞ্ছনীয় কিনা সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই ব্যবস্থার পক্ষে প্রদর্শিত সুবিধাগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। সুতরাং এইরূপ সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য উচ্চকক্ষের অবস্থিতি প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূর করা এবং অসুবিধাগুলির সংস্কার করা উচিত মনে হয়। সংস্কার করিতে হইলে সর্বপ্রথম উচ্চকক্ষে সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহার ফলে সমস্ত রাজ্য হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি উচ্চকক্ষে নির্বাচিত হইবেন এবং সমস্ত রাজ্যের স্বার্থ তাহাতে কিছুটা সংরক্ষিত হইবে আশা করা যায়। সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষের যে ভূমিকা থাকা প্রয়োজন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের উচ্চকক্ষে সেই ভূমিকা সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। সর্বাগ্রে রাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্বের নীতিকে রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তি করা বিধেয়—ইহার জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা তাই সর্বপ্রথম অনুভব করা হয়।

মন্তব্য

লোকসভার স্পীকার (Speaker of the House of the people): ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৯৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই সদস্যগণ একজন স্পীকার (Speaker) এবং একজন ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) নির্বাচন করিবেন। 'Speaker' শব্দটি আসিয়াছে "Spokesman" শব্দটি হইতে এবং ইংলণ্ডের হাউস অফ্ কমন্সের অনুকরণে। আইনসভার নিম্নকক্ষের অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করেন তাহাকে স্পীকার (Speaker) বলা হয়। অনেক আগে ইংলণ্ডের কমন্সসভার সদস্যগণের রাজার নিকট কোন আবেদন বা প্রার্থনা জানাইবার জন্য একজন মুখপাত্র বা Spokesman থাকিতেন, যিনি সদস্যগণের পক্ষ হইতে রাজার নিকট সেই আবেদনপত্র বা প্রার্থনাপত্র পেশ করিতেন। তাহা হইতেই স্পীকার (Speaker) নামটি হইয়াছে। বর্তমানে ইংলণ্ডে হাউস অফ্ কমন্সে স্পীকারকে নির্বাচন করা হয়। ভারতবর্ষেও স্পীকারকে নির্বাচিত করা হয়।

স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের কাজের মেয়াদ থাকিবে লোকসভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত। অর্থাৎ পার্লামেন্টের সভ্যপদে যতদিন তিনি অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার লোকসভার সদস্য দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে স্পীকার পদে নিযুক্ত থাকা সম্ভব। সভ্যপদ খারিজ হইলেই স্পীকারের পদ হইতে তাঁহাকে অবসর লইতে হয়। কিন্তু যদি লোকসভার অধিকাংশ সদস্য স্পীকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্পীকারকে পদত্যাগ করিতে হয় (৯৪ নম্বর ধারা)। তবে এই জাতীয় অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করিবার পূর্বে অন্ততঃ ১৪ দিনের একটি নোটিশ দিতে হইবে। যখন এই অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া লোকসভার আলোচনা চলিবে, তখন স্পীকার আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না অথবা লোকসভায় বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট হইলে তিনি নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিতে পারিবেন না। আবার যে কোন সময়ে স্পীকার ডেপুটী স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করিতে পারেন। ডেপুটী স্পীকারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অপসারণ করা চলে। অথবা অনুরূপভাবে পার্লামেন্টের সদস্যপদ হইতে তাঁহার পদচ্যুতিতে কিংবা তিনি নিজে লিখিতভাবে স্পীকারকে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে তাঁহার পদশূন্য হয় (সংবিধানের ৯৪ নং ধারা)। ভারতের স্পীকারের পদটিকে নিরপেক্ষ ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ করিবার জন্য ভারতীয় সংবিধানে কতিপয় ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্পীকারের (ও ডেপুটি স্পীকারের) বেতন ইত্যাদিকে ভারত সরকারের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (Charged on the Consolidated Fund of India) হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতিবৎসর তাঁহাদের বেতন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়টিকে পার্লামেন্টের আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য সেখানে পেশ করিবার প্রয়োজন হয় না। আবার ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে তাঁহাকে অপসারণ করিতে হইলে ১৪ দিনের 'নোটিশ' দিতে হইবে এবং লোকসভার সদস্যদের অধিকাংশ দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে হইবে। ইহা ছাড়াও নিরপেক্ষভাবে যাহাতে স্পীকার লোকসভার কার্য সম্পাদন করিয়া ইহার সুনাম ও মর্যাদাকে উন্নীত করিতে পারেন তাহার জন্য ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে লোকসভার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক আহূত হইয়া কোন বিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ করা ছাড়া অন্য সময়ে তিনি লোকসভার আলোচনা বা তর্কবিতর্কে অংশগ্রহণ করিবেন না বা কেবলমাত্র কোন বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলেই তাঁহার 'নির্ণায়ক ভোট' (Casting Vote) (কেবলমাত্র

স্পীকারের কার্যকাল

স্পীকারের অপসারণ পদ্ধতি

স্পীকারের পদটিকে নিরপেক্ষ করার জন্য ব্যবস্থা

তাঁহার অপসারণ লইয়া আলোচিত বিষয় ছাড়া) প্রদান করিয়া জটিল পরিস্থিতির সমাধান করা ছাড়া অন্য সময়ে ভোট প্রদান করিবেন না। আবার সংবিধানের ১২২নং ধারা অনুযায়ী লোকসভার স্পীকারের আচরণ সম্বন্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

লোকসভার স্পীকার ব্রিটিশ হাউস অফ্ কমন্সের স্পীকারের অনুরূপ ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করেন। স্পীকার লোকসভার প্রত্যেকটি অধিবেশনের প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। তবে যখন তাঁহার অপসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব লইয়া লোকসভায় আলোচনা চলে তখন তিনি সেই সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিলেও তাহাতে সভাপতিত্ব করিতে পারেন না। সেখানে ডেপুটি স্পীকার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। লোকসভার নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি সভার কার্যক্রম স্থির করেন। রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা সম্পর্কে সদস্যদের আলোচনা করিবার সময় নির্দিষ্ট করেন। যে কোন প্রস্তাব অথবা প্রশ্নের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসার অধিকার স্পীকারের আছে। বাজেটের উপর আলোচনার মুলতবী প্রস্তাব প্রভৃতি আলোচনা করিবার জন্যও তিনি সদস্যদের নির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া দেন। অর্থকরী সংক্রান্ত আলোচনা যথাসম্ভব দ্রুত সম্পাদন করার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই তিনি অবলম্বন করিতে পারেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন বিলের সংশোধনী প্রস্তাব অথবা বিলটি গ্রহণ না করার প্রস্তাব আনয়ন করা যায় না। তিনি কোন বিলকে গেজেটে প্রকাশ করিবার আদেশ দান করিতে পারেন। লোকসভার শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সর্বদা তাঁহাকে সতর্কভাবে কার্যাবলী পরিচালনা করিতে হয়। যে কোন সদস্যকেই বক্তৃতা করিতে হইলে অথবা অন্য কোনভাবে লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে স্পীকারের অনুমতি লইতে হয়। বক্তৃতাকালে যদি কোন সদস্য কোন বিষয় লইয়া অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা চালান অথবা কোন বিষয়ের ক্রমাগতই পুনরুক্তি করিতে থাকেন তাহা হইলে স্পীকার তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন। কোন সদস্য যদি তাহার আচরণ দ্বারা বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন তো স্পীকার তাহাকে উক্ত দিবসের মত বহিষ্কারের আদেশ পর্যন্ত দান করিতে পারেন। আবার যদি কোন সদস্য ইচ্ছাপূর্বক সভার কার্য বিঘ্নিত করেন এবং আইন-কানুনের সম্পূর্ণ অপব্যবহার দ্বারা সভার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে বিশৃংখলা আনয়ন করেন অথবা স্পীকারকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেন ও তাঁহার সতর্ক বাণীকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইচ্ছামত সভার কাজে অংশগ্রহণ করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে স্পীকার অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যের "নামোল্লেখ" ("Name") করিতে পারেন। ইহাছাড়া, স্পীকার সাময়িকভাবে কোন অধিবেশনের কার্য বন্ধ রাখিতে পারেন, অথবা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করিতে পারেন। যদি

স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

লোকসভায় কখনও নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হ'ন অর্থাৎ 'কোরাম' না হয় তো তিনি লোকসভার অধিবেশন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারেন। অর্থাৎ লোকসভার কাজ সুরু করার পূর্বে তাহাকে দেখিতে হয় যে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য লোকসভায় উপস্থিত আছেন কিনা। কোন বিল রাজ্যসভায় অথবা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবার পূর্বে স্পীকার লোকসভা কর্তৃক ঐ বিল গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণপত্র দান করেন। কোন বিল অর্থ বিল (Money bill) কিনা সে সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভা হইতে রাজ্যসভায় পাঠাইবার সময় উহা যে অর্থবিল সে সম্বন্ধে প্রমাণপত্র (Certificate) তিনিই প্রদান করেন (সংবিধানের ১১০ নং ধারার ৪ নং অনুচ্ছেদ)। রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করিবার সময়ও স্পীকারই এই মর্মে প্রমাণপত্র দান করিয়া সহি করেন যে উহা অর্থবিল (Money bill)।

স্পীকার লোকসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষা করেন। যদি কখনও কোন সদস্যের অধিকার কোন কর্তৃপক্ষ ভঙ্গ করেন তো স্পীকার তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ পন্থা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিতে পারেন। আবার তিনি রাষ্ট্রপতির সহিত লোকসভার আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কার্য করেন। অর্থাৎ লোকসভার উদ্দেশ্যে প্রেরিত রাষ্ট্রপতির বাণী ও বার্তা স্পীকারের নিকট যায়। আবার লোকসভার যাবতীয় খবরাখবর যাহা রাষ্ট্রপতির জ্ঞাতার্থে পাঠানো হয় তাহাও স্পীকারের মাধ্যমে যায়। যদি কখনও লোকসভার কোন অধিবেশনে স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে লোকসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন হয়। লোকসভার সদস্যবৃন্দ হইতে তিনি একটি সভাপতিদের তালিকা প্রণয়ন করেন। সেই তালিকাভুক্ত সদস্যদের মধ্য হইতে ক্রমানুসারে কোন সদস্য সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। আবার লোকসভার অধিবেশনে আগন্তুক বর্গের প্রবেশাধিকার দান করার ক্ষমতাও স্পীকারের। তিনি কোন আগন্তুককে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার আদেশ দান করিতে পারেন। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন কমিটির সভাপতির নিয়োগ তিনিই করেন। তাঁহার একটি গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ হইতেছে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্তসভায় সভাপতিত্ব করা (সংবিধানের ১১৮নং ধারার ৪নং অনুচ্ছেদ)। যদি কোনও বিষয়ে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহা হইলে তিনি সেই বিষয়ে ভোট গ্রহণ করেন এবং ভোটের শেষে তাহার ফলাফল তিনিই ঘোষণা করেন। যদি তাঁহার মতে কোন সদস্যের কোন উক্তি অশোভন, নিন্দাপূর্ণ বা পার্লামেণ্টীয় সভ্যতাবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট শব্দ বা বক্তৃতার উক্ত অংশ তিনি বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে স্পীকারকে একজন

অত্যন্ত কুশলী, বিবেচক ও সুদক্ষ ব্যক্তি হইতে হয়। তাঁহার কুশলতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে ভারতীয় পার্লামেণ্টীয় শাসনব্যবস্থার ক্রমোৎকর্ষতা। ভারতের লোকসভার স্পীকার ও রাজ্যসভার সভাপতির মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য আছে বিপুল। স্পীকার লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন, আর রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি। যুক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার, কিন্তু রাজ্যসভার সভাপতি তাহা করেন না। কোন বিল অর্থবিল কিনা সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্পীকারের। স্পীকার লোকসভার নির্বাচিত ব্যক্তি; কিন্তু রাজ্যসভার সভাপতি (উপরাষ্ট্রপতি) পদাধিকার বলে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যসভার সভাপতি এবং লোকসভার স্পীকার উভয়েরই মাসিক বেতন ২২৫০ টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত তাঁহারা ৫০০ টাকা ভাতা পাইয়া থাকেন। কিন্তু, যখন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন তখন তিনি রাষ্ট্রপতির প্রাপ্য বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন।

স্পীকার ও রাজ্যসভার সভাপতি

ভারতের লোকসভার স্পীকার এবং ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকারের মর্যাদা এবং ক্ষমতা প্রায় একরূপ। কিন্তু আমেরিকার জনপ্রতিনিধি সভার (House of Representative) স্পীকারের কাজ কিছুটা অন্য ধরণের। আমেরিকার জনপ্রতিনিধিসভার স্পীকারের কার্যকাল ২ বৎসর। তিনি কখনই দল-নিরপেক্ষ থাকেন না। বরং, জনপ্রতিনিধি সভায় তিনি আইন প্রণয়ন কাজের পরিচালনা করেন। আমেরিকায় সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ কিছু পরিমাণে হওয়ায় শাসনবিভাগের সচিবগণ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিসভার নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে স্পীকারের উপর। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তবে জনপ্রতিনিধিসভার সভাপতি হিসাবে স্পীকার সভার বিভিন্ন নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের লোকসভার স্পীকার এবং ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকার সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ থাকেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করা ছাড়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁহারা কখনই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না; তাঁহারা সর্বদাই দল নিরপেক্ষ থাকেন।

ভারতের লোকসভা ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্স এবং আমেরিকার জন-প্রতিনিধি সভার স্পীকারদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

ভারতের স্পীকারপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে তাঁহাদের কার্য ও ক্ষমতাকে পরিচালিত করেন। তাঁহারাও ইংলণ্ডের ন্যায় স্পীকারের পদটির নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক আইনসভাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিকতার মর্যাদায় উন্নীত করিয়া

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সাফল্য অর্জন করার ব্যাপারে বেশ কিছুটা দায়িত্ব স্পীকারের উপর আসিয়া পড়ে। ভারতীয় স্পীকার এই দায়িত্ব পালন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া অনেক মহল হইতে দাবি করা হয়। ইংলণ্ডের স্পীকার দলীয় সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং দলীয় সভাসমিতিতেও কখনও অংশ গ্রহণ করেন না। ভারতের স্পীকারের পদে নির্বাচিত ব্যক্তি ও তাঁহার দলীয় সভাসমিতি হইতে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন। তিনিও দলের সদস্যবর্গের সহিত সাধারণতঃ মেলামেশা করেন না। ইংলণ্ডের স্পীকারের এই নিরপেক্ষতা ভারতের ক্ষেত্রে অনুকরণের চেষ্টা যথেষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবুও ১৯৫৪ সালে ভারতের লোকসভায় স্পীকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। স্পীকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি অবশ্য অগ্রাহ্য হইয়া যায়। এইরূপ অনাস্থা প্রস্তাব হয়ত ইহাই সূচিত করে যে স্পীকারকে আরও সজাগ ও সতর্কভাবে তাঁহার ক্ষমতা পরিচালিত করিতে হইবে, সমস্ত সদস্যের মনোভাব এমনভাবে তাঁহাকে পাঠ করিতে হইবে ও এমনভাবে তাঁহার কর্তব্যকে পরিচালিত করিতে হইবে যেন তাঁহার নিরপেক্ষতার উপর কাহারও সন্দেহ করার কিছু না থাকে। সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী পক্ষকে বক্তব্য বলিবার অধিকার পরিপূর্ণ ভাবে প্রদান করা উচিত। তবে ইহাও দেখিতে হইবে যেন অনাবশ্যক ভাবে সংসদের কর্মে ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্যই তাঁহারা এই অধিকারকে ভোগ করিতে না পারেন। সরকারী মহলের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতহীন ভাবে বিষয়টির সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া তাহাদের অধিকারকে ভোগ করিতে দেওয়া উচিত। সরকারী দল যেন অধিকার বলে লোকসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেন সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে। বস্তুতঃ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিরপেক্ষভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া যদি স্পীকার তাঁহার কার্যকে পরিচালিত করেন ও ক্ষমতার প্রয়োগ করেন তাহা হইলে ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন সভা যে গণতান্ত্রিকতার পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্পীকারের নিরপেক্ষতা ও তাঁহার মর্যাদা

ভারতের-পার্লামেণ্টে বিরোধীদলের ভূমিকা (Role of the Opposition in the Indian Parliament) : ভারতের পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে পার্লামেণ্টীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তত্ত্বগত আলোচনা করা হইতেছে।

পার্লামেণ্টের অন্যতম কাজ হইতেছে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিয়া ইহার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা। এই সমালোচনার সংগঠন এবং পরিচালনা করিয়া থাকে সরকার-বিরোধী দল

বিরোধী দল সরকারের সমালোচনা করে

যে দলের আইন সভায় সংখ্যাধিক্য নাই এবং সেজন্য যে দল সরকার গঠন করিতে পারে না, সেই দলকেই বিরোধী দল বলা হয়। ইহার প্রধান কাজ হইল সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমতকে নিজের পক্ষে আনা যাহাতে পরবর্তী নির্বাচনের সময় ইহা জনগণের আস্থা অর্জন করিয়া পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে পারে। সরকারী দলের যেমন শাসন পরিচালনা করিবার অধিকার থাকে, সরকার-বিরোধী দলের সেইপ্রকার সরকারী দলের বিরোধিতা এবং সমালোচনা করিয়া সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অধিকার আছে। যদি পরবর্তী নির্বাচনে আগেকার বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তখন সেই দল সরকার গঠন করিবার সুযোগ লাভ করে ও আগেকার সরকারী দল তখন বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং বিরোধী দলের সর্বদাই বিকল্প সরকার (alternative government) গঠন করিবার যোগ্যতা রাখিতে হয়। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরোধী কোন শক্তিশালী দল এখনও এখানে ঐক্যবদ্ধভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বিকল্প সরকার গঠন করিবার মত শক্তি বিরোধী দল এখনও অর্জন করে নাই।

বিরোধিতা সর্বদাই গঠনমূলক হওয়া উচিত

যদিও বিরোধী দলের প্রধান কাজ সরকারের বিরোধিতা করা, সেই বিরোধিতা দায়িত্বশীল এবং গঠনমূলক হওয়া উচিত। কেননা, আজ যে দলের বিরোধী দলের ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে সেই দল যদি সরকার গঠনের সুযোগ পায়, তখন ইহাকেও অনুরূপভাবে বিরোধী দলের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা

মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ডের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, ক্যাবিনেট, সদস্যগণই প্রকৃতপক্ষে কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এমন কি, আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও কমন্সসভাকে ক্যাবিনেটের মুখাপেক্ষী এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারী শাসনের পিছনে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রিসভার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের অধিবেশনে শুধু সরকারের পক্ষে দলীয় নেতাই নহেন তিনিই বর্তমানে কমন্সসভার ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রিসভার এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কাজের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত রাখা এবং মন্ত্রিদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা খুবই দরকার। সেই গুরু দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে বিরোধী দল। ভারতের দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেসের। অন্যান্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে দুইটি কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দল জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বাত্মক কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

অবশ্য জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র দল, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, প্রভৃতি ক্ষেত্রবিশেষে জাতীয় জীবনের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কংগ্রেস ছাড়া অন্য দলগুলির নীতির ব্যাপারে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ সুদৃঢ় বিরোধী দল ভারতে দেখা যায় না। তাহারা সম্মিলিতভাবে সরকারের সমালোচনা করে, কিন্তু অনেক সময় সেগুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে গঠনমূলক হয় না। আবার দলীয় ক্ষমতার জোরে গঠনমূলক হইলেও বিরোধীদলের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিতেও কংগ্রেসের পক্ষে অসুবিধা হয় না।

বিরোধী দল শুধু সরকারের সমালোচনাই করে না, ইহা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণও করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের গুরুত্ব ইহার প্রচলিত নাম হইতেই অনুমান করা যায়। ইংলণ্ডের সরকারকে যেমন রাজা বা রাণীর সরকার (His or Her Majesty's Government) বলা হয়, বিরোধী দলকেও সেই প্রকার রাজা বা রাণীর বিরোধী দল (His or Her Majesty's Opposition) বলা হয়। বিরোধী দল প্রয়োজন হইলে সরকার পক্ষের সহিত বিভিন্ন ধরণের বোঝাপড়া ও চুক্তি করিয়া থাকে যাহাতে সরকার জাতীয় স্বার্থে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে জরুরীকালীন অবস্থায় (emergency) সৃষ্টি হইলে বিরোধী দল সম্মিলিত সরকার গঠনে সরকারী দলের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া থাকে ; সরকার পক্ষের যে সমালোচনা বিরোধী দল করিয়া থাকে, তাহা জাতীয় স্বার্থেই করিয়া থাকে। সুতরাং এই সমালোচনা সর্বদাই গঠনমূলক হয়। জাতীয় সংকটের সময় বিরোধী দলও সরকারী দলের সহিত একযোগে কাজ করে। ইহাই ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর সরকারের বিরোধী দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিরোধী দলের নেতার সহিত বৈঠকে মিলিত হন। তাহা ছাড়া, সরকার পক্ষের সমুদয় কাজই যে উৎকৃষ্ট অথবা গ্রহণযোগ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ফলে সরকারও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ উপকৃত হয়। কমন্সসভার যে পাব্লিক একাউন্টস কমিটি (Public Accounts Committee) গঠিত হয়, তাহাতে সভাপতি নির্বাচিত হন সাধারণতঃ বিরোধী দলের নেতা অথবা একজন বিরোধী দলের প্রভাবশালী সদস্য। এইরূপ জরুরী অবস্থায় ভারতে বিরোধী দলকে সরকারের সহিত একযোগে কাজ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে যেরূপ জরুরী অবস্থায় সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে একটি অপূর্ব একতাবোধ দেখা যায় ভারতের ক্ষেত্রে তেমন হয় না ; হয়ত ইহার কারণ এই যে স্বাভাবিক অবস্থায় যে গুরুত্ব বিরোধী দল আশা করে তাহাদের

জরুরী অবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা

কার্যকলাপের উপর সেই গুরুত্ব সরকারী দল আরোপ করে না। নিজেদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকারী দলের পক্ষে বিরোধী দলের কার্যাবলী সম্বন্ধে স্বাভাবিক অবস্থায় অবজ্ঞাই হয়ত উভয়ের মধ্যে সংহতির অভাব ঘটাইয়াছে।

বিরোধী দলের যে ভূমিকা পার্লামেণ্টারী শানব্যবস্থায় থাকা উচিত সেই ভূমিকায় ভারতে বিরোধী দল কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয়। নিজেদের মধ্যে নীতিগত ঐক্যের অভাবে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই সুযোগে সরকারী দলের পক্ষে অনেক সময় বিরোধী দলকে উপেক্ষা করার প্রয়াস দেখা যায়। বস্তুতঃপক্ষে বিভিন্ন দলের বিখণ্ডন, নূতন নূতন দলের উদ্ভব, কোন দলের বিলোপ, ঘনঘন দলত্যাগ প্রভৃতি দলীয় ব্যবস্থাকে এমনই জটিল করিয়াছে যে ভারতে কতদিনে যে একটি বলিষ্ঠ বিরোধীদল গঠিত হইয়া পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অপূর্ণ অঙ্গের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটাইবে তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। যাহা হউক, ভারতে দলীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত হইলেও আনন্দের কথা সরকার দলকে বিরোধিতা করিবার ব্যাপারে আলাদাভাবে প্রতিটি দলই যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এইরূপ কৃতিত্বের গুরুত্ব হয়ত অনেক বৃদ্ধি পাইত যদি দলের সংখ্যা এত বেশী না হইত কিংবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের মধ্যেও এতটা বৈষম্য না থাকিত। সাম্প্রতিককালে ভারতে দলত্যাগের ঘটনাও দল এবং বিরোধীদল—উভয়েরই পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় ভূমিকা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে।)

১৯৬৭ সালের চতুর্থ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কেন্দ্রে খুব অল্প সংখ্যক সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কংগ্রেস সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিয়াছে। এই অল্পসংখ্যক সদস্যের কিছুও দলত্যাগ করিলে কেন্দ্রে কংগ্রেসী শাসনের অবসান হওয়া অসম্ভব নয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে কমিউনিষ্টদের দুই সরিকের মধ্যে ও অন্যান্য বিরোধীদলের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যায় তাহাতে একথা স্পষ্ট হয় যে উহারা দলীয় বিভেদ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিলে ভারতের নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিপূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইত। আবার যে জনসংঘ, স্বতন্ত্র দল দুইটি বেশী সংখ্যায় পার্লামেণ্টে আসন লাভ করিয়াছে তাহারাও দক্ষিণপন্থী হওয়ায় পার্লামেণ্টে একটি বিশিষ্ট বিরোধী দল গঠিত হয় নাই। চতুর্থ নির্বাচনের পর বিভিন্ন দলগুলি কর্তৃক গঠিত সরকার ভারতের অর্ধেক রাজ্যে আজ ক্ষমতায় আসীন। সরকারের সমালোচনা করিয়া, জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া ও তাহাদের আস্থা অর্জন করিয়া-ই আজ বিরোধী দল ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের যে ভূমিকা থাকা উচিত সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং বিকল্প সরকার গঠনেও সমর্থ হইয়াছে। সমস্ত

দলগুলির সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টার উপরই তাহাদের এই ভূমিকার সাফল্য নির্ভর করে।

পার্লামেণ্ট এবং ইহার সদস্যদের কতিপয় সুবিধা (Privileges of the Parliament and its members) :

ইংলণ্ডের কমন্সসভার ন্যায় ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণও সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যাহাতে সম্পূর্ণ দায়িত্বের সহিত নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদের এই সুবিধাগুলি থাকা দরকার। পার্লামেণ্টের সদস্যদের এই সুবিধাগুলি আছে বলিয়াই তাঁহারা নির্ভয়ে কাজ করিয়া যাইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের যদি সম্পূর্ণ বাক্-স্বাধীনতা না থাকিত তবে তাঁহারা ঠিকভাবে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন না। পার্লামেণ্টের সদস্যদের এই সুবিধাগুলি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা একটি উচ্চ শ্রেণীতে তাহাদের ফেলা হইয়াছে ; তাঁহারা যাহাতে নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া এবং ঠিকভাবে করিয়া যাইতে পারেন সেইজন্য তাঁহাদের এই সুবিধাগুলি থাকা দরকার। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এবং পার্লামেণ্টের 'ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার' অথবা নিয়মের অধীন থাকিয়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ সম্পূর্ণভাবে বাক্-স্বাধীনতা ভোগ করেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশনে কোন সদস্য সরকার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলুন না কেন, তাহা লইয়া আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। পার্লামেণ্টের বিতর্কের বিবরণীও আদালতে প্রেরণ করা যায় না। শুধু বাক্স্বাধীনতাই নহে, সমষ্টিগতভাবে পার্লামেণ্টের সদস্যগণের লিখিতভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশেরও (Right of Publication) স্বাধীনতা আছে। লোকসভা কিংবা রাজ্যসভার কর্তৃত্বাধীন কোন কাগজ বা রিপোর্ট প্রকাশের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্টের ভিতরে যদি কোন সদস্যের আচরণ অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। আবার বাহিরের কোন লোক যদি পার্লামেণ্টের কোন সদস্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও পার্লামেণ্টের আছে। ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেণ্টের সদস্যদের তিনটি অধিকার আছে ; যথা—(১) গ্রেপ্তার না হইবার অধিকার, (২) জুরী অথবা সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থিত না থাকিবার অধিকার এবং (৩) বাক্-স্বাধীনতা।

সদস্যগণের বাক্-স্বাধীনতা

রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশের স্বাধীনতা

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়া অন্যান্য যে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পার্লামেণ্ট ও ইহার সদস্যগণ ভোগ করিবেন তাহা পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা

স্থির করিবে। সংবিধানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে যতদিন পর্যন্ত পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া পার্লামেণ্ট ও ইহার সদস্যদের অধিকার ইত্যাদি স্থির না করিতেছে ততদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের কমন্সসভার সদস্যবৃন্দ এবং কমিটি যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে ভারতের পার্লামেণ্ট ও ইহার সদস্যগণও তাহাই ভোগ করিবে। পার্লামেণ্টের সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত ধারাগুলি সংবিধানের ১০৫নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। রাজ্য আইনসভার অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের ধারাও পার্লামেণ্টের অধিকার সম্পর্কিত ধারারই অনুরূপ।[১]

ইংলণ্ডের কমন্সসভার অধিকার পার্লামেণ্ট ভোগ করে

ভারতের পার্লামেণ্টের ও ইহার সদস্যবৃন্দের অধিকার সমূহের বিচার ইংলণ্ডের কমন্সসভার ও তাহার সদস্যগণের অধিকার ও সুযোগ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে করা হইতেছে। যেহেতু ভারতীয় পার্লামেণ্ট এখনও পর্যন্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা পার্লামেণ্ট ও ইহার সদস্যদের অধিকার নির্দিষ্ট করে নাই, সুতরাং ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সের অধিকারগুলিই আইনতঃ ভারতের পার্লামেণ্ট ও ইহার সদস্যগণ ভোগ করিবে।

ইংলণ্ডের কমন্সসভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুযোগ ও অধিকার হইল— পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলাকালীন কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা চলে না। এইরূপ অব্যাহতি দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে দেওয়া হয় এবং ইহা কার্যকরী থাকে অধিবেশন সুরু হওয়ার ৪০ দিন পূর্ব হইতে ও ইহার সমাপ্তির ৪০ দিন

১। ১০৫ নম্বর ধারা।

(1) "Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament

(2) No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any Committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings.

(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the Committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and until so defined, shall be those of House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and Committees, at the Commencement of this Constitution.

(4) The provisions of Clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of Parliament or any Committee thereof as they apply in relation to members of Parliament"

পর পর্যন্ত। তবে নিবর্তনমূলক আটক আইনের (Preventive Detention Act) ক্ষেত্রে অথবা ফৌজদারী অভিযোগের ক্ষেত্রে (Criminal Case) এইরূপ অধিকার কোন সদস্য ভোগ করে না। ভারতের পার্লামেন্টের সদস্যগণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। কোন সদস্যকেই অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ৪০ দিন পূর্ব হইতে উহার সমাপ্তির ৪০ দিন পর পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা চলে না, অবশ্য ইংলণ্ডের মতই নিবর্তনমূলক আটক আইন অথবা ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত সদস্য এইরূপ অধিকার ভোগ করেন না। আবার অধিবেশন চলার সময় কোন সদস্যকেও জুরির কার্যে অথবা পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করা চলিবে না।

সদস্যগণের গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার

সদস্য ছাড়া অন্যান্যদের কক্ষ পরিত্যাগ করার আদেশ দানের অধিকার

সাধারণতঃ যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের ন্যায় জরুরী অবস্থায় আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষই কিছুটা গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে চায়। এইরূপ আলাপ আলোচনা বা বিতর্কের সময় উভয় কক্ষই পার্লামেন্টের সদস্য নহেন এমন ব্যক্তিদের কক্ষ পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ দান করিতে পারে। আবার সদস্য ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি শান্তি ও শৃংখলার খাতিরেও নিষিদ্ধ করা হয়। পার্লামেন্ট এই অধিকারগুলি ভোগ করে।

আদালতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অধিকার

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে সদস্যগণ বাক্-স্বাধীনতা ভোগ করেন। যে কথা কক্ষের সদস্যগণকে বলা যায় বা যে কাজ করা হয় তাহার জন্য কোন আদালত সদস্যদের নিকট হইতে কোনরূপ কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারে না। এইরূপ কাজের জন্য কোন সদস্যকে আদালত শাস্তি প্রদানও করিতে পারে না। উড়িষ্যার আইন সভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার কোন সদস্যের কোন প্রশ্নকে বাতিল করিলে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করা হইলে উড়িষ্যা হাইকোর্ট রায় দান করে যে আইনসভার উক্ত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা আদালতের নাই।[২]

অবমাননার জন্য দণ্ডবিধান

ইংলণ্ডের কমন্সসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইতেছে—আইনসভার অবমাননার[৩] জন্য দণ্ডবিধানের অধিকার। এইরূপ অধিকার ভারতীয় পার্লামেন্টও উপভোগ করে। ইংলণ্ডের কমন্সসভা সাধারণতঃ অবমাননার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে (ক) তিরস্কার ও সতর্ক করিয়া দেয়, (খ) বলপূর্বক কক্ষের সম্মুখে

২। Misra v. Nanda Kishore.

৩। 'অবমাননা' শব্দটির অর্থ হইল কোন কার্য করা বা না করা যাহার দ্বারা পার্লামেন্টের

উপস্থিত করাইয়া কঠোর ভাবে তিরস্কার করে অথবা (গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড প্রদান করিতে পারে।

ইংলণ্ডে যে গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি দেখা যায় তাহা হইল—কোন ব্যক্তিকে এইরূপে অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করা হইলে বিচারবিভাগ সে সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তবে যদি কখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটিতে অবমাননার কারণটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয় এবং আটকটি বে-আইনী বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আদালত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। অর্থাৎ অবমাননার কারণ পরোয়ানায় নির্দিষ্ট না থাকিলে কোন ব্যক্তি এইরূপ অবমাননার জন্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে না, অথবা আদালতেরও সাহায্য পাইবে না। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষই অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে। ইহারা পার্লামেন্টের অধিকার-সংক্রান্ত কমিটির মাধ্যমে বিচার করায় যে পার্লামেন্টের কোন অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে কিনা অথবা তাহাদের অবমাননা করা হইয়াছে কিনা।

১৯৬১ সালে বোম্বাই-এর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা "Blitz"এর সম্পাদক শ্রীকরঞ্জিয়াকে আইনসভার অবমাননার জন্য অভিযুক্ত করিয়া লোকসভা কঠোরভাবে ভর্ৎসনা (Reprimand) করে। উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকাতে "Kripalani Impeachment" নামক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেটি আইন-সভার অধিকারকে ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সমস্ত কক্ষের নিকট তিনি দোষী সাব্যস্ত হন।

আবার কমন্সসভা উহার কক্ষে আলোচিত যে কোন বিষয়ের প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ নিষিদ্ধ কার্য-বিবরণীর প্রকাশ (বিনা অনুমতিতে) আইনসভার অবমাননাকর (Breach of Privilege) বলিয়া অভিহিত হয়। ভারতের পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভাগুলি (ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে) কমন্সসভার এই অধিকারগুলি ভোগ করিয়া থাকে। বিহারের 'সার্চলাইট' পত্রিকার সম্পাদক বিহার বিধানসভার কোন সদস্যের কোন আপত্তিজনক উক্তির কোন বিশেষ অংশকে (যাহা স্পীকার কর্তৃক কার্য-

উভয় কক্ষ অথবা ইহার সদস্যগণ কিংবা কর্মচারীবৃন্দের কার্যে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে. অথবা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ঐরূপ বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। মে তাঁহার "Parliamentary Practice"-এ এই প্রসঙ্গে যে কথা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"Any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty or which has the tendency, directly or indirectly to produce such results that may be treated as a contempt even though there is no precedent of this offence".

বিবরণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল) প্রকাশ করার জন্য আইনসভার অধিকার ভঙ্গজনিত অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৪] অবশ্য এইক্ষেত্রে তিনি মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আদালতে এইরূপ অভিযোগের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রীমকোর্ট মামলাটিতে রায় প্রদান করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতের পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন দ্বারা নিজেদের অধিকার স্থির না করা পর্যন্ত তাহারা কমন্স-সভার অধিকার ভোগ করিবেন। ভারতীয় আইন-সভাগুলির উপর এই যে অধিকার প্রদান করা হইতেছে ইহা সংবিধানের একটি বিশেষ ব্যবস্থা, কিন্তু মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ব্যবস্থা। তাই যতদিন পর্যন্ত না পার্লামেণ্ট নিজেদের অধিকার আইনের দ্বারা নির্ধারিত করিতেছে ততদিন পর্যন্ত মৌলিক অধিকার পার্লামেণ্ট বা রাজ্য আইন সভাগুলির অধিকারকে সীমাবদ্ধ করিতে পারিবে না। পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্য আইন সভাগুলি এই মর্মে আইন প্রণয়ন করিলে সেই আইনের অন্তর্ভুক্ত ধারাগুলি মৌলিক অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে।

মৌলিক অধিকার বনাম পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভার অধিকার

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য আইন সভার অধিকার সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আইনসভা বনাম আদালতের অধিকার লইয়া একটি যুগান্তকারী আলাড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।[৫]

ভারতের পার্লামেণ্ট ও রাজ্যগুলির আইনসভার অধিকার, ইহার সদস্য-গণের অধিকার প্রসঙ্গে জড়িত আলোচনার পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আইন সভাগুলির অধিকারগুলি মনে হয় আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া বাঞ্চনীয়, তাহাতে শুধু অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিরই সমাধান হয় না, ইহা গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতেও যথেষ্ট সহায়তা করে।

মন্তব্য

পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (Legislative Procedure in Parliament)

শাসনতন্ত্রের ১০৭ নং ধারা অনুযায়ী অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। বিল সরকারী অথবা বেসরকারী হইতে পারে। সরকারী বিল সেইগুলি যেগুলি কোন মন্ত্রী কর্তৃকই কেবল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয়। পার্লামেণ্টের অন্যান্য যে কোন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলকে বেসরকারী বিল বলা হয়। বেসরকারী বিল ও সরকারী বিলের মধ্যে

সরকারী ও বেসরকারী বিল

৪। Sharma vs. Shri Krishna (1958).

৫। রাজ্য আইনসভার আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

একটু পার্থক্য আছে। যদি মন্ত্রী ব্যতীত কোন সদস্য কোন বিল উত্থাপন করিতে চাহেন তো তাঁহাকে উক্ত মর্মে ১ মাসের নোটিশ দাখিল করিতে হয়। অবশ্য স্পীকারের অনুমতিক্রমে উক্ত সময়ের কমেও বিলটি উত্থাপনের প্রস্তাব পেশ করা যায়। বেসরকারী বিলটি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া লোকসভার নিকট একটি রিপোর্ট ঐ সংক্রান্ত কমিটি প্রদান করে। উক্ত কমিটি (Committee on Private Member's Bills and Resolutions) বিলটির গুরুত্ব অনুসারে উহা 'ক' অথবা 'খ' কোন্ পর্যায়ে পড়ে তাহা নির্ধারিত করে। 'ক' পর্যায়ের বিলটির গুরুত্ব সাধারণতঃ বেশী। এই কমিটি বিলটির আলোচনার সময়ও নির্দিষ্ট করে। ইহার পর এইরূপ বিল সংসদে আলোচনা করা হয়। ইহা ছাড়া, সরকারী ও বেসরকারী বিল পাসের পদ্ধতিতে আর কোন পার্থক্য করা হয় নাই।

বেসরকারী বিল পাসের পদ্ধতি

সরকারী বিল কেবলমাত্র কোন মন্ত্রীই উত্থাপন করিতে পারেন। মন্ত্রী বিলটি উত্থাপনের সময় সভার অনুমতি চাহিয়া একটি প্রস্তাব পেশ করেন। স্পীকার কক্ষের নিকট প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য রাখেন। অনুমতি লাভ করার পর মন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করেন। অবশ্য কোন বিল যদি পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইবার পূর্বেই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়, তবে তাহা পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিবার জন্য সভার অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

বিলটির উত্থাপন ও ইহার প্রথম পাঠ

কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইবার পর সেই বিলটি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যথা :—

বিলের দ্বিতীয় পাঠ

(ক) বিলটি বিবেচিত হউক,

(খ) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হউক।

(গ) অপর কক্ষের সম্মতি-সাপেক্ষে বিলটি উভয় কক্ষের একটি যৌথ কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক,

(ঘ) জনমত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচারিত হউক।

সাধারণতঃ এইরূপ প্রস্তাব করার সময় মন্ত্রী বিলটির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে সদস্যগণকে অবহিত করান। বিলটি লইয়া এই পর্যায়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলিতে পারে, তবে ইহার বিভিন্ন ধারার বিশদ আলোচনা এই সময় করা চলে না, অথবা উহার কোনরূপ সংশোধন প্রস্তাবও করা যায় না। বিলটি সম্পর্কে আনীত উক্ত চারিটি প্রস্তাবের কোন সংশোধন প্রস্তাব অবশ্য করা চলে। বিলটির বিবেচনা সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে ইহার তৃতীয় পাঠ সুরু হয়। যদি বিলটি কমিটিতে প্রেরণ করা হয় কিংবা জনমত গ্রহণের জন্য প্রচারিত হয় তবে সেই মতামতের জন্য কিছু সময় অতিবাহিত হয়।

মতামত সংগৃহীত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিলটি সিলেক্ট কমিটি কিংবা যুক্ত কমিটির অধিবেশনে মন্ত্রী প্রেরণ করিতে পারেন। তবে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে খুব কম বিলই ভারতে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। ইংলণ্ডের সহিত এইখানে ভারতের পার্থক্য। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ সমস্ত বিলকেই কমিটি কর্তৃক বিবেচনা করানো হয়। কিন্তু ভারতে খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ হয়। কমিটি বিলটির সমস্ত দিক পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে সংশোধনের প্রস্তাবও করে। তবে কমিটি উহার আসল উদ্দেশ্য ও নীতির কোন সংশোধনের প্রস্তাব করিতে পারে না। বিলটি যদি নির্দিষ্টভাবে উত্থাপিত না হয় তবে ঐ মর্মে সংশোধন প্রস্তাব করা চলে, আবার বিলটি যদি আইনের কোন ধারার পরিপন্থী হয় তবে সে বিষয়েও যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করার প্রস্তাব কমিটি করিতে পারে।

কমিটি কর্তৃক বিবেচনা প্রদান

এইভাবে পুংখানুপুংখরূপে বিলটিকে বিবেচনা করিয়া কমিটি বিলটি সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রদান করে তাহা সংশ্লিষ্ট কক্ষে প্রেরণ করা হয়। রিপোর্টটি এবং কোন সংশোধন করা হইলে সংশোধিত বিল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী 'বিলটি বিবেচিত হউক' এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভার সদস্যগণ বিলটির বিভিন্ন ধারার সমালোচনা করিতে পারেন এবং ইহার সংশোধন প্রস্তাবও করিতে পারেন। এই পর্যায়ে বিলটিকে গ্রহণ অথবা সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব লইয়া বিতর্ক চলে।

কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট প্রদান

যদি বিলটির কোন সংশোধন না হয়, অথবা যদি বিলটিকে সংশোধিত করা হয় এবং ইহা সংশোধিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় তাহা হইলে সেই কক্ষে বিলটি পাস হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহাকে ইংলণ্ডের কমন্সসভার তৃতীয় পাঠের (Third Reading) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

বিলের তৃতীয় পাঠ

একটি কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হইয়া গেলে অপর কক্ষে বিলটি প্রেরিত হয়। অপর কক্ষে বিলটিকে অনুরূপভাবে অনুমোদিত হইতে হয়। অপর কক্ষ ইচ্ছা করিলে বিলটিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে শাসনতন্ত্রের ১০৮(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, অপর কক্ষ ইচ্ছা করিলে বিলটিকে সংশোধিত করিয়া ইহা অনুমোদন করিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে বিলটি প্রথম যে কক্ষে উত্থাপিত হইয়াছিল সেই কক্ষে ইহাকে পুনরায় ফেরত পাঠানো হয়। যদি প্রথম কক্ষ

উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ হইলে কি করা হইবে

এই সংশোধন অনুমোদন করে, তবে ইহা শাসনতন্ত্রের ১১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। আবার যদি প্রথম কক্ষ এই সংশোধন গ্রহণ না করিতে চাহে, তবে শাসনতন্ত্রের ১০৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ-অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। সর্বশেষে, এক কক্ষ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইয়া যাইবার পর যদি অপর কক্ষ ছয় মাসের পরও ইহা টেবিলে ফেলিয়া রাখে এবং ইহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে, তবে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ১০৮(১)(গ) নম্বর ধারা অনুযায়ী উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

যখন উভয় কক্ষ কর্তৃক এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিলটি অনুমোদিত হয় তখন রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ইহা প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি যদি সম্মতি দেওয়া হইতে বিরত থাকেন, তবে বিলটির মেয়াদ সেখানেই শেষ হইয়া যায়। যদি রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করেন, তবে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি অবশ্য পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে পার্লামেন্টের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া না গেলে যদি বিলটি পুনরায় পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং যদি পুনরায় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক ইহা অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন না।

অর্থসংক্রান্ত বিল (Money bills) ঃ কর ধার্য করা, কর তুলিয়া দেওয়া, করের হার পরিবর্তন করা এবং কোন করের নিয়ম পরিবর্তন করা সংক্রান্ত কোন বিল, সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ অথবা ঋণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বিল এবং Consolidated Fund of India অথবা Contingency Fund of India হইতে খরচ সংক্রান্ত কোন বিল, Consolidated Fund of India খাতে কোন অর্থপ্রাপ্তি, ভারতের Public Accounts সংক্রান্ত কোন বিল অথবা মুদ্রানিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বিল, ইত্যাদি সবই অর্থসংক্রান্ত বিলের (Money bills) আওতায় পড়ে।[৬] অর্থসংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যসভায়

৬. Art 110 of the Constitution,

"A bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely, (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, (b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Govt. of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Govt. of India, (c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such fund, (d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India, (e) the declaring of any expenditure

উত্থাপন করা যায় না। যদি কোন বিল প্রকৃতই অর্থসংক্রান্ত বিল কিনা এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠে, তবে স্পীকার সেই বিষয়ে রুলিং প্রদান করেন। আবার অর্থবিল উত্থাপন করার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ করার অর্থ কেবলমাত্র সরকারই অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিবেন, যাহাতে সরকারী বাজেটে বিপর্যয় নামিয়া না আসে।

অন্যান্য বিলের মত লোকসভায় অর্থসংক্রান্ত বিল অনুমোদিত হইয়া যাইবার পর ইহা রাজ্যসভা কর্তৃক সমর্থিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। রাজ্যসভা কোন অর্থসংক্রান্ত বিল অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বিলটি পাইবার ১৪ দিনের মধ্যেই রাজ্যসভা নিজের সুপারিশসহ ইহাকে লোকসভায় পাঠাইয়া থাকে। লোকসভা ইচ্ছা করিলে রাজ্যসভার সুপারিশ গ্রহণ করিতে পারে অথবা নাও পারে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা অর্থসংক্রান্ত বিলটিকে লোকসভার নিকট ফেরত না পাঠায় তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে উভয় কক্ষ কর্তৃকই বিলটি অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ অর্থবিলের ক্ষেত্রে উচ্চ কক্ষের ক্ষমতা অপেক্ষা নিম্নকক্ষের ক্ষমতা অনেক বেশী করা হইয়াছে।

অর্থবিল ও অন্যান্য অর্থসম্বন্ধীয় বিল (Money bills and other Financial bills) : সংবিধানের ১১০ নং ধারায় (a হইতে f পর্যন্ত "কেবলমাত্র") বর্ণিত বিষয়গুলি অর্থবিলের সংজ্ঞায় পড়ে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে "কেবলমাত্র" (only) শব্দটি ১১০ নং ধারায় সংযোজিত হওয়ার ফলে উক্ত ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কোন বিষয় কোন বিলের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহা অর্থ বিল (money bill) বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এই জন্যই অর্থবিলের সহিত অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলের মধ্যে কিছু পার্থক্যের কথাও সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি সংবিধানের ১১০ নং ধারার 'a' হইতে 'f' এ বর্ণিত বিষয়গুলির সহিত অন্যান্য কোন বিষয়ও কোন বিলে সংযোজিত হয় তাহা হইলে উহা "অন্যান্য অর্থ-সম্বন্ধীয় বিল"-এর পর্যায়ে পড়িবে।

অন্যান্য অর্থসম্বন্ধীয় বিল আবার দুই প্রকারের হইতে পারে :

(ক) যে সকল বিলে অর্থ বিলের বিষয় ও অন্যান্য বিষয় একত্রে থাকে তাহা প্রথম পর্যায়ের অন্যান্য অর্থ সম্বন্ধীয় বিল। কোন বিলে কর সম্বন্ধীয় বিষয়ের সহিত অন্যান্য বিষয় যুক্ত হইলে উহা অর্থবিলের আওতায় না আসিয়া

---

to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India, or the increasing of the amount of any such expenditure, (f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State, or (g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f)".

অন্যান্য অর্থ সম্বন্ধীয় বিলের অন্তর্গত হইবে। এই ধরণের বিল কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির সুপারিশক্রমেই পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় উত্থাপিত হইতে পারে। অর্থবিলের সহিত এই বিলের এই দিক হইতে প্রচুর সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা অর্থবিল নয়। সংবিধানের ১০৯ নং ধারা এই বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং রাজ্যসভা সেইজন্যই এই ধরণের অর্থসম্বন্ধীয় বিলকে অন্যান্য সাধারণ বিলের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে অর্থবিল নয় বলিয়া দুই কক্ষের মধ্যে এই বিল লইয়া মতানৈক্য (deadlock) দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৮ নং ধারাকে অনুসরণ করিয়া উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের ভোটে উক্ত বিল সম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতে পারেন।

(খ) দ্বিতীয় ধরণের অন্যান্য অর্থসম্বন্ধীয় বিলের অন্তর্গত সেই সকল সাধারণ বিল যেগুলিতে অর্থবিলের কোন বিষয়বস্তু না থাকিলেও সেই বিল গৃহীত হওয়ার পর ভারতের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India) হইতে খরচ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ধরণের বিল যে কোন কক্ষেই উত্থাপিত হইতে পারে এবং সাধারণ বিল (ordinary bill) পাসের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এই বিল পাস করা হয়। তবে সংবিধানের ১১৭(৩) নং ধারার দ্বারা ইহার উপর এই বাধা স্থাপন করা হইয়াছে যে এরূপ বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা গেলেও কোন কক্ষেই ইহার বিচার বিবেচনা চলে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতির সুপারিশ উহাতে লাভ করা যায়। এই বিলের ক্ষেত্রেও রাজ্যসভার প্রত্যাখ্যান অথবা সুপারিশ প্রদান করার ক্ষমতা রহিয়াছে।

এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে কোন বিল অর্থবিল (money bill) কিনা সেই বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ দেখা দিলে লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তকেই চরম বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালত, পার্লামেন্টের কোন কক্ষ কিংবা অন্য কেহ কোনরূপ প্রশ্ন তুলিতে পারিবে না।

পার্লামেন্টের অর্থসম্বন্ধীয় কার্য : ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতির অনুসরণে ভারতেও অর্থসম্বন্ধীয় কতিপয় বিষয়ে পার্লামেন্টের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে কর ধার্য বা করবৃদ্ধির কোনরূপ প্রস্তাব মন্ত্রিগণ ছাড়া অন্য কেহ উত্থাপন করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা সরকারী কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বেসরকারী কর ধার্য বা কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে না পারিলেও ইহা হ্রাস অথবা রহিত করার প্রস্তাব করিতে পারেন। আবার সংবিধানের ২৬৫ নং ধারায় স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে আইনের দ্বারা ছাড়া কোন প্রকারের কর ধার্য অথবা সংগ্রহও করা চলিবে

না।[৭] সংবিধানের ১১৩ নং ধারার ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে ব্যয়মঞ্জুরী সংক্রান্ত কোন দাবী পার্লামেন্টে উপস্থিত করা যাইবে না।[৮] পার্লামেন্টের অর্থসম্বন্ধীয় কর্ম পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হইল—জনপ্রিয় কক্ষ বা লোকসভাকে অর্থসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে অত্যধিক ক্ষমতা দান। লোকসভায়ই কেবলমাত্র অর্থবিল উত্থাপন করা যাইবে। সংবিধানের ১০৯ নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে রাজ্যসভায় কোন অর্থবিল উত্থাপন করা যাইবে না।[৯] আবার লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার সময় আমরা দেখিয়াছি যে অর্থবিল লোকসভায় অনুমোদিত হইয়া রাজ্যসভায় গেলে সেখানে তাহারা বিলটি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক থাকিলে কেবলমাত্র ১৪ দিন পর্যন্ত ইহার বিলম্ব ঘটাইতে পারে। অর্থবিল সম্পর্কিত এই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে যাইয়া লোকসভা রাজ্যসভাকে আইনের সীমারেখার মধ্যে থাকিয়াও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে এই বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করার স্বপক্ষে বলা হয় যে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আলোচনা করা ছাড়া যদি ইহার বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর সমস্ত বেসরকারী সদস্যগণের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে তবে সরকারী বাজেট অনেক সময় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে পারে। আবার অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা পার্লামেন্টে থাকাতে সরকারের পক্ষেও উপযুক্তভাবে জনসাধারণের আশা ও আকাংখাকে বিল প্রণয়নের সময়ই উহার ভিতর রূপদান করা সম্ভবপর হয়। ভারতীয় সংবিধানের এই দিকটি পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে।

পার্লামেন্টের অর্থ-বিষয়ক কার্যের বিভিন্ন নিয়মাবলী

পার্লামেন্টে বাৎসরিক অর্থ-বিবরণী পেশ ও ইহার পদ্ধতি (Submission of Annual Financial Statement (or Budget) to the Parliament and its procedure) : লোকসভায় অর্থমন্ত্রী বাৎসরিক অর্থ বিবরণী পেশ করেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতিটি আর্থিক বৎসরের আনুমানিক আয়ব্যয়ের একটি হিসাব পার্লমেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এই হিসাবই বাজেট, এবং ইহা প্রথমে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক নিম্নকক্ষ বা লোকসভায় দাখিল করা হয়। এই বাজেটপেশ করিবার

৭। Art. 265 :—"No tax shall be levied or collected except by authority of law".

৮। Art. 113 (3) :—"No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President".

৯। Art. 109 (1) ;—"A Money Bill shall not be introduced in the Council of States".

সময় তিনি হিসাব সম্পর্কিত নানা বিষয়ে সদস্যগণের অবগতির জন্য বক্তৃতা প্রদান করিতে পারেন। আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবটির দুইটি ভাগ থাকে, একটি ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় এবং অপরটি পার্লামেণ্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ ব্যয়। প্রথম ধরণের ব্যয় সম্পর্কে বলা যায় যে উহার জন্য প্রত্যেক বৎসর পার্লামেণ্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। তবে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই এইরূপ ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা চলে। রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি রাজ্যসভা ও লোকসভার সভাপতি ও সহসভাপতিগণের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি—ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়, অর্থাৎ প্রথমোক্ত ধরনের ব্যয়। আবার আইন করিয়া পার্লামেণ্ট কোন ব্যয়কে এইরূপ ব্যয়ের পর্যায়ে ফেলিতে পারে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য ব্যয় হইল দ্বিতীয় ধরণের ব্যয়। এইরূপ ব্যয়ের জন্য প্রতিবৎসর লোকসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

বাজেট পেশ

বাজেট পেশ করার পর ইহা লইয়া উভয় কক্ষেই আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার সময় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীরও পর্যালোচনা, সমালোচনা ইত্যাদি চলে। সদস্যগণ বাজেট লইয়া সামগ্রিকভাবে যে আলোচনা করেন, বিভিন্ন বিষয়ে যে মন্তব্য ইত্যাদি করেন অথবা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন সে সম্পর্কে উত্তর প্রদান করেন অর্থমন্ত্রী।

বাজেট লইয়া আলোচনা

সাধারণভাবে বাজেট লইয়া আলোচনা হওয়ার পর নিম্নকক্ষে ব্যয় মঞ্জুরীর দাবীগুলি লইয়া আলোচনা হয় ও পরে উহার জন্য স্পীকার ভোট গ্রহণ করেন। সমস্ত কাজ যাহাতে সত্বর সম্পন্ন করা যায় সেজন্য স্পীকার কক্ষের নেতার সহিত আলোচনা করিয়া একটি তারিখ নির্ধারণ করেন যাহার মধ্যে আলোচনা ও ভোটাভুটি কার্য সমাপ্ত করিতে হয়। যদি উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেটের সমস্ত বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত না হয় অথবা বিভিন্ন ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না যায় তবে সেই সমস্ত ব্যয়ের ব্যাপারে স্পীকার আলোচনা ছাড়াই ভোট গ্রহণের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে লোকসভা ব্যয়সংক্রান্ত প্রস্তাবের হ্রাস করণের অথবা ইহার প্রত্যাখানের জন্য পাল্টা প্রস্তাব ছাড়া এইগুলির বৃদ্ধির জন্য কোন প্রস্তাব করিতে পারে না।

বিভিন্ন ব্যয়মঞ্জুরীর দাবী লইয়া আলোচনা ও ভোটাভুটি

যে ব্যয় মঞ্জুরীর কথা বলা হইল তাহা অনুমোদন হইয়া গেলেই লোকসভায় সত্বর বিনিয়োগ আইনটি (Appropriation Act) অনুমোদিত করাইতে হয়। এই বিনিয়োগ আইনটিও পাস করানোর আগে বিনিয়োগ বিলটি লোক-

সভায় উপস্থিত করিতে হয়। ঐ বিল অনুমোদিত হইলে উহা আইনে পর্যবসিত হয়। এইরূপ বিনিয়োগ আইন পাস করা হইলেই উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যয়ের দরুণ ধার্য অনুমোদিত অর্থ সরকার ব্যয় করিতে পারেন। বিনিয়োগ বিলটি সম্পর্কে আলোচনার সময় মঞ্জুরীকৃত কোন ব্যয়ের উপর কোন সংশোধন আনয়ন করা যায় না, যেহেতু যখন ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী গ্রহণ করা হয় তখনই পরিপূর্ণভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বিনিয়োগ আইন

এই প্রসঙ্গে হয়ত অনেকের মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, বাজেট পাস হইতে যখন যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় এবং বাজেট ও বিভিন্ন ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী সমর্থিত হওয়ার পরেই কেবল (বিনিয়োগ আইন পাস করার পর) সরকার অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হন তখন নূতন আর্থিক বৎসর সুরু হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় অর্থ কিরূপে ব্যয় করা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে নূতন আর্থিক বৎসর সুরু হওয়ার আগে লোকসভা সরকারকে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি প্রদান করিবার জন্য গণনানুদান বিল (Votes on Accounts) ও গণনানুদান সংক্রান্ত বিনিয়োগ আইন [Appropriation (Votes on Account) Act] পাস করেন। ইহার ফলে নূতন বৎসরের বাজেট ও বিনিয়োগ আইন অনুমোদন হওয়ার পূর্বেই সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার অধিকার পায়।

গণনানুদান বা Votes on Account

হয়তো কোন বৎসর পার্লামেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় কম হইয়া যায় যাহার ফলে আরও অধিক ব্যয় মঞ্জুরীর প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত অনুদান (Additional grants কিংবা Supplementary grants) বা প্রয়োজনীয় অধিক ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি চলতি বৎসরেই অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়। আবার যদি অনুমোদিত অর্থের অধিক ব্যয় হইয়া যায় তো অধিক ব্যয়ের দাবিও লোকসভায় অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয় (excess grants)।

Additional grants ও Excess grants

কোন অপ্রত্যাশিত কিংবা অনিশ্চিত ব্যয় যদি হঠাৎ করিতে হয় তাহা হইলে লোকসভা সরকারকে সেই অর্থ ব্যয় করার অনুমতি প্রত্যয়ানুদান বা ব্যতিক্রমানুদানের মাধ্যমে প্রদান করিতে পারে। হয়তো কখনও বন্যা, দুর্ভিক্ষ কিংবা যুদ্ধের জন্য আকস্মিকভাবে সরকারের অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইতে পারে, অথচ অর্থের পরিমাণ অগ্রেই অনুমান করাযায় না, সেই ক্ষেত্রে সরকারকে এইরূপ প্রত্যয়ানুদানের (Votes on Credit) সাহায্যে অর্থের ক্ষমতা প্রদান করা যায়। আবার চলতি বছরের ব্যয়ের মধ্যে না পড়িলেও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের ব্যয় বহনের জন্য লোকসভা ব্যতিক্রমানু-

প্রত্যয়ানুদান ও ব্যতিক্রমানুদান Votes on Credit and Exceptional Grants

দানের (Exceptional Grants) সাহায্যে সরকারকে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে।

বাজেট পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। বাজেটে পেশ করার সাথে সাথে করধার্য বা সংগ্রহের জন্যও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা গ্রহণ করিতে হয়। সেজন্য এই মর্মে করের প্রস্তাবসমূহকে একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। এই বিলকে রাজস্ব বিল (বা Finance Bill) বলা হয়। যদি কোন কোন কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে হয় অথবা যদি নূতন কোন করের প্রবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে তাহার জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন হয় (১১৭ (১) নং ধারা)। যদি কোন অর্থবিল এমন কোন রাজস্ব বা করসম্বন্ধীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয় যাহাতে রাজ্যগুলি বিশেষভাবে আগ্রহশীল তাহা হইলে সেইরূপ অর্থবিল উত্থাপন করার পূর্বে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ (সংবিধানের ২৭৪ (১) নং ধারা) ও গ্রহণ করিতে হয় (১১৭ (১) নং ধারা ছাড়া)। এইরূপ সুপারিশ লাভ করা হইলে উক্ত বিল অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হয়। অনুমোদিত হইলে উহা রাজস্ব আইন (Finance Act) নামে অভিহিত হয়। তখন প্রস্তাব অনুযায়ী কর ধার্য ইত্যাদির কার্যে সরকার অগ্রসর হন। তবে এইরূপ প্রস্তাবের উপর কর হ্রাস বা বিলোপের সংশোধনও আনয়ন করা যায়।

রাজস্ব আইন (Finance Act)

সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ (Parliament's control over Finance): পার্লামেণ্টের আয়-বায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ মূলক কাজ ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিধান অনুযায়ী আমরা দেখিয়াছি যতক্ষণ পর্যন্ত না পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া নির্দেশদান করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার বা শাসন বিভাগ কোনরূপ ব্যয়ই করিতে পারে না। কোনরূপ ব্যয় করিতে হইলে সরকারকে পার্লামেণ্টের আইনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করিতে হইবে। ভারতের সঞ্চিত তহবিল হইতে কোনরূপ অর্থব্যয় সরকার সরাসরি করিতে পারে না, এবং শাসন বিভাগকে এই ক্ষেত্রে আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইয়াছে। ঠিক অনুরূপ ভাবেই পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে শাসনবিভাগ আইনসভার অনুমোদন ব্যতীত যে কোন প্রকার করই গ্রহণ করিতে পারিবে না। পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা গৃহীত ক্ষমতার মাধ্যমে শাসনবিভাগ কর সংগ্রহের কাজে অগ্রসর হয়। তবে কেবলমাত্র উক্ত ব্যবস্থাকেই সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণের একমাত্র কার্যকরী পন্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। যেহেতু আইনসভার পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ইহা বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হয় না যে সরকার আয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে আইনসভার নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে পালন করিতেছে সেইজন্য এই বিষয়ে সতর্কভাবে অনুসন্ধান করা

বিবরণী প্রদান করা ও সরকারকে সংযত করিয়া চলিবার জন্য আইনসভাকে সহায়তা করার জন্য কিছু ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হইয়াছে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যে সরকার ব্যয়ের অপচয় না ঘটায় কিংবা প্রয়োজনমত ব্যয় সংক্ষেপ করে অথবা যে উদ্দেশ্যে ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে। এই সমস্ত ঠিকভাবে করার জন্য পার্লামেণ্টকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সহায়তা করে। তাহাদের মধ্যে (১) ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, (২) সরকারী গাণিতিক কমিটি (The Public Accounts Committee) এবং (৩) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির (The Estimates Committee) নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের অর্থসম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General of India) : ভারতের অর্থ সম্বন্ধীয় বিষয়ে নিয়ন্ত্রক হিসাবে ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। সরকারের আয়ব্যয় আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর তাহা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে কিনা ইহা দেখিবার জন্যই মুখ্যতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতে এইরূপ একটি পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অবশ্য ইংলণ্ডের অনুরূপ হইলেও ক্ষমতা ইত্যাদির ব্যাপারে উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইংলণ্ডে অডিটর জেনারেল আইনসভার অংশ হিসাবে বিবেচিত হন, এবং তিনি নিজেই আইনসভার নিকট সরাসরি তাঁহার হিসাবে পরীক্ষার ফলাফল জানান। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব রাষ্ট্রপতির নিকট এবং রাজ্যের হিসাব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট অডিটর জেনারেল পেশ করেন। উক্ত হিসাবকে কেন্দ্রের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের নিকট এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভার নিকট উপস্থাপিত করার দায়িত্ব যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের (সংবিধানের ১৪৯নং ধারা)। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাবলিক একাউণ্টস কমিটি (Public Accounts Committee) লোকসভায় তাহার রিপোর্ট পেশ করে। আবার ইংলণ্ডে অডিটর জেনারেল কম্পট্রোলার বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে দেখেন যে সরকারের আয়-ব্যয় যথাযথ ও আইনসঙ্গতভাবে 'ব্যাংক অফ ইংলণ্ডে' জমা হইতেছে কিনা এবং সেই টাকা খরচ করা হইতেছে কিনা। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্ধারিত সীমার মধ্যে সরকার ইচ্ছামত টাকা তাহার সঞ্চিত তহবিল হইতে তুলিতে পারে। অডিটর জেনারেলের পূর্ব অনুমোদন ইহাতে প্রয়োজন হয় না। অডিটর জেনারেল শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করেন আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের সীমা যেন কোথাও লংঘন করা না হয়।

সরকারী হিসাব পরীক্ষক : ইংলণ্ড ও ভারতের অডিটর জেনারেল

ভারতের অডিটর জেনারেলকে জনসাধারণের অর্থের রক্ষক নামে (Guar-

dian of the public purse) অভিহিত করা হয়। তিনি পার্লামেন্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করেন যে, সরকারের শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন বিভাগ কর্তৃক স্থিরীকৃত আয়ব্যয় সম্পর্কিত বাজেটের সীমা লংঘন করিয়াছে কিনা। ইহা দেখা তাঁহার দায়িত্ব যে একটি কানাকড়িও আইন-সভার নির্দেশ ছাড়া শাসন বিভাগ সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India or of a State) হইতে যেন খরচ না করে। অর্থাৎ তাঁহার প্রধান কাজ হইল দেখা, যে কোন খরচই সরকার করুক না কেন তাহা যেন আইনসভার অনুমোদনক্রমে হয়। এইজন্য অডিটর জেনারেল ইউনিয়ন ও রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা করেন ও তাহাদের হিসাব তৈয়ারী করিয়া তাঁহার রিপোর্টসহ রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালের নিকট পার্লামেণ্ট অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য পেশ করেন। ইহা ছাড়াও বাৎসরিক সরকারী হিসাব তৈয়ারী করার দায়িত্ব তাঁহার। ইউনিয়ন ও রাজ্যের হিসাব কিরূপে রক্ষিত হইবে ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমতি লইয়া তাহা স্থির করেন অডিটর জেনারেল। অডিটর জেনারেল এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে পারেন যে কোন অপচয়মূলক ব্যয় হইয়াছে কিনা। এমন কোন ব্যয় সম্বন্ধেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন যেগুলি তাঁহার বিবেচনায় স্বাভাবিক ন্যায় ও নীতির সীমা লংঘন করিয়াছে। তিনি বস্তুতঃ পার্লামেন্টের পক্ষ হইতে শাসনবিভাগের যথেচ্ছ খরচের উপর একটি বাধা হিসাবে আমাদের শাসনব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান দখল করিয়া আছেন। তাঁহার কার্যাবলী কি প্রকার হইবে তাহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। তবে যতদিন পর্যন্ত পার্লামেণ্ট এই সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়ন না করিতেছে ততদিন পর্যন্ত বর্তমান অডিটর জেনারেল সেই সমস্ত কার্য ও ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন যেগুলি ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হইবার পূর্বে অডিটর জেনারেল উপভোগ করিতেন। হিসাব রক্ষক ও হিসাব পরীক্ষক হিসাবে যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসমূহ তাঁহার আছে, সে সম্বন্ধে উপরেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে যে গুরুত্বপূর্ণ পদ ভারতের অডিটর জেনারেল অধিকার করেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

অডিটর জেনারেলের কাজ ও ক্ষমতা

তবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন, এইরূপ যে গুরুত্বপূর্ণ পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ইহার উপর কতকাংশে নির্ভর করিতেছে ভারতীয় জনগণের অর্থের অপচয়মূলক ব্যয় বা অ-ফলপ্রসূ ব্যয় বন্ধ করা, তাঁহার পদের প্রকৃতি কি এবং সেই প্রকৃতির সহিত কতদূর সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাদি দেওয়া হইয়াছে। ভারতের কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলকে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। শাসনবিভাগের কর্তৃত্বমুক্ত এই পদাধিকারী ব্যক্তির কার্যাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া

চেষ্টা করা হইয়াছে এমন একটি কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করিবার যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে সরকারের ত্রুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনসভার নিকট রিপোর্ট করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে অডিটর জেনারেলের পদকে করা হইয়াছে শাসন হইতে মুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। এইরূপ কর্তৃত্বকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দেওয়ার জন্য সংবিধানে কতিপয় ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। প্রথমত, তাঁহার নিয়োগের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অডিটর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং তাঁহাকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাঁহার ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্য-সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যবৃন্দের দুই তৃতীয়াংশ যদি অসদাচরণ এবং অক্ষমতার জন্য কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলকে অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করে কেবলমাত্র তাহা হইলেই অডিটর জেনারেলকে রাষ্ট্রপতি অপসারিত করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার অপসারণ ব্যবস্থা অনায়াসসাধ্য না করিয়া তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে।

তাঁহার পদের প্রকৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির ন্যায়ই তাঁহার বেতন ও চাকুরীর সর্তাদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের মারফৎ নির্ধারিত হইবে, এবং একবার তিনি কার্যে বহাল হইলে তাঁহার কার্যাবলীর সর্তাদি তাঁহার স্বার্থবিরোধী করিয়া পরিবর্তিত করা চলিবে না। পার্লামেণ্ট ১৯৫৩ সালে একটি আইনের[১০] দ্বারা কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের চাকুরীর সর্তাদি নির্দিষ্ট করিয়াছে। এই আইনের দ্বারা অডিটর জেনারেলের কার্যকালের মেয়াদ সাধারণতঃ ৬ বৎসর করা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে তাঁহার কার্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করিতে পারেন। এই দিক হইতেও একজন বিচারপতির ন্যায় অডিটর জেনারেল স্বাতন্ত্র্য ভোগ করেন।

তৃতীয়ত, শাসকবৃন্দের কর্তৃত্ব মুক্ত রাখিবার জন্য সংবিধানের দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল অবসরের পর কোন সরকারী কাজ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহার ফলে সরকারের চাকুরীতে পুনরায় অংশ গ্রহণ করিবার মোহ না থাকায় তাঁহার পক্ষে ইউনিয়ন অথবা রাজ্যের শাসনবিভাগের পরিতোষবিধান এবং তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ কাজ করার সম্ভাবনা মোটেই থাকিবে না। এদিক হইতেও

১০। The Comptroller and Auditor General (Conditions of Service) Act 1953.

যে তাঁহার পদকে স্বাতন্ত্র্য দান করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

সর্বশেষে, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল[১১] ও তাঁহার দপ্তরের ব্যয় ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (charged on the Consolidated Fund of India)। ইহার জন্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন ও ভোটের প্রয়োজন হয় না। এইদিক হইতেও তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত অডিটর জেনারেলের কার্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটি ত্রুটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি একাধারে হিসাব প্রস্তুতকারক এবং হিসাব পরীক্ষক। অনেকেই এইরূপ সমালোচনা করেন যে একই হাতে হিসাব প্রণয়ন ও হিসাব পরীক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত করা একটি বিশেষ অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ। বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে হিসাব প্রণয়ন ও হিসাব পরীক্ষা একই হস্তে রাখা হইবে না। হিসাব প্রণয়ন করিবার কার্য শাসন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া অডিটর জেনারেলকে কেবলমাত্র হিসাব পরীক্ষক হিসাবে কার্য করিতে দেওয়ার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিভাগে ইতিপূর্বেই হিসাব প্রণয়ন ও হিসাব পরীক্ষার কার্য বিভক্তিকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী হিসাব প্রণয়ন সম্পূর্ণরূপে শাসনবিভাগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এবং হিসাব পরীক্ষার কাজ অডিটর জেনারেলের হস্তে রাখা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা এবং আরও কয়েকটি বিভাগে এইরূপ ক্ষমতার বিভক্তিকরণের প্রচেষ্টা কার্যকরী না হওয়ায় সেখানে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়ার্কস, হাউসিং এণ্ড সাপ্লাই প্রভৃতি বিভাগে এই ব্যবস্থা ১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে চালু হওয়ার পর এখনও বলবৎ আছে এবং এই ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া সরকারী মহল হইতে দাবি করা হয়। ইহা সুখের কথা সন্দেহ নাই, তবে অডিটর জেনারেলের নিকট হইতে হিসাব ক্ষমতা প্রত্যেকটি বিভাগের ক্ষেত্রে পৃথক করিয়া তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রণীত হিসাবের ত্রুটি ইত্যাদির প্রদর্শন ক্ষমতায় যদি বিশেষভাবে ক্ষমতাশালী না করা যায়, তবে সরকারের অপচয়মূলক ব্যয় ও অর্থের অসদ্ব্যবহার ও অ-ফলপ্রসূ ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতাকে আরও অধিক কার্যকরী করিতে তিনি সক্ষম হইবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এই সম্পর্কে একথাও বলা সঙ্গত যে, যে সমস্ত বিভাগে অডিটর জেনারেলের ক্ষমতার বিভক্তিকরণ করা হইয়াছে সেই সব বিভাগে

হিসাব প্রণয়ন ও হিসাবের পরীক্ষার কাজ বিভক্তিকরণ ও সাম্প্রতিক ব্যবস্থা

১১। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল মাসিক ৪০০০ টাকা বেতন পান।

আইনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার বিভক্তীকরণ কার্যকরী করা আশু কর্তব্য।

সরকারী গাণিতিক কমিটি (The Public Accounts Committee):

সরকারী গাণিতিক কমিটি বা Public Accounts Committee পার্লামেন্ট (এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভা) কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের দ্বারা গঠিত হইবে ও ইহার কার্যাবলী পরিচালনা করিবে। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই কমিটি, লোকসভার কমিটি, এবং ইহার ১৫ জন সদস্য প্রত্যেক বৎসর লোকসভার সদস্যবৃন্দ দ্বারা এবং লোকসভার সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও রাজ্যসভার ৭ জন সদস্যকে এই কমিটির সহিত যুক্ত করা চলে। ইংলণ্ডে এইরূপ কমিটির সদস্য কেবলমাত্র হাউস অব কমন্সের সদস্য হইতেই নির্বাচিত হন, হাউস অব লর্ডস বা উচ্চ কক্ষের সদস্য এই কমিটিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

গঠন

ইউনিয়নের গাণিতিক কমিটি বা পাবলিক একাউন্টস কমিটির কার্য হইল সরকারের বিনিয়োগ হিসাব বা Appropriation Accounts এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করা। এই উদ্দেশ্যে কমিটির দেখিতে হয় যে:—

কমিটির কার্য

(ক) যে টাকা সরকারের হিসাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া দেখানো হয় তাহা ন্যায্যতঃ মঞ্জুর করা হইয়াছিল এবং যে উদ্দেশ্যে এই অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছিল ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যয় করা হইয়াছে।

(খ) এক খাত হইতে আর এক খাতে যে টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করা হইয়াছে।

(গ) ইহাও এই কমিটি দেখে যে অপচয় ও ক্ষতি বন্ধ করিয়া ব্যয়-সংক্ষেপ করা যায় কিনা এবং প্রয়োজন হইলে অমিতব্যয়, অপচয়মূলক ব্যয় প্রভৃতির দিকে পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণও ইহাকে করিতে হয়।

এইভাবে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নৈতিক মানের উন্নতি বিধান করিবার জন্য উপরোক্ত কমিটি অডিটর জেনারেলের পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করেন। তাঁহাদের রিপোর্ট পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হইলে সে সম্বন্ধে সদস্যবৃন্দ আলোচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে এমন নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করিতে পারেন যাহাতে আর্থিক ব্যয়ের সমীচীনতা বোধ দ্বারা পরিচালিত উক্ত নিয়ম-কানুন সরকারী আয়-ব্যয়ের নৈতিক মান অনেক উন্নত করিতে পারে। এই কমিটির সুপারিশক্রমে অর্থকরী ব্যাপারকে কার্যকরী করা ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর থাকিলেও ইহার দায়িত্ব থাকে বিশেষভাবে অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের।

এই কমিটির কার্যাবলী পর্যালোচনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে সরকারী

অর্থ ব্যয় হইবার পর এইরূপ কমিটির উপর বিচার-বিবেচনার ভার ন্যস্ত করিয়া ইহার ক্ষমতাকে খুবই সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে একথা বলিতে পরা যায় যে এইরূপ কমিটির বিচার-বিবেচনার ফল জনসাধারণের নির্বাচিত উল্লিখিত লোকসভার সদস্যবৃন্দের নিকট পেশ করিতে হয়। তাঁহারা ইহাতে যে সুপারিশ করেন এবং ইহার যে আলোচনা করেন পরবর্তী বৎসরে সেইরূপ আলোচনার ভিত্তিতে সরকার তাঁহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রণ করিতে স্বভাবতঃই চেষ্টা করেন। ব্যয়িত হইবার পরও এই সম্বন্ধে আলোচনা করার ব্যবস্থা ("Post Mortem") থাকায় সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে যথেচ্ছাচার করা খুব সুবিবেচনার কাজ হয় না। তাই এইরূপ কমিটির গুরুত্ব উপেক্ষা করাও সঙ্গত নয়।

আনুমানিক ব্যয়হিসাব কমিটি (The Estimates Committee) **:**

ইতিপূর্বেই আলোচনার সময় দেখা গিয়াছে যে সরকারী হিসাব পরীক্ষা করার দায়িত্ব কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের। পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির কাজ হইতেছে ইহা দেখা যে সরকার যে টাকা খরচ করিতেছেন তাহা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা অথবা সরকারী ব্যয়ে এমন কিছু আছে কিনা যাহা অপচয়মূলক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঘটনাটি ঘটিবার পর ঐরূপ বিশ্লেষণ এই দুইটি সংস্থা করে এবং তাহাদের রিপোর্টের মাধ্যমে পার্লামেণ্টকে এই বিষয় অবহিত করায়। কিন্তু ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া এইরূপ ব্যয় সংকোচ করা যায় কিনা এই বিষয়ে পার্লামেণ্টকে সহায়তা করার জন্য যে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহাই আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি নামে পরিচিত।

কমিটির গঠন ও কার্যকলাপ

লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এই কমিটির ৩০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করেন। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন না। ইহার চেয়ারম্যান সদস্যগণের মধ্য হইতে স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই কমিটির কার্যকাল একবৎসর থাকে। কিন্তু কমিটির সদস্যগণের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা কমিটির কার্যব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রথাগত ভাবে স্থির হইয়াছে যে প্রতি বৎসর পূর্বেই কমিটির সদস্যগণের এক তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করিবেন।

সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবটি পর্যালোচনা করিয়া কমিটি দেখে যে ব্যয় সংক্ষেপ করার কোন সুযোগ আছে কিনা; আবার শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার সাধনও করা যায় কিনা কিংবা কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব কিনা এই বিষয়েও বিচার করিয়া এই মর্মে ইহাকে

রিপোর্ট প্রদান করিতে হয়। এই কমিটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা বিভিন্ন বিষয়ে যে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই ব্যয় ঠিক ঠিক ভাবে বণ্টিত হইয়াছে কিনা। কমিটির আর একটি কাজ হইতেছে সরকারী ব্যয়ের সংক্ষেপকরণের নিমিত্ত এবং সরকারী কাজে দক্ষতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য বিকল্প নীতি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করা। এইদিকে ভারত ও ইংলণ্ডের কমিটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে সরকারী কাজের নীতি সংক্রান্ত বিষয়ের যথার্থতা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা এই কমিটির নাই। সরকারী নীতির মধ্যে থাকিয়াই উহাকে যাবতীয় প্রস্তাবাদি করিতে হয়। তাই ভারতের আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটিকে অধিক ক্ষমতাশালী বলা চলে। এই কমিটি পার্লামেণ্টে বাজেট পেশ করার পরই ইহার কাজ আরম্ভ করে। ইহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন বিভাগের আনুমানিক যে ব্যয় ধরা হয় তাহা হইতে কিছু বাছিয়া লইয়া তাহার পর্যালোচনা সুরু করে। আনুমানিক হিসাবের সমস্ত ব্যয় লইয়া একযোগে কাজ করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ইহারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিতে পারে এবং ইহাদের রিপোর্টের তথ্যগত সত্যতা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট তাহাদের রিপোর্ট প্রেরণ করিতে পারে। এইভাবে তাহারা তাহাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া লোকসভায় পেশ করে। এই রিপোর্ট লইয়া কোনরূপ আলোচনার উদ্ভব না হইলেও সদস্যগণ বক্তৃতার সময় এই কমিটির রিপোর্ট হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতে পারেন। কমিটি তাহাদের কাজ শেষ হইলেই পার্লামেণ্টে রিপোর্ট দাখিল করিতে পারে। একসঙ্গে সব কাজ করা এবং রিপোর্ট পেশ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার কমিটির কাজের গুরুত্ব এত বেশী থাকায় তাহাদের সহায়তা করার জন্য এক বা একাধিক সাব কমিটি গঠন করারও ব্যবস্থা আছে। তবে কমিটির বিচার বিবেচনার পূর্বেও ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি পাস হইয়া যাইতে পারে। কমিটির রিপোর্ট আংশিকভাবে পার্লামেণ্টে পেশ হয়।

কমিটির কাজ

এই কমিটির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। যেমন, এই কমিটি যে সমস্ত মন্তব্য করে সেই মন্তব্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গলদগুলি দূর করিতে চেষ্টা করে। আবার কমিটির তীব্র সমালোচনা এড়াইবার জন্যও অনেক সময় সরকারী বিভাগ ব্যয় সংকোচন করার সমস্ত পন্থা সযতনে খুঁজিয়া তাহা কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে। ইহা ছাড়াও ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা হইতেছে ইহা আনুমানিক হিসাব নিকাশের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হয়। অথচ আইনসভার পক্ষে সময়ের অভাবের দরুণ অনেক সময়ই বাজেটের বিভিন্ন দিক লইয়া চিন্তা করাও সম্ভব হয় না, কিংবা ঐ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করারও অবকাশ থাকে না। এইদিক হইতে এইরূপ

কমিটির উপস্থিতি খুবই বাঞ্ছিত ও সময়োপযোগী মনে হয়। আগামী বছরের ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি উপস্থাপিত করার সময় এই কমিটির রিপোর্টের দ্বারা সংসদের সদস্যগণ যে যথেষ্ট প্রভাবিত হন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।[১২] লোকসভা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে বলীয়ান এই কমিটি শতাধিক বিবৃতি বা "Report" এখন পর্যন্ত পেশ করিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলিই সরকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং এই কমিটির উপযোগিতা একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলা চলে না।

কমিটির উপযোগিতা

ভারতের পার্লামেণ্টের মর্যাদা (The Position and Status of the Indian Parliament) : ভারতের পার্লামেণ্টের মর্যাদা সম্যক অনুধাবন করার পূর্বে ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের মর্যাদা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। আবার এ ইআলোচনা সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইন পরিষদ বলিতে কি বুঝায় সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই করা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করার কারণ ভারতের পার্লামেণ্ট বা কেন্দ্রীয় আইনসভার মর্যাদার ব্যাপারে উক্ত রাষ্ট্র দুইটির মধ্যবর্তী এক বিশেষ স্থান অলঙ্কৃত করে। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন আইনপরিষদের যে পরিমাণ ক্ষমতা থাকে, ইহার ভিত্তিতে আইনপরিষদগুলিকে সার্বভৌম এবং অসার্বভৌম আইনপরিষদ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

সার্বভৌম আইন পরিষদ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি আইন পরিষদ যাহার আইন প্রণয়ন করিবার আদিম ক্ষমতা আছে এবং যাহা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্য কোনও উপরের কর্তৃপক্ষ হইতে পায় নাই। এমন কোনও আইন রাষ্ট্রে থাকিতে পারে না যাহা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সার্বভৌম আইন পরিষদের নাই। আবার এমন কোন আইন নাই যাহা ইহা সংশোধন অথবা বাতিল করিতে পারে না। সর্বশেষে, কেহই সার্বভৌম আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সার্বভৌম আইন পরিষদের ক্ষমতা অসীম। বৃটেনের রাজা সমেত পার্লামেণ্ট (King-in-Parliament) একটি সার্বভৌম আইন পরিষদ। বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার

১২. "Though the report of the Estimates Committee is not debated in the House, the fact that it carries on its examination throughout the year and places its views before the members of the House as a whole exerts a statutory influence in checking governmental extravagance in making demands in the coming year, and in moulding its policies without involving a friction in the House".

[D. Basu. Introduction to the Constitution of India—Page 173]

ক্ষমতা অন্য কোনও উপরের আইন পরিষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। তাহা ছাড়া, উক্ত পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কেও কেহ কোন প্রশ্ন করিতে পারে না।

অপরপক্ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি অসার্বভৌম আইন পরিষদ। ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ, শাসনতন্ত্রের নিয়মানুসারে ইহাকে কাজ করিতে হয়। ইহার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের সহিত শাসনতন্ত্রের কোনও বিধানের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সুপ্রীম কোর্ট ইহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে মূলরাষ্ট্রের আইন পরিষদগুলি যে আইন প্রণয়ন করে, সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডে আইন সভাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আদালত পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে পারিলেও ইহার বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিতে পারে না। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কিন্তু আমেরিকার কোন আইনের বৈধতা লইয়া শুধু প্রশ্নই তুলিতে পারে না; আইনটির যৌক্তিকতা বিচার করিয়া যদি ইহা স্বাভাবিক ন্যায় ও নীতিকে লংঘন করিয়াছে বলিয়া মনে করে তবে তাহাকে বাতিলও করিতে পারে।

আমরা ভারতে পার্লামেণ্টকে ইংলণ্ডের ন্যায় চরম সার্বভৌম আইন প্রণয়ন বিভাগ হিসাবে প্রত্যক্ষ করি না। ইংলণ্ডের ন্যায় এই ব্যাপারে ভারত অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে না। কারণ ভারতের পার্লামেণ্ট ক্ষমতা লাভ করে সংবিধান হইতে। সুতরাং কোন আইনের সংবিধানের কোন ধারার বিরোধী বা পরিপন্থী হইলে আদালত তাহা অবৈধ বলিয়া অভিহিত করিতে পারে।

ভারতের পার্লামেণ্ট অসার্বভৌম

এইখানে আমেরিকার আইন সভার সহিত ভারতীয় পার্লামেণ্টের কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ভারতীয় পার্লামেণ্টকেও অনেকে অ-সার্বভৌম আইন-প্রণয়ন বিভাগ হিসাবে অভিহিত করিতে চাহেন। লিখিত সংবিধানের কোন ধারার পরিপন্থী কোন আইন ভারতীয় আদালত কর্তৃক কখনই বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহা বিচার বিবেচনা করিবার ভার সম্পূর্ণভাবে ভারতের আদালতের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তবে পার্লামেণ্ট যে একেবারেই সার্বভৌম নয় সেকথাও ঠিক নয়। কেননা পার্লামেণ্টের হস্তে সংবিধান এমন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে, যাহা দ্বারা পার্লামেণ্ট সংবিধানের যে কোন

ইহা কতকাংশে সার্বভৌমও বটে

ধারাকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংশোধন করিতে পারে; কিন্তু আমেরিকা এইরূপ ক্ষমতা ভোগ করে না। শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া আমেরিকার

আইনসভা যদি বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করিতে চাহে তবে তাহাকে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেখানকার আইনসভার প্রেরণায় আমেরিকার সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে। সুতরাং সংবিধানের সংশোধনের দিক হইতে ভারতের পার্লামেণ্ট আমেরিকার আইনসভা অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য ভোগ করে। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে ভারতের পার্লামেণ্টকেও সংবিধানের কোন সংশোধন আনয়ন করার পূর্বে রাজ্য আইনসভাগুলির সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। এ বিষয়ে বলা যায় যে মোটামুটি রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি দলের প্রাধান্য এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক থাকায় ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার এইরূপ সম্মতি পাইতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। ফলে এই বিষয়ে পার্লামেণ্টের অবাধ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার (Golaknath Vs the State of Punjab) মামলার রায় প্রদানকালে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করিয়াছে যে ৩৬৮নং ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করা চলে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের সংশোধন করা অথবা সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পার্লামেণ্টের নাই। ইতিপূর্বে পার্লামেণ্ট সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া অসঙ্গত কাজ করিয়াছে, ভবিষ্যতে এইরূপ হস্তক্ষেপ করা চলিবে না।

এই বিষয়ে বর্তমানে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীনাথ পাই লোকসভায় একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন যাহার ফলে শাসনতন্ত্রের ৩৬৮নং ধারাটি সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে অর্পন করা যায়। এই বিলের বক্তব্য হইল যে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের ৩৬৮নং ধারাটিকে সংশোধন করিয়া সেখানে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া রাখুক যে দরকার হইলে মৌলিক অধিকারের তালিকায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। এই বিলটিও পার্লামেণ্টে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যগণের মধ্যে একটি মিশ্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সাধনই নহে, বিচার বিভাগীয় ত্রুটি বিচ্যুতিও (Judicial errors) দূর করার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে বলিয়া একদল সদস্য মনে করেন। ১৯৬৯ সালের বাজেট অধিবেশনে এই বিল সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার আশা আছে।

আমেরিকা ও ভারতের পার্লামেণ্ট ও আদালত

আইনসমূহ বিচার করিয়া দেখার জন্য যে অধিকার ভারতের শাসনতন্ত্র ইহার আদালতকে দান করিয়াছে তাহা ভারতীয় পার্লামেণ্টের চরম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে এ বিষয়ে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এই ক্ষেত্রে আমেরিকার আদালতের প্রাধান্য ততখানি ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই যতখানি করা হইয়াছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের। দুইটি

দেশেরই আদালত বিচার করিতে পারে সংবিধান অনুযায়ী আইন প্রণীত হইয়াছে কি না এবং কোনরূপ অসামঞ্জস্য দেখা দিলেই আইনটি বাতিল করার ক্ষমতা উভয়েরই আছে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আরও দেখিতে পারে যে, যে আইনটি প্রণীত হইয়াছে তাহা জনসাধারণের স্বার্থানুকূল কিনা। যদি মার্কিন আদালতের মতে এইরূপ আইন জনস্বার্থ পরিপন্থী বিবেচিত হয় তবে তাহা বাতিল করার ক্ষমতাও আদালত ভোগ করে। ভারতীয় আদালত কিন্তু পার্লামেণ্টের কোন আইন-ই, ইহা যত অন্যায় ও জনস্বার্থ পরিপন্থী-ই হউক না কেন, তাহা বাতিল করিতে পারে না, যদি ইহা সংবিধানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে থাকিয়াই রচিত হইয়া থাকে। শাসনতন্ত্রের বিশেষ ধারাটির সংশোধন অনুমোদিত হইলেই মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যে কোন ধারার সংশোধন পার্লামেণ্টের অধিকারভুক্ত হইবে। সুতরাং এইদিক হইতে ভারতীয় পার্লামেণ্টকে সার্বভৌম আইনসভার সমান না হইলেও ঐরূপ মর্যাদা দেওয়ার একটা প্রয়াস সংবিধানে রাখা হইয়াছে মনে হয়।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উপসংহারে বলা যায় যে কিছু বাধা সমেত ভারতীয় পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ন্যায় চরম ক্ষমতার অধিকারী। আবার বাধানিষেধগুলি যখন কার্যকর হয় তখন ইহা আমেরিকার আইনসভার ন্যায় অ-সার্বভৌম আইনসভায় পর্যবসিত হয়। তবে যে বাধা-নিষেধগুলি ভারতের ক্ষেত্রে উপযুক্ত করা হইয়াছে তাহার দ্বারা ভারতীয় পার্লামেণ্টের পক্ষে চরম ক্ষমতার অধিকারী হইবার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। আমেরিকার ন্যায় যদি "আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি" (due process of law) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা যাইত তাহা হইলে হয়ত ভারতের পার্লামেণ্টের পক্ষে ইংলণ্ডের ন্যায় কতিপয় ক্ষেত্রে চরম প্রাধান্য উপভোগ করা সম্ভবপর হইত না।

ভারতের কমিটি ব্যবস্থা (Committee System in India) :

পার্লামেণ্টের কার্যপরিধি ক্রমশঃই বাড়িয়া যাওয়ায় বর্তমানে অনেক কাজ বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও কমিটি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতের কমিটি ব্যবস্থা ব্রিটেনের কমিটি ব্যবস্থার অনুকরণে গঠিত হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি ব্যবস্থার সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশী এবং ব্রিটেনের কমিটি ব্যবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য বেশী। প্রথমত, ভারতের কমিটিগুলির মধ্যে কতিপয় কমিটির ক্ষমতা ও কাজ ব্রিটিশ কমিটিগুলির তুলনায় ব্যাপক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, লোকসভার আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee) এবং সরকারী গাণিতিক কমিটি (Public Accounts Committee) সরকারী নীতির মূল্যায়ন করিয়া বিকল্প নীতি গ্রহণের

সুপারিশ প্রদান করিতে পারে এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিবর্তনের সুপারিশও প্রদান করিতে পারে। ব্রিটেনের এই দুইটি কমিটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী কাজের অনুসন্ধান করিতে পারে, কিন্তু সরকারী নীতিকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য লোকসভা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কমিটির প্রবর্তন করিয়াছে। যেমন ভারতের লোকসভা সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি (The Committee on Government Assurances) গঠন করিয়াছে। এই জাতীয় কমিটি ইংলণ্ডে নাই। এই কমিটির কাজ হইতেছে, সরকার বিভিন্ন সময়ে লোকসভায় যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহা কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে লোকসভায় রিপোর্ট প্রদান করা। তৃতীয়ত, ভারতীয় কমিটি-গুলির ক্রিয়াকলাপের ফলে আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কারণ এই কমিটিগুলি বিভিন্ন সরকারী দপ্তরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানাইতে এবং তথ্য সরবরাহ করিতে বলিতে পারে। এইজন্য বিভাগীয় সচিবদের কমিটির সামনে উপস্থিত হইতে হয় এবং কমিটি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হয়।

ভারতীয় পার্লামেণ্টের কমিটিগুলিকে সাধারণভাবে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়; অস্থায়ী কমিটি (Ad Hoc Committees) এবং স্থায়ী কমিটি (Standing Committees)। অস্থায়ী কমিটিগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয় এবং এইগুলির কাজ শেষ হইলে কমিটিগুলিও ভাঙ্গিয়া যায়। যেমন, বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills) এবং যুক্ত কমিটিগুলি (Joint Committees) কাজ সমাপ্ত হইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। স্থায়ী কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয় এবং অস্থায়ী কমিটিগুলির ন্যায় কাজ শেষ হইলেই ভাঙ্গিয়া যায় না। ভারতে স্থায়ী কমিটিগুলির উদাহরণ হিসাবে ভারতের লোকসভায় ও রাজ্যসভায় কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি (Business Advisory Committee), আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petitions), অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (Privilege Committee), নিয়মাবলী সম্পর্কিত কমিটি (Rules Committee), সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লোকসভার বিভিন্ন কমিটি (The Committees of the House of the People)ঃ লোকসভার অধিবেশন সুরু হইলেই স্পীকার অনধিক ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি (Business Advisory Committee) গঠন করেন। স্পীকার নিজে এই কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটির প্রধান কাজ হইতেছে সরকারী বিল আলোচনা অথবা অন্যান্য সরকারী কাজের জন্য কতটা সময় ধার্য করা হইবে সেই সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা। অনুরূপ একটি কমিটি হইতেছে আবেদন সংক্রান্ত

কমিটি (Committee on Petitions)। ইহার সদস্য সংখ্যাও ১৫ জন। জনসাধারণ কোন বিল অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে লোকসভার নিকট যে আবেদন করে তাহা বিচারবিবেচনা করা এবং লোকসভার নিকট সেই সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা এই কমিটির কাজ।

স্পীকার লোকসভার কর্মপদ্ধতি ও পরিচালনা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার জন্য ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি (Rules Committee) গঠন করেন এবং পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতিত্ব করেন। প্রয়োজন মনে করিলে এই কমিটি লোকসভার নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য সুপারিশ প্রদান করিতে পারে।

অধিকার সংক্রান্ত কমিটিও (Committee of Privileges) স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হয়। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। এই কমিটি লোকসভার, লোকসভার সদস্যের অথবা লোকসভার কোন কমিটির অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের বিচার বিবেচনা করে। লোকসভা অথবা স্পীকার যদি অধিকার ভঙ্গ সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন এই কমিটির নিকট প্রেরণ করেন তখন এই কমিটিকে বিভিন্ন তথ্য বিচার করিয়া স্থির করিতে হয় প্রকৃতই অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে কিনা, এবং ঐ মর্মে সুপারিশ প্রদান করিতে হয়।

স্পীকার কর্তৃক আরও তিনটি কমিটি এক বৎসরের জন্য মনোনীত হয় এবং সেইগুলিরও সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। কমিটিগুলি হইতেছে মন্ত্রিরা লোকসভায় যে প্রতিশ্রুতি দেন তাহা কতদূর কার্যকর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Government Assurances), শাসন বিভাগের হস্তে সমর্পিত (delegated) আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সম্পর্কে নিয়ম-কানুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য সদস্য দ্বারা গঠিত অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Subordinate Legislation) এবং লোকসভার বৈঠকে সদস্যদের অনুপস্থিতি বিচার করা সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Absence of Members from the Sittings of the House)। কোন বিল আইনে পরিণত হইবার পূর্বে যখন বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন সিলেক্ট কমিটি (Select Committee) গঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্যই এই কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন এবং সদস্যদের মধ্য হইতে স্পীকার সভাপতি নিযুক্ত করেন। বিলের বিভিন্ন ধারা লইয়া এই কমিটি আলোচনা ও বিচার বিবেচনা করে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারী নথিপত্র ও জ্ঞাতব্য তথ্য তলব করে। সিলেক্ট কমিটি উহার রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করে।

বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য কমিটিও (Committee on Private Member's Bills and Resolutions) অনধিক ১৫ জন সদস্য

লইয়া এক বৎসরের জন্য স্পীকার কর্তৃক গঠিত হয়। সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার জন্য ১০ জন লোকসভার সদস্য এবং ৫ জন রাজ্যসভার সদস্য লইয়া একটি কমিটি (Committee on Public Undertakings) ১৯৬৪ সাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। লোক-সভার দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হইতেছে সরকারী গাণিতিক কমিটি (Public Accounts Committee) এবং আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee)। দুই কক্ষের যুক্তকমিটিও (Joint Committee of both Houses) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যখন কোন বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রী বা সদস্য প্রস্তাব করেন যে বিলটি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, তখন এই কমিটি গঠিত হয়। যে কক্ষে বিলটি উত্থাপিত হয়, সেই কক্ষের সদস্যদের নাম ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উল্লেখ করেন। অপর কক্ষ তখন ইহার সদস্যদের নাম স্থির করে। এই ভাবে যুক্ত কমিটি গঠিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

আইন প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেণ্টের কাজ **(Functions of the Parliament regarding Law-making)**—পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। ইহার অধিবেশন বজায় রাখা এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। অবশ্য এই কাজে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হন।

পার্লামেণ্টের মুখ্য কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা। সরকারী এবং বে-সরকারী বিলগুলি লইয়া বিতর্কের অনুষ্ঠান করিয়া ও সেইগুলি অনুমোদন করিয়া রাজ্যসভার নিকট প্রেরণ করাই লোকসভার মুখ্য কাজ। কিন্তু, অর্থ সংক্রান্ত বিল শুধু লোকসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে, শুধু লোকসভাই ইহার সংশোধন করিতে পারে। অর্থসংক্রান্ত বিল লইয়া রাজ্যসভা বিতর্ক করিতে পারে বটে; কিন্তু ইহার সংশোধন করিতে পারে না। সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় তালিকার (Union List) এবং যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেই পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, অথবা সন্ধি, চুক্তিও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সর্ত পালন করিবার প্রয়োজন হয় অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয় তাহা হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কখনও এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনপ্রণয়ন করা উচিত, তবে পার্লামেণ্ট সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় লইয়া রাজ্য বিধানমণ্ডল এবং পার্লামেণ্টের প্রণীত আইনের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়, তবে পার্লামেণ্টের আইনটিই কার্যকর হইবে এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইনটি বাতিল হইয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব **(Parliament's Control Over Union Finances)**—কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ, কেননা, সরকারের সুপারিশ ব্যতীত কোন নূতন কর ধার্যের দাবী অথবা ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী করা যায় না। লোকসভার ক্ষমতা হইল ব্যয় হ্রাস বা বিলোপ করার,—ইহা ছাড়া, সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার অন্য কোন ক্ষমতা নাই। অবশ্য সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সমালোচনা করিবার এবং কৈফিয়ৎ তলব করিবার অধিকার লোকসভার আছে। তবে বর্তমানে কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যাপারে লোকসভার যাহা কিছু ক্ষমতা, তাহা মন্ত্রিগণই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। সরকারের আয়-ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্যসভার সিদ্ধান্ত লোকসভার সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। যেমন রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি। এইগুলি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল **(Consolidated Fund of India)** হইতে খরচ করা হয়। এইগুলি পার্লামেন্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ ব্যয় (Votable expenditures) নহে; পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ এইগুলি লইয়া আলোচনা করিতে পারে।

সরকারের উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব **(Parliament's Control over the Government)**—তত্ত্বের দিক হইতে চিন্তা করিলে পার্লামেন্ট সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কেননা মন্ত্রিগণকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণ মন্ত্রিগণকে সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণও সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। তাহা ছাড়া, মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা অথবা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকার লোকসভার আছে এবং তাহা কার্যকরী হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রিত করে।

পার্লামেন্ট ও ইহার সদস্যগণের অধিকার **(Privileges of the Parliament and its Members)**—সংবিধানের ১০৫ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে পার্লামেন্টের সদস্যগণ বাক-স্বাধীনতা, আইন সভায় বলা অথবা করা কোন কাজের জন্য কোন আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত না হওয়ার স্বাধীনতা, গ্রেপ্তার না হওয়ার স্বাধীনতা প্রভৃতি ভোগ করেন। আরও বলা হইয়াছে যে যতদিন পর্যন্ত পার্লামেন্ট আইনের দ্বারা পার্লামেন্ট ও ইহার সদস্যগণের অধিকার স্থির না করিতেছে ততদিন ভারতীয় পার্লামেন্ট ও ইহার সদস্যগণ ইংলণ্ডের কমন্স সভা (House of Commons), ইহার সদস্যগণ ও বিভিন্ন কমিটি যে ক্ষমতা ভোগ করিত তাহাই ভোগ করিবে।

ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল এবং পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি—ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ সরকার ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করিতেছেন কিনা দেখার জন্য ও উক্ত মর্মে পার্লামেন্টে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল হিসাব রক্ষক ও পরীক্ষকের কাজ করেন। তাঁহাকে হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া কেবলমাত্র হিসাব পরীক্ষকের কাজেই নিযুক্ত রাখার জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে। সরকারের বিনিয়োগ হিসাব এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করাই হইল পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির কাজ। এই উদ্দেশ্যে এই কমিটি দেখে যে,—যে টাকা সরকারের হিসাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া দেখান হয় তাহা ন্যায্যতঃ মঞ্জুর করা হইয়াছিল কিনা, এক খাত হইতে আর এক খাতে যে টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ আছে কিনা এবং ক্ষতি ও অপচয় বন্ধ করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করা যায় কিনা।

পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Two Houses in the Parliament)—অর্থসংক্রান্ত বিল ব্যতীত যে কোন বিল পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে প্রথমে উত্থাপিত হইতে পারে, এবং এক কক্ষে ইহা অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষে ইহা প্রেরিত হয়। উভয় কক্ষই বিলটির রদবদল করিতে পারে। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি (Money Bills) প্রথমে লোকসভায় উত্থাপিত হয়। রাজ্যসভা এই বিলগুলি লইয়া বিতর্ক করিতে পারে, কিন্তু লোকসভার সিদ্ধান্তের উপর বিলগুলির কোনও প্রকার সংশোধন করিতে পারে না। অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর রাজ্যসভায় প্রেরিত হইলে, রাজ্যসভাকে ১৪ দিনের মধ্যে ইহার সুপারিশসহ বিলটিকে লোকসভার নিকট ফেরৎ পাঠাইতে হয়। ঐ সুপারিশগুলি গ্রহণ করা অথবা না-করা লোকসভার উপর নির্ভর করে। যদি রাজ্যসভা ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি ফেরত না পাঠায়, তবে বিলটি অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং যথারীতি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ইহাকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য বিলগুলিকে আইনে পরিণত করার ব্যাপারে দুইটি কক্ষই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। যদি একটি কক্ষ কোন সাধারণ বিল অনুমোদন করে অথচ অপর কক্ষ ইহা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা বিলটির সংশোধন সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় অথবা একটি কক্ষ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর অপর কক্ষ ছয় মাসের মধ্যেও বিলটি অনুমোদন না করে, তবে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে বিলটি অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। কোন বিলকে আইনে পরিণত হইতে হইলে ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতের পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে বিলটির তিনটি পাঠ (Three Readings) হয় এবং ইহার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাজ্যসভার কোন কোন সদস্য লোকসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। তাহাছাড়া, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভা অধিকতর শক্তিশালী।

ভারতীয় পার্লামেণ্টের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা—শাসনতান্ত্রিক মর্যাদার দিক হইতে ভারতীয় পার্লামেণ্ট, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট এবং আমেরিকার আইনসভার মধ্যবর্তী একটি স্থান অধিকার করে। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার মধ্যে থাকিয়া ভারতীয় আইনসভা যে কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু সংবিধান বিরোধী কোন আইন আদালত কর্তৃক বাতিল হয়।

লোকসভার স্পীকার—স্পীকার লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন। যদি কোন বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হয় তবে তিনি নির্ণায়ক ভোট দান করেন। লোকসভার অধিবেশনে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেন। কোন বিল অর্থবিল কিনা কিংবা অর্থবিল লোকসভায় অনুমোদিত হইলে উহা যে অর্থবিল সে সম্বন্ধে প্রমাণপত্র (certificate) প্রদান করেন স্পীকার। তাঁহার সিদ্ধান্ত অর্থবিল নির্ণয়ে চরম। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনাস্থা প্রস্তাবে তিনি পদচ্যুত হন। লোকসভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তাঁহার কাজের মেয়াদ থাকে। তিনি লোকসভার সদস্য হন। তবে স্পীকার নিযুক্ত হওয়ার পর দলীয় সংগঠনের সহিত সাধারণতঃ তিনি যুক্ত থাকেন না, যাহাতে নিরপেক্ষভাবে লোকসভার অধ্যক্ষের কাজ তিনি করিতে পারেন।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা—কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অগণতান্ত্রিক, অনাবশ্যক অপচয়ের কারণ বলিয়া ইহার সমালোচনা করা হইলেও এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে জ্ঞানী, গুণী লোক লইয়া গঠিত এই পরিষদের বলিষ্ঠ আলোচনায় অনেক সময় নিম্নকক্ষ প্রভাবিত হইয়া জন-স্বার্থ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হইতে বিরত থাকে। আবার দ্রুত আইন প্রণয়নের জন্য যে

সমস্ত বিষয়ে যথাযথ চিন্তা করার অবকাশ নিম্নকক্ষ পায় না সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা উচ্চকক্ষ করে এবং নিম্ন-কক্ষকে সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে।

Exercise

1. Discuss the composition and the functions of the Indian Parliament.

(ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।) (১৯৮-১৯৯, ২০০-২০২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the Law-making process in the Indian Parliament. (C. U. 1966)

(ভারতীয় পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা কর।) (২২২-২৫ পৃষ্ঠা)

3. How is a Money Bill passed by the Indian Parliament ?

(পার্লামেন্টে অর্থবিল কিরূপে অনুমোদিত হয় ?) (২২৫-২৬ ; ২২৮-৩১ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the composition and the functions of the House of the People.

(লোকসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর) (১৯৮-২০২ পৃষ্ঠা)

5. Give an account of the position and the powers of the Speaker of the House of the People.

(লোকসভার স্পীকারের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।) (২০৯-২১৪ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the privileges of the Parliament and members of the Indian Parliament.

(ভারতীয় পার্লামেন্টের ও পার্লামেন্টের সদস্যগণের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (২১৮-২২২ পৃষ্ঠা)

7, Give an account of the Parliament's control over Union Finances.

(কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (২৩১-৩৯ পৃষ্ঠা)

8, Discuss the relation between the Lok Sabha and the Council of States.

(লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর) (২০৩-২০৬ পৃষ্ঠা)

9. Do you support bi-cameralism at the centre in India ? Give reasons for your answer.

(কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা কি সমর্থনযোগ্য) (২০৬-২০৯ পৃষ্ঠা)

10 Discuss the relation between the two Houses of the Indian Parliament, (C. U. 1966)

(ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সম্পর্ক আলোচনা কর।) (২০৩-২০৬ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the role and functions of the Comptroller and Auditor General in the Indian Constitution. How far his independence has been sought to be secured in the constitution ? (২৩২-৩৬ পৃষ্ঠা)

(কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা কর। সংবিধান ইহার স্বাতন্ত্র্য কিভাবে বজায় রাখিয়াছে ?)

12. Write a note on the (1) Public Accounts Committee and (2) Estimates Committee. (২৩৬-৩৯ পৃষ্ঠা)

(সরকারী গাণিতিক কমিটি ও আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির উপর টীকা লিখ।)

13. Write a note on the constitutional status of the Parliament of India with special reference to America and Great Britain.

(আমেরিকা ও গ্রেটব্রিটেনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পার্লামেন্টের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা)

14. How far has the supremacy of the Parliament of India been maintained in the Indian democratic constitution?

(ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব কতটা সংরক্ষিত হইয়াছে ?) (২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা)

15. What is a money Bill? Carefully describe the procedure in introducing and passing a Money Bill in the Union Parliament.

(অর্থবিল কাহাকে বলে ? কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে কিভাবে অর্থবিল উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয় বর্ণনা কর।) (২২৫-২৬ ; ২২৮-৩১ পৃষ্ঠা)

16. Discuss the nature of financial control exercised by Parliament over the finances of the Union. (C. U. 1967) (২৩১-৩৯ পৃষ্ঠা)

(পার্লামেন্ট কিভাবে সরকারের অর্থসংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রিত করে আলোচনা কর।)

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজ্যের শাসনব্যবস্থা
(The State Executive)

[রাজ্যপাল—তাঁহার ক্ষমতা ও কাজ—তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও তাঁহার পদমর্যাদা—রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ—তাঁহাদের কাজ ও ক্ষমতা, রাজ্যপালের সহিত সম্পর্ক—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী—এডভোকেট জেনারেল।]

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের শাসনব্যবস্থার জন্য পৃথক ব্যবস্থা রহিয়াছে। তবে রাজ্যের শাসনব্যবস্থার পরিচালনা পদ্ধতি প্রায় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ। রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত। রাজ্যের শাসন-বিভাগের প্রধান একজন রাজ্যপাল।[1] রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনিও রাজ্যসরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ এবং একদল সরকারী কর্মচারী আছেন। নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপালকে রাজ্যের দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ও বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করিতে হয়।

রাজ্যশাসন ব্যবস্থার ভূমিকা

রাজ্যপাল (Governor)ঃ যে কোন ভারতীয় রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীর যে যোগ্যতা থাকা উচিত রাজ্যপালকেও সেই যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়। রাজ্যপালকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হয় এবং অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।[2] সংবিধানের ১৫৮ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল কোনরূপ লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না অথবা কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যের লোকসভার বা বিধানসভার সভ্য থাকিতে পারিবেন না। বিধানসভার বা পার্লামেন্টের কোন সদস্য রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হইলে কার্যভার গ্রহণ করার দিন হইতে আইনসভার ঐ সদস্যপদ শূন্য হইয়াছে ধরা হয়।[3]

রাজ্যপাল পদের প্রার্থীর যোগ্যতা

১। "There shall be a Governor of each state".
[Art. 153 of the Constitution]

২। "No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years."
[Art. 157 of the Constitution]

৩। "The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the legislature of any state specified in the 1st schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the legislature of any such state be appointed Governor he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor".
[Art, 158 (1) and (2) of the Constitution]

রাজ্যপালের কার্যকলাপ ৫ বৎসর নির্দিষ্ট থাকিলেও তিনি পুনঃনির্বাচিত হইতে পারেন।

ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় রাজ্যগুলির শাসকপ্রধান রাজ্যপালের নিয়োগ ও পদচ্যুতির আলোচনা প্রসঙ্গে পৃথিবীর অপর কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অংশ-রাজ্যের রাজ্যপ্রধানগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমেরিকায় অঙ্গ রাজ্যগুলির রাজ্যপাল সেই রাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাঁহাদিগকে অপসারণ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভাকে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে হয় (Impeachment)। এইরূপভাবে আইনসভা কর্তৃক অভিযুক্ত (impeached) হইয়া তাঁহারা অপসারিত হন। আবার কোন কোন রাজ্যে তাঁহাদিগকে প্রত্যাগমন (recall) করানো যায়। এইরূপ আদেশ করার অধিকারী রাজ্যের জনগণ এবং সেই আদেশের মারফৎ রাজ্যপালকে পদচ্যুত করা যায়। আবার অষ্ট্রেলিয়ায় রাজ্যপালগণ গ্রেটবৃটেনের মন্ত্রিসভা কর্তৃক সমর্থিত হইয়া রাজশক্তি দ্বারা নিযুক্ত হন ও তাঁহাদের পদচ্যুতি সংক্রান্ত ক্ষমতাও রাজশক্তি ভোগ করে। অষ্ট্রেলিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যে রাজ্যপালের নিয়োগ ও পদচ্যুতিতে কোন ক্ষমতা নাই। কেবলমাত্র ব্রিটিশ সরকার রাজ্যপাল নিয়োগের সময় অষ্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ট অংশ-রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর মতামত গ্রহণ করে। ক্যানাডার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রদেশসমূহের উপরাজ্যপাল (Lieutenant Governor) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ইহাদের পদচ্যুত করার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করে। ভারতের রাজ্যগুলির রাজ্যপাল নির্বাচনেও ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি রাষ্ট্রপতির মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার রাজ্যপালের পদচ্যুতির ব্যাপারেও ক্যানাডা ও ভারত উভয়েরই মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে; তাহা হইল, কেন্দ্রীয় সরকার (ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি) রাজ্যপালকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তবে উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্যটি পরিলক্ষিত হয় তাহা হইল ক্যানাডায় রাজ্যপালকে পদচ্যুত করিতে হইলে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণকে পদচ্যুত করিতে হইলে এইরূপ কোন কারণ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতে রাজপালকে কেন্দ্রীয় সরকারের যন্ত্র বা এজেণ্ট হিসাবে রাজ্যে ব্যবহার করার জন্য রাষ্ট্রপতির হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কতিপয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যপালগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতির পদ্ধতি বিশ্লেষণ

রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যপালের কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া একথা বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে যে কোন সময় পদচ্যুত করিতে পারেন।

ইহা ছাড়া রাজ্যপালের কার্যকাল সমাপ্ত হইবার পূর্বেও রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে পারেন[৪] [সংবিধানের ১৫৬(২) ধারা]। তিনি মাসিক ৫৫০০৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন, বিনা ভাড়ায় বাসস্থান পাইবেন। পার্লামেণ্ট তাঁহার বেতন সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে, তবে সংবিধানের ১৫৮(৩)(৪) নং ধারা অনুযায়ী তাহার কার্যকালের সময় বেতন হ্রাস করা চলিবে না।

রাজ্যপালের কার্য হইতে অবসর ও কার্যে অবস্থানকালীন ভাতা

রাজ্যপালের নির্বাচিত হওয়া উচিত কিনা :

অনেকে বলেন রাজ্যপালের রাজ্যের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া উচিত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়, কেননা প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী ব্যবস্থার ইহাই নীতি। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজ্যপালগণ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁহার ইচ্ছাধীনে রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই ব্যবস্থা একটু অগণতান্ত্রিক এবং ইহা আমাদের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র-প্রবণতা সূচীত করে। তবে এই নিয়মের স্বপক্ষে এতদিন বলা হইত যদিও রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, তবুও তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসনকাজ পরিচালনা করেন না; রাজ্যের শাসনবিভাগীয় কাজ প্রকৃত পক্ষে পরিচালনা করেন রাজ্যের মন্ত্রিসভা। সুতরাং এই ক্ষেত্রে রাজপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মোটেই অগণতান্ত্রিক হয় নাই। কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে রাজ্যপালগণ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য-রাজনীতিতে যোগ দিয়াছেন রলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, অনেক রাজ্যেই বর্তমানে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা থাকায় অনেকেই এই সন্দেহ পোষণ করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপাল অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারের ক্রিয়াকলাপে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অনেকে মনে করেন যে পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালগণের নির্বাচিত হওয়া উচিত। সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রথা অনুযায়ী রাজ্যপালের নিয়মতান্ত্রিক, দলনিরপেক্ষ শাসক হিসাবেই কাজ করা উচিত। রাজ্যপাল দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিবেন ইহাই আমাদের সংবিধানের ব্যবস্থা মনে

৪। "The Governor shall hold office during the pleasure of the President."

The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office."

[Act. 156 (1) and (2) of the Indian Constitution]

হয়। যদি রাজ্যপাল নির্বাচিত হন তবে তিনি অবশ্যই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সহিত যুক্ত হইবেন। কেননা, সেক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর অভিরুচি অনুযায়ী রাজ্যপালকে চলিতে হইবে। সেইজন্য অনেকে মনে করেন রাজ্যপালকে নির্বাচিত করিবার ব্যবস্থা না করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ ঠিক কাজই করিয়াছেন। বরং যেহেতু রাজ্যপালকে সর্বদাই দলনিরপেক্ষ থাকিতে হয়, সেইজন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিযুক্ত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এবং রাজ্যপালকে দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে রাখায় ভালই হইয়াছে। তবে ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত ভাষণের সম্পূর্ণ অংশ রাজ্যপাল গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে নূতন বিধানমণ্ডলীর উদ্বোধনের দিন যে জটিলতার সৃষ্টি হয় (৬ই মার্চ ১৯৬৯ সালে) তাহার জন্য কোন কোন মহল দাবি করেন যে রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারেই রাজ্যের রাজ্যপালগণকে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন করা উচিত।

রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং কাজ (**Powers and Functions of a Governor**)ঃ রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত। রাজ্যের সমুদয় কার্য তাঁহার নামেই পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতির ন্যায় কূটনৈতিক অথবা সামরিক ক্ষমতা রাজ্যপালের নাই। শাসন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত এবং আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা তাঁহার আছে।

রাজ্যপালের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (**Executive Power**)ঃ সংবিধানের ১৫৪ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত। উক্ত ক্ষমতাসমূহ তিনি নিজে পরিচালনা করেন অথবা তাঁহার নিয়োজিত কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক করান।[৫] সংবিধানের ১৬৪ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহারই পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রিমণ্ডলী ছাড়াও রাজ্যপাল রাজ্যের এড্‌ভোকেট জেনারেল এবং রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দকে নিয়োগ করেন। মন্ত্রিমণ্ডলী এবং এডভোকেট জেনারেলের কার্যকাল রাজ্যপালের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দকে তিনি পদচ্যুত করিতে পারেন না। সংবিধানের ৩১৭ নং ধারা অনুযায়ী তাঁহারা সুপ্রীম কোর্টের বিবৃতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুত হইতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিবার অধিকার না থাকিলেও সংবিধানের ২১৭(১) নং ধারা অনুযায়ী এই নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৫। "The executive power of the state shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution". [Art. 154(1)]

সংবিধানের ৩৩৩ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল ইঙ্গ-ভারতীয় জনসাধারণের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোককে বিধানমণ্ডলের সদস্যরূপে মনোনীত করিতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন উক্ত সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত রূপ প্রতিনিধিত্ব সম্ভবপর হয় নাই। প্রথম পর্যায়ে এইরূপ মনোনয়নের মাধ্যমে সংরক্ষণ ক্ষমতা সংবিধান চালু হওয়ার পর দশবৎসর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। কিন্তু সংবিধানের অষ্টম সংশোধনের দ্বারা এইরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থার কার্যকাল আরও দশবৎসর অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়ান হইয়াছে। সংবিধানের ১৭১(৫) নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলের উচ্চকক্ষে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতির ক্ষেত্র হইতে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিবৃন্দের কয়েকজনকে সদস্যপদে মনোনীত করিতে পারেন।

রাজ্যপালের যাবতীয় শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির সহিত জড়িত। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রাজ্যপাল যে ক্ষমতা উপভোগ করেন তাহার সহিত যদি উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির পার্থক্য হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি গৃহীত হইবে এবং রাজ্যসরকারের নীতি বাতিল হইবে।

রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বিভিন্ন রাজ্যের উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির ব্যবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা। এই সম্পর্কে রাজ্যপালকে ভারত সরকারের নিকট প্রতি বৎসর একটি বিবৃতি পেশ করিতে হয়।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers of the Governor): রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলীর একটি অংশ। রাজ্যপাল তাঁহার আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বলে রাজ্যবিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে অথবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সংবিধানের ১৭৫নং ধারা অনুযায়ী বিধানসভার অথবা বিধানমণ্ডলীর উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ঘটাইতে পারেন।[৬] তিনি কোন বিল সম্পর্কে আলোচনাকালে অথবা অন্য কোন ব্যাপারেও বিধানমণ্ডলীর একটি অথবা উভয়কক্ষে বাণী প্রেরণ করিতে পারেন।[৭] সংবিধানের ১৭৬(১) নং ধারা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর এবং প্রতি বৎসর প্রথম অধিবেশন সুরু হওয়ার দিন রাজ্যপাল বিধানসভা অথবা বিধানমণ্ডলীর উভয়

৬। Art. 175 (1)—"The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a state having a Legislative council either House of the legislature of the state, or both Houses assembled tcgether, and may for that purpose require the attendance of members."

৭। Art. 175 (2) "The Governor may send messages to the House or Houses of the Legislature of the state, whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration."

পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বানের কারণ ব্যক্ত করিবেন।[৮]

রাজ্যপাল সম্মতিদান না করিলে কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। একটি বিল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হইবার পর রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন। সেক্ষেত্রে উহা আইনে পরিণত হয়। তিনি বিলটিতে সম্মতিদান নাও করিতে পারেন অথবা নিজে সম্মতি প্রদান না করিয়া রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। তিনি কিছু সংশোধনী প্রস্তাবসহ অথবা উহা ছাড়াই পুনর্বিবেচনার্থে বিলটিকে রাজ্যবিধানসভার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। যদি রাজ্যবিধানমণ্ডলী বিলটিকে বিবেচনার পর পুনরায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে রাজ্যপালের সংশোধনী প্রস্তাব বিলটিতে গৃহীত হউক বা না হউক উক্ত বিলে রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন। হাইকোর্টের মর্যাদার হানি হয় এইরূপ বিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার বিবেচনার্থে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকেন। রাষ্ট্রপতি অর্থবিল ব্যতীত অন্যবিলের ক্ষেত্রে উহাতে সম্মতি দান করিতে পারেন অথবা একটি বাণীসহ রাজ্যপালের মাধ্যমে বিধানমণ্ডলীর নিকট পুনর্বিবেচনার্থে উহা প্রেরণ করিতে পারেন। বিলটি পুনর্বিবেচিত হইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহাতে সম্মতি প্রদান করার অথবা সম্মতি প্রদান না করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির।

অর্থাৎ একটি রাজ্যের রাজ্যসংক্রান্ত বিল রাজ্যপাল কর্তৃক রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে উক্তবিলের আইনে পর্যবসিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির উপর। অর্থসংক্রান্ত যে বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থে প্রেরণ করা হয় তাহাতে তিনি হয় সম্মতি দান করিবেন কিংবা উহাতে সম্মতিদান করিবেন না। সংবিধানে এমন কোন ধারা গৃহীত হয় নাই যাহাতে কোন বিলে সম্মতি জ্ঞাপন অথবা সম্মতি প্রদান না করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। ফলে কোন বিল অনির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রপতি নিজের নিকট রাখিয়া উহাকে অকার্যকরী করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একটি তৃতীয় পন্থার কথাও বলা যায়। কোন রাজ্যের বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন কিনা এ সম্বন্ধে সংবিধানের ১৪৩ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংরক্ষিত বিলটিকে সুপ্রীম কোর্টে পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। কেরালায় কমিউনিষ্ট দলের মন্ত্রিসভা থাকাকালে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিলটির

৮। Art176 (1) "At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a state having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এই ধারার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিলটিকে সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে যথার্থই রাজ্যের উপর কেন্দ্রের প্রবল প্রাধান্যের কথাই মনে হয়।

রাজ্যপালের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত তাঁহার অর্ডিন্যান্স জারী করিবার ক্ষমতা। সংবিধানের ২১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক প্রণীত অর্ডিন্যান্স রাজ্য বিধানমণ্ডলীর আইনের অনুরূপ বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত অর্ডিন্যান্সের ন্যায় রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স সংক্রান্ত ব্যাপারেও আদালত কোনরূপ বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে না। অর্ডিন্যান্সটি প্রণয়ন করার যৌক্তিকতা লইয়াও আদালতকে বিচার করার ক্ষমতা সংবিধান দান করে নাই। কেবলমাত্র এইরূপ অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের ব্যাপারে 'Legislative competence' লইয়া বিচার করার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়েই কেবল রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। এইরূপ অর্ডিন্যান্স জারী করিবার জন্য রাজ্যপাল আইনসভাকেভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তবে আইনসভাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশের পূর্বেই যদি অর্ডিন্যান্সটি জারী করা হইয়া যায় তবে উহা অবৈধ বিবেচিত হইবে।[৯] এইরূপ অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ক্ষমতা রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন (discretionary) ক্ষমতার অন্তর্গত নয়। এই ক্ষমতা তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্য এবং পরামর্শানুক্রমে পরিচালনা করিয়া থাকেন। অর্ডিন্যান্সটি রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নিকট অনুমোদনের জন্য উহার অধিবেশন সুরু হইবার পর উপস্থাপিত করিতে হয়। আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৬ সপ্তাহ পরে এইরূপ অর্ডিন্যান্স অকার্যকর হয় যদি না পূর্বেই বিধানমণ্ডল কর্তৃক অননুমোদিত হইয়া ইহা বাতিল হইয়া যায়। রাজ্যপাল নিজেও এইরূপ অর্ডিন্যান্স যে কোন সময় প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন। কেন্দ্রীয় কোন আইনের সহিত রাজ্যপাল কর্তৃক ঘোষিত অর্ডিন্যান্সের কোনরূপ বিরোধ থাকিলে রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স চরম বলিয়া বিবেচিত হয়, যদি সেই অর্ডিন্যান্স রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী ঘোষিত হয়।

রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ক্ষমতা

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা: সংবিধানের ২০২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারের যাবতীয় সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব রাজ্যপাল বাজেটের আকারে প্রতি আর্থিক বৎসরের প্রথমে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে দিয়া বিধানসভায় উত্থাপিত করেন। তাঁহার সুপারিশ ব্যতীত ব্যয় বরাদ্দের কোন দাবি করা যায় না। সংবিধানের ২০৫ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যের জন্য অধিক ব্যয় বরাদ্দের দাবী করিতে পারেন। যে কোন প্রকার অর্থ সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমতি ব্যতীত বিধানসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না (সংবিধানের ২০৭ নং ধারা)। আবার এইরূপ বিল বিধান পরিষদে প্রথমেই উত্থাপন করা যায় না।

৯। Bidya v. Prov. of Bihar, A. 1950 Pat. 19,

রাজ্যপালের বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা—সংবিধানের ১৬১ নম্বর ধারা অনুযায়ী যদি আদালতের বিচারে দোষী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোন মামলায় হারিয়া যায়, যাহার উপর রাজ্যের শাসনবিভাগের পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে, তাহা হইলে রাজ্যপাল সেই ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন অথবা তাহার দণ্ডাদেশ লাঘব করিয়া দিতে পারেন।[১০] রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,

(ক) রাষ্ট্রপতি সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মকুব, মার্জনা, হ্রাস করিতে পারেন ; রাজ্যপালের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

(খ) কেন্দ্রীয় আইন ভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধী ব্যক্তির যে কোন দণ্ড মার্জনা, মকুব প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি করিতে পারেন ; কিন্তু রাজ্য সরকারের আইন ভঙ্গ জনিত অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মার্জনা করার ক্ষমতা রাজ্যপালের নাই। অন্য কোন দণ্ড হ্রাস করা, বা মকুব করার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করা অথবা উহাকে অন্য দণ্ডে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে।

(গ) মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত আদেশ রহিত করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতিই উপভোগ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মকুব, হ্রাস প্রভৃতি রাজ্যসরকারের ক্ষমতাগুলি রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করার কথা বলেন। তাহাদের যুক্তি হইল, রাজ্যে যে রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য বেশী থাকিবে সেই দলের জনসাধারণ রাজ্যপালের দণ্ড হ্রাসের ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় দণ্ডের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। তবে বিরুদ্ধ সমালোচক ইহার বিরুদ্ধেও মন্তব্য করেন এবং রাষ্ট্রপতির হস্তে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হইলেও যে দণ্ডের গুরুত্ব কমিবে না সে সম্বন্ধেও তাহারা নিঃসন্দেহ নহেন। দীর্ঘকালীন সমাধান হিসাবে এ কথা বলা চলে যে, আইনকে রাজনৈতিক কোনরূপ চাপ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখাই ভাল এবং দণ্ড হ্রাস, মকুব এবং মার্জনা করার ব্যাপারে আইনের অন্তর্নিহিত ভাবের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত—তাহার প্রতিটি শব্দের অর্থের দ্বারা নহে। সেজন্য শাসনতন্ত্রের সংশোধন নিষ্প্রয়োজন।

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও তাঁহার পদমর্যাদা (Discretionary powers and position of Governor) : রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির

১০। *Art*, 161 :—"The Governor of a state shall have the power to grant pardons, reprieves, respite or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends."

ন্যায় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপালকে কিছু স্বেচ্ছাধীনভাবে কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা (To act in his discretion) দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। এ কথাও উক্ত ধারায় বলা আছে যে, রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলির নির্বাচনে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চরম এবং চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। উহার বৈধতা লইয়া কোনরূপ প্রশ্ন করা চলিবে না। রাজ্যপালকে মন্ত্রিসভা কোন পরামর্শদান করিয়াছিল কি না অথবা পরামর্শ দান করা হইয়া থাকিলে কি ধরণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কোন এক্তিয়ার আদালতের নাই।[১১]

স্পষ্টরূপে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাসমূহের কথা সংবিধানের কয়েকটি ক্ষেত্রেই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের (খ) বিভাগে বর্ণিত উপজাতি এলাকার শাসন পরিচালনার ব্যাপারে আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি (Agent) হিসাবে তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। সংবিধানের ২৩৯ (২) ধারা অনুসারে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট কোন রাজ্যের রাজ্যপালকে প্রদান করিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় (discretion) উক্ত ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসনকার্য মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই পরিচালনা করিতে পারেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে একথা মনে করা ঠিক নয় যে, উক্ত বিষয়গুলি ছাড়া রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

১১। *Art* 163 (1) "There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, expect in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

163 (2) "If any question arises whether any matter is or is not a matter in respect of which the Governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion."

163 (3) "The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any Court."

রাজ্যপালের পরিপূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির নিকট। ইহা ছাড়া, রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নির্ধারণের ব্যাপারে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত চরম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে একথা স্পষ্ট হইবে যে, রাজ্যপাল সংবিধানে বর্ণিত না থাকিলেও মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত আরও কিছু ক্ষেত্রে আপন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিমণ্ডলীয় পরামর্শ ছাড়া রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিচালনা

১৯৬৯ সালের ৬ই মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর যৌথ অধিবেশন উদ্বোধনকালে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর মন্ত্রিসভা কর্তৃক লিখিত ও অনুমোদিত ভাষণের সম্পূর্ণ অংশটি পাঠ করেন নাই। কারণ, তিনি নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অনুমোদিত ভাষণটির দুইটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশগুলি পাঠ করেন। শাসনতন্ত্রের ১৭৬ নং ধারা অনুযায়ী যদিও রাজ্যপাল নূতন নির্বাচিত বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন উদ্বোধনকালে কেন বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন উদ্বোধন করা হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে বাধ্য, এবং যদিও সেক্ষেত্রে রাজ্যপালকে মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রস্তুত ভাষণ পাঠ করিতে হয়, তবুও রাজ্যপাল সেক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া দুইটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া ভাষণটি পাঠ করেন। রাজ্যপাল এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার কারণ হিসাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে উক্ত অনুচ্ছেদ দুইটি সরকারের নীতির সহিত সম্পর্কশূন্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ।[১২] উদাহরণ স্বরূপ প্রথমত, সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুসারে চলিতেছে না বলিয়া একটি রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ রিপোর্ট রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও যাইতে পারে। সুতরাং মন্ত্রিসভার বিপক্ষে দেওয়া রিপোর্ট মন্ত্রিসভা কর্তৃক সমর্থিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালের কেরালার ঘটনাবলীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। ১৯৫৯ সালে তৎকালীন কেরলের রাজ্যপাল শ্রীরামকৃষ্ণরাও-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করেন। সেই সময় সেখানে কমিউনিষ্ট দল শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল। কেরালার মন্ত্রিসভার নীতির সহিত

১২। Art 176: "At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Lagislature of the causes of its summons."

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দরুণই সম্ভবতঃ রাজ্যপাল এইরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে সেখানকার কমিউনিষ্ট শাসনের বিলোপ ঘটান। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যে কতখানি অসীম তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার ১৯৬৩ সালে যখন উত্তর প্রদেশে মন্ত্রিসভার সংকট সুস্পষ্ট হয় তখনও দেখা যায় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দিল্লী পর্যন্ত গমন করিয়াছেন। কোন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। কেরালায় ১৯৬৫ সালের নির্বাচনোত্তর ঘটনা রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেখানে কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলেও দুই একটি দলের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যে যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার মাধ্যমে মন্ত্রিসভা গঠনের একটি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তাহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সেখানে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নির্বাচনে কোন একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়তো ছিল না, কিন্তু দুই একটি দলের মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য যে সক্রিয় প্রস্তুতি দেখা গিয়াছিল তাহাকে কোনরূপ মর্যাদা দান না করিয়া এইরূপ ভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করায় অনেক মহল হইতেই তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল, রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়াছিলেন। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ১৮ই ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন, কিন্তু রাজ্যপাল সেই পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছে এই ধারনার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন, যেহেতু তাঁহার পরামর্শমত যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ১৮ই ডিসেম্বরের পূর্বে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে অস্বীকৃতি জানান।[১৩]

দ্বিতীয়ত, একটি মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। তবে আইনসভায় একের অধিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেই এইরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিচালনা প্রকট হয়। একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে রাজ্যপালের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠনে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশ ও বিহারে আইন সভায় বৃহত্তম দল হিসাবে কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হয় যদিও বিরোধীদলের মধ্য হইতেও অন্য দলের সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল। বিহারে কতিপয় দলের

১৩। এই প্রসঙ্গে "রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্ক" সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

সহযোগিতায় গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ। আইন সভায় সরকার পক্ষের পরীক্ষা না হওয়া অবধি এই সমস্যার সমাধান হইবে না মনে হয়।

ইহা ছাড়া, রাজ্যের কোন বিল রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও তাহা আইনে পরিণত হইবার পূর্বে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান নাও করিতে পারেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কয়েকটি বিষয়ে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনার্থে এইরূপ বিল তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত রাজ্যপাল নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার (discretionary power) প্রয়োগ করিতে পারেন। রাজ্য ও কেন্দ্রের মন্ত্রিপরিষদ একদলীয় না হইলে সাধারণতঃ রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক হয়। কেননা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতির অভিরুচির উপর নির্ভরশীল রাজ্যপালের স্থায়িত্ব কখনই বজায় থাকে না যদি না রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শানুযায়ী গৃহীত বা পরিচালিত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যের মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির উক্ত ইচ্ছার সহিত একমত নাও হইতে পারেন। তাই রাজ্যপাল এইসব ক্ষেত্রে নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কমিউনিষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলী প্রস্তাবিত কেরালা শিক্ষাসংক্রান্ত বিলটিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য রাজ্যপাল প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদিও কেরালার আইনসভা বিলটি অনুমোদন করিয়াছিল তবুও রাজ্যপাল তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের মতামত গ্রহণ করিয়া উহা নাকচ করিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে ইহা অনুধাবন করা যায় যে, রাজ্যপাল অংশতঃ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। জরুরী অবস্থায় যখন রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতির 'এজেন্ট' বা প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিতে হয়, তখনও তাঁহার পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। আপাতদৃষ্টিতে নিয়মতান্ত্রিক হইলেও তাই তাঁহাকে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিনিধি বলিয়া অভিহিত করিলে বোধহয় খুব ভুল হইবে না।[১৪]

১৪। "......in Dr. Ambedkar's words addressed to the Constituent Assembly, the Governor may reserve certain things in order to give the President (Union Government) the opportunity to see that the rules under which the provincial Governments are supposed to act according to the Constitution or in subordination to the Central Government are observed. But should the Governor choose to exercise his discretion

রাজ্যপালের পদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, রাজ্যপাল পূর্বের ন্যায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার উপর অধিক দৃষ্টি না রাখিয়া শাসনতন্ত্র এবং রাষ্ট্রপতির মর্যাদার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন। রাজ্যের সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা এবং সেইমত তাঁহার রিপোর্ট তৈয়ারী করার দিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়। রাষ্ট্রপতির কোনরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা না থাকায় তাঁহার পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ সৃষ্টি না করিয়া উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। এই দিক হইতে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের পদের প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতির পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করা খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হইয়া টিঁকিয়া থাকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। রাজ্যপাল এই দিক হইতে কিছুটা মন্ত্রিসভার শাসনমুক্ত। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শানুক্রমে রাজ্যপালকে রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী শাসক-প্রধান করিয়া তুলিতে পারেন। রাজ্য-মন্ত্রিসভা অপেক্ষা ও রাষ্ট্রপতির অভিরুচির জন্য রাজ্যপালকে বিশেষভাবে যত্নবান হইতে হয়। তবে যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিমণ্ডলী একই দলভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে কোনরূপ গোলযোগ হওয়ারই সুযোগ ঘটে না, কেননা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শানুক্রমে কার্যতঃ রাজ্যশাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলীর মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রধানমন্ত্রী একই দলভুক্ত বলিয়া নীতির দিক হইতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা দেয় যাহার ফলে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে রাজ্যপালের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে সব সময়েই অবহিত থাকিতে পারেন।

রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্যপাল ঃ—সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালকে উপদেশ ও পরামর্শ দিবার জন্য এবং তাঁহার কার্যে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। রাজ্য বিধানমণ্ডলে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা সংবিধানের ১৬৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যপাল কর্তৃক

---

independently of the Centre. the President (Union Government) would according to Article 156 (1) of the constitution be entitled to withdraw his pleasure from him. Whereas the limits to the Governor's discretion within the constitutional machiney of the local States are mainly determined by an express constitutional provision, his responsibility to the centre is not moral as suggested by one of the members of the Constituent Assembly, but sanctioned by law." (Alexandrowicz—Constitutional Development in India, PP. 144-45).

নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল সংবিধানের উক্ত ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন।

রাজ্যপাল ও মন্ত্রিমণ্ডলী

মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ সমস্ত বিষয়ে রাজ্যপালকে পরামর্শ দান করিবে, তবে সংবিধানের ১৬৩(২) নম্বর ধারায় একথা বলা আছে যে, কয়েকটি বিষয়ে রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে স্বেচ্ছাধীন বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা রাজ্যপাল উপভোগ করেন। এই ক্ষমতার প্রয়োগকালে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা হোক বা না হোক উহার বৈধতা সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

মন্ত্রিগণ সমষ্টিগতভাবে রাজ্য বিধানসভার নিকট এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যপালের নিকট দায়ী থাকেন। যে কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক মন্ত্রীকে আইনসভার যে কোন কক্ষের সভ্য হইতে হয়।

মন্ত্রিমণ্ডলীর দায়িত্ব

যদি এমন কোন লোক মন্ত্রী নিযুক্ত হন, যিনি আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে আইন সভার সদস্যপদে নির্বাচিত হইতে হয়, অন্যথায় তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ হইতে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিগণ প্রত্যেক রাজ্যের স্বার্থের সহিত জড়িত এক বা একাধিক দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। যদিও শাসনতন্ত্রে কেবলমাত্র মন্ত্রিসভার উল্লেখই রহিয়াছে, তবুও রাজ্য মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী দেখা যায়। যদি বিধান সভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করেন অথবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন তবে সমষ্টিগতভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকেন বলিয়া মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইনের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীর বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হয়।

সংবিধানের ১৬৭নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শাসন ও আইন বিষয়ক সমুদয় প্রস্তাব রাজ্যপালকে জ্ঞাত করান। ইহা ছাড়াও, উক্ত ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত যে সব বিষয়ে অবহিত হইতে চাহেন, সেই সব বিষয়ে তাঁহাকে অবহিত করাইবার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যপাল কোন একজন মন্ত্রীর প্রস্তাবকে মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা বিবেচনা করাইতে পারেন, যদি ঐরূপ কোন প্রস্তাব পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক বিবেচিত না হইয়া থাকে।

সাধারণ অবস্থায় রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের সময় অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণার সময় রাজ্যপাল মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ বিনাই

শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। ১৯৬৫ সালে কেরালার নির্বাচন সমাপ্তির পর যখন দেখা গেল যে এককভাবে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নাই, তখন সেই রাজ্যের রাজ্যপালের বিবরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেরালার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। যদি রাজ্যপাল কখনও মনে করেন যে, মন্ত্রিমণ্ডলী সংবিধান বিরোধী কার্য করিতেছে, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় রাজ্যপাল মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া আপন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারেন। আবার একটি মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর রাজ্যে কোন একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে রাজ্যপাল আপন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন করিয়া অপর একটি মন্ত্রিসভা নিয়োগ করিতে পারেন। সুতরাং আপন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বলে রাজ্যপাল পরোক্ষভাবে মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যাবলী প্রভাবান্বিত করেন। রাজ্যপাল রাজ্যে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার ঘোষণার মাধ্যমেও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারেন—মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করিতে পারেন। চতুর্থ নির্বাচনোত্তর রাজস্থান রাজ্যটির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সেখানে কোনদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলেও তদানীন্তন রাজ্যপাল বিভিন্ন দলের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান, কিন্তু কিছুদিন পরই বিরোধীদলগুলি কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় বলিয়া প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে সেখানে আইনসভাকে না ভাঙ্গিয়া রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। অবশেষে, কিছুকাল পর অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে কিছু নির্দলীয় সদস্যের সমর্থনের জোরে কংগ্রেস দলই পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠদল হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে।

মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই রাজ্যপাল কাজ করিতে পারেন

তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য মন্ত্রিসভা একদলীয় হইলে সাধারণতঃ রাজ্যপালের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করার প্রশ্ন দেখা দেয় না। সে সব ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে অবস্থান করেন, এমন কি বিধানসভায় যে ভাষণ তাঁহাকে দিতে হয় তাহাও মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তুত করিয়া দেন অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপাল শাসনকার্য ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকেন। তবে উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা অনুধাবন করা যায় যে রাজ্যপাল নামেমাত্র রাজ্যের শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসাবে অবস্থান করিলেও তিনি একেবারেই সাক্ষীগোপাল হিসাবে শাসনকার্যে বিরাজ করেন না। বস্তুতঃ, উপদেশ দান করিয়া, সতর্ক করিয়া দিয়া এবং স্বীয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া অনেক সময়ই তিনি রাজ্যের শাসন কার্যে প্রভুত প্রভাব

রাজ্যপাল কি নামেমাত্র প্রধান?

বিস্তার করিতে পারেন। তাই মন্ত্রিপরিষদের সহিত সম্পর্ক বিচারে তাঁহাকে নামেমাত্র রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে অভিহিত করা চলে না।

রাজ্যপাল এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্ক

(Relation between the Governor and the Council of Ministers)

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্ক লইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী) নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজ্য মন্ত্রিসভা গঠন করেন রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় কংগ্রেস দল কর্তৃক এবং কয়েকটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী দলগুলি কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পূর্বে যখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং সব রাজ্য সরকারই একই রাজনৈতিক দল দ্বারা গঠিত হইত তখন রাজ্যপাল এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে কি সম্পর্ক থাকিবে তাহা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হয় নাই। কারণ, তখন রাজ্যপালগণ সর্বদাই নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় পশ্চিমবঙ্গে যখন ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বাতিল করিয়াছিলেন। তখন হইতেই রাজ্যপাল প্রকৃতই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা সেই সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার (Discretionary Powers) ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে সেইগুলির বৈধতা লইয়া কোনরূপ প্রশ্ন করা চলিবে না। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন,—ইহাই সংবিধানে বলা হইয়াছে। কিন্তু রাজ্যপাল তাহা করিতে বাধ্য কিনা সেই সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছে ; অবশ্য এই জাতীয় প্রশ্ন উঠার জন্য আমাদের শাসনতন্ত্রের অসম্পূর্ণতাই দায়ী। গত ১৯৬৯ সালের ৬ই মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর যৌথ অধিবেশন কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ধর্মবীর মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া মন্ত্রিসভা কর্তৃক লিখিত ও অনুমোদিত ভাষণ পাঠ করিবার সময় দুইটি অনুচ্ছেদ বাদ দেন। রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

প্রয়োগ করিয়া উক্ত ভাষণের দুইটি অনুচ্ছেদ পাঠ-বহির্ভূত রাখেন। ইহাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ১৭৬ নং ধারা অনুযায়ী বিধানমণ্ডলীর নূতন অধিবেশন আহ্বান করিবার সময় নূতন অধিবেশনটি কেন আহ্বান করা হইল এবং বিধানমণ্ডলী কি কাজ করিবে সেই সম্পর্কে রাজ্যপালকে তাঁহার ভাষণের মাধ্যমে সরকারের নীতি বর্ণনা করিতে হয় সেই ভাষণটি প্রস্তুত করেন রাজ্যের মন্ত্রিসভা। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার ভাষণ হইতে দুইটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন। রাজ্যপাল অবশ্য নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে উক্ত অনুচ্ছেদ দুইটি পাঠ না করিয়া তিনি সংবিধান বিরোধী কাজ করেন নাই। কারণ উক্ত অনুচ্ছেদ দুইটি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ. এবং সরকারের নীতির সহিতও এই দুইটি অনুচ্ছেদের কোন সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু মন্ত্রিসভার লিখিত ভাষণ রাজ্যপাল এড়াইয়া যাইতে পারেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন রাজ্যপালের পক্ষে এই ধরণের আচরণ করা উচিত হয় নাই।

কতিপয় ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন, এই প্রকার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। শাসনতন্ত্রের ২০০ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে রাজ্যপাল নিজে সম্মতি না দিয়া তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালা বিধানসভা শিক্ষাবিল অনুমোদন করিলে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ রাজ্যপালকে উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজ্যপাল সেই বিলে সম্মতি প্রদান না করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা প্রেরণ করেন। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ১৮ই ডিসেম্বর রাজ্যবিধানসভার অধিবেশন ডাকার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন। কিন্তু রাজ্যপাল সেই পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হারাইয়াছে এই ধারণার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন। অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে। ১৯৬৮ সালে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট প্রথমে যে রিপোর্ট

কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলেন নাই।

প্রদান করেন, তাহাতে বিধানসভা যাহাতে না ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় সেই মর্মে সুপারিশ ছিল। অবশ্য পরে যখন কোন দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হন নাই তখন উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী সর্বদাই রাজ্যের প্রকৃত শাসক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

রাজ্যপাল স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই রাজ্যপাল রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন বজায় রাখেন অথবা উহা ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু রাজ্যপাল সর্বদাই যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন তাহা নহে ; যদি মন্ত্রিসভা কখনও পদত্যাগ করে তখন বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন করার দায়িত্ব রাজ্যপালের হাতে আসে। বিশেষতঃ, যদি রাজ্যবিধানমণ্ডলে কোনও রাজনৈতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে তবে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary power) প্রয়োগ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনকালেও রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করিয়া নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, এমন কি বিধানমণ্ডলে রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করেন, তাহাও মুখ্যমন্ত্রীই তৈয়ার করিয়া দেন। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন বলিয়া শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত সমুদয় ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন।

রাজ্যপাল কি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন? (Can the Governor dismiss the Council of Ministers ?): রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা তাহা লইয়া সমগ্র ভারতে সম্প্রতি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সংবিধানের ১৬৪(১) ধারা অনুযায়ী বরখাস্ত করিবার পর এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সংবিধানের ১৬৪(১) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে "The Council of Ministers shall hold their office under the *PLEASURE* of the Governor।" কিন্তু এই ধারায় এমন কোন কথা বলা হয় নাই যে, রাজ্যপাল নিজের ইচ্ছায় যখন খুশী তখন তাঁহার অভিরুচি প্রত্যাহার করিয়া মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন। বরং সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যের মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল এবং রজ্যসরকারের পক্ষে যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বিধানসভায় মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারিবেন ততক্ষণই ইহা নিজপদে সমাসীন থাকিতে পারিবেন। মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার পিছনে রাজ্যপাল ধরমবীর কারণ দেখাইয়াছেন যে ২৮৪ জন সদস্য

রাজ্যপালের কাজের পক্ষে যুক্তি

বিশিষ্ট বিধানসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য ছিল ১৩০ জন এবং আরও ১৭ জন সদস্য যুক্তফ্রন্ট হইতে দলত্যাগ করায় এবং লিখিতভাবে রাজ্যপালের নিকট তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় রাজ্যপাল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে মন্ত্রিসভা রাজ্যবিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছে, সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রিসভাকে একদিনের জন্যও বজায় রাখা উচিত নহে। সেইজন্য তিনি সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য এমন একজনকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন যিনি রাজ্যে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও স্থিতিশীল মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করিবার জন্য অবিলম্বে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং এই অনুরোধ জানান হইয়াছিল ১৯৬৭ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে। এই অনুরোধ অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্তই করেন। কিন্তু রাজ্যপালের ঐ তারিখ মনঃপূত না হওয়ায় (কারণ তাঁহার মতে বিধানসভার অধিবেশন অনেক দেরীতে ডাকা হইয়াছিল) এবং তিনি এই মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘিষ্ঠতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হওয়ায় সংবিধানের ১৬৪(১)নং ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। এখানে স্বভাবতঃই কতিপয় সাংবিধানিক প্রশ্নের সৃষ্টি হইতে পারে।

রাজ্যপালের কাজ সম্পর্কে সাংবিধানিক প্রশ্ন

যথা, (১) যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা স্বপদে বহাল আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিনা। (২) মন্ত্রিসভা যদি রাজ্যপালের পরামর্শ অনুযায়ী বিধানসভার অধিবেশনের তারিখ নির্দিষ্ট দিন হইতে আরও আগে ধার্য না করিতে চাহেন তবে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা। (৩) বিধানসভায় অধিবেশনে মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হইয়াছে তাহা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা। (৪) বিধানসভার অধিবেশনে শক্তি পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপালের এমন কোন ধারণা করা উচিত কিনা যে মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা বজায় রাখিবার অভিরুচি (Pleasure) প্রত্যাহার করিয়া লওয়া উচিত কিনা।

সংবিধানগত এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে একমাত্র সুপ্রীম কোর্টের এবং এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের মতামত অথবা উপদেশ চাওয়া হইলে সেই মতামত বা উপদেশ সর্বজনগ্রাহ্য এবং চূড়ান্ত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবিধানের ধারা সংক্রান্ত বিতর্কের সৃষ্টি হইবার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের উপদেশ চাওয়া হয় নাই,—যদি সেই উপদেশ পাওয়া

যাইত, তবে অনেক শাসনতান্ত্রিক জটিলতার নিরসন হইত। কিন্তু ভারত সরকারের আইন দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতে এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টে যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা সংবিধানের ধারা নাকি এই ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট। অথচ সংবিধানগত কোন সূত্র এই বিষয়ে তাহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; এই শাসনতান্ত্রিক। জটিলতারও তাই নিরসন হয় নাই। তাহারা নিশ্চিত ছিলেন যে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা সম্পূর্ণ বৈধ ও সংবিধানসম্মত। সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে রাজ্যপালকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য এবং তাঁহার কাজে সহায়তা করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। সংবিধানের ১৬৪ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্য বিধানসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই ধারা অনুযায়ী যিনিই মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন তাঁহাকে মুখ্যমন্ত্রী হইবার পূর্বে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে নিজেকে নির্বাচিত করিতে হইবে। সুতরাং একটি মন্ত্রিসভা থাকাকালীন সেই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন কিনা এবং তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যপাল যাঁহাকে নূতন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে চাহেন তিনিই বিধানসভায় নূতনভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হইতে পারিয়াছেন কিনা তাহা যাচাই করিবার একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র হইতেছে বিধানসভা; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আগে (১) ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, (২) নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নূতন একজন নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, এবং (৩) নূতন মন্ত্রিসভার পিছনে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আছে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য নূতন মন্ত্রিসভার সমর্থনে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। রাজ্যপালের এই কাজ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। আইন এবং সংবিধান বিশারদগণের মধ্যে অনেকেই রাজ্যপালের কাজকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহাকে শাসনতন্ত্র সম্মত কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথচ শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা সুপ্রীম কোর্টের মতামত বা উপদেশ এই ব্যাপারে চাওয়া হয় নাই। কিন্তু রাজ্যপালের এই কাজকে আপাতদৃষ্টিতে সংবিধান বিরোধী বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের এই কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং রাজ্যপাল কর্তৃক আহূত বিধানসভার অধিবেশন একটি সংবিধান-বিরোধী মন্ত্রিসভার পরামর্শে আহূত মনে করিয়া

রাজ্যপালের কাজে কেন বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে?

বিধানসভার স্পীকার বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেন।

বিধানসভার ভিতরে বিধানসভার দায়িত্ব, অধিকার এবং ক্ষমতার সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন ব্যাপারে স্পীকারের রুলিং গ্রহণ করিতেই হইবে এবং ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায় না। সুতরাং রাজ্যপাল যে অবস্থায় মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিয়াছেন তাহা সংবিধান সম্মত হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে আমরা এখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষের রুলিং আলোচনা করিব।

মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি সম্পর্কে স্পীকারের রুলিং

স্পীকার তাঁহার রুলিং-এ বলেন যে বিধানসভার পূর্বতন অধিবেশনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সংবিধানের ১৬৪ (২) ধারা অনুসারে যৌথ-ভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী ছিলেন। সাংবিধানিক অবস্থা সম্পর্কে স্পীকার মনে করেন যে মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন থাকিবেন কি থাকিবেন না সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার একমাত্র এক্তিয়ার বিধানসভার। মন্ত্রিসভা যদি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা হারান তবে সংবিধানের ১৬৪ (২) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভা পদত্যাগে বাধ্য থাকেন। স্পীকার তাঁহার মন্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলির নিম্নলিখিত মন্তব্যটির উল্লেখ করেন। "মন্ত্রিসভা আইন-সভার সৃষ্টি। এই সভা (আইনসভা) মন্ত্রিসভা তৈয়ার করিতে পারেন, ভাঙ্গিতেও পারেন। গভর্ণর শুধু সভার Registering authority ; আমার আশংকা অন্য কোন পথ গ্রহণ করিলে তাহা গণতন্ত্রের মূলে আঘাত হানিবে।" স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সংবিধানের ধারা এবং পূর্বোক্ত নজির উভয়েরই দ্বারা মন্ত্রিসভা নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতা স্বীকৃত হইতেছে না।" স্পীকার বলেন, সংবিধানের ১৬৪(২) ধারা সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করিলে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা খারিজের এইরূপ কোন ক্ষমতা ন্যস্ত আছে বলিয়া প্রকটিত হয় না।" সুতরাং রাজ্যপাল কর্তৃক সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার কোন আইনসম্মত ভিত্তি স্পীকার খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য স্পীকার মনে করেন, বিধানসভার এই অধিবেশন রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভার অজ্ঞাতসারে গঠিত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী আহূত হইয়াছে বলিয়া বে-আইনী ও সংবিধান বিরোধী। যদি রাজ্যপালের ২২শে নভেম্বরের আদেশ বলে আহূত বিধানসভার অধিবেশন (২১শে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হয়) বে-আইনী ও সংবিধান বিরোধী হয় তাহা হইলে স্পীকারের মতে "শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা (অর্থাৎ পূর্বতন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা) শুধু যে ক্ষমতায় আসীন আছেন তাহাই নহে, একমাত্র তিনিই ১৭৪ (১) ধারা অনুসারে রাজ্যপালকে পরামর্শ প্রদান করার (অর্থাৎ সভা ডাকার পরামর্শ

প্রদান করার) অধিকারী। সেই পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল কর্তৃক আহূত বিধানসভাই বৈধ এবং যথাযথভাবে ডাকা হইবে। স্পীকার বিধানসভার অধিবেশনের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত রুলিং প্রদান করিবার আগে ইহার বৈধতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায় উক্ত আপাত রুলিং প্রদান করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন। স্পীকার ইহাও বলেন যে সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অভিমত গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদের চেয়ারম্যান রুলিং প্রদান করেন যে রাজ্যপাল সংবিধান-বিরোধী কোন কাজ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে স্পীকারের রুলিংকে কেন্দ্র করিয়া। স্পীকারের এই রুলিং সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য করা হইয়াছে। কোন কোন আইনজীবী মনে করেন যে স্পীকার তাঁহার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ভারত সরকারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, এই মহলের মতে রাজ্যপালের কোন কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা স্পীকারের এক্তিয়ারের মধ্যে নাই। স্পীকার শুধু বিধানসভার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিজের ক্ষমতা সীমিত রাখিবেন। কিন্তু কোন কোন আইনজীবী মনে করেন যে স্পীকার ঠিক কাজই করিয়াছেন এবং বিধানসভার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই জাতীয় কোন কাজ (তাহা যে কোন লোকেরই হোক না কেন) সম্পর্কে রুলিং প্রদান করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্পীকার সংবিধান হইতে পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শেষ পর্যন্ত সুযোগ প্রদান না করিয়া বিধানসভার অজ্ঞাতসারে যেভাবে রাজ্যপাল একটি মন্ত্রি-সভাকে বাতিল করিয়া অপর একটি মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রিসভা নিয়োগে কিংবা মন্ত্রিসভা বাতিল করিবার ব্যাপারে বিধানসভার ক্ষমতা ও সুযোগকে অস্বীকার করা হইয়াছে এবং স্বভাবতঃই স্পীকার মনে করিতে পারেন যে ইহার ফলে বিধানসভার স্বাভাবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সুতরাং রাজ্যপালের এই কাজের উপর বিধানসভার অধিকার-রক্ষক হিসাবে স্পীকারের রুলিং দেওয়ার ক্ষমতা আছে এবং ইহার জন্য স্পীকারের বিরুদ্ধে আদালতেও যাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, বিধানসভায় স্পীকার কি বলিয়াছেন তাহা লইয়া কটাক্ষ অথবা বিরূপ মন্তব্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। সুতরাং স্পীকার আদৌ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন কিনা তাহা বলা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী পদচ্যুত করিয়া সংবিধান বহির্ভূত কাজ করেন নাই—এই মর্মে কলিকাতা হাইকোর্ট একটি রায়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীপুরণলাল লক্ষণ পাল এবং শ্রীমহাবীর প্রসাদ শর্মার তরফ হইতে পশ্চিমবঙ্গের

রাজ্যপাল কর্তৃক তৎকালীন পি. ডি. এফ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ পি. সি. ঘোষ এবং আরও দশজন মন্ত্রী নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া "কুয়ো ওয়ারেনটো" (Quo Warranto) ধরনের হুকুম-নামা জারির জন্য দুইটি আবেদন পেশ করা হইয়াছিল ; কিন্তু ১৯৬৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপতি শ্রীবি. সি. মিত্র এই আবেদন নাকচ করিয়া বলেন, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুসারে রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপিত হয় নাই। রাজ্যপালের "অভিলাষ" (pleasure) সম্পূর্ণ নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ। এই আবেদন সম্পর্কে বিচারপতি বলেন, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ এবং অভিরুচি (Pleasure) প্রত্যাহার করিয়া লইয়া মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা একমাত্র রাজ্যপালকেই দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যপালের এই "অভিরুচি" প্রত্যাহারের ক্ষমতাও নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ। এক মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া নূতন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সংবিধানসম্মত কাজ করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া আদালতে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নাই বলিয়া বিচারপতি অভিমত প্রকাশ করেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়—রাজ্যপালের "সন্তুষ্টি"র কোন শর্ত নাই

কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের এই রায় প্রধানতঃ দুইটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছে এবং অনেকেই খোলা মন লইয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। প্রথম প্রশ্নটি হইতেছে রাজ্যপাল যদি যখন খুশী তখনই মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিবার নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত ক্ষমতা ভোগ করেন, তবে বিধানসভার নিকট সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের সার্থকতা কোথায়? মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিধানসভা অনাস্থা প্রকাশ করে অথচ যদি রাজ্যপালের এই 'অভিলাষ' (Pleasure) হয় যে মন্ত্রিসভা তবুও কাজ করিয়া যাইবে কিংবা পদত্যাগ করিবে না, তবে কি তাহাও সংবিধানসম্মত হইবে? রাজ্যপালের "অভিলাষ" যদি নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত হয়, তবে তো রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে বিধানসভার মতের বিরুদ্ধেও যে কোন মন্ত্রিসভাকে বজায় রাখিতে পারেন কিংবা মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারন। সেই ক্ষেত্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতের শাসনতান্ত্রিক অনুমোদন বলিয়া কি কিছু থাকিবে না এবং তাহা কি সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে না।

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হইতেছে, যদি রাজ্যপাল নিজের "অভিরুচি" অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিবার নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করেন, তবে কি অনুরূপ অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে নিজের "সন্তুষ্টি"

অনুযায়ী যে কোন সময়ে পদচ্যুত করিবার নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করেন? শাসনতন্ত্রে রাজ্যপালের সহিত রাজ্যমন্ত্রিসভার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে বিধান সংযোজিত হইয়াছে, একই ভাষায় অনুরূপ বিধান সংযোজিত হইয়াছে রাষ্ট্রপতির সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্পর্ক সম্বন্ধে।

কলিকাতা হাইকোর্টের এই রায় পশ্চিমবঙ্গের স্পীকারকে তাঁহার রুলিং পরিবর্তনে বাধ্য করে নাই। ১৯৬৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আহূত হইলে স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯৬৭ সালের ২৯শে নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভার অগোচরে রাজ্যমন্ত্রিসভাকে বাতিল করা সংবিধানবিরোধী হইয়াছে বলিয়া তিনি যে আপাত রুলিং দিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্তন করার কোন কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সুতরাং ১৯৬৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখেও তিনি তাঁহার পূর্বেকার আপাত-রুলিং-ই বহাল রাখিতেছেন।

স্পীকারের পরবর্তী রুলিং

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিচারপতি বি. সি. মিত্রের রায় প্রকাশিত হইবার পর আবেদনকারিগণ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত পাওয়া না যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিতর্কমূলক বিষয়ের কোন সমাধান হইবে না। আমাদের শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হইতেছে সুপ্রীম কোর্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের কোন বিধান সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা না দিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংবিধানের বিধান সম্পর্কে কোন বিতর্কেরই চূড়ান্ত সমাধান হইতে পারে না।

চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা সুপ্রীম কোর্ট

এই প্রসঙ্গে স্পীকারের রুলিংটির যৌক্তিকতাও বিবেচনা করা যাইতে পারে। স্পীকার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলিত রীতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণের দায়িত্ব যে শুধু আইনসভার নিকট, এবং আইনসভাই যে মন্ত্রিসভা গঠন অথবা মন্ত্রিসভা পতনের মাধ্যম,—তাহাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার একটি প্রথা হইতেছে (তাহা ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে) যে বিধানসভার সদস্য না হইয়াও ছয় মাসের জন্য যে কেহ মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় শ্রীআন্নাদুরাই প্রথমেই বিধানমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন না; তিনি পরে বিধানমণ্ডলীর সদস্য হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, কোন মন্ত্রিসভার উপর বিধানসভার আস্থা আছে কি নাই, তাহা বিচার করিবার জন্য ছয়মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে এবং তাহা সংবিধানসম্মত। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলিত রীতি

বাতিল হইবার পূর্বে বিধানসভার শেষ অধিবেশন হইয়াছিল ১৯৬৭ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে। কিন্তু তাহার পর সাড়ে তিন মাস না যাইতেই রাজ্যপাল ২১শে নভেম্বর তারিখে মন্ত্রিসভাকে বাতিল করিয়াছিলেন; অথচ মন্ত্রিসভা ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই অবস্থায় বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার জন্য মন্ত্রিসভাকে সুযোগ না দিয়া ইহাকে বরখাস্ত করিয়া রাজ্যপাল সংসদীয় গণতন্ত্রের (Parliamentary Democracy) ঐতিহ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। ১৯৫৫ সালে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি একটি মামলার রায় প্রদান করিবার ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন যে ভারতে যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল হইতেছেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান; মন্ত্রিসভার পরামর্শেই তিনি কাজ করেন। শাসনতন্ত্রের ১৬৩ নম্বর ধারায়ও ইহাই বুঝানো হইয়াছে। রাজ্যপালের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায় না অথবা কোন কিছুর জন্য রাজ্যপালকে দায়ী করা যায় না—ইহার অর্থ হইতেছে এই যে রাজ্যপালের পক্ষে মন্ত্রিসভাই বিধানসভার কাছে দায়ী থাকেন। সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারায় ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে মন্ত্রিসভা বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং যদি মন্ত্রিসভা সেইজন্য নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করিবার জন্য বিধানসভার অধিবেশন একটি নির্দিষ্ট তারিখে আহ্বান করিতে প্রস্তুত থাকেন (কোন অবস্থায়ই ঐ তারিখ বিধানসভার শেষ অধিবেশনের পর হইতে ছয় মাসের বেশী দেরী হইতে পারে না) সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল আর কয়েকটি দিন অপেক্ষা করিয়া বিধানসভার অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে এই জটিলতার সৃষ্টি হইত না।

১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লীতে স্পীকারদের যে নিখিল ভারত সম্মেলন হয় তাহাতে ভারতের লোকসভার স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি বলেন যে রাজ্যপাল তখনই মন্ত্রিসভাকে বাতিল করিতে পারেন যখন দেখা যায় যে মন্ত্রিসভা বিধানসভায় ইহার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়া যাইবার পরেও পদত্যাগ করিতেছেন না। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি আরও বলেন যখনই মন্ত্রিসভা রাজ্যপালকে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার পরামর্শ প্রদান করিবেন, তখনই রাজ্যপালের উচিত বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি কর্তৃক প্রকাশিত অভিমতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভাকে বিধানসভার অধিবেশনে অনাস্থাসূচক প্রস্তাবের সম্মুখীন হইবার সুযোগ না দিয়া (যদিও মন্ত্রিসভা রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়াছিলেন ১৯৬৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য) ইহাকে বরখাস্ত করিয়া সংবিধানের

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির অভিমত

বিরোধী কাজ করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুলিং ঠিকই হইয়াছে। যদি ১৯৬৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা হইত এবং সেই অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদিত হইত এবং ইহা অনুমোদিত হইবার পরেও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ না করিতেন তবেই রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত হইত।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা এবং সেই সম্পর্কে স্পীকারের রুলিংটিও ঠিক হইয়াছে কিনা,—এই দুইটি বিষয়ে আলাদাভাবে বিচার করিতে হইবে। স্পীকার যদি উক্ত রুলিং না দিতেন তবে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইত। কিন্তু, বিধানসভার ভিতর স্পীকারের রুলিং উপেক্ষা করা যায় না; কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে ইহা অবশ্য—গ্রাহ্য। ভারত সরকারের আইন দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজ্যপালের এই কাজকে যতই সংবিধানসম্মত মনে করুন না কেন, সুপ্রীম কোর্টের নিকট হইতে এই বিষয়ে চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট মতামত না পাওয়া পর্যন্ত ইহাতে বিতর্কের অবকাশ থাকিবেই।

রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলী: (Functions of the Council of Ministers) মন্ত্রিসভার কার্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল দেখা যে যৌথ দায়িত্বের দ্বারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকা মন্ত্রিপরিষদের একান্ত প্রয়োজন সেই দায়িত্ব বজায় রাখার জন্য অর্থাৎ আইনসভার আস্থাভাজন থাকার জন্য শাসনকার্যের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে উপযুক্তরূপ সমন্বয় সাধন করা হইতেছে কিনা। মন্ত্রিসভার নীতিকে কার্যকরী করিয়া শাসন বিভাগ সুষ্ঠুভাবে কাজ না করিলে অথবা বিভিন্ন শাসনবিভাগের মধ্যে শাসনকার্য সংক্রান্ত বিভেদ ও বৈষম্য থাকিলে মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয় এবং সেই জবাব সন্তোষজনক না হইলে তাহাদিগকে আইনসভার আস্থা হারাইতে হয়। দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পক্ষে আইনসভার অনাস্থাভাজন হইয়া শাসনকার্যে বহাল থাকা সম্ভব হয় না।

আইনসভার আস্থাভাজন থাকা, অন্যথায় পদত্যাগ করা

সুতরাং পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি মন্ত্রিপরিষদ অথবা ক্যাবিনেটকে করিতে হয় তাহা হইল শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ। প্রাত্যহিক শাসনকার্য সম্পাদন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদকে ব্যস্ত না হইলেও চলে। কেবলমাত্র যে কাজ শাসনবিভাগ পরিচালনা করিবে সেই কাজকে মন্ত্রিসভা কর্তৃক সমর্থিত নীতির অন্তর্গত হইতে হইবে। মন্ত্রিসভা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রেই এই বিষয়ে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে। সুনির্দিষ্ট

নীতি নির্ধারণ করিয়া এইভাবে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি কখনও কোন নীতি সম্পর্কে কোন বিভাগে প্রশ্ন ওঠে, অথবা কোন কাজ করিতে যাইয়া শাসনবিভাগ দেখে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা হইলে সেই বিষয়ে আদেশ গ্রহণ করার জন্য বিভাগটিকে ক্যাবিনেটের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া দেন কোন্ বিষয়টিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে।

সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা ও শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা

ভারতীয় রাজ্যগুলির মন্ত্রিপরিষদের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে আইন-প্রণয়ন করা। আইনসভায় বর্তমানে সরকারের তরফ হইতে যে বিল উত্থাপন করা হয় এবং আইন-প্রণয়ন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারিত হয় তাহা মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বেই করা হইয়া থাকে। এই কাজের সাফল্যের উপর অনেকাংশে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল সমগ্র মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমেই হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ বিল অননুমোদিত হওয়ার অর্থ মন্ত্রিসভার উপর আইনসভার অনাস্থাই সূচিত করে। আবার সাধারণ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল মন্ত্রিসভা কর্তৃক অননুমোদিত হইয়া আইনসভা কর্তৃক সমর্থিত হওয়ার অর্থও মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর আইনসভার অনাস্থা নির্দেশ করে। সুতরাং আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হয়।

আইন-প্রণয়নে মন্ত্রিসভার ভূমিকা

ইহা ছাড়াও রাজ্যের সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও মন্ত্রিপরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (অর্থাৎ বাজেট), প্রত্যেকটি আর্থিক বৎসরের প্রথমে মন্ত্রিসভাই আইনসভায় উপস্থিত করে এবং ইহাকে আইনসভা দ্বারা সমর্থন করায়। ব্যয়-মঞ্জুরীর দাবি অনুমোদিত হওয়ার পরই প্রতিবৎসর সরকারী তহবিল হইতে শাসনবিভাগ খরচা করিতে পারে। এই ব্যয়-মঞ্জুরীর দাবি রাজ্যপালের অনুমোদন লইয়াই মন্ত্রিসভা আইন সভায় উত্থাপন করে। আবার কর ধার্য করার ব্যাপারে কিংবা প্রচলিত কর বৃদ্ধি অথবা করবিলোপ সংক্রান্ত প্রস্তাবও রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে মন্ত্রিসভাই আইনসভায় উত্থাপন করে অর্থাৎ সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা

এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়া রাখা উচিত যে মন্ত্রিসভার উপরোক্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। সমস্ত মন্ত্রীই নীতি নির্ধারণ বা আইন-প্রণয়নে সম্পূর্ণ সহযোগিতায় কার্য করে সন্দেহ নাই, তবে

মন্ত্রিসভার কার্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রভাব

সকলের মধ্যে একটি সংহতিকারী সংযোগ হিসাবে বিরাজ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনরূপ বিভেদ বা বৈষম্য মন্ত্রিগণের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা মুখ্যতঃ মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমেই করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে মন্ত্রিসভার কার্যাবলীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister of a State in India): রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ বলা চলে। তিনি রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে তিনি রাজ্যপাল-কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন।

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন। আবার কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে হইলে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীপদে নির্বাচিত হইতে হইলে সদস্যকে নিম্নকক্ষেরই সভ্য হইতে হইবে সংবিধানে এইরূপ কোন ধারা সন্নিবেশিত হয় নাই অর্থাৎ উচ্চকক্ষের কোন সদস্যের মুখ্যমন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়ার পথে কোন বাধা নাই।

মুখ্যমন্ত্রিপদে নিয়োগ-যোগ্যতা

(মোট কথা মুখ্যমন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইতে হইলে সদস্যকে হয় বিধানসভা কিংবা বিধান পরিষদের সভ্য হইতে হয়।) আবার উক্ত দুইটি কক্ষের সভ্য নহেন এমন লোককেও রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিতে পারেন, তবে এইরূপ নিয়োগের ছয়মাসের মধ্যে অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীকে আইনসভার যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে হইবে। সাধারণ অবস্থায় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারীদলের নেতাকেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাইয়া থাকেন। ইহার কারণও ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার নিকট দায়ী। সুতরাং এমন লোককেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত করেন যিনি আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সমর্থন পাইতে সক্ষম।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারেই শাসনবিভাগের যাবতীয় কাজ রাজ্যপাল পরিচালনা করেন। রাজ্যপালের হস্তে শাসনসংক্রান্ত যে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ মুখ্যমন্ত্রীরই ক্ষমতা। আপন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় পরিচালিত ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে রাজ্যপাল মোটামুটিভাবে বাধ্য থাকেন বলা চলে।

মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যম

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে সংবাদাদি আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি রাজ্যের শাসন ও অন্যান্য নানাবিষয়ে সর্বদাই রাজ্যপালকে অবহিত করিতে বাধ্য থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে সম্পর্কেও রাজ্যপালের নিকট রিপোর্ট প্রদান করার দায়িত্ব তাঁহার। আবার রাজ্যপাল যদি কোন বিষয় জানিতে চাহেন তবে সে সম্পর্কেও রাজ্যপালের নিকট বিবরণী প্রদান করিতে হয়

মুখ্যমন্ত্রীকে। কোন মন্ত্রীর কোন সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেট কর্তৃক আলোচিত না হইয়া বিবেচিত হইলে রাজ্যপাল সে বিষয়ে মন্ত্রিসভাকে পুনরায় বিবেচনা করিতে আদেশ দান করিতে পারেন। যেহেতু মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার নিকট দায়ী তাই রাজ্যপাল এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ-দায়িত্ব নীতিটিকে কার্যকরী করার প্রয়াস পান। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীই বিষয়টি মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা পুনর্বিবেচনা করান।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিপরিষদ শাসনবিভাগের কাজ পরিচালনা করেন এবং রাজ্যপাল সাধারণতঃ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের প্রকৃত শাসক হিসাবে অভিহিত করা চলে। তবে রাজ্যপালগণ যে কতিপয় ক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলীর ও মুখ্যমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন ও কার্যতঃ কাজ করিয়াছেন তাহা আজ কাহারও অবিদিত নয়। কেরালার বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাবিলকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করেন। পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার জন্য রাজ্যপালকে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী যে পরামর্শ দান করেন তাহা রাজ্যপাল গ্রহণ করেন নাই। মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছে এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। পুনরায় ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবাংলা বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন উদ্বোধনকালে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রিসভা কর্তৃক লিখিত ও অনুমোদিত ভাষণের দুইটি অনুচ্ছেদ পাঠ করা হইতে বিরত থাকেন। আবার ১৯৬৮ সালে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ও নূতন নির্বাচনের পরামর্শ দেন, কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া না দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী যে সর্বদা রাজ্যের প্রকৃত শাসক হিসাবে বিরাজ করেন বা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। (আবার পশ্চিম বাংলায় ১৬৪ (১) নং ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত করার জন্য রাজ্যপাল যে "অভিলাষ" ("pleasure") প্রয়োগ করেন তাহা যদি সত্যসত্যই নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ হয় তাহা হইলেও বলিতে হয় মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃত শাসক নহেন।)

মুখ্যমন্ত্রী কি প্রকৃত শাসক?

মুখ্যমন্ত্রীর কাজের মধ্যে আর একটি কাজ হইল ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিমণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করা। এই কাজ করার সময় তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর ভিতর বিভিন্ন সদস্যের নানা বিভেদ ও অনৈক্য দূর করার গুরুত্বপূর্ণ

মন্ত্রিমণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করা

দায়িত্বটি তাঁহার। ক্যাবিনেটে বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিতর্কমূলক আলোচনা চলে সে সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব লইয়া আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে হয়। অথচ সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া কোনরূপ ভাঙ্গনের সৃষ্টি ক্যাবিনেটের অভ্যন্তরে যাহাতে না দেখা দেয় সে বিষয়েও তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে হয়।

মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রিদের মধ্যে অগ্রগণ্য (*'Primus inter Pares'*)। তাঁহারই পরামর্শে রাজ্যপাল কোন সদস্যকে মন্ত্রিপদে নিয়োগ কিংবা মন্ত্রিপদ হইতে পদচ্যুত করেন। বিধানমণ্ডলীতে প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করিতে হয় এবং সেই অনুযায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। (কিছুকাল পূর্বে পাঞ্জাবে মন্ত্রিদের সংখ্যা বাড়াইয়া সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী ক্যাবিনেটে তাঁহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।) ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যে দলীয় গোলযোগের দরুণ মুখ্যমন্ত্রীগণকে ক্যাবিনেটের সদস্য নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হয়। অবশ্য তবুও সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি রাজ্য ছাড়া অধিকাংশ স্থানেই ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব, ক্যাবিনেটের সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি লইয়া প্রচুর গোলযোগ দেখা গিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের ফলে এই সমস্যার সমাধান হয় সন্দেহ নাই। ক্যাবিনেটের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে যাইয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ বিভিন্ন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। আবার মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক সময় মন্ত্রিগণকে এক দপ্তর হইতে অন্য দপ্তরে স্থানান্তরিত করিতেও দেখা যায়। প্রয়োজন হইলে যে কোন মন্ত্রীকে পরামর্শদান করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে তিনিই অগ্রসর হন। বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যেও কোন ব্যাপারে মতানৈক্য ঘটিলে তাহার মীমাংসার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া ক্যাবিনেটের অভ্যন্তরে সংহতি সাধন করিতে হয়। বিধানসভার অনাস্থা এড়াইবার জন্য অনেক সময় কোন মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করিতেও বাধ্য করেন। সুতরাং মন্ত্রিসভার ভিত্তি স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্যতা, কর্মকুশলতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্যাবিনেটের সহিত তাঁহার সুন্দর সহযোগিতার ফলে রাজ্যটির শাসনব্যবস্থার ভিত্তি যে অনেকখানি সুদৃঢ় হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্যাবিনেটের সহিত মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক

মুখ্যমন্ত্রী আইনসভার ভিতরে সরকারী নেতৃত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্বদাই প্রয়াস পান। এইজন্য দলের সংহতি যাহাতে কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহাও তাঁহাকে দেখিতে হয়। সরকারী নীতিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা, আইনসভার সদস্যগণের সকলপ্রকার প্রশ্নের সুন্দর জবাব প্রদান করা,

বিরোধী দলের সহিত সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সর্বোপরি নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব তাঁহাকেই বহন করিতে হয়। যে কোন সরকারী নীতিকে কার্যকরী করিতে যাইয়া সেই প্রসঙ্গে সদস্যগণকে সন্তোষজনকভাবে উত্তর দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁহাকে করিতে হয়। শাসন বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে সরকারী নীতি গ্রহণ করার পর শাসন বিভাগের দৈনন্দিন কাজে তাঁহাকে সর্বদা কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে হয় না। আইনসভায় তাঁহার সহকর্মী যে কোন মন্ত্রীকে সর্বাবস্থায় সহযোগিতা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তুত থাকিতে হয়। সরকারের মুখপাত্র হিসাবে যে কোন মন্ত্রীদপ্তরের যে কোন বিষয়েই আইনসভার সদস্যগণের প্রশ্নের জবাব মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেন এবং কার্যতঃ দিয়াও থাকেন।

আইনসভা ও মুখ্যমন্ত্রী

কার্য ও ভূমিকার দিক হইতে মুখ্যমন্ত্রীর সহিত তাঁহার দলের সম্পর্ক যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা সহজেই অনুমেয়। দলীয় ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং সেই দলের সংহতি বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁহার। নিজের কাজ ও আচরণ দ্বারা মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য দলের সুনাম ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করা যাহাতে তাহাদের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যে দলের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই দলের প্রচারিত কার্যসূচী অনুযায়ী সরকারী কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সরকারী ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করাও মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাজ হয়। পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য প্রচুর। সেই জনমতকে পরিপূর্ণরূপে নিজের কার্য দ্বারা প্রভাবিত করা গেলে আগত নির্বাচনীতে তাঁহার ও তাঁহার দলের স্থান অগ্রাধিকার লাভ করে সন্দেহ নাই। সুতরাং জনমতকে নিজের দলের প্রতি অনুরক্ত করার দিকেও তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সহিত প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ও সহযোগিতা রক্ষা করা তাঁহার অবশ্য করণীয় কর্তব্য হয়। প্রয়োজনমত প্রচার কার্যদ্বারাও এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করিতে হয়। দলের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তাঁহার দলীয় সরকারের স্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা, কর্মকুশলী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হইতে হয়। এইরূপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা আপন ব্যক্তিত্বে স্বীয় দলের মধ্যে যেমন নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন তেমনি জনসাধারণের উপরও একটি প্রাধান্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার দল

ভারতীয় রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্য, ক্ষমতা ও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় তাঁহাদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা অসঙ্গত নয় যে অনেকগুলি রাজ্যই উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিশৃংখলায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বিপর্যয়ের একটি কারণ উপযুক্ত নেতার অভাব। ইহা আপাততঃ

আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্তমান থাকিলেও জাতীয় পর্যায়ে দলীয় সংগঠনে ইহার ফল খুব ভাল নাও হইতে পারে। এইরূপ বিভেদ মিটাইবার জন্য সর্বাগ্রেই প্রয়োজন দলীয় সংহতি আরও সুদৃঢ় করা। তাই উপসংহারে বলা যায় যে অধিকাংশের দ্বারা সমর্থিত সত্যকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন নেতার পক্ষে রাজ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ দলীয় বিশৃংখলা দূর করা মোটেই কষ্টকর ব্যাপার হয় না। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর পদে কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনের সময়ই যথোচিত সতর্কতা দলীয় ভিত্তিতে অবলম্বন করা উচিত যাহাতে নেতৃত্বের পদ গ্রহণকারী ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে কোন অবস্থায় দলের সকলেই প্রস্তুত থাকে।

ভারতীয় রাজ্যগুলিতে বর্তমানে কাম্য নেতৃত্বের অভাবে বিশৃংখলা

সাম্প্রতিক চতুর্থ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি যে রাজ্যের অবস্থাকে আরও জটিল করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিভিন্ন রাজ্যে বহু দলের সরকার গঠন করা হইয়াছে—কংগ্রেসের পক্ষে অর্ধেক রাজ্যে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভবপর হইয়াছে। বহু বিরোধী দলগুলি লইয়া গঠিত (যে দলের মধ্যে মিল খুব কম আছে) মন্ত্রিসভার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং জনগণ কর্তৃক দেওয়া ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করার জন্য মন্ত্রি-মণ্ডলীর মধ্যে সুসংহতি যে অবশ্যই বাঞ্ছনীয় সে কথা অনস্বীকার্য। এই সংহতি-সাধনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আছে। তাই বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে অকংগ্রেসী দল পরিচালিত সরকারগুলিতে মুখ্যমন্ত্রিগণ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন।

এ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General for the State): সংবিধানের ১৬৫নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যে একজন এ্যাডভোকেট জেনারেলকে নিয়োগ করেন। এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে অভিষিক্ত ব্যক্তির হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা থাকিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, বিচার বিভাগীয় কোন পদে দশ বৎসর আসীন থাকিতে হইবে অথবা ন্যূনপক্ষে তাঁহার দশ বৎসরকাল হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট রূপে কার্য সম্পাদিত হওয়া চাই। রাজ্যের আইন বিষয়ক মুখ্য পরামর্শ দাতা হইতেছেন এ্যাডভোকেট জেনারেল। রাজপাল কর্তৃক প্রেরিত আইন বিষয়ক ব্যাপারে তিনি রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দান করিবেন অথবা রাজ্যপাল কর্তৃক নির্ধারিত আইন-সংক্রান্ত কার্যাবলী স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল সাধারণতঃ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাজ্যপালের সন্তোষের উপরই নির্ভর করে এ্যাডভোকেট জেনারেলের স্থায়িত্ব। রাজ্যপাল এ্যাডভোকেট জেনারেলের বেতন স্থির করেন।

সংক্ষিপ্তসার

রাজ্যপালের মর্যাদা, ক্ষমতা ও কাজ (Position, Powers and Functions of a Governor): রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনপ্রার্থীর যে যোগ্যতা থাকা উচিত, রাজ্যপালকেও সেই যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়।

রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনবিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হন। তাঁহার কতিপয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers) আছে। সেইগুলি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ্যে উপজাতি অঞ্চল সংক্রান্ত শাসন-পরিচালনা প্রধান। তাহা ছাড়া, যখন রাজ্যবিধানমণ্ডলীর কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে না এবং বিভিন্ন দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন উঠে, সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। যদি রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তবে রাজ্যপালকে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তিনি কিছু পরিমাণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পান।

এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপালের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার (Executive powers) প্রথম হইল তিনি রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তাহা ছাড়া, রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General), রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্য সিভিল সার্ভিসের সরকারী কর্মচারীগণকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলীর একটি অংশ ; তিনি ইহার সদস্য নহেন। রাজ্যপাল তাঁহার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার (Legislative power) বলে রাজ্যবিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে অথবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, যে সকল রাজ্যে রাজ্যবিধান-মণ্ডলীর উচ্চকক্ষ আছে, সেগুলিতে তিনি কয়েকজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। সেই সদস্যগণকে অবশ্যই বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি হইতে হইবে। রাজ্যবিধানমণ্ডলী কর্তৃক কোন বিল অনুমোদিত হইয়া রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইলে রাজ্যপাল ইহাতে নিজের সম্মতি প্রদান না করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। অবশ্য রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করিলেই রাজ্যবিধানমণ্ডলীর অনুমোদিত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে। রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যপালের সম্মতি ব্যতীত রাজ্যবিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না। রাজ্যবিধানমণ্ডলীর অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। পরে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আরম্ভ হইলে তাহা বিধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। রাজ্যপালের আর্থিক ক্ষমতা (Financial powers) অনুযায়ী তিনি সরকারের যাবতীয় সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব বাজেটের আকারে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে দিয়া বিধানসভায় উত্থাপিত করেন। যে কোন প্রকার অর্থ-সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমতি ব্যতীত বিধানসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি বিধানমণ্ডলীর উভয় কক্ষের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তবে রাজ্যপাল উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

রাজ্যপালের যাবতীয় শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির সহিত জড়িত। যুগ্মতালিকাভুক্ত (Concurrent) বিষয়গুলি সম্বন্ধে রাজ্যপালের যে ক্ষমতা তাহার সহিত যদি

উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির পার্থক্য হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতিই গৃহীত হইবে এবং রাজ্যসরকারের নীতি বাতিল হইবে।

যদি আদালতের বিচারে দোষী কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোন মামলায় হারিয়া যায় যাহার উপর রাজ্যের শাসনবিভাগ নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে, তবে রাজ্যপাল সেক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং তাহার দণ্ডাদেশ লাঘব করিয়া দিতে পারেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজ্যের প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তবে সাধারণ অবস্থায়, অর্থাৎ তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা না গেলে তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় কাজকর্ম করেন। তবে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা চলে না। তাহা ছাড়া, তাঁহার কার্যকাল প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর।

অনেকে বলেন, রাজ্যের জনগণ কর্তৃক রাজ্যপাল নির্বাচিত হওয়া উচিত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের ইহাই নীতি। কিন্তু, ভারতবর্ষে রাজ্যপালগণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁহার ইচ্ছাধীনে রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই ব্যবস্থা একটু অ-গণতান্ত্রিক এবং ইহা আমাদের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রপ্রবণতা সূচিত করে। তবে এই নিয়মের স্বপক্ষে বলা যায়, যদিও রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, তবুও তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসনকাজ পরিচালনা করেন না। রাজ্যের শাসনবিভাগীয় কাজ প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা করে রাজ্যের মন্ত্রিসভা। সুতরাং, এক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মোটেই অ-গণতান্ত্রিক হয় নাই। বরং, যেহেতু রাজ্যপালকে সর্বদাই দলনিরপেক্ষ থাকিতে হয়, সেজন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিযুক্ত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এবং রাজ্যপালকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখায় ভালই হইয়াছে।

রাজ্যসরকারের মন্ত্রিসভা (Council of Ministers of the State)—শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপালকে উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। রাজ্যবিধানমণ্ডলীতে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রিগণকে রাজ্যবিধান-মণ্ডলীর যে কোন কক্ষের সভ্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রী হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে কোন মন্ত্রী বিধানমণ্ডলীর সদস্য না হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই রাজ্যের স্বার্থের সহিত জড়িত এক বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজ্য মন্ত্রিসভায়ও আমরা ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) এবং উপমন্ত্রী দেখিতে পাই যদিও শাসনতন্ত্রে শুধু মন্ত্রিসভার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। মন্ত্রিগণ সমষ্টিগতভাবে রাজ্যবিধানসভার নিকট দায়ী। যদি বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করেন অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণের সরকারের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত সমুদয় প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক (Relation between the Governor and the Council of Ministers)—রাজ্যপাল স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন বজায় রাখেন অথবা ইহা ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু রাজ্যপাল সর্বদাই যে নিয়ম-

তান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন তাহা নহে; যদি মন্ত্রিসভা কখনও পদত্যাগ করে, তখন বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন করার দায়িত্ব রাজ্যপালের হাতে আসে। বিশেষতঃ, যদি রাজ্যবিধানমণ্ডলীতে কোন রাজনৈতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে তবে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary power) প্রয়োগ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনকালে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করিয়া স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। সাধারণ অবস্থায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সব কাজ করেন। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister of an Indian State)

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীরই অনুরূপ বলা যায়। তিনি রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং তিনি রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে নিযুক্ত করেন। কোন মন্ত্রীর পদচ্যুতিও তাঁহারই সুপারিশক্রমে রাজ্যপাল কর্তৃক সমাধা হইয়া থাকে। মুখ্যমন্ত্রী কেবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মন্ত্রিবর্গের অন্যান্য সভ্যও তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়।

রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নির্বাচিত হন বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী আইনসভার দ্বারা কোন বিষয়কে গ্রহণ করাইতে পারেন। বিধানসভায় যে কোন মন্ত্রীর সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তুত থাকেন; তিনি রাজ্যসরকারের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে বিধানসভার কাছে দায়ী থাকেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যবর্গের এবং রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেলের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রিসভার যোগসূত্র হিসাবে মুখমন্ত্রীকে বিবেচনা করা যায়। রাজ্যের কোন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের দর্শন লাভ করেন না। মন্ত্রিবর্গের যাবতীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রাজ্যপালকে অবহিত করানোর দায়িত্ব মুখ্যতঃ মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী তাই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা (real executive) বলিয়া বিবেচিত হন। চতুর্থ নির্বাচনের পর বহু রাজ্যে অকংগ্রেসী দল সরকার গঠন করার পর কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণ মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করিয়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিয়া যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছে—তাহা হইল সত্যই মুখমন্ত্রিগণ কি রাজ্যের প্রকৃত শাসক?

Exercise

1. Briefly describe the powers and functions of the Governor of a State. Is he free in the exercise of these powers?

(রাজ্যপালের কাজ ও ক্ষমতা আলোচনা কর। তিনি কি স্বেচ্ছায় এই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন?)

(২৫০-৬২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the relation between (a) Governor and Council of Ministers and (b) Council of Ministers and the State Legislature.

(রাজ্যপাল ও মন্ত্রিমণ্ডলী এবং মন্ত্রিমণ্ডলী ও রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর)

(২৬২-৬৭ পৃষ্ঠা ; ২৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the discretionary powers of the Governor.

(রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সম্পর্কে একটি টীকা লিখ) (২৫৭-৬২ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the position and powers of the Council of Ministers of the State with special reference to the Chief Minister.

(মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্পর্ক ও পদমর্যাদা আলোচনা কর) (২৭৫-৮১ পৃষ্ঠা)

5. Write note on the Advocate General for the State.
(রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ) (২৮১ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the position and powers of the chief minister of an Indian State. (C. U. B. A. Part I, 1965) (২৭৭-৮১ পৃষ্ঠা)
(ভারতের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা কর)

7. Is the Governor of an Indian State a 'magnificient cipher'? Give reasons for your answer.
(রাজ্যপাল কি জাঁকজমকপূর্ণ নামেমাত্র প্রধান?) (২৬৪-৬৭ পৃষ্ঠা ; ২৫৭-৬২ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the composition and functions of the Council of Ministers of an Indian State.
(রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর) (২৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the working of the Cabinet system in the State.
(রাজ্যে ক্যাবিনেট প্রথার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর) (২৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the constitutional position of the Governor of an India state in relation to the state Council of Ministers.
(মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে রাজ্যপালের সাংবিধানিক পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (২৬২-৬৭ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the relationship (a) between the President of India and the Governor of a State, and (b) between the Governor and the Chief Minister. (C. U. B. A. 1967)
[(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের মধ্যে সম্পর্ক, এবং (খ) রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।] (১৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা, ২৬৫-২৮১ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য)

12. Discuss the constitutional relationship between the Governor of a state and his Council of Ministers. Can the Governor act independently of the Ministers? If so, how and when? (C. U. B. A. 1968)
(রাজ্যপাল এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক আলোচনা কর। রাজ্যপাল কি মন্ত্রিদের পরামর্শ না লইয়া কাজ করিতে পারেন? যদি পারেন, কখন পারেন?) (২৬২-৬৭ পৃষ্ঠা)

13. Can the Governor dismiss the Council of Ministers? Give reasons for your answer in the light of the recent experience of West Bengal.
(রাজ্যপাল কি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন? পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।) (২৬৭-৭৫ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায়

রাজ্যবিধানমণ্ডলী
(Legislature of the State)

রাজ্য আইনসভার গঠন—বিধান পরিষদ—বিধান সভা—বিধান মণ্ডলের কার্য ও ক্ষমতা এবং রাজ্যের আইনসভার দুইটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক—রাজ্যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার যৌক্তিকতা—বিধান সভার স্পীকার—রাজ্য আইনসভা ও ইহার সদস্যগণের অধিকার—বিল-পাসের পদ্ধতি—অর্থবিল।

রাজ্য আইনসভার গঠন (Composition of the State Legislature) : সংবিধানের ১৬৮নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যের কোন কোন বিধানমণ্ডলী দুই কক্ষ বিশিষ্ট আবার কোন কোন বিধানমণ্ডলী এককক্ষ বিশিষ্ট হয়। দুইকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নিম্ন-পরিষদকে বিধান সভা (Legislative Assembly) এবং উচ্চ পরিষদকে বিধান পরিষদ (Legislative Council) বলা হইয়া থাকে। এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে বিধানসভা (Legislative Assembly) বলা হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত আটটি রাজ্যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা[1] আছে এবং ৬টি রাষ্ট্রে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা[2] দেখা যায়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের সংশোধন দ্বারা মধ্যপ্রদেশের জন্য বিধান পরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংবিধানে কোন রাজ্যে বিধান পরিষদের গঠন অথবা লোপ করিবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে (সংবিধানের ১৬৯নং ধারা)। কোন রাজ্যের বিধানসভার মোট সভ্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সভ্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য সমর্থন করিলে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ পার্লামেন্টের আইন অনুসারে লোপ বা গঠিত হইতে পারিবে।

দ্বিকক্ষ ও এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

বিধান পরিষদ (Legislative Council) : কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের আকার উক্ত রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সংবিধানের ১৭১নং ধারা অনুযায়ী বিধান পরিষদ বা উচ্চ পরিষদের সদস্য সংখ্যা বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার $\frac{1}{3}$ ভাগের বেশি হইতে পারে না, তবে উক্ত সংখ্যা ৪০-এর কম হইবে না। বিধান পরিষদের সদস্যগণ কিছু পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন (আনুমানিক $\frac{5}{6}$ অংশ) এবং কিছু রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন (আনুমানিক $\frac{1}{6}$ অংশ)। উচ্চ পরিষদের সদস্য সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যবৃন্দের দ্বারা (অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড

উচ্চ পরিষদের গঠন

১। এই আটটি রাজ্য হইল অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ।

২। এই ৬টি রাজ্য হইল আসাম, গুজরাট, কেরালা, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও নাগাভূমি।

ইত্যাদি), প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিধানসভার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক একক হস্তান্তর-যোগ্য সমানুপাতিক ভোট দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশ রাজ্যের স্নাতককেন্দ্র হইতে গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক এবং আর এক-দ্বাদশাংশ ন্যূনপক্ষে তিন বৎসরকাল রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত জড়িত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন। শিক্ষকদের আসন সংখ্যার বিলোপ ও উহা স্বায়ত্ত-শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান ও স্নাতক কেন্দ্রে গ্রাজুয়েটগণের মধ্যে বণ্টন করার একটি প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বাকী অংশ রাজ্যপাল বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিবৃন্দ হইতে মনোনয়ন করেন। বিধানপরিষদ একটি স্থায়ী পরিষদ, ইহাকে কখনও ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। তবে সংবিধানের ১৭২ (২) নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক দুই বৎসরে ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। বিধানসভার কোন সভ্যকে বিধানসভা নির্বাচিত করিতে পারে না।

পরিষদের সভ্য-পদের যোগ্যতা

বিধান পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) এবং একজন সহকারী সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচিত করেন। উক্ত সভাপতি অথবা তাঁহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কার্য পরিচালনা করিয়া বিধান পরিষদের অধিবেশন চলাকালে উক্ত সভার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখেন। বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে তাঁহাকে (ক) ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়, (খ) ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হয় এবং (গ) রাজ্যের বিধানসভার ভোটার হইতে হয়। কোন বিচারালয় কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বিবেচিত হইলে অথবা নির্বাচনে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অথবা ভারত সরকার কিংবা রাজ্যসরকারের অধীন কোন লাভজনক পদে আসীন থাকিলে কোন ব্যক্তি বিধানপরিষদ কিংবা বিধানসভার সদস্যপদের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন না।

বিধানসভার গঠন

বিধান সভা (Legislative Assembly): রাজ্য-বিধানসভার সদস্যগণকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ কর্তৃক, নির্বাচনের জন্য বিভক্ত ভৌগোলিক নির্বাচন এলাকা হইতে (Territorial Constituency) এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করিতে হইবে যেন প্রত্যেক ৭৫ হাজার জনসাধারণের জন্য অনধিক একজন সদস্য নির্বাচিত হয়। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০ জনের কম এবং ৫০০ জনের বেশি হইতে পারে না। রাজ্যপাল সংবিধানের ৩৩৩নং ধারা অনুযায়ী বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপযুক্তরূপ প্রতিনিধিত্ব

হয় নাই। এইরূপ সংরক্ষণ আগামী ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে।

সংবিধানের ১৭২নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যবিধানসভার স্থায়িত্বকাল ৫ বৎসর। রাজ্যপাল এই পরিষদকে ৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সংবিধানের ১৭২(১)নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থা থাকাকালীন পার্লামেণ্ট রাজ্য-বিধানসভার কার্যকাল প্রতিবারে এক বৎসর করিয়া বাড়াইয়া দিতে পারেন, তবে উহার স্থায়িত্বকাল কোনক্রমেই জরুরী অবস্থার প্রত্যাহারের পর ৬ মাসের অধিক বাড়ানো চলে না।

বিধান সভার স্থায়িত্ব

উপরে বর্ণিত বিধানপরিষদের সভ্যপদে নির্বাচিত হইবার যে যোগ্যতা থাকা দরকার, বিধানসভার সভ্যবৃন্দেরও সেই একই যোগ্যতা থাকা দরকার; কেবলমাত্র বিধানসভার সভ্যপদে নির্বাচিত হইতে হইলে সদস্যটিকে ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়—বিধানপরিষদের সদস্যের ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধানসভার সভ্যপদের যোগতা

বিধানসভার সভ্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য হইতেই একজন স্পীকার এবং একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন। রাজ্যবিধানসভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার পার্লামেন্টের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের অনুরূপ কার্য এবং ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকেন। বিধানসভার অধিবেশনে স্পীকার সভাপতিত্ব করেন এবং ইহার যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন ও অধিবেশন চলাকালে বিধানসভার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখেন।

রাজ্য আইনসভা (বা বিধানমণ্ডলীর) ক্ষমতা এবং কার্য ও বিধানমণ্ডলীর দুইটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক (Powers and the functions of the state legislature and relation between the two Houses of legislature) : রাজ্য-আইনসভা উচ্চ ও নিম্নকক্ষ লইয়া গঠিত। আইনসভার সর্বপ্রথম কাজ হয় সরকারী কর্মপরিচালনাকারী সংস্থা, মন্ত্রিসভার গঠন। মন্ত্রিসভাকে গঠন করার পর উহার কার্যাবলী ঠিকঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে আইনসভা। মন্ত্রিগণ আইনসভার নিকট দায়ী। সুতরাং মন্ত্রিগণকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আইনসভার আছে। তাঁহাদের কাজের সমালোচনা করিয়া আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রিমণ্ডলী তথা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াসী হন। ইহা ছাড়াও বিধানমণ্ডলী রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করে, অর্থসংক্রান্ত এবং অন্যান্য বিল বিবেচনা করে।

রাজ্যবিধানমণ্ডলীর প্রধান কাজ রাজ্যতালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে

যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরও আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্য-বিধানমণ্ডলীর আইনসমূহ এইসব ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়। রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার ঘোষণা করা হইলে সমস্ত রাজ্যের উপর সংবিধানের ২৫০নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এইভাবে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য বিধানমণ্ডলীর আইন প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ দেখা যায়। যুগ্মতালিকার বিষয় (concurrent list) সম্পর্কেও রাজ্য বিধানমণ্ডলী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তবে রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত যুগ্মতালিকার বিষয়ে আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত উক্ত বিষয়ের আইনের বিরোধী হইলে রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর প্রণীত আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যায় এবং পার্লামেণ্টের আইন কার্যকর হয়। রাজ্য-বিধানমণ্ডলী যদি এই আইন সম্পর্কে পূর্বেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে তাহা হইলে উক্ত আইন পার্লামেণ্টের আইনের সহিত আপাত বিরোধী হইলেও উহা বাতিল হইবে না।

রাজ্যতালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে ক্ষমতা

রাজ্যসরকারের মন্ত্রিগণ যৌথভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ দ্বারা গঠিত বিধানসভার নিকট দায়ী থাকেন। বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে অনাস্থামূলক অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। সেইজন্য বিধানমণ্ডলীকে সরকারের সহিত জনগণের যোগ-সূত্র হিসাবে অভিহিত করা যায়। এইভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে উভয় কক্ষের মধ্যে নিম্নকক্ষই অধিক ক্ষমতা উপভোগ করে।

মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বিধানসভার নিকট

অর্থ সংক্রান্ত যে কোন বিল কেবলমাত্র বিধানসভায়ই উত্থাপিত হইতে পারে। বিধানপরিষদে এইরূপ বিলের উত্থাপন করা যায় না। উক্ত বিল বিধানপরিষদে আলোচনার্থে প্রেরণ করা হয়। তবে বিলটি পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে উহা বিধানসভায় পুনরায় ফেরৎ পাঠাইতে হয়। বিধান-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হোক বা না হোক, অথবা ১৪ দিনের মধ্যে উহা বিধান-সভার নিকট ফেরৎ দেওয়া হোক বা না হোক বিলটি বিধানপরিষদের নিকট প্রেরণের ১৪ দিন পরে উহা উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বিধানপরিষদ কর্তৃক উক্ত বিলে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হইলে অথবা বিধানপরিষদ উক্ত বিলটির বিরোধিতা করিলেও বিধানসভা উহা পূর্বের আকারেই অনুমোদিত বলিয়া রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারে। বিধানপরিষদের সংশোধন অথবা বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করিলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হয়। সেইজন্য এ

অর্থবিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের সম্পর্ক

বিষয়ে বিধানসভার ক্ষমতা অনন্য। তবে বিধানসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও সীমাহীন নহে। কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষ নহে; যেমন রাজ্যপাল, বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, বিধান-পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং রাজ্যের ঋণ সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি। এইগুলি রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (Charged on the Consolidated Fund of the State)। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা উচিত যে, বিধানসভার নিকট ব্যয় বরাদ্দের যে কোন দাবী রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত করা যায় না। এইরূপ ব্যয় বরাদ্দের দাবী আইনসভার উচ্চকক্ষেও উত্থাপন করা যায় না।

অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্যান্য বিল বিধানমণ্ডলীর যে কোন কক্ষেই উত্থাপিত করা যায়। এইরূপ কোন বিল যদি বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং বিধানপরিষদ যদি (ক) উহা গ্রহণ না করে, অথবা (খ) যদি বিধানপরিষদ এমন কোন প্রস্তাবসহ বিলটিকে গ্রহণ করে যাহা বিধানসভা কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয় অথবা (গ) যদি বিধানপরিষদের নিকট প্রেরিত হইবার তিন মাসের মধ্যে উক্ত বিলটি বিধানপরিষদ গ্রহণ না করে তাহা হইলে বিধানসভা পুনরায় কিছু সংশোধনসহ অথবা সংশোধন বিনা ঐ বিলটিকে বিধানপরিষদের নিকট প্রেরণ করে। বিধানপরিষদ দ্বিতীয় বারেও প্রথম বারের ন্যায় বিলটিকে অনুমোদন করিতে পারে অথবা নাও করিতে পারে অথবা কিছু সংশোধনী প্রস্তাব দিতে পারে। কিন্তু বিলটিকে বিধানপরিষদ এক মাস পর্যন্তই কেবল ধরিয়া রাখিতে পারে। দ্বিতীয় বার বিধানপরিষদের নিকট প্রেরিত হইবার একমাস পরে উক্ত বিলটি বিধানপরিষদের অনুমোদন ছাড়াই উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করিলেই বিলটি আইনে পরিণত হয়। ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে রাজ্যপাল নিজে অনুমোদন না করিয়া যে কোন বিলকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য ধরিয়া রাখিতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি দিতেও পারেন অথবা নাও দিতে পারেন।

বস্তুতঃ রাজ্যের বিধানপরিষদের ক্ষমতা অতি নগণ্য। কোন একটি অর্থসংক্রান্ত বিল মাত্র ১৪ দিন পর্যন্ত তাহারা ধরিয়া রাখিতে পারে। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডের উচ্চকক্ষ (House of Lords) অর্থসংক্রান্ত বিল একমাস পর্যন্ত আলোচনার্থে ধরিয়া রাখিতে পারে। অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য বিলের ক্ষেত্রেও নিম্নকক্ষ অনন্য ক্ষমতার অধিকারী। উচ্চকক্ষের যে কোন 'ভেটো'কে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাজ্য বিধানসভার রহিয়াছে। বিধানপরিষদ, উপরের আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট যে, অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল কেবলমাত্র ৪ মাস পর্যন্ত নিজেদের কাছে রাখিয়া উহার আইনে রূপান্তরকে বিলম্বিত করিতে পারে।

ইংলণ্ডের উচ্চকক্ষ অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য কোন বিলে 'ভেটো' প্রদান করিলে উক্ত বিলটিকে উচ্চকক্ষের 'ভেটো'র উপর হইতে অনুমোদন করাইতে হইলে হাউস অব কমন্স বা ইংলণ্ডের নিম্নকক্ষকে পর পর তিনটি অধিবেশনে উক্ত বিলটিকে অনুমোদন করাইতে হইবে। এই দিক হইতে ভারতের রাজ্য-বিধানপরিষদের ক্ষমতা কত কম তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

জরুরী অবস্থার ঘোষণার দ্বারা অথবা রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যটির আইনপ্রণয়ন ভার স্বহস্তে তুলিয়া লইতে পারেন, এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার উপর উক্ত রাজ্যের আইন-প্রণয়ন ভার ন্যস্ত করিতে পারেন। এই সময়ে আইনসভার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করা যায়। সেইজন্য বিধানসভা বা বিধানপরিষদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। বিধানমণ্ডলীর করণীয় কাজও সেই সময় কিছুই থাকে না।

একটি গুরুপূর্ণ বিষয়ে আইনসভার দুইটি কক্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সংবিধানের ১৬৯নং ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্যের বিধানসভার মোট সভ্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সভ্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থনে সেই রাজ্যের বিধানপরিষদ পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে বিলুপ্ত বা গঠিত হইতে পারে। সুতরাং বিধানপরিষদ বা উক্ত সভার গঠনেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিম্নকক্ষ বা বিধানসভার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

রাজ্যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার যৌক্তিকতা (Bicameralism in the States)ঃ বিধানপরিষদের (উচ্চকক্ষের) ক্ষমতা এইরূপভাবে সীমবদ্ধ বলিয়া অনেকে উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ, রাজ্যবিধান পরিষদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ অবহিত ছিলেন বলিয়া ভারতে রাজ্যবিধানপরিষদ বা উচ্চকক্ষের গঠন ও বিলোপ সংক্রান্ত বিশেষ একটি বিধান সংবিধানের অন্তর্গত করা হইয়াছে। সংবিধানের ১৬৯নং ধারায় বিধানপরিষদের গঠন অথবা বিলোপের কথা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, যদিও তত্ত্বগতভাবে উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তার জন্য অনেকেই অনেক মতামত প্রকাশ করেন এবং সেই সমস্ত মতামত ভারতের রাজ্য বিধানপরিষদের স্থায়িত্বের অনুকূল, তবুও কার্যতঃ দেখা যায় বিধানসভা এরূপভাবে আইনের মাধ্যমে অনন্য ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে যে উপদেশ তো দূরের কথা অনেক সময় বিধানপরিষদ তাহাদের হাতে দেওয়া একটি বিলকে বিলম্ব করার ক্ষমতারও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। বিলম্ব করিয়া উক্ত বিলটি সর্বদিকে আলোচনা ও তাহার জন্য জনমত গঠন করার পূর্বেই তাহাদের

মাথার উপর দিয়া আইনসভার নিম্নকক্ষ বিলটিকে অনুমোদন করিয়া লয়।

যাহা হউক, ভারতের রাজ্যের আইনসভাগুলি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইবে কি এককক্ষবিশিষ্ট হইবে সেই প্রসঙ্গে যে মতামত প্রদান করা হয় তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। আইনসভাগুলির দুইটি কক্ষ থাকার স্বপক্ষে প্রথমেই বলা হয় যে এদেশের নির্বাচকগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত। ফলে একটি কক্ষ থাকিলে উহাতে অযোগ্য ও অশিক্ষিত ব্যক্তির নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। এই কারণে উচ্চকক্ষ বা বিধানপরিষদের অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। বিধানপরিষদে মনোনয়ন দ্বারা শিক্ষিত, জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করা যায় বলিয়া নিম্নকক্ষ-প্রণীত আইন ও নীতি উচ্চকক্ষ বা বিধানপরিষদ কর্তৃক সম্যকরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিধানসভা ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া দ্রুত আইন প্রণয়ন করিয়া জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজ করিতে পারে। উচ্চকক্ষ সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি সহযোগে নিম্নকক্ষের এইরূপ কাজের উপর বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। আবার অনেক সময়ে তাহাদের আলোচনা জনমত গঠনে ও জনসাধারণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার জাগরণেও সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, বিধানপরিষদ বা উচ্চকক্ষ আছে বলিয়াই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতিনিধিত্ব সম্ভবপর হয়। ইহা ছাড়া, ভারতীয় রাজ্যের আইন সভায় এমন কতিপয় ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি না হইয়াও আইনসভার কার্যকলাপে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধরণের ব্যক্তি নির্বাচনের ন্যায় জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে আইনসভার সদস্যপদে নিযুক্ত হইতে অনিচ্ছুক থাকিতে পারেন। সুতরাং মনোনয়ন দ্বারা উচ্চকক্ষে এইসমস্ত লোককে নিযুক্ত করা গেলে তাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে।

চতুর্থত, বলা যায়, বিধানপরিষদ কোন্ আইন বা নীতি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ সেই সম্পর্কে বিধানসভাকে পরামর্শ দান করিতে পারে। সংবিধানের ধারা অনুযায়ী সেই পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করার ইচ্ছা নিম্নকক্ষের। উচ্চকক্ষ কেবলমাত্র কোন নীতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমতই প্রদান করে, যাহার ফলে নিম্নকক্ষের ক্ষতি তো হয় না-ই, বরং ইহারা অনেক ক্ষেত্রে উপকৃতও হয়।

সর্বশেষে যে যুক্তিটি দেওয়া হয় তাহা হইল এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকিলে তাহা স্বেচ্ছাচারী হইয়া নাগরিকদের স্বাধীনতা হরণ করিতে পর্যন্ত উদ্যত হইতে পারে। এইদিক হইতে উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষটির স্থায়িত্বের যুক্তি রাজ্যের আইনসভাগুলির পক্ষে প্রদান করা হইয়া থাকে। উচ্চকক্ষ জনসাধারণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেকাংশে সহায়ক হয় বলিয়া ইহার বিলুপ্তি অনেকেই কাম্য বিবেচনা করেন না।

তবে বর্তমানে এইরূপ দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চকক্ষের হস্তে দেওয়া কার্য ও ক্ষমতার স্বরূপ দেখিয়া অনেকেই এই কক্ষের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশাহত হইয়া ইহার বিলুপ্তিই কামনা করিতেছেন। ইহাছাড়াও এইরূপ কক্ষের বিপক্ষে আজকাল অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হয়। প্রথমেই বলা হয় যে নিম্নকক্ষ কোন আইন প্রণয়ন ও নীতি গ্রহণের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এইরূপ আইনকে নিজেরা তো বিবেচনা করেই উপরন্তু বিভিন্ন কমিটি কর্তৃকও প্রয়োজন হইলে সেইগুলি বিচার করাইয়া লইয়া থাকে। বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক ভারতের রাজ্য-আইনসভাগুলির পক্ষে বিল ইত্যাদি বিবেচনা করানোর পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর করা গেলে দ্বিতীয় কক্ষ অপেক্ষাও ইহার অনেক সুফল পাওয়া যাইবে। সুতরাং নিম্নকক্ষ ভাবাবেগে পরিচালিত হয় এইরূপ মনে করার সঙ্গত কোন কারণই নাই।

দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে উচ্চকক্ষ থাকার অর্থই হইল অধিকতর আর্থিক ব্যয়। এইরূপ অর্থ দ্বিতীয় কক্ষের জন্য অনাবশ্যকভাবে ব্যয় না করিয়া ইহার দ্বারা অধিকতর জনকল্যাণকর কাজ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভারতীয় রাজ্যগুলির অনেকেই অর্থনৈতিক নানা সমস্যায় জর্জরিত। ঐ অর্থ সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিয়োজিত হইলে জনগণের যে কল্যাণ হইবে উচ্চকক্ষ রাখার ফলে তাহা হইবে কিনা সন্দেহ।

তৃতীয়ত, এইরূপ উচ্চকক্ষের অবস্থিতির ফলে অনেকের মতে প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন ব্যাহত হয়। অনেকে আবার এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলেন যে ভারতীয় রাজ্যগুলির উচ্চকক্ষ একটি বিলকে সর্বসাকুল্যে ৪ মাসই কেবল বিলম্ব ঘটাইতে পারে। এই চার মাস সময় এমন কিছু নয় যাহার মধ্যে তাহারা উপযুক্তরূপে জনমত বিলটির বিরুদ্ধে গঠন করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা তখন যে কতখানি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সর্বশেষে, রাজ্যগুলির উচ্চ পরিষদের কাজ হইতে দেখা যায় যে তাহারা কখনই নিম্নকক্ষের গৃহীত প্রস্তাবাদির উপর উল্লেখযোগ্য সংশোধন আনয়ন করিতে পারে নাই। বরং, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থিতির জন্য কোন বিল পাস হইতে অহেতুক বিলম্ব হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধন নিম্নকক্ষকে প্রভাবিতও করিতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে এইরূপ উচ্চকক্ষ (যাহার গঠন মনোনয়ন বলিয়া অগণতান্ত্রিকও বিবেচিত হয়) না রাখার জন্যই অনেকে সুপারিশ করেন।

কিন্তু একথা বিস্মৃত হওয়া চলে না যে কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি কক্ষের ক্ষমতা যত কমই হউক না কেন উহার কিছুটা অন্ততঃ পরোক্ষ প্রভাব থাকেই। তত্ত্বগতভাবে অনেক যুক্তি এই ব্যবস্থার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দেওয়া যায়, তবে পরিশেষে এই কথাও বলা যায় যে যখন

উচ্চকক্ষের অবস্থিতি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের কক্ষের মতামতকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না তখন ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তাহাদের বিলোপসাধন করিয়া উক্ত ব্যবস্থার তত্ত্বগত সুবিধাগুলি পাইবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবার সার্থকতা কোথায়?

বিধানসভার স্পীকার (Speaker of the Legislative Assembly): ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, বিধানসভায় সভাপতিত্ব করেন স্পীকার, এবং তাঁহার অবর্তমানে সেই পদে অধিষ্ঠিত হন ডেপুটি স্পীকার। বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে এবং বিধানসভার সদস্যগণের দ্বারা স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ বিধানসভার সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটেই স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন।

স্পীকার নির্বাচন

ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের সভাপতি বা স্পীকারের ন্যায় রাজ্যবিধানসভার স্পীকারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সংবিধানে কয়েকটি ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। প্রথমেই দেখা যায় স্পীকারের (এবং ডেপুটি স্পীকার) বেতন ও ভাতা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে (Charged on the Consolidated Fund of State)। অর্থাৎ তাঁহাদের বেতন ইত্যাদি লইয়া প্রতিবৎসর আইন সভায় ভোটাভুটির প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের পদচ্যুতির পদ্ধতিকে অনায়াসসাধ্য না করিয়া তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহাদের অপসারিত করিতে হইলে ওই মর্মে বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ প্রস্তাবকে উত্থাপন করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয়। সর্বশেষে, বিধানসভার সমস্ত দলের সভ্যদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্পীকার কখনই কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন না। যখন কেবলমাত্র দুইপক্ষে সমসংখ্যক ভোট পড়ে তখনই তিনি তাঁহার নির্ণায়ক ভোট (casting vote) দ্বারা অচল অবস্থা দূর করেন। আবার বিধান সভার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যতটুকু কথাবার্তা বলা প্রয়োজন ততটুকুই কেবলমাত্র তিনি কথা বলেন। কোনরূপ বিতর্কমূলক বিষয় সম্বন্ধে সদস্যগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে তাঁহাদের অবহিত করাইতে পারেন। তবে এই সময়েও নিজের মতামত সচরাচর তিনি ব্যক্ত করেন না। আবার তর্ক-বিতর্কের সময়েও সাধারণতঃ তিনি অংশগ্রহণ করেন না। এইভাবে তাঁহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

স্পীকারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রথার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা

স্পীকারের ক্ষমতার আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিতে হয় তাঁহার কিছু নিয়োগ সম্পর্কিত ক্ষমতা আছে। কখনও তিনি অথবা ডেপুটি স্পীকার অনুপস্থিত থাকিলে সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি প্রত্যেক সভার সূচনাতেই বিধানসভার সদস্যবর্গের মধ্য হইতেই একটি সভাপতির তালিকা (A panel of chairmen) প্রস্তুত করেন। আবার আবেদন কমিটি, অধিকার সম্পর্কিত কমিটি, কার্যসম্পর্কিত পরামর্শ দান কমিটি, নিয়মকানুন সংক্রান্ত কমিটি প্রভৃতি স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়।

নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

স্পীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে কোন্ বিলটি অর্থবিল সেই সম্পর্কে প্রমাণপত্র দান করা। তিনি রাজ্যপালের নিকট কোন বিলকে উপস্থিত করার সময় অথবা বিধান পরিষদে বিলটিকে প্রেরণকালে সংবিধানের ১৯৯(৪)নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এইমর্মে প্রমাণ পত্র স্বাক্ষর করেন।[১] আবার কোন বিল অর্থবিল কিনা এই সম্পর্কে বিধানমণ্ডলীতে বিতর্কের সৃষ্টি হইলে কিংবা কোনরূপ সন্দেহ দেখা দিলে সংবিধানের ১৯৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনসভার নিম্নকক্ষের সভাপতি বা স্পীকারের সিদ্ধান্তকেই চরম বলিয়া গণ্য করা হইবে।[২]

অর্থবিল সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধান্ত চরম

স্পীকারের আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল রাজ্যপাল এবং বিধানসভার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। বিধানসভা হইতে রাজ্যপালের নিকট কিংবা রাজ্যপালের নিকট হইতে বিধানসভায় প্রেরিত সমস্ত সংবাদই স্পীকারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

স্পীকার রাজ্যপাল ও আইনসভার সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যম

আইনসভার অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার মুখ্য দায়িত্ব স্পীকারের। ইহা তাঁহাকেই দেখিতে হয় যে, সংখ্যালঘু দলের সদস্যদের অধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। সভার কার্যক্রম স্থির করা, মুলতবী প্রশ্ন সম্পর্কে অনুমতি প্রদান করা, বৈধতার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা প্রভৃতি সমস্তই আইনসভার অভ্যন্তরে তাঁহার কার্যাবলীর অন্তর্গত। ইহা ছাড়া, বাজেট সম্পর্কে দ্রুত আলোচনা সম্পাদন করানোর জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, কোন

আইনসভার অভ্যন্তরে স্পীকারের কার্য

১। Art. 199 (3) "If any question arises whether a Bill introduced in the Legislature of a state which has a Legislative Council is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the Legislative Assembly of such state thereon shall be final."

২। Art. 199 (4) "There shall be endorsed on every Money Bill when it is transmitted to the Legislative Council under Art 198, and when it is presented to the Governor for assent under Art 200, the Certificate of the Speaker of the Legislative Assembly signed by him that it is a Money **Bill.**"

বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা এবং ভোটের শেষে ফলাফল ঘোষণা করার দায়িত্বও তাঁহারই। বিধানসভায় কোন বিল ভোটে অনুমোদিত হইবার সময় স্পীকার ভোট দান করেন না। তবে যদি কোন বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট প্রদত্ত হয় তাহা হইলে তিনি নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করিতে পারেন। বিধান সভায় যদি শাসনতন্ত্রের কোন বিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তবে তিনি সেই ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বিধান সভার কাছে তাহাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। আইনসভার অভ্যন্তরে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কোন সদস্যের উক্তিতে অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি থাকিলে তাঁহাকে তিনি বক্তৃতা প্রদান করা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আবার কোন সদস্য বিশৃংখল আচরণের দ্বারা স্পীকারকে অমান্য করিলে, কক্ষের নিয়ম কানুনের অপব্যবহার করিলে অথবা কক্ষের কাজে ইচ্ছাপূর্বক বিশৃংখলা আনয়ন করিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যটিকে তিনি কক্ষ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারেন অথবা "নাম উল্লেখ" দ্বারা সেই ব্যক্তিটিকে অধিবেশনের অবশিষ্টকালের জন্য অধিবেশনে যোগদান করা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

স্পীকার তাঁহার নিজ ক্ষমতাবলে যে কোন সময়েই বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৬৭ সালের ২৯শে নভেম্বর যখন পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পরামর্শে বিধান সভার অধিবেশন আহ্বান করেন তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তদানীন্তন এবং বর্তমান স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্মে একটি সাময়িক 'রুলিং' দেন যে বিধানসভার অধিবেশন এমন একটি মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাজ্যপাল কর্তৃক আহূত হইয়াছে যাহা সংবিধানসম্মত ভাবে গঠিত নয়; সুতরাং তিনি তাঁহার সাময়িক 'রুলিং'-এর মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্পীকারের এই রুলিং-এর বিরুদ্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা সম্ভবপর হয় নাই। রাজ্যপালও সেইদিনই বিধানসভার অধিবেশন শেষ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। দেখা যাইতেছে, বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা ও ইহা শেষ হইয়াছে ঘোষণা করার ক্ষমতা রাজ্যপালের থাকিলেও বিধানসভার অধিবেশন আহূত হইলে তাহা চলিতে দেওয়া অথবা না দেওয়ার ক্ষমতা স্পীকারের আছে। বিধানসভার ক্রিয়াকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে রুলিংপ্রদান করার ক্ষমতা স্পীকারের আছে, এবং ইহা তাঁহার চূড়ান্ত ক্ষমতা। বিধানসভার অধিবেশনে শক্তি পরীক্ষা না হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর পদচ্যুত করেন সেই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার স্পীকার বলেন যে ইহাতে বিধানসভার সামগ্রিক অধিকার অবহেলিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি

ইহা সংবিধান বহির্ভূত (১৬৪ (২)নং ধারা) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ; কেননা, মন্ত্রিসভা তাহার কাজের জন্য শুধু বিধানসভার নিকট দায়ী বলিয়া বিধান-সভাই অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করাইতে পারে। যদিও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী বি. সি. মিত্র ঘোষণা করেন যে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভাকে খারিজ করা (১৬৪(১)নং ধারা অনুযায়ী) সম্পূর্ণ বৈধ; তবুও স্পীকারের রুলিং লইয়া আদালতে কোন প্রশ্ন উঠে নাই এবং বিচার-পতির রায়েও স্পীকারের রুলিং-এর কোন উল্লেখ করা হয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির রায়ও স্পীকারের রুলিং-এর কোনও পরিবর্তন করিতে পারে নাই। স্পীকারের এই রুলিং-এর ফলে যে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইতিপূর্বে ভারতের কোন বিধান সভায়ই স্পীকারের রুলিং লইয়া এত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই।

যদিও স্পীকারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং তাঁহাকে নিরপেক্ষ করার জন্য কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তবুও বলা যায় ভারতীয় রাজ্যগুলির স্পীকার ইংলণ্ডের স্পীকারের ন্যায় পরিপূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। স্পীকারকে দলীয় সভাসমিতিতে যোগদান করার জন্য অনেকেই সমালোচনা করিয়া থাকেন। আবার ইংলণ্ডে যেরূপ স্পীকারের পুনঃনির্বাচিত হইবার প্রথা প্রচলিত, ভারতের রাজ্যবিধানসভাগুলিতে এইরূপ হয় না, এমন কি অনেক সময় যিনি পূর্বে স্পীকার ছিলেন আইনসভায় পুনঃ-নির্বাচিত হওয়ার পরেও তিনি ওই পদ অলংকৃত করেন নাই। সুতরাং ভারতের রাজ্যগুলিতে স্পীকারের পদটি মর্যাদা সম্পন্ন হইলেও যেরূপ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মর্যাদা লাভের অধিকারী হওয়া তাঁহার উচিত ছিল সেইরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

রাজ্যবিধান পরিষদের সভাপতির ক্ষমতা

মোটামুটিভাবে বিধানপরিষদের সভাপতি বিধানসভার সভাপতির অনুরূপ ক্ষমতাই ভোগ করেন। কেবল মাত্র অর্থবিল সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা স্পীকারের ক্ষমতার অনুরূপ নহে। অর্থবিল সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী বিধানসভার স্পীকার,—বিধানপরিষদের সভাপতি নহেন।

রাজ্যবিধানমণ্ডলী ও ইহার সদস্যদের অধিকার (Privileges of State Legislature and its Members) : আইনসভা ও ইহার সদস্যগণের স্বাতন্ত্র্য যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্য তাহাদের কিছু সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা হইয়া থাকে। এইরূপ সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে বলিয়া

কেন অধিকার দান করা হয় ?

আইনসভার সদস্যগণ নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়। জনসাধারণের

সভা ও জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের যদি জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত অথবা আলোচিত কোন মতামতের জন্য শাস্তি লাভ করিবার ভয় থাকিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের কাঠামোর গণতান্ত্রিক ভিত্তি শিথিল হইত সন্দেহ নাই।

যে অধিকার ও সুযোগ রাজ্য-আইনসভা ও ইহার সদস্যগণ ভোগ করেন তাহা মোটামুটি পার্লামেণ্ট ও ইহার সদস্যগণের অধিকারেরই অনুরূপ। বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা আলোচনা করা হইয়াছে। আরও দুই একটি উদাহরণ সহ নিম্নে রাজ্য-আইনসভা ও ইহার সদস্যগণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

এইরূপ অধিকারগুলি সংবিধানের ১৯৪নং ধারার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।[৩] সংবিধানের ১৯৪নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী অথবা আইনসভায় বাক্-স্বাধীনতা থাকিবে। আবার উক্ত ধারার ২নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে আইনসভায় কিছু বলিলে বা ভোটদান করিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আদালত অভিযুক্ত করিতে পারিবে না।

বাক্স্বাধীনতা, ভোটদান অথবা কাগজপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা

আইনসভা অথবা আইনসভার কোন সদস্য যদি আইনসভার কার্য সম্পর্কিত কোন রিপোর্ট বা কাগজপত্র প্রকাশ করে, তাহা হইলেও তাহা আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূতই থাকিবে। তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য স্পীকার কর্তৃক নিষিদ্ধ আইনসভার কার্যের কোন অংশ প্রচারের জন্য এইরূপ অব্যাহতি পাওয়া যায় না। তখন আইনসভার অবমাননার দায়ে সংশ্লিষ্ট সভ্যকে অথবা ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা চলে। আবার যদি বাক্-স্বাধীনতা উপভোগ করিতে যাইয়া কোন সদস্য আইনসভার শৃংখলা ভঙ্গ করেন তাহা হইলেও ঐরূপ আচরণের জন্য স্পীকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

ইহা ছাড়া, সংবিধানের উপরোক্ত ধারার ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্যগণ ও আইনসভা যে অধিকারগুলি ভোগ করিবে তাহা রাজ্য আইনসভাই আইন প্রণয়ন করিয়া স্থির করিবে। তবে যতদিন না পর্যন্ত এইরূপ আইন প্রণীত হয় ততদিন পর্যন্ত তাহারা সংবিধান চালু হওয়ার দিন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট, ইহার সদস্যবর্গ অথবা তথাকার বিভিন্ন কমিটি যে অধিকারগুলি ভোগ করিত তাহাই ভোগ করিবে। যেহেতু রাজ্য বিধানমণ্ডলী এখনও এই সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়ন করে নাই, সুতরাং তাহাদের অধিকারগুলি ইংলণ্ডের আইনসভারই অনুরূপ ধরিয়া লইতে হইবে।

অন্যান্য অধিকার—ইংলণ্ডের আইনসভা, সদস্য ও কমিটির অধিকারের অনুরূপ

৩। Art. 194 of the Constitution :—

ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতের রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সদস্যগণকে অধিবেশন সুরু হওয়ার ৪০ দিন পূর্ব হইতে এবং ইহার সমাপ্তির ৪০ দিন পর পর্যন্ত ফৌজদারী অথবা নিবর্তনমূলক আটক আইন ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাইবে না। আবার আইনসভার যখন অধিবেশন চলে তখন কোন সদস্যকে জুরীর কাজে অথবা আদালতে সাক্ষ্যদান করার জন্য আহ্বান করা যায় না। কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই আইনসভার জ্ঞাতার্থে সেই সংবাদ পাঠাইতে হয়। আইনসভার অভ্যন্তরে স্পীকারের অনুমতি ছাড়া কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

গ্রেপ্তার হইতে অব্যাহতি

আইনসভার অধিবেশনের শৃংখলা বজায় রাখার জন্য অথবা জরুরী আলোচনা করার সময় স্পীকার আগন্তুকের অধিবেশনে উপস্থিতি নিষেধ করিতে পারেন অথবা উপস্থিত আগন্তুকগণকে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করিতে নির্দেশ দান করিতে পারেন।

আগন্তুকের আইন-সভার অধিবেশনে উপস্থিতি সংক্রান্ত নিষেধ

আইনসভায় যে কাজ হয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই আদালতকে প্রদান করা হয় নাই। এই অধিকার দ্বারা আইনসভা কক্ষের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিবার সুবিধা উপভোগ করে। উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় এই সম্বন্ধে যে মামলা হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ এখানে

অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের অধিকার

---

194 (1) "Subject to the provisions of the Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every state.

(2) No member of the Legislature of a state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any Committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a House of such Legislature of any report, paper, votes or proceedings.

(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a state, and of the members and the Committees of a House of such Legislature shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom and of its members and Committees, at the commencement of this Constitution.

(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of, a House of the Legislature of a state or any Committee thereof as they apply in relation to members of that legislature."

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উত্তরপ্রদেশের কোন একজন সদস্যকে বিশৃংখল আচরণের জন্য স্পীকার কক্ষ হইতে অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বহিষ্কার করেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতের বিচার প্রার্থনা করা হইলে আদালত রায় প্রদান করিবার সময় স্পষ্টই জানায় যে বিধানমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আদালতের নাই।[৪] আবার উড়িষ্যার হাইকোর্ট ও আইনসভার কোন সদস্যের কোন প্রশ্নকে স্পীকার বাতিল করিতে পারেন কিনা এইমর্মে রায় দান করিতে যাইয়া অভিমত প্রদান করে যে আদালত আইনসভার এইরূপ অভ্যন্তরীণ অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিতে সক্ষম নয়

আইনসভার অবমাননা

ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে অধিকারটি ভারতীয় রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ এবং বিধানমণ্ডলী নিজেই ভোগ করে তাহা হইল আইনসভার অবমাননাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের অধিকার। কোন ব্যক্তিকে আইনসভার অবমাননার জন্য তিরস্কার করা, কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা অথবা কারাদণ্ড দেওয়ার এই ত্রিবিধ অধিকার রাজ্যবিধানমণ্ডলী ভোগ করে। এইরূপ অবমাননা প্রসঙ্গে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ আইনসভায় যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বিধানমণ্ডলীর অধিকার বনাম আদালতের এক্তিয়ার লইয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। মামলাটির বিশদ বিবরণ সহযোগে এই প্রসঙ্গে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায় লইয়া নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া কোন পুস্তিকা রচনার অভিযোগে তিনজন সমাজতন্ত্রী কর্মী আইনসভার অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অভিযুক্ত করা হয়। দুইজন কর্মী আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া আইনসভা কর্তৃক ভর্ৎসিত হন, কিন্তু অপরজন শ্রীকেশব সিং উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। সাতদিনের কারাদণ্ড ভোগ করার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন এডভোকেট শ্রী বি. সোলোমনের (Shri B. Solomon) মারফৎ এই আদেশের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণের আবেদন (*Habeas Corpus Petition*) জানান। বিচারক শ্রী এন. ইউ. বেগ এবং বিচারক শ্রী জি. ডি. সেহগল (N. U. Beg and G. D. Sehgal, J. J.) আবেদনটি শুনিয়া উহার সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান করার জন্য শ্রীকেশব সিং-কে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দান করেন। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ইহাতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যে নাগরিক

৪। Rajnarayan Singh *vs* The Speaker of U. P.
৫। Misra *vs*, Nand Kishore.

আদালতে বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন, যে এ্যাডভোকেট বন্দীপ্রত্যক্ষী করণের আবেদনটি পেশ করিয়াছেন এবং যে বিচারকগণ ঐ আবেদনটি বিচার করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই আইনসভার অবমাননা (Contempt of the House) করিয়াছেন। আইনসভা অতঃপর বিচারকদ্বয় এবং এ্যাডভোকেটকে কক্ষে উপস্থিত হইয়া উক্ত অভিযোগের উত্তর প্রদান করার জন্য নির্দেশ দান করে। ইহার পর বিচারকদ্বয় এবং এ্যাডভোকেটের আবেদনক্রমে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২৮ জন বিচারপতির পূর্ণ অধিবেশনে আইনসভার উক্ত সিদ্ধান্তটির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। পরবর্তী কোন আদেশ দ্বারা আইনসভা এ্যাডভোকেট ও বিচারকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত "ওয়ারেণ্ট"টি তুলিয়া লয়। তবে আইনসভার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আইনসভার অবমাননার জন্য কেন তাঁহাদের অভিযুক্ত করা হইবে না এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সিদ্ধান্তটি অব্যাহত রাখা হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রপতি তখনই সমস্ত বিষয়টি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য এবং এই সম্বন্ধে পরামর্শ-দান করার জন্য সংবিধানের ১৪৩নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উহা সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরণ করেন।[৬] সুপ্রীম কোর্টের নিকট যে প্রশ্নগুলির বিবেচনার্থে রাষ্ট্রপতি উক্ত বিষয়টি প্রেরণ করেন তাহা হইল—কোন নাগরিক আইনসভার অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হইয়া আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারেন কিনা, অথবা কোন এ্যাডভোকেট এইরূপ আবেদন পত্র পেশ করিলে কিংবা কোন বিচারক এই আবেদনের বিচার করিলে তাঁহারা আইনসভার অবমাননা করিয়াছেন বলা চলিবে কি না? সুপ্রীম কোর্ট ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন। সুপ্রীম কোর্ট যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা হইল বিচারক বেগ ও বিচারক সেহগল কিংবা এ্যাডভোকেট সোলোমন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধিকার ভঙ্গ করিয়া তাহার অবমাননা করেন নাই। তবে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করার সময় সুপ্রীমকোর্ট স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে আইনসভার অধিকার, অব্যাহতি ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্ত প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহারা বিচার বিবেচনা করেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট প্রেরিত নির্দিষ্ট বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের মতামতকে তাঁহারা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হইতে ইহা অনুধাবন করা যায় যে আইনসভার অধিকারগুলির সীমা অতিক্রম করিয়া আইনসভা যদি অধিকার ভোগ করিতে প্রয়াসী হয় তাহা হইলে নাগরিকগণকে হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। অবশ্য সুপ্রীম কোর্ট নাগরিকগণের আইনসভায় অবমাননার অভিযোগ লইয়া নিম্ন আদালতের

৬। (Special Reference No. 1 of 1964)।

শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নাই, অথবা নাগরিকগণের কোন মৌলিক অধিকার আইনসভার অধিকারদ্বারা সীমাবদ্ধ নয় সে সম্বন্ধেও কোনরূপ মতামত প্রকাশ করেন নাই।

সুপ্রীম কোর্টের অভিমতকে খুব উৎসাহের সহিত বিভিন্ন আইনসভা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে কোনরূপ অভিমত প্রকাশ না করিয়া বিধানমণ্ডলীগুলি খুবই সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৬৫ সালে বোম্বাইতে আইনসভা সমূহের প্রিসাইডিং অফিসারদের অধিবেশনে ভাষণ দান কালে লোকসভার স্পীকার তৎকালীন শ্রীহুকুম সিং প্রকাশ্যেই অবশ্য সুপ্রীম কোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে সংবিধান-প্রণেতাগণ ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে যখনই সংসদ বা কোন বিধানমণ্ডলী অবমাননার দায়ে কোন নাগরিককে দণ্ডিত করেন, তখনই উহা আদালতের এক্তিয়ারের বাহিরে চলিয়া যায়। তিনি বলেন যে সংবিধানের ১৯৪ (৩) ধারাকে উপযুক্তভাবে ব্যক্ত করিয়া সংবিধানের এই অভিপ্রায়কে রূপ দেওয়া উচিত। শ্রীসিং-এর মতে সকলের উপরে রহিয়াছে সংবিধান, সুপ্রীম কোর্ট নহে। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাই কেবলমাত্র করিবে—নূতন করিয়া সংবিধান রচনার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের নাই।

গত ১০ই মার্চ ১৯৬৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি ডিভিসন বেঞ্চ শ্রীকেশব সিং-এর একটি আবেদনপত্রকে নাকচ করিয়া সেই প্রসঙ্গে রায় দেওয়ার সময় বলেন যে আইনসভার কোন কার্যের যৌক্তিকতা আদালত বিচার করিতে পারে। ইহার অর্থ এই নয় যে আইনসভা ঐরূপ কাজ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, আইনসভা ইহার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শ্রীকেশব সিং-কে আইনসভার অধিকার ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত করিয়া ৭ দিনের কারাদণ্ড দিয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তকে আদালত নাকচ করিতে পারে না। আদালতের রায় অনুসারে তাই শ্রীসিং-কে সম্পূর্ণ কালের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য তিনি ৬ দিন কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন; সুতরাং আরও একদিনের জন্য স্পীকারের আদেশমত দেওয়া কারাদণ্ড তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গের শেষে বলা যায় যে আইনসভা বনাম আদালতের অধিকার লইয়া সম্প্রতি যে মতবিরোধ দেখা যাইতেছে তাহার অবসান হওয়া আশু কর্তব্য। সেইজন্য ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের অধিকারের অনুরূপ না রাখিয়া ভারতীয় পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভাগুলি এবং ইহাদের সভ্যবৃন্দের অধিকার, অব্যাহতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন মহল সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যায় শঙ্কিত হইয়া আইন প্রণয়ন দ্বারা এবং প্রয়োজন হইলে সংবিধান সংশোধন করিয়া আইনসভার প্রাধান্যকে আদালতের উপরে স্থাপন করিতে আগ্রহশীল। আইনসভার

মর্যাদা এবং সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অধিকতর ক্ষমতা দ্বারা আইনসভাকে শক্তিশালী করার কথাও অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমেরিকার কংগ্রেস ভারতীয় পার্লামেণ্ট ও রাজ্যবিধানমণ্ডলীগুলি অপেক্ষা অনেক কম অধিকার ও ক্ষমতা উপভোগ করে, অথচ উক্ত (আমেরিকার) আইনসভাটি কম মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী নয়। এমনকি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টও বর্তমানে আইনসভার অধিকারগুলি সম্পর্কে ব্যাপক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। এইরূপ করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ পার্লামেণ্টের বাহিরে জনসাধারণের খোলাখুলিভাবে মতামত গ্রহণের ও প্রকাশের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা। ইহাতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মর্যাদাই যে শুধু অক্ষুণ্ণ আছে তাহা নহে, জনসাধারণের মতামত প্রকাশের পথে কোন কার্যকর বাধা না থাকায় সেখানে গণতন্ত্র প্রসারের পথও সুগম হইয়াছে। ইংলণ্ডের অধিকার সংক্রান্ত কমিটির ১৯৬৪ সালের জুন মাসে দেওয়া রিপোর্টটির আলোচনা প্রসঙ্গে লণ্ডনের 'The Times' পত্রিকাটি ২৫শে জুন ১৯৬৪ সালে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে মন্তব্যটি করেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য :—"The frequent invocation of privilege is more likely to harm than elevate the reputation of the Parliament."

আইনসভার অধিকার, সুযোগ, সুবিধা, অব্যাহতি ইত্যাদি লয়া সুপ্রীমকোর্টের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে কোনরূপ আইন প্রণয়ন বা ঐ সম্পর্কে নূতন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সময় 'The Times'-এর উপরোক্ত মন্তব্যটি স্মরণ রাখা হইলে ভারতীয় পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র যে ক্রমোন্নতির পথে আরও একধাপ অগ্রসর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতে আইনসভার দ্বারা জনগণের মৌলিক অধিকার হয়ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তবে তাহা হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা যেমন অমূলক নয় তেমনি আইনসভার হাতেও এরূপ ক্ষমতা রাখা উচিত যাহার দ্বারা তাহাদের পক্ষে সার্বভৌম আইনসভা হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হওয়া এবং সেইমত কার্য করা সম্ভবপর হয়। জনগণের অধিকারগুলিকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া যেমন উচিত, আইনসভার অধিকারগুলিরও বিকাশ তেমনি কাম্য। আইনসভার অধিকার বিশ্লেষণ অথবা আইনসভার অধিকারকে নির্দিষ্ট করার সময় এই উভয় দিকই যেন বিচার করা হয়।

রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (Law-making Process in the State Legislature) ঃ একটি সাধারণ বিল পাস করার পদ্ধতিতে রাজ্যের আইনসভা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। রাজ্যেও কোন বিল প্রণীত হওয়ার জন্য ইহার প্রত্যেকটি

কক্ষেই (যে বিধানমণ্ডলীতে বিধানসভা ও বিধানপরিষদ আছে) তিনটি করিয়া পাঠের (First, Second and Third Reading) প্রয়োজন হয়।

কোন বিল উত্থাপন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সভার অনুমতি চাহিয়া প্রস্তাব করিতে হয়। যখন এইরূপ অনুমতি লাভ করা হয় তখন সদস্য বিলটি উত্থাপন করেন। এই সময়ে বিলটি লইয়া আলোচনা করা যায় না। ইহার পর উহাকে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। যদি অবশ্য রাজ্যপাল কোন বিলকে গেজেটে প্রকাশ করার অনুমতি দান করেন তাহা হইলেও সেই সম্পর্কে আর পুনরায় অনুমতি লওয়ার জন্য নূতন করিয়া প্রস্তাব করার প্রয়োজন হয় না।

বিলের প্রথম পাঠ

বিলটি উত্থাপন করা হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য এই মর্মে প্রস্তাব করিতে পারেন যে (ক) বিলটি বিবেচিত হউক ; অথবা (খ) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, অথবা (গ) বিলটি জনমত গ্রহণের জন্য প্রচারিত হউক। বিলটির সাধারণ নীতি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া তখন আলোচনা করা যায়। তবে এই পর্যায়ে বিভিন্ন ধারাগুলি লইয়া পুংখানুপুংখভাবে আলোচনা করা চলে না; অবশ্য যদি বিলটি বিবেচিত হউক এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে উহার তৃতীয় পাঠ স্বরু হয় এবং সেই সময় বিলটির বিভিন্ন ধারা লইয়া বিশদ আলোচনা চলে। যদি বিলটিকে জনমত গ্রহণের জন্য প্রচার করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা হইলে জনমত গ্রহণ করা হইলে উহা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার প্রস্তাবও করা যায়। অথবা কোন সদস্যের সংশোধনের ফলেও বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে।

বিলের দ্বিতীয় পাঠ

যখন বিলটি কমিটিতে প্রেরণ করা হয় তখন কমিটি উহার সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে, বিভিন্ন ধারার বিশদ আলোচনা করে। সংবিধানের কোন ধারার পরিপন্থী কোন ধারা বিলটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কেও সতর্কভাবে বিচার ও বিবেচনার দায়িত্ব কমিটির। তবে বিলটির বিভিন্ন ধারার বিচার ও আলোচনার সময়ে কমিটি উহার নীতি ও উদ্দেশ্যকে পরিবর্তিত করিতে পারে না। এক্ষেত্রে আরও জানা উচিত যে সংশ্লিষ্ট আইনসভাই কমিটি গঠন করে।

কমিটিকর্তৃক বিবেচনা

কমিটি অতঃপর সংশ্লিষ্ট কক্ষে তাহাদের আলোচনা ও বিবেচনার ফল জানায়। এই পর্যায়কে রিপোর্ট পর্যায় বলা হয়। কমিটি রিপোর্টটি আইন-সভার কক্ষটিতে প্রদান করিলে বিলটির উত্থাপক এইমর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন যে (১) কমিটির নিকট হইতে আসা বিলটি বিবেচিত হউক, অথবা (২) বিলটি পুনরায় কমিটিতে প্রেরিত হউক অথবা (৩) বিলটি কিংবা সংশোধিত বিলটি জনমত সংগ্রহের জন্য পুনঃপ্রচারিত

কমিটির রিপোর্ট

হউক। তবে সাধারণতঃ এই পর্যায়ে বিলটি বিবেচিত হউক এই মর্মেই ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করেন। আইন সভার কক্ষটির অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা শুরু হয়।

বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

বিলটিকে এই পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে সদস্যগণ বিবেচনা করেন। ইহার প্রতিটি ধারা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলে এবং বিলটির বিভিন্ন ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাবও গ্রহণ করা যায়। তবে সংশোধন গ্রহণ করা কিংবা বাতিল করার সিদ্ধান্ত ভোটের দ্বারা লওয়া হইয়া থাকে।

বিলের তৃতীয় পাঠ

এইরূপে বিলটির বিভিন্ন ধারা লইয়া চূড়ান্তভাবে আলোচনা হওয়ার পর ইহাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা বা সামগ্রিকভাবে বর্জন করার প্রস্তাব করা হয়। এই পর্যায়কে বিলের তৃতীয় পাঠ বলা হয়। এই সময়ে এইমর্মে প্রস্তাব করা হয় যে বিলটি গৃহীত হউক। তখন যে বিতর্ক চলে তাহাও সামগ্রিকভাবে বিলটিকে গ্রহণ করা কিংবা বর্জন করার বিষয় লইয়াই হয়। বিলটি আইনসভার কক্ষটিতে গৃহীত হইলে অনুরূপ পর্যায়ে ইহাকে অপর কক্ষেও গৃহীত হইতে হইবে। দুইটি কক্ষের দ্বারা গৃহীত বিলটি রাজ্যপালের সম্মতি পাইলেই আইনে পরিণত হইবে।

অর্থবিল প্রণয়ন পদ্ধতি (Procedure for Passing Money Bills) : সংবিধানের ১৯৯ নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রস্তাব সম্বলিত বিলকে অর্থবিল বলা হয়। রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলে দেওয়া অর্থ, উহা হইতে ব্যয় করা কিংবা উহাতে জমা দেওয়া, ঐরূপ তহবিল হইতে বিনিয়োগ করা, কোন কর স্থাপন করা, বিলোপ করা, পরিবর্তন করা, কোন ব্যয় রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য কিনা কিংবা ঐরূপ কোন ব্যয়ের অংক বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই অর্থবিলের পর্যায়ে পড়ে। তবে কোন বিলের বিষয় যদি কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আঞ্চলিক উদ্দেশ্যে কর স্থাপন, কর বিলোপ, কর পরিবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত হয়, অথবা উহা যদি লাইসেন্সের জন্য অথবা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য ফী হয় অথবা উহা যদি জরিমানার জন্য ধার্য অর্থদণ্ড সংক্রান্ত হয় তাহা হইলে এইরূপ বিল অর্থবিল বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অর্থবিলের বিভিন্ন ভাগ

অর্থবিলের কয়েকটি ভাগ আছে। প্রথমত, ইহাকে অর্থবিল এবং অন্যান্য অর্থসম্বন্ধীয় বিল—এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। অর্থবিলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় দেখা গিয়াছে যে, কর প্রবর্তন, হ্রাস, বিলোপ অথবা ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ের সহিতই এইরূপ বিল সম্পর্কযুক্ত। উক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অর্থসংক্রান্ত যে বিষয়গুলি আছে সেইগুলিই দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত (অর্থাৎ অন্যান্য অর্থ সম্বন্ধীয়) বিল আবার দুইভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিলটিতে অর্থবিলের এবং অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ থাকে। এইরূপ বিল

উপরোক্ত অর্থবিল এবং অন্যান্য অর্থসম্বন্ধীয় বিলের ন্যায় বিধানসভায়ই কেবলমাত্র রাজ্যপালের সুপারিশ লইয়া উত্থাপন করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্যান্য অর্থসম্পর্কিত বিলে অর্থবিলের বিষয়সমূহ না থাকিলেও উহাকে অনুমোদন করা একান্ত দরকার হয়, যেহেতু উহা গৃহীত হওয়ার পরই কেবলমাত্র প্রয়োজন হইলে রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ খরচ করা যায়। এই ধরনের বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা গেলেও ইহার বিচার-বিবেচনা রাজ্যপালের সুপারিশক্রমেই কেবল করা যায়। আবার এই ধরনের বিলটি সাধারণ বিলের ন্যায়ই অনুমোদন করা হয়।

অর্থবিল কেবল আইনসভার নিম্নকক্ষ বা জনপ্রতিনিধি কক্ষেই রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে উত্থাপন করা যায়। এই ব্যবস্থা হইতে ইহা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে অর্থসম্পর্কিত বিলের উত্থাপনের দায়িত্ব মুখ্যতঃ মন্ত্রিসভা বা সরকারের। এইরূপ বিল (Money bill) উত্থাপিত হওয়ার পর নিম্নকক্ষে গৃহীত হইলে উহা (যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর দুইটি কক্ষ আছে) উচ্চ কক্ষ বা বিধানপরিষদে প্রেরণ করা হয়। বিধানপরিষদের হাতে কেবলমাত্র এই ধরনের বিলে সুপারিশ করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা বিলটিকে সংশোধন অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। বিধানপরিষদকে অর্থবিল সম্বন্ধে ১৪ দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, এবং ১৪ দিনের মধ্যেই তাহাদের সুপারিশসহ উহা বিধানসভায় ফেরত পাঠাইতে হয়। বিধানপরিষদ বিলটির ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ (recommendation) প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করা কিংবা গ্রহণ না করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিধানসভার আছে। যদি সুপারিশগুলি বিধানসভা মানিয়া লয় তবে উক্ত সুপারিশসহ বিলটি উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে; আর যদি বিধানসভা উক্ত সুপারিশগুলি নাকচ করে তবে যে অবস্থায় বিলটি বিধানসভায় গৃহীত হইয়াছিল ও বিধানপরিষদে সুপারিশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল সেই অবস্থায় ইহা উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আবার যদি কখনও বিধানপরিষদ ১৪ দিনের মধ্যে তাহাদের সুপারিশসহ বিলটি বিধানসভায় ফেরত না পাঠায় তাহা হইলেও উক্ত ১৪ দিনের পর ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয়কক্ষ কর্তৃকই অনুমোদিত হইয়াছে। ইহার পর রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করার পর বিলটি আইনে পরিণত হয়।

অর্থবিল পাসের পদ্ধতি

এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে কোন বিল অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ বা প্রশ্ন তোলা হইলে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া বিবেচিত হইবে। রাজ্যপালের সম্মতির জন্য অর্থবিল তাঁহার কাছে উপস্থিত করার সময় অথবা সুপারিশের জন্য বিধানপরিষদে উহা প্রেরণ করার সময় স্পীকার বিলটি যে অর্থবিল সেই মর্মে একটি প্রমাণপত্র স্বাক্ষর করেন।

ইতিপূর্বেই রাজ্যপালের আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে যে তিনি কোন বিলে সম্মতি প্রদান করিতে পারেন অথবা নাও প্রদান করিতে পারেন। অর্থবিল ভিন্ন অন্য বিল তিনি রাজ্যের আইনসভায় পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। যদি রাজ্য-আইনসভা দ্বিতীয়বার এইরূপ বিল অনুমোদন করে তাহা হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতিদান করিতে বাধ্য থাকেন। অবশ্য ইচ্ছা করিলে তিনি উহা নিজে বিবেচনা না করিয়া রাষ্ট্রপতির বিবেচনা ও সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ঐরূপ বিলে সম্মতি দিতেও পারেন আবার সম্মতি নাও দিতে পারেন কিংবা অর্থবিল না হইলে রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্যবিধানমণ্ডলীতে উহা পুনর্বিবেচনার্থে প্রেরণও করিতে পারেন। রাজ্যবিধানমণ্ডলী উহা পুনরায় গ্রহণ করিলেও ঐ বিল অনুমোদন করা না করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত আছে।

কোন বিলে রাজ্য-পালের সম্মতি দান

রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি ঃ কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির আইনসভার অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতিতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বাজেট অনুমোদন, সেই বিষয়ে সাধারণ আলোচনা, ব্যয়মঞ্জুরীর দাবী সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা ও ভোট গ্রহণ, বিনিয়োগ আইন প্রণয়ন করা, গণনানুদান, অতিরিক্ত অনুদান প্রভৃতি সমস্তই রাজ্যবিধানমণ্ডলীর অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতির অন্তর্গত। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন বিভাগের অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং উহার আর পুনরালোচনা করা হইল না।

আবার আয়-ব্যয়ের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে আইনসভাকে সহায়তা করার জন্য রাজ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি দেখা যায় তাহারা হইল কেন্দ্রেরই মত (১) ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General of India), সরকারী গাণিতিক কমিটি (The Public Accounts Committee) এবং আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি (The Committee on Estimates)। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন বিভাগের কার্যাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। ভারতের কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে রাজ্যের আইনসভার ক্ষেত্রেও তাহা সমভাবেই প্রযোজ্য। কার্যক্ষমতা এবং উপকারিতা ইত্যাদির দিক হইতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের গাণিতিক কমিটি, আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বর্ণিত কার্যাবলী রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত ; রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যের কমিটিগুলি রাজ্য-বিধানমণ্ডলীতে উহা প্রদান করে, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিগুলি পার্লামেণ্টে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করে।

সংক্ষিপ্তসার

রাজ্যবিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা ও কাজ (Powers and Functions of the State Legislature): বিধানমণ্ডলীর প্রধান কাজ হইল, রাজ্য তালিকার (State list) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। যুগ্ম তালিকার (Concurrent list) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি লইয়াও রাজ্যবিধানমণ্ডলী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু যুগ্ম তালিকার বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন যদি রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইনের বিরোধী হয় তবে পার্লামেণ্টের প্রণীত আইন গৃহীত হয় এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি বাতিল হইয়া যায়। অর্থসংক্রান্ত কোনও বিল একমাত্র বিধানসভায় উত্থাপন করা যায়। বিধানপরিষদ ইহা লইয়া বিতর্ক করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সংশোধন করিতে পারে না। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্যান্য বিল বিধানমণ্ডলীর যে কোন কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। বিধানসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি ইহার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে; যেমন রাজ্যপাল, বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, বিধানপরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং রাজ্যের ঋণ সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি। রাজ্য বিধানসভার নিকট মন্ত্রিগণ নিজেদের কাজের জন্য সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকেন এবং বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু, যদি শাসনতন্ত্রের ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তবে বিধানমণ্ডলী ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ে এবং রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের তথা রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। স্বাভাবিক সময়ে যদিও বিধানসভা মন্ত্রিগণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিগণই বিধানসভার সমুদয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন।

রাজ্যের দুই কক্ষের প্রয়োজনীয়তা: বিধানপরিষদে মনোনয়ন দ্বারা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণকে আইনসভার কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া যায়। নিম্নকক্ষের ভাবাবেগে পরিচালিত আইন প্রণয়ন করার পথে উচ্চকক্ষ বা বিধানপরিষদ বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। বিধান-সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে সভ্য হইতে অনিচ্ছুক সত্যিকারের রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে বিধানপরিষদে নিযুক্ত করা চলে। কিন্তু উচ্চপরিষদ ভারতীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। ইহারা নিম্নকক্ষের সহিত উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে নাই, কিংবা যে ক্ষমতা তাহাদের হাতে দেওয়া আছে তাহার উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারাও সত্যিকারের সংশোধনকারী পরিষদ হিসাবে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। বরং, এই কক্ষ ব্যয়বহুল ও নানা বিষয়ে অবাঞ্ছিত বিলম্ব ঘটাইয়া কোথাও কোথাও অসুবিধার সৃষ্টি ঘটাইয়াছে। সুতরাং এইরূপ উচ্চকক্ষ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলা হয়। তবে এইরূপ উচ্চ পরিষদকে সংস্কার করিয়া রাখা গেলে হয়ত যে ভূমিকা উচ্চকক্ষের থাকা উচিত ইহারা সেই ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি: অর্থবিল কেবলমাত্র নিম্নকক্ষেই রাজ্যপালের সুপারিশ লইয়া উত্থাপিত হয়। অন্যান্য বিল যে কোন কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। বিলটি আইনে পরিণত করিতে হইলে প্রতিটি কক্ষে ইহার তিনটি পাঠের প্রয়োজন হয়। উভয় কক্ষে বিলটি গৃহীত হইলে রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করিয়া ইহা আইনে পরিণত হয়।

Exercise

1. Discuss the composition and functions of the State Legislature.
[রাজ্য বিধানমণ্ডলীর গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।] (২৮৬-২৯০ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the composition and functions of a State Legislative Assembly of India. [রাজ্য বিধান সভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।] (২৮৭-২৯০ পৃষ্ঠা)

3. What are the functions of a State Legislative Council? Has it got any utiility? [রাজ্য বিধান পরিষদের ক্রিয়াকলাপ কি কি? ইহার কি কোন উপযোগিতা আছে?] (২৮৮-২৯৪ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the relation between two houses of a State Legislature. and indicate their respective functions. [রাজ্য বিধানমণ্ডলীর উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক এবং ইহাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ আলোচনা কর।] (২৮৮-২৯১ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the law-making process in a State Legislature. [রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা কর।] (৩০৩-৩০৭ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the powers, privileges and immunities of the State Legislature and its members. [রাজ্য বিধানমণ্ডলীর এবং ইহার সদস্যদের ক্ষমতা, সুবিধা এবং অব্যাহতির শর্তগুলি আলোচনা কর।] (২৯৭-৩০৩ পৃষ্ঠা)

7. Write a note on the function and position of the Speaker in a State Legislative Assembly. [রাজ্য বিধান সভায় স্পীকারের কাজ এবং মর্যাদার উপর একটি টীকা লিখ।] (২৯৪-২৯৭ পৃষ্ঠা)

8. Do you advocate retention of the second chamber in a State Legislature? Give reasons for your answer. [রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে উচ্চকক্ষ বজায় রাখা কি তুমি সমর্থন কর? তোমার উত্তরের কারণ বর্ণনা কর।]

[**সংকেত :** ২৯১-২৯৩ পৃষ্ঠা হইতে উচ্চকক্ষের পক্ষে ও বিপক্ষে দেওয়া যুক্তি ও উপসংহার লেখ। এই প্রসঙ্গে বল—সাম্প্রতিক পশ্চিম বাংলার বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে বিধান পরিষদ বিলোপ করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বিধান পরিষদের অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন তাহা জোরালো ভাষায় সকলেই আইনসভায় ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করা যায় সংসদের আগামী অধিবেশনেই পশ্চিম বাংলার বিধানসভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।]

9. Fully explain the compositiou. Powers and functions of the Legislative Council of West Bengal. (C.U.B.A. 1969) [পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্য সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।]

[**সংকেত :** ২৮৬ পৃষ্ঠা এবং ২৮৮-৯১ পৃষ্ঠা হইতে বিধান পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্য লিখ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্য সম্বন্ধে আলোচনা বইটির শেষে বিশেষ অনুশীলনীতে করা হইয়াছে।]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের বিচারব্যবস্থা
(India's Judicial System)

(ভারতের সুপ্রীম কোর্ট—বিচারপতিগণের নিয়োগ ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যবস্থা—সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কাজ—সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা—ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট—রাজ্যের আদালত—হাইকোর্ট—নিম্ন আদালত-সমূহ)।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত থাকে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রাপ্ত এই ক্ষমতাগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করিলে অথবা ক্ষমতার প্রয়োগকালে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অথবা কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মতভেদ বা একের কার্যে অপরের হস্তক্ষেপ হইতে উদ্ভূত গোলযোগ দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় তাহার মীমাংসা করে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়কে শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে অভিহিত করা হয়।[১] পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারতবর্ষ তাহার নূতন শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ গঠন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারালয়ের স্বাধীনতা কতটুকু রহিয়াছে তাহা উভয়ের ক্ষমতাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে পরে বর্ণনা করা হইবে। প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রভৃতির আলোচনা করা হইতেছে।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণঃ ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে রহিয়াছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। সংবিধানের ১২৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই সুপ্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বিচারপতিগণের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন।

১৯৫৬ সালে[২] এবং ১৯৬০ সালে পার্লামেণ্ট আইনের[৩] দ্বারা বিচারপতি-

১। "A federal Government being essentially a composite government, conflicts are inevitable; hence it is an essential feature of a Federal Policy that there should be a judicial body independent of both the Federal Legislature and Executive and of the governments of the units, and whose duty it is to interpret the Constitution uniformly and adjudicate upon any dispute of this nature".

২। Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956.

৩। Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960.

গণের সংখ্যা যথাক্রমে দশ জন এবং তেরজন নির্দিষ্ট হয়। সংবিধানের ১২৭—২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি এই ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াও প্রধান ধর্মাধিকরণ এবং রাজ্যসমূহের হাইকোর্টগুলির বিচারপতির সহিত প্রয়োজন বোধে পরামর্শ করিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে হয় (সংবিধানের ১২৪ নম্বর ধারা)।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে গেলে বিচারপতিকে ভারতের নাগরিক হইতে হয় এবং একজন প্রখ্যাতনামা আইনজ্ঞ হইতে হয়, অথবা একটি হাইকোর্টে অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্য বিচারপতি থাকিতে হয় অথবা অন্ততঃ ১০ বৎসরকাল কোন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট থাকিতে হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য কোন নিম্নতম বয়সের উল্লেখ সংবিধানে নাই। তবে একবার নিয়োগের পর বিচারপতি নিজপদে ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বহাল থাকেন। কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে পারেন। আবার যদি কখনও কোন বিচারপতি শাসনতন্ত্র লংঘন করেন অথবা অসদাচরণের অপরাধে অপরাধী হন তবে রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ প্রদান করিয়া সেই বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তবে এইরূপ আদেশ রাষ্ট্রপতি তখনই দিতে পারেন, যখন পার্লামেন্টের প্রত্যেক কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণ (impeach) করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন [১২৪ (৪) নম্বর ধারা]।

বিচারপতিগণের বেতন ইত্যাদি

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক ৫০০০ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণের মাসিক বেতন ৪০০০ টাকা। তাঁহাদের বেতন, ভাতা, পেনসন প্রভৃতি পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা স্থির হয়, তবে সংবিধানের ১২৫ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী বিচারপতিগণের নিয়োগের পর তাঁহাদের স্বার্থ-বিরোধী করিয়া বেতন, ভাতা ইত্যাদির কোনরূপ হ্রাস করা যায় না। অবশ্য ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে অর্থসম্বন্ধীয় জরুরী অবস্থা থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন ইত্যাদি ব্যয়সংক্রান্ত ব্যাপার পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য প্রতিবৎসর সেখানে পেশ করিতে হয় না। সংবিধানের ১৪৬(৩) নম্বর ধারা অনুযায়ী ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের সঞ্চিত

তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (charged on the Consolidated Fund of the Union)।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের যে স্বাধীনতা অনেকাংশে সংরক্ষিত তাহা তাঁহাদের অপসারণ, বেতন নির্ধারণ, অবসরের পর তাঁহাদের আইন-ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়া প্রভৃতি সংবিধানের বিভিন্ন ধারা হইতে সম্যক বুঝা যায়। একথা অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্রপতির হাতে বিচারপতির অপসারণ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, এবং ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতেও বিচারপতিগণের স্থায়িত্ব তাঁহাদের নিজেদের সদ্ব্যবহারের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তবে পার্লামেণ্টের হাতে সংবিধান-বিরোধী কাজের প্রতিকার হিসাবে বিচারপতিকে পদচ্যুত করাইবার যে অস্ত্র রহিয়াছে তাহার দ্বারা তাঁহাদের স্বাধীনতা অনেকাংশে খর্ব করা হইয়াছে। আবার বিচারপতিবৃন্দের স্বাধীনতা সংরক্ষণের অনুকূলে বলা হয় যে সংবিধানের ১২৪ (৭) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি ভারতের অভ্যন্তরে কোন বিচারালয়ে বা কোন কর্তৃপক্ষের সম্মুখে কোনরূপ কার্য বা ওকালতি করিতে পারিবেন না; অবশ্য রাষ্ট্রপতির অনুমতি লইয়া ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্ট বা ভারতের ফেডারেল কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতিকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। তবে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বিচারপতি পদে বা বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারের নিয়োগে প্রাক্তন বিচারপতিগণের উপর যথেষ্ট বাধা নিষেধ আরোপ করা হইলেও শাসনসংক্রান্ত বা রাষ্ট্রনৈতিক অন্য কোন পদে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করার পথে সংবিধানগত কোন বাধা নিষেধ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে কেহ কেহ মনে করেন যে ভবিষ্যতে সরকারের আনুকূল্য লাভের জন্য সরকার ও জনসাধারণের মামলায় রায় দেওয়ার সময় অনেক সময় বিচারপতিগণের পক্ষে স্বাধীনতা থাকিলেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া কাজ করা সম্ভবপর নাও হইতে পারে। বিচারপতিগণকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে দেওয়ার জন্যও অন্ততঃ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নিয়োগ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট বাধা-নিষেধ থাকা দরকার। আবার বিচারপতিগণের নিয়োগের বেলায়ও রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। একথা সংবিধানে বলা আছে যে রাষ্ট্রপতি বিচার বিভাগের পরামর্শ ও অনুমোদন লইয়া বিচারপতি নিযুক্ত করিবেন, তবে সংবিধানের কোন ধারায়ই বলা নাই যে রাষ্ট্রপতিকে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত পরামর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। পরোক্ষভাবে একথা বলা যায় যে, যেহেতু রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে কার্য পরিচালনা করিতে হয় সেইজন্য এই নিয়োগের

বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

ক্ষেত্রেও মন্ত্রিমণ্ডলীর দেওয়া কোন পরামর্শ অগ্রাহ্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। ফলে শাসনব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত বিচার ব্যবস্থার পরিচালকবৃন্দের পক্ষে স্বাধীনতা বোধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিচার বিষয়ে নিরপেক্ষতা অর্জন করা কতখানি সম্ভবপর তাহা সহজেই অনুমেয়।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কাজ (Powers and functions of the Supreme Court): সুপ্রীম কোর্টের কিছু মূল ক্ষমতা (Original Jurisdiction), আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা (Appellate Jurisdiction) এবং পরামর্শ দান সংক্রান্ত (Advisory Jurisdiction) ক্ষমতা আছে।

(১) **সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার ক্ষমতাসমূহ**: সংবিধানের ১৩১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে—যদি (১) ভারত সরকারের সহিত কোন রাজ্যসরকার অথবা কতিপয় রাজ্যসরকারের গোলযোগ হয়, অথবা (২) যদি কোন ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক মূলরাজ্য একদিকে থাকে এবং অন্যান্য কতিপয় রাজ্য অন্য দিকে থাকে, অথবা (৩) যদি বিভিন্ন মূল রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক গোলযোগের সৃষ্টি হয় তবে সুপ্রীম কোর্ট ইহার মূল ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া এই সব বিবাদ ও গোলযোগের বিচার করিয়া থাকে। এইরূপ বিবাদের মীমাংসা সুপ্রীম কোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণের মূল এলাকায় হইয়া থাকে, ভারতের অন্য কোন আদালতে এইরূপ মামলার বিচার হয় না। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে উপরোক্ত বিবাদ বা গোলযোগ সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার আয়ত্তে আসিবে তখনই যখন উক্ত বিবাদ বা গোলযোগের সহিত বৈধ অধিকারের প্রশ্ন জড়িত থাকে।

মূল এলাকার ক্ষমতাসমূহ

উল্লিখিত তিন প্রকার বিবাদ যদি শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে সম্পাদিত কোন সন্ধি, চুক্তি, সনদ অথবা অঙ্গীকার পত্র সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত চুক্তি ইত্যাদি যদি শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পরেও বলবৎ থাকে তাহা হইলে ঐ প্রকার বিবাদ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের বিচার করিবার অধিকার নাই। আবার যদি এইপ্রকার সন্ধি, চুক্তি, সনদ অথবা অঙ্গীকারপত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের বিচার করা নিষিদ্ধ থাকে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট এই বিবাদগুলির মীমাংসা বা বিচার করিতে পারে না। অবশ্য এই প্রকার বিবাদ সংক্রান্ত বিচার তাহার মূল এলাকায় না করিতে পারিলেও সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত বিষয়ে তাঁহাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করিতে বাধ্য থাকে। সুতরাং মূল এলাকার এই ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান এলাকার মাধ্যমে কার্যকর করা যায়। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ বা একটি মূল রাজ্যের

মূল এলাকা সংক্রান্ত ক্ষমতার উপর বাধা নিষেধ

অধিবাসীর সঙ্গে অন্য কোন মূল রাজ্যের অধিবাসীর বিবাদের বিচার সুপ্রীম কোর্ট তাহার মূল এলাকার অধীনে করিতে পারে না।

(২) **সুপ্রীম কোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ** সুপ্রীম কোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারেঃ—(ক) শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য আপীল, (খ) দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আপীল এবং (গ) ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আপীল।

শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপীল

যদি কোন মামলা সম্বন্ধে (দেওয়ানী, ফৌজদারী অথবা যে কোন প্রকারই হউক না কেন) হাইকোর্ট এইরূপ মন্তব্য করে ও সেই মর্মে এইরূপ প্রমাণ পত্র দান করে যে মামলাটির সহিত শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহা হইলে সেই মামলার জন্য হাইকোর্ট হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। যদি কোন ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এইরূপ প্রমাণ পত্র (Certificate) প্রদান করিতে রাজী না থাকে অথচ সুপ্রীম কোর্ট মনে করে যে মামলাটির সহিত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপুর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে তাহা হইলে এইরূপ মামলা সুপ্রীম কোর্টে পাঠান চলিবে।

দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত আপীল

সংবিধানের ১৩৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি কোন দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে হাইকোর্ট এইরূপ প্রমাণপত্র দেয় যে, (ক) মামলাটির বিষয়বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য অন্ততঃ ২০ হাজার টাকা (অথবা যে পরিমাণ টাকা এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা ধার্য করিবে) অথবা (খ) কোন ডিক্রি, আদেশ অথবা রায় অন্ততঃ ২০ হাজার টাকা মূল্যের পরিমাণের সহিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত; অথবা (গ) হাইকোর্টের মতে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলযোগ্য (টাকার অঙ্ক যাহাই হউক না কেন), তাহা হইলে সেই মামলা সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। যে সব দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের সহিত একমত হয় সেই সব মামলা সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলের জন্য গৃহীত হয় তখনই যখন হাইকোর্ট এই মর্মে মন্তব্য করে ও প্রমাণ পত্র (certificate) দেয় যে মামলাটির ভিতর শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন নিহিত রহিয়াছে।

ফৌজদারী মামলা সম্পর্কিত আপীল

সংবিধানের ১৩৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি অথবা অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীল করা যায়—(ক) যদি হাইকোর্ট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা (খ) যদি হাইকোর্ট কোন নিম্ন আদালতে চলার সময় কোন মামলা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বিচারের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে

ও তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দান করে, অথবা (গ) যদি হাইকোর্ট কোন মামলাকে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলযোগ্য বিবেচনা করিয়া উক্ত মর্মে প্রমাণ পত্র দাখিল করে। আবার যদি হাইকোর্ট এই মর্মে প্রমাণপত্র দেয় যে ফৌজদারী মামলাটির সহিত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত তাহা হইলেও সুপ্রীম কোর্ট মামলাটিকে আপীলের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারে (সংবিধানের ১৩২নং ধারা)। ইহা ছাড়া, ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা হাইকোর্ট হইতে আপীল গ্রহণ করিবার অধিকতর ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে প্রদান করিতে পারে।

ভারতের মধ্যে সমস্ত বিচারালয়ের সমস্ত প্রকার রায় ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার বিশেষ অনুমতি সুপ্রীম কোর্ট দিতে পারে (সংবিধানের ১২৬ নং ধারা)। অবশ্য জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে পার্লামেণ্ট এইরূপ আইনের দ্বারা সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতাশালী করিতে পারে তখনই যখন রাজ্যবিধানমণ্ডলী এই মর্মে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করে। তবে সামরিক আদালত বা সামরিক ট্রাইব্যুন্যালের ক্ষেত্রে সংবিধানে ১৩৬(২)নং ধারা অনুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা চলে না। একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বিশেষ ক্ষমতার বলে সুপ্রীম কোর্ট শুধুমাত্র হাইকোর্ট নহে ভারতের যে কোন আদালতের যে কোন বিচারের বিরুদ্ধে তাহার নিকট আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি প্রদান করিতে পারে (special leave)। সেই ক্ষমতা তাহাকে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং অতি সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য এমন কোন বাধা সংবিধানে নির্দিষ্ট করা হয় নাই যাহা এইরূপ বিবেচনার মাপকাঠি হইবে। তবুও সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা হইতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে যেক্ষেত্রে ন্যায় ও নীতির স্বাভাবিক বিধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে মনে হইবে অথবা মামলাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে সেই সব ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট তাহার দরবারে মামলাটির শুনানীর জন্য বিশেষ অনুমতি প্রদান করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "Generally speaking, this Court will not grant special leave unless it is shown that exceptional and special circumstances exist, that substantial and grave injustice has been done and that the case in question presents features of sufficient gravity to warrant a review of the decision appealed against."

আপীলের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অনুমতি দান

(৩) **সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান সংক্রান্ত ক্ষমতা:** সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিষয়ক ক্ষমতা ছাড়াও কিছু পরামর্শদান সম্পর্কিত ক্ষমতা

আছে। সংবিধানের ১৪৩নং ধারা অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রপতির কখনও মনে হয় যে আইনগত অথবা শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য লইয়া এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠিয়াছে বা উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহাতে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ ও অভিমত লওয়া একান্ত প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত চাহিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিবেচনার পর রাষ্ট্রপতিকে তাহাদের পরামর্শ জানাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট যে মতামত প্রকাশ করে বা উপদেশ প্রদান করে তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতে সরকার বাধ্য নহেন। আবার একথাও প্রণিধানযোগ্য যে এইরূপ ক্ষেত্রে পরামর্শ দান করিতে সুপ্রীম কোর্ট বাধ্য নহে।

ইহা ছাড়া, প্রাক-সংবিধানের সন্ধি, চুক্তি, সনদ ইত্যাদি সংক্রান্ত যে সব বিষয় সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকা-বহির্ভূত রাখা হইয়াছে সে সম্বন্ধেও রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ পরামর্শ চাওয়া হইলে সুপ্রীম কোর্ট তাহা প্রদান করিতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাওয়া হইলে তাহা মামলার আকারে প্রেরণ করিবার জন্য সরকারের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এই সম্পর্কে উপদেশ দান না করিবার ক্ষমতা আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের আছে।

পরামর্শদান এলাকার যৌক্তিকতা

সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান এলাকার যৌক্তিকতা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলেন। দুইটি বিরুদ্ধবাদীর যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ইহার যৌক্তিকতা আমরা আলোচনা করিব। এক দল বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে শাসকদের পরামর্শের একটি বিভাগে পরিণত করা মোটেই কাম্য নহে। যদিও একথা বলা আছে যে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রাপ্ত পরামর্শ বা উপদেশকে ভবিষ্যতে সুপ্রীম কোর্টের আদেশ বলিয়া উহাকে কার্যকর করিতে পারা যায় না, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে সুপ্রীম কোর্টের দেওয়া পরামর্শ ভবিষ্যৎ মামলার স্বার্থ বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। আবার একথাও বলা যায় যে প্রকৃত ঘটনা বা বিষয়বস্তু না জানিয়া কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা খুবই অসমীচীন কাজ যাহা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের মর্যাদাকে মোটেই বাড়ায় না, বরং ক্ষুণ্ণ করে। আবার একদল ইহার স্বপক্ষে বলেন যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২১৩নং ধারায় বর্ণিত আদালতের হাতে শাসন বিভাগকে পরামর্শদান করার এই ক্ষমতা ভারতের নূতন সংবিধানে চালু রাখিয়া ভালই করা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে কোন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেই পরামর্শ লওয়া থাকিলে অথবা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার আগে সরকার উহার আইনগত ব্যাখ্যা জানিয়া লইলে ভবিষ্যতে বহু জটিল

পরিস্থিতির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে উহাতে শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন ধারা থাকিলে সে সম্বন্ধে সরকার পূর্বেই সর্বোচ্চ বিচারালয়ের পরামর্শ দ্বারা সচেতন থাকিতে পারে, ফলে বহু অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামলার উদ্ভব ব্যহত রাখা যায়। শ্রীদুর্গাদাস বসু বলেন, "The chief utility of such an advisory judicial opinion is to enable the Government to secure an authoritative opinion either as to the validity of a legislative measure before it is enacted or as to some other matter which may not go to the courts in the ordinary course and yet the Government is anxious to have authoritative legal opinion before taking any action."[৪]

বস্তুতঃ, সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেকটি বিচাপতি লইয়া যদি এইরূপ পরামর্শের জন্য পাঠানো বিষয়ে আলোচনা করা যায় তো এতগুলি বিশিষ্ট আইনবিদের সুচিন্তিত অভিমতকে বিশেষভাবেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে যতটা সম্ভব কম এই ক্ষমতার প্রয়োগ করা উচিত এবং যখন পরামর্শদানের এলাকায় সুপ্রীম কোর্টকে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে বলা হইবে তখন যতদূর সম্ভব সুপ্রীম কোর্টের সমস্ত বিচারপতিকে লইয়া গঠিত পূর্ণ বেঞ্চ দ্বারা ইহার আলোচনা করানো বিধেয়। ভরদ্রাচারিয়া কমিটির রিপোর্ট এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।[৫]

রাষ্ট্রপতি Delhi Act, 1912 এবং Kerala Education Bill-এর বৈধতা সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য উহা সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করেন। অবার ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের নিকট এই মর্মে উপদেশ চাহেন যে নেহরু-নুন চুক্তির দ্বারা বেরুবাড়ী পাকিস্তানে হস্তান্তর করিবার জন্য ইউনিয়নের আইন প্রণয়ন অথবা শাসনতন্ত্রের সংশোধন

৪। D. Basu...Introduction to the Constitution of India. p. 234 (1960)

৫। "There has been considerable difference of opinion amongst jurists and political thinkers on the expediency of placing on the Supreme Court an obligation to advise the head of the State on difficult question of law. It may be assumed that such jurisdiction is scarcely likely to be invoked, and if, as we propose, the court is to have a strength of ten or eleven judges pronouncement by full court may well be regarded as authoritative. This can be insured by requiring that references to the Supreme Court for advice shall be dealt with by the full court."

—Vardrachariar Committee—ভারতের Constituent Assembly-র নিকট প্রেরিত রিপোর্ট।

করার প্রয়োজন আছে কি না। সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে এই বিষয়ে তাহাদের অভিমত জানায়। ১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশে আইনসভা ও আদালতের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়েও রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাহিলে সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাকে পরামর্শ দান করে।

(৪) উপরোক্ত ক্ষমতা ছাড়াও সুপ্রীম কোর্টের আরও কতিপয় ক্ষমতা আছে। সংবিধানের ১৩৭ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট তাহার নিজের দেওয়া কোন রায় বা আদেশের পুনরায় বিবেচনা করিতে পারে। সংবিধানের ১৩৮ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাসমূহ সম্প্রসারিত হইতে পারে যদি পার্লামেণ্ট এই মর্মে আইন প্রণয়ন করে। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত আইন বা আইনের ব্যাখ্যা ভারতের অন্তর্গত সমস্ত বিচারালয়কে মানিয়া চলিতে হয়। সংবিধানের ১৩৯ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus), প্রতিষেধ (Prohibition), অধিকারের কথা জিজ্ঞাসাকরণ (Quo warranto) এবং উৎপ্রেষণ (Certiorari) ধরণের আদেশ বা লেখ জারি করিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। সরকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টের নিকট বিচার দাবী করিতে পারে; সুপ্রীম কোর্ট উক্ত আদেশের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ রাখিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের অপরাপর ক্ষমতা

সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা (Position of the Supreme Court of India): সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ আলোচনা করিয়া একথা বলা যায় যে পৃথিবীর যে কোন সর্বোচ্চ বিচারালয় হইতে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট প্রধান বিচারালয় হিসাবে ব্যপকতর ক্ষমতা উপভোগ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে, আপীল আদালত হিসাবে এবং সংবিধানের সংরক্ষক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে ইহা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যদিও অঙ্গরাজ্যগুলির পারস্পরিক চুক্তির ফলে উদ্ভব হয় নাই, তবুও একথা বলা চলে যে যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আইন ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার বিভাজন করা হইয়াছে। সংবিধানের ১৩১ নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্য অথবা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিবাদ ও গোলযোগ মিটাইবার অনন্য ও মূল অধিকার ভোগ করে। এই দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের চরম ক্ষমতাই সুপ্রীম কোর্ট পরিচালনা করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে

আপীল আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা পৃথিবীর যে কোন

বিচারালয়ের মধ্যে ব্যাপক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন যে সমস্ত মামলায় নিহিত রহিয়াছে সেই সমস্ত মামলার জন্য হাইকোর্ট হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। ইহা ছাড়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারেও সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীল করা যায়। সংবিধানের ১৩৬ নং ধারা অনুযায়ী সামরিক ট্রাইব্যুনাল ছাড়া ভারতের অন্যান্য যে কোন আদালতের যে কোন রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি প্রদান করিবার অধিকার ইহার আছে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের এইরূপ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আপীল গ্রহণের কোন ক্ষমতা নাই। ইহা কেবলমাত্র নিম্নতম বিচারালয় অথবা মূল রাষ্ট্রগুলির উচ্চতম বিচারালয় হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থের সহিত জড়িত মামলাগুলি সম্পর্কে আপীল বিচার করে। আবার ইংলণ্ডের উচ্চতম আপীল আদালত লর্ড সভা হইতে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকা আরও ব্যাপক। কেননা, দেওয়ানী মামলা লর্ডসভার আপীল আদালতে (Court of Appeal) বিবেচনার্থে গৃহীত হয় তখনই যখন তাহা উচ্চ ন্যায় আদালত হইতে (High Court of Justice) প্রেরণ করা হয় অথবা যখন তাহা আপীল আদালতের অর্থাৎ লর্ডসভা কর্তৃক আপীলের জন্য বিশেষ অনুমতি লাভ করে। লর্ডসভার পাঁচজন বিচারপতির নিকট এইরূপ মামলার আপীলের শুনানী হয়—লর্ড চ্যান্সেলার ইহার সভাপতিত্ব করেন। আবার যে সকল ফৌজদারী মামলা (Criminal Case) এ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর আপীলের জন্য প্রেরিত হয়, লর্ডসভা সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে কেবল সেইগুলিরই বিচার বিবেচনা করে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তুলনামূলক বিচারে ইংলণ্ড ও আমেরিকা অপেক্ষা আপীল আদালত হিসাবে অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষমতা উপভোগ করে।

আপীল-আদালত হিসাবে

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যে কোন ধারা অথবা অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করিতে পারে। ইহা বস্তুতঃ শাসনতন্ত্রের রক্ষক। জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষিত আছে কিনা তাহাও দেখা সুপ্রীম কোর্টের কাজ। আবার আইনপ্রণয়নবিভাগ ও শাসনবিভাগ সংবিধান অনুযায়ী কাজ করিতেছে কিনা সে সম্বন্ধেও সতর্ক দৃষ্টি রাখে সুপ্রীম কোর্ট। এই ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বা পর্যালোচনা (Judicial review of legislation) হিসাবে অভিহিত করা যায়। শাসনবিভাগ এবং আইন-বিভাগের মধ্যে যাহাতে শাসনতান্ত্রিক সীমা লংঘিত না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত

শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে

সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা আরও ব্যাপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কোন আইনের বৈধতা লইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারে। ইহা আবার কোন আইন সংবিধান অনুযায়ী প্রণীত হইয়াছে কিনা সেই বিচারও করিয়া থাকে। ফলে একটি আইনের আইনে রূপান্তর ও ইহাকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করা তখনই হইবে যখন মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট তাহাকে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিবে। কিন্তু ইংলণ্ডের বিচারালয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া কখনই ঘোষণা করিতে পারে না। কোন আইন ন্যায়সংগত কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার ইংলণ্ডের বিচারালয়ের নাই। এই দিক হইতে ভারত আমেরিকা ও ইংলণ্ড উভয়ের মধ্যবর্তী একটি স্থান অধিকার করে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে যদি উক্ত আইন সংবিধানের কোন ধারা অথবা অনুচ্ছেদকে লংঘন করে। সংবিধানের সীমা লংঘিত না হইলে কোন আইনকে, তাহা অন্যায় ও অযৌক্তিক হইলেও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করার কোন ক্ষমতা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নাই। এই দিক হইতে ভারত ইংলণ্ডের বিচারালয়ের ক্ষমতার অত্যন্ত নিকটবর্তী।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া যখন রাজ্য বিধানসভাগুলি আইন প্রণয়ন করে তখন সে আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে সুপ্রীম কোর্ট দ্বিধা করে নাই। শাসনবিভাগ সুপ্রীম কোর্টের বিধানকে অমান্য করে নাই। ইহা সংবিধানের বিশেষ ধারাটিকে সংশোধন করিয়া পুনরায় রাজ্য-বিধানমণ্ডলীর প্রণীত আইনগুলিকে বৈধ করিয়া লয়। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার মামলাটির রায় প্রদানকালে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করে যে সংবিধানের ১৩ (২) নং ধারায় যখন নিষেধ করা হইয়াছে যে মৌলিক অধিকার হরণ করিয়া অথবা ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না তখন পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়াও কোন মৌলিক অধিকার হরণ অথবা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। সুপ্রীম কোর্টের এই রায় সম্প্রতি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে।[৬] বিচার বিভাগের তুলনায় আইন প্রণয়ন বিভাগকে কিরূপে আরও অধিক ক্ষমতাশালী করা যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা ইতিমধ্যেই হইয়াছে এবং আগামী দিনে আরও আলোচনার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইরূপ অনেক আইনকেই শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধ অমান্য করার অজুহাতে সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু পার্লামেণ্ট সেইসব ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন দ্বারা উক্ত আইনকে সম্পূর্ণরূপে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ

আইনসভার কর্তৃত্বের উপর আদালতের প্রাধান্য

৬। এই প্রসঙ্গে ১০৮-১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিচার বিভাগ অপেক্ষা আইন প্রণয়ন বিভাগের প্রাধান্য ভারতে অত্যধিক দেখা যায়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর উক্তি এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "We honour our judges......but......we will tolerate no legal quibbles; no law, no judge is going to come in our way......"। এই দিক হইতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আইনসভার কর্তৃত্বের উপর আদালতের অবাধ প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতে এই ব্যবস্থা স্বীকৃত হয় নাই। পার্লামেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী সংবিধান সংশোধন ও সেই অনুযায়ী তাহারা আইনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আদালত এই অবস্থায় অন্যায়, অসংযত ও অযৌক্তিক আইনের বৈধতা সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্নই তুলিতে পারে না।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের তুলনা ঃ ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট মূল এলাকা সংক্রান্ত ক্ষমতা অধিক ভোগ করে। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্যগুলির ও যুক্তরাষ্ট্র এবং অঙ্গ রাজ্যের বিবাদ বিরোধের মীমাংসা উভয়ই সুপ্রীম কোর্ট করিয়া থাকে, তবে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট যে সকল মামলা কোন সন্ধি, রাষ্ট্রদূত, কোন সরকারী মন্ত্রী অথবা কোন কন্সাল প্রভৃতির সহিত জড়িত তাহা তাহার মূল এলাকায় বিচার করে। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের এইরূপ কোন মামলার বিচার মূল এলাকায় করার ব্যবস্থা নাই।

মূল এলাকা

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আপীল সংক্রান্ত এলাকায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা পরিচালনা করে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত এইরূপ মামলার আপীল করা চলে। আবার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট নিজেই আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি প্রদান করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের এইরূপ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আপীল গ্রহণের কোন ক্ষমতা নাই। ইহা কেবলমাত্র নিম্নতম আদালত অথবা মূল রাষ্ট্রগুলির উচ্চতম বিচারালয় হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থের সহিত জড়িত মামলাগুলি সম্পর্কে আপীল বিচার করে।

আপীল এলাকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উভয় সুপ্রীম কোর্টই কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, তবে এই ব্যাপারে "আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি" বা 'Due process of law' কথাটি মার্কিন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করায় উক্ত রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। "আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি"

বলিতে আইনটির যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা, ভাল মন্দ ইত্যাদি বুঝায়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কোন আইন সংবিধান বিরোধী না হইলেও যদি উহা অযৌক্তিক অথবা ন্যায় ও নীতি বিরোধী বলিয়া মনে করে তাহা হইলে ঐরূপ আইন কখনই বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের প্রাধান্য অধিক

ভারতীয় সংবিধানের খসড়ায় এইরূপ 'Due process of law' অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া সংবিধানে 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি' অথবা 'Procedure established by law' কথাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র সেই সমস্ত আইনকেই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা লাভ করে যেগুলি শাসনতন্ত্রের বিধিনিষেধ লংঘন করে। অথচ পার্লামেন্টের এক্তিয়ারভুক্ত অন্যান্য সমস্ত আইন, তাহা যত অন্যায় বা অযৌক্তিকই হউক না কেন, অনায়াসেই সুপ্রীম কোর্টের সমালোচনার ক্ষমতা—বহির্ভূতই থাকিয়া যায়। এইদিক হইতে দেখা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালতের প্রাধান্য প্রবল, কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ অধিক প্রাধান্য লাভ করে।

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্র বিরোধী আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু শাসনতন্ত্রের বিশেষ ধারাকে যখন আইনসভা সংশোধন করিয়া লইয়াছে এবং সংশোধিত শাসনতন্ত্রের বিধি অনুসরণ করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছে তখন তাহার বৈধতা সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্ট কোন প্রশ্ন তোলে নাই। ইহা কখনও আইনের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নূতন আইনও সৃষ্টি করে নাই। তাহারা আইনটি সংবিধান-বিরোধী কি-না কেবলমাত্র তাহাই ব্যক্ত করিয়াছে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট "আইনসভার তৃতীয় কক্ষে" (a third legislative chamber) পরিণত হয় নাই। কিন্তু আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি করিয়াছে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিরোধিতার জন্যই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহার "New Deal" পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করিতে পারেন নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রেই শাসনবিভাগ ও আইনসভার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা ও হস্তক্ষেপের ফলে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যে কোন আইনই সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করিয়া দিতে পারে যদিও উহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Hughes-এর মতে, "We are under the constitution but the constitution is what the judges say it is"। এই দিক হইতে অনেকে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টকে "আইনসভার তৃতীয় কক্ষ" হিসাবে অভিহিত করেন।

সুপ্রীম কোর্ট আইনসভার তৃতীয় কক্ষ

আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ দান সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা নাই। অথচ ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নিকট কোন বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে সুপ্রীম কোর্ট বিচার ও বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানাইয়াছে।

পরামর্শদান এলাকা

রাজ্যের বিভিন্ন আদালত

(State Courts)

হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণঃ রাজ্যের প্রধান আদালতের নাম হাইকোর্ট। সংবিধানের ২১৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ থাকিবে। তবে সংবিধানের ২৩১নং ধারায় পার্লামেণ্টকে দুই অথবা আরও বেশী রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে কয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন সেই কয়জন বিচারপতি লইয়া হাইকোর্ট গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি স্বল্পকালের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারেন। তবে কোন বিচারপতির ৬২[৭] বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে তিনি আর স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থকিতে পারেন না।

হাইকোর্টের গঠন

রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। তবে তাঁহাকে সাধারণ বিচারপতিদের নিয়োগের সময় রাজ্যের রাজ্যপাল ও ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া যেকোন বিচারককে একটি হাইকোর্ট হইতে অন্য হাইকোর্টে বদলি করিতে পারেন। মনে রাখিতে হইবে রাজ্যের হাইকোর্ট ভারতের সুসম্বদ্ধ বিচার ব্যবস্থার (integrated system of Courts) অঙ্গস্বরূপ। যদিও রাজ্যের হাইকোর্ট রাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে, ইহা ভারতের বিচারব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের সহিত জড়িত। কোন হাইকোর্টের কাজের চাপ বাড়িয়া গেলে রাষ্ট্রপতি অনধিক

বিচারপতিগণের নিয়োগ এবং স্থায়িত্ব

৭। সংবিধানের ১৫শ সংশোধন।

দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারেন। হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ৬২ বৎসর পূর্ণ না হওয়া অবধি তাঁহার স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তবে যদি কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন, অথবা যদি কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন অথবা অন্য কোন হাইকোর্টে বদলি হন তাহা হইলে ৬২ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই সেই বিচারপতিকে তাঁহার পদ খালি করিতে হয়। ইহা ছাড়া, অকর্মণ্যতা, অসদাচরণ অথবা শাসনতন্ত্র লংঘনের অপরাধে পার্লামেণ্টের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত অপসারণ প্রস্তাব দ্বারা অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

বেতন, ভাতা ইত্যাদি

হাইকোর্টের বিচারপতি মাসিক ৩৫০০ টাকা বেতন পান এবং প্রধান বিচারপতি মাসিক ৪০০০ টাকা বেতন পান। ইহা ছাড়া, পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা, পেনসন ইত্যাদিও তাঁহারা পাইয়া থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের ন্যায় তাঁহাদের ক্ষেত্রেও একবার বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট হইলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির অর্থসম্বন্ধীয় জরুরী ক্ষমতা ছাড়া আর কখনও বিচারপতিগণের পদে বহাল থাকাকালে উহা কমান যায় না।

বিচারপতি পদের যোগ্যতা

কাহাকেও হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে অন্ততঃ দশ বৎসর ভারতের বিচারবিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে অথবা অন্ততঃ দশ বৎসর কোন হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের ২২০নং ধারায় বলা হইয়াছে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর কোন হাইকোর্টের বিচারপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কোন আদালত কিংবা কর্তৃপক্ষের সামনে ওকালতির কাজ করিতে পারিবেন না। তিনি ভারতের নাগরিক হইবেন এবং তাঁহার বয়স ৬২ বৎসরের কম থাকিবে।

কোন হাইকোর্টের কার্যাবলী রাজ্যের আঞ্চলিক সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে ; তবে যে সব ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা একটি হাইকোর্টের এলাকা বিস্তৃত করে সেখানে ইহার এলাকা বিস্তৃত হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা আন্দামান এবং নিকোবর ও পাঞ্জাব হাইকোর্টের এলাকা দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

ভারতের সংবিধানের ২২৫ নং ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট সেই সমস্ত ক্ষমতাগুলি উপভোগ করিবে,—সংবিধান চালু হইবার পূর্বে যেগুলি ইহাদের এলাকাভুক্ত ছিল ; তবে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে যে সমস্ত বাধা নিষেধ পূর্বে

ছিল সেগুলির বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ শহরে হাইকোর্টের মূল এলাকায় কিছু ক্ষমতা আছে। ইহারা রাজ্যের প্রধান দেওয়ানী আদালত ও মূল বিচারের অধিকারী। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রেও ইহারা মূল এলাকায় বিচারের অধিকার প্রাপ্ত প্রদান আদালত ছিল। বর্তমানে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে মূল এলাকায় ((Original Powers) বিচার মাদ্রাজ এবং বোম্বাই শহরের হাইকোর্টের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা এখনও বলবৎ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে হাইকোর্টের কিছু ক্ষমতা রহিয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট সংবিধানের ২২৬নং ধারা অনুযায়ী নিজ এলাকার মধ্যে কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আদেশ, নির্দেশ অথবা কোন কিছুর কারণ দেখাইবার জন্য নোটিশ দিতে পারে। সংবিধানের ২২৮নং ধারা অনুযায়ী যদি কোন হাইকোর্ট মনে করে যে, কোন মামলার সহিত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহা হইলে ইহা নিম্ন আদালতে চলিতেছে এইরূপ কোন মামলা নিজের হস্তে তুলিয়া লইতে পারে। সংবিধানের ২১৫নং ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট একটি অভিলেখ-আদালত (Court of Record), এবং ইহা আদালতের অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। সংবিধানের ২২৭নং ধারা অনুযায়ী সামরিক ট্রাইব্যুন্যাল ছাড়া নিম্নতম সমস্ত আদালত এবং ট্রাইব্যুন্যালের উপর হাইকোর্ট তত্ত্বাবধান করে।

হাইকোর্টের বিভিন্ন ক্ষমতা

নিম্ন আদালত সমূহ (Subordinate Courts) : ভারতের সংবিধানের ২৩৩নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যের জিলা জজের নিয়োগ, পদে অধিষ্ঠান এবং পদের উন্নতি সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যপাল হাইকোর্টের সহিত পরামর্শ করেন। ইহা ছাড়া, সংযুক্ত জিলা জজ, ছোট আদালতের মুখ্য জজ, মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ, সহকারী দায়রা জজ প্রভৃতির অনুরূপ নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারেও রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করেন। কোন ভারতীয় নাগরিক অনধিক সাত বৎসর এ্যাডভোকেট অথবা আইনজীবী থাকিলে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক মনোনীত হইলেই রাজ্যপাল তাঁহাকে জিলা জজ পদে নিয়োগ করিতে পারেন। বিচার বিভাগের অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক (বা State Public Service Commission) এর সহিতও পরামর্শ করেন। সাধারণভাবে সমস্ত নিম্নতম আদালত সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কর্তৃত্ব হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

নিম্নতম বিচারকবৃন্দের নিয়োগ ইত্যাদি

নিম্নতম আদালতসমূহের বিচারব্যবস্থা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার

বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের কার্যাবলী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের গঠনের সহিত নিম্নে আলোচিত হইল।

দেওয়ানী বিচারের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামে পঞ্চায়েত আদালতসমূহ রহিয়াছে। পূর্বে এই কাজ করিত ইউনিয়ন কোর্ট। পঞ্চায়েত আদালত-সমূহ কয়েকটি গ্রাম লইয়া অথবা প্রত্যেক গ্রামে অবস্থিত। ইহারা সামান্য টাকার দেওয়ানী মামলা সমূহের বিচার করিয়া থাকে। এইরূপ আদালতের বিশেষ সুবিধা হইল ইহাদের রায় যেহেতু চূড়ান্ত এবং যেহেতু গ্রাম্য জনসাধারণ এইখানেই সাধারণ বিচার সমূহের সমস্ত সুযোগ লাভ করে সেইজন্য সাধারণ বিচার ব্যবস্থার জন্য তাহাদের নিজেদের কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া অন্যত্র মামলার জন্য যাইতে হয় না। বর্তমানে এইরূপ পঞ্চায়েত আদালত বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তবে কোন বিশেষ কারণে এইরূপ আদালত সমূহের রায় ইহার উপরে অবস্থিত মুন্সেফী আদালত বাতিল করিয়া দিতে পারে।

দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার জন্য আদালত সমূহ

মুন্সেফী আদালত মহকুমা ও জিলা সহরে অবস্থিত। মুন্সেফের আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু গ্রাম অথবা যেখানে থানা আছে সেখানেও দেখা যায়। মুন্সেফের আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে ইহার উপরের আদালত সাব-জজের আদালতে আপীল করা যায়। সাবজজের আদালত মূল ও আপীল বিচার উভয়ই করে। এখানে মূল বিচার হয় যদি টাকাপয়সার দাবিদাওয়া কোন মামলায় বেশী থাকে। সাবজজের আদালতের উপর জেলাজজের আদালত রহিয়াছে। মুন্সেফের ও সাবজজের আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে জেলাজজের আদালতে। জেলাজজের আদালতে যে কোন মূল্যের দাবি সংক্রান্ত মামলার শুনানী হয়। জেলা আদালত প্রত্যেক জেলায় আছে অথবা কয়েকটি রাজ্যে একাধিক জেলার জন্য একটি জেলা আদালত আছে। কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য নগর-আদালত (বা City Courts) আছে। ইহাছাড়া, বড় বড় সহরে ছোট ছোট মামলার বিচারের জন্য ছোট আদালত (Small Causes Courts) রহিয়াছে। এই আদালতগুলি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও আইনের ব্যাখ্যা ভুল করিলে হাইকোর্ট ইহাদের রায়ের বিরুদ্ধে আদেশ জারী করিতে পারে। এইভাবে উহাদের রায় সংশোধন করার দায়িত্ব হাইকোর্টের।

ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বিচারালয় পঞ্চায়েত আদালত। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সর্বনিম্ন বিচারালয় ছিল ইউনিয়ন বেঞ্চ। বর্তমানে ছোট ছোট ফৌজদারী মামলার বিচার এই পঞ্চায়েত আদালতেই হইয়া থাকে। সহরে ম্যাজিষ্ট্রেট বা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী মামলার বিচার হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন যিনি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার জন্য আদালতসমূহ

পাইয়া থাকেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ থাকেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপরে থাকেন দায়রা জজ (Sessions Judge)। জেলা জজই হন জেলার দায়রা জজ। ইহা ছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একজন দায়রা জজ এবং কিছু সহকারী দায়রা জজও আছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করা যায় ; প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী দায়রা জজের বিচারের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী দায়রা জজের নিকট হয়। ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই, প্রভৃতি যে সব স্থানে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত আছে তাহাদের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়। দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধেও আপীল করা চলে হাইকোর্টে। কোন কোন রাজ্যে জুরীর সাহায্যে বিচারপতিগণ কোন বিশেষ ফৌজদারী মামলার বিচার করিয়া থাকেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court of India)—ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে আছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং আরও সাতজন বিচারপতি আছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতির সহিত অথবা বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে এই বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন, তাঁহাদের ৬৫ বৎসর বয়সে কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে আইন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে গেলে বিচারপতিকে (১) ভারতের নাগরিক হইতে হইবে, একটি হাইকোর্টে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য বিচারপতি থাকিতে হইবে ; (২) দশ বৎসরের জন্য কোন হাইকোর্টের অথবা সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে; অথবা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে তাঁহাকে একজন উচ্চ স্তরের আইনশাস্ত্রবিশারদ হইতে হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ কোন হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণের মাসিক বেতন চারি হাজার টাকা। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী কতিপয় বিশেষ কাজের জন্য বিচারপতি নিয়োগ করা যায়। যেমন, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে ট্রাইব্যুন্যালের বিচারক-রূপে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যদি কখনও কোন বিচারপতি শাসনতন্ত্র লংঘন করেন অথবা অসদাচরণের অপরাধে অপরাধী হন, তবে পার্লামেণ্টের প্রতি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণ (Impeach) করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা ও ক্ষমতা (Position and Powers of the Supreme Court) : সুপ্রীম কোর্টের কিছু মূল ক্ষমতা (Original Powers), আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা (Appellate Powers) এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষমতা (Advisory Powers) আছে। (১) ভারত সরকারের

সহিত কোন অথবা কতিপয় রাজ্যসরকারের গোলযোগ হইলে, অথবা (২) কোন ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক মূল রাজ্য একদিকে থাকিলে, এবং অন্যান্য কতিপয় রাজ্য অপরদিকে থাকিলে, অথবা (৩) বিভিন্ন মূল রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার মূল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই সব বিবাদের বিচার করিয়া থাকে।

বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ বা এক রাজ্যের অধিবাসীর সঙ্গে অন্য কোন রাজ্যের অধিবাসীর বিবাদের বিচার সুপ্রীম কোর্টের মূল ক্ষমতার আওতায় পড়ে না।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। সাধারণতঃ তিনটি ক্ষেত্রে আপীল হইতে পারে ; যথা,—(১) শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য আপীল, (২) দেওয়ানী মামলার এবং (৩) ফৌজদারী মামলার আপীল। কোন মামলা সম্বন্ধে যদি হাইকোর্ট এমন কোনও মন্তব্য করে যে উহাতে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন নিহিত আছে, তবে সেই মামলার জন্য হাইকোর্ট হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। যদি কোন দেওয়ানী মামলার বিষয়বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা (অথবা যে পরিমাণ টাকা এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা ধার্য করিবে) হয় তবে সেই মামলা সম্বন্ধেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। যদি হাইকোর্ট কোন মামলার রায় প্রদানকালে এমন কোন মন্তব্য করে যে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীলযোগ্য তবে সেই মামলা সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। যদি হাইকোর্টের বিচারে দেখা যায় যে কোন ডিগ্রি, আদেশ অথবা রায় অন্ততঃ বিশ হাজার টাকার মূল্যের পরিমাণের সহিত জড়িত, তবে সুপ্রীম কোর্টের কাছে সে সম্বন্ধে আপীল করা যায়। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্ট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া অথবা মামলাটি নিম্ন আদালত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তবে সেই মামলা লইয়া সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। তাহা ছাড়া, যদি কোন ফৌজদারী মামলা সম্বন্ধে হাইকোর্ট এমন কোন প্রমাণপত্র (Certificate) দেয় যে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে আপীলযোগ্য, তবে সেই মামলা লইয়া সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে।

সুপ্রীম কোর্ট আমাদের শাসনতন্ত্রের রক্ষক। সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন বিষয়ের আইনগত অথবা শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা উপদেশ দিতে পারে। কিছুকাল পূর্বে কেরালা সরকারের শিক্ষাবিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চাহিয়াছিলেন। সরকার যদি কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করেন তবে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টের বিচার দাবী করিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনমত বন্দীকে আদালতে দেখা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া (Habeas Corpus), চরমাদেশ প্রদান করা (Mandamus), নিষেধ করা (Prohibition), অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করা (Quo Warranto) প্রভৃতির মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে। পার্লামেন্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি শাসনতন্ত্রের সীমা লংঘন করিতেছে কি-না তাহা দেখিবার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের। ইহাকে আমরা "আইন প্রণয়নের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা" (Judicial Review of Legislation) বলিতে পারি।

সুপ্রীম কোর্টের পর আমরা প্রত্যেক রাজ্যে হাইকোর্ট (High Court) এবং অন্যান্য আদালত দেখিতে পাই।

রাজ্যের বিভিন্ন আদালত (State Courts)—রাজ্যের প্রধান আদালতের নাম হইতেছে হাইকোর্ট (High Court)। একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে কয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, ততজন বিচারপতি লইয়া হাইকোর্ট গঠিত হয়। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, এবং ৬২ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। শুধু অকর্মণ্যতা, অসদাচরণ অথবা শাসনতন্ত্র লংঘনের অপরাধে পার্লামেণ্ট

কর্তৃক অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি তাহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। কাহাকেও হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে অন্তত: দশ বৎসর ভারতের বিচারবিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে অথবা অন্তত: দশ বৎসর কোন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে। কোন কোন রাজ্যের হাইকোর্টগুলির, যেমন বোম্বাই ও কলিকাতা হাইকোর্টের কিছু মূল ক্ষমতা (Original Powers) আছে। এই ক্ষমতাবলে ইহারা রাজ্যের প্রধান দেওয়ানী আদালত। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দেশ, আদেশ অথবা কোন কিছুর কারণ দেখাইবার জন্য নোটিশ দিতে পারে। যদি কোনও হাইকোর্ট মনে করে যে, কোন মামলার সহিত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা জড়িত, তবে সেই ধরণের মামলা ইহা নিম্ন আদালত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। আদালতের অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে হাইকোর্ট শাস্তি প্রদান করিতে পারে।

দেওয়ানী আদালত হিসাবে হাইকোর্টের অধীনে আমরা দেখিতে পাই, বিভিন্ন জেলা ও সহরে জজকোর্ট, ইহার নীচে প্রতি মহকুমায় অথবা কোন কোন জেলা-সহরে মুন্সেফ কোর্ট থাকে। এমন কি বর্ধিষ্ণু গ্রাম অথবা যেখানে থানা আছে, এই রকম স্থানেও মুন্সেফ-আদালত দেখা যায়। বড় বড় সহরে ছোট ছোট মামলার জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) দেখিতে পাওয়া যায়। জজ-কোর্টগুলিতে মূল এবং আপীল সংক্রান্ত বিচার উভয়ই হয়। অনুরূপভাবে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই হাইকোর্টের পর প্রতি জিলায় দায়রা জজ এবং ইহার পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত; ইহার নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত আছে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার হয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে। সর্বনিম্ন ফৌজদারী আদালত হইল গ্রামাঞ্চলের ইউনিয়ন বেঞ্চ এবং পঞ্চায়েতগুলি। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সহরের হাইকোর্টগুলি জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মামলার বিচার করে।

Exercise

1. Give a brief outline of the Judicial System of India.
(ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (সংক্ষিপ্তসার দেখ।)

2. Discuss the composition and functions of the Supreme Court of India and indicate its importance in the constitutional system of India. (C. U. B. A. Part I, 1966)
(সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর এবং ভারতের শাসনব্যবস্থায় ইহার গুরুত্ব দেখাও।) (৩১০-৩২০ পৃষ্ঠা)

3. Write notes on Subordinate Courts.
(নিম্ন আদালতগুলির সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ।) (৩২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

4. Give an account of the Judicial System of a State.
(রাজ্যের বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (৩২৩-২৫ পৃষ্ঠা)

5. Compare the Indian Supreme Court with the American Supreme Court.
(ভারতীয় ও আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা কর।) (৩২১-২৩ পৃষ্ঠা)

6. To what extent does the Supreme Court of India enjoy the powers of judicial review of legislation?

(ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কতখানি বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা উপভোগ করে ?) (৩২০-২২ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the measures adopted to ensure independence of the judges in our country.

(ভারতের বিচারপতিগণের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা কর।)

(৩১২-১৩ পৃষ্ঠা, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the constitutional position of the Supreme Court of India. (C. U. B. A. Part I, 1968)

(ভারতের সুপ্রীমকোর্টের সাংবিধানিক মর্যাদা আলোচনা কর।) (৩১৮-২১ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the functions and importance of the High Courts. How are the judges of the High Courts appointed? (C. U. B.A. Part I, 1965)

(হাইকোর্টের ক্রিয়াকলাপ এবং গুরুত্ব আলোচনা কর। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কিভাবে নিযুক্ত হন।)

(৩২৩-২৫ পৃষ্ঠা)

10. Give a short account of the judicial system of West Bengal. (C.U.B.A. 1969) (পশ্চিমবঙ্গের বিচারব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।]

[**সংকেত :** ৩২৩-২৭ পৃষ্ঠা দেখ। রাজ্যের বিভিন্ন আদালতগুলি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা অবলম্বনপূর্বক পশ্চিমবঙ্গের বিচারব্যবস্থার একটি বিবরণী দাও।]

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন
(Amendment of the Indian Constitution)

[ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রকৃতি—অনমনীয় ও নমনীয় শাসনতন্ত্র—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি।]

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ একথা অনুভব করিয়াছিলেন যে জাতীয় জীবনধারার পরিবর্তন হইলে তাহা দেশের শাসনতন্ত্রে রূপ পাওয়া উচিত যাহাতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হইতে পারে। জাতীয় জীবনের স্বার্থের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত সমন্বয় না থাকে তো দেশের অগ্রগতি শুধু ব্যাহত হয় না, প্রগতিশীল জনগণের মনেও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি এরূপ রাখা হয় নাই যাহাতে উহাকে জাতির প্রগতির স্বার্থে সহজে পরিবর্তন করা না যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের শাসনতন্ত্র খুব অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় করা হয় নাই। বরং সুপরিবর্তনশীল সংশোধন পদ্ধতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমাদের শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উক্তিটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "While we want this constitution to be as soild and permanent as we can make it, there is no permanence in constitution. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop the nation's growth of a living, vital, organic people"... সেইজন্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দুষ্পরিবর্তনমূলক সংশোধন ব্যবস্থা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত হয় নাই। পণ্ডিত নেহরুর উক্তির মধ্যে আমরা শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি কেন নমনীয় বা সুপরিবর্তনশীল করা হইয়াছে তাহার কারণ জানিতে পারি—"In any event, we could not make this constitution so rigid that it cannot be adapted to changing conditions. When the world is in turmoil and we are passing through a very swift period of transitions, what we may do to-day may not be wholly applicable tomorrow."

ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রকৃতি

ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধন কিরূপে করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে সংবিধান সমূহের বিভাগ ও তাহাদের সম্বন্ধে তত্ত্বগতভাবে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। যেভাবে সাধারণ আইন

পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেইভাবেই যদি শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের সংশোধন এবং পরিবর্তন করা সম্ভব হয় তবে তাহাকে সুপরিবর্তনশীল বা নমনীয় (Flexible) শাসনতন্ত্র বলা হয়। কিন্তু যদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়—যেভাবে সাধারণ আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণয়ন করা যায় সেভাবে উহার সংশোধন করা না যায়—তাহা হইলে সেই শাসনতন্ত্রকে দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় (Rigid) শাসনতন্ত্র বলে। আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনমনীয়, কেননা ইহার সংশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেস সভার দুই কক্ষে মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যকে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে; অথবা বিকল্পে আটচল্লিশটি রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ বত্রিশটি রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে, এবং এইরূপ সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের আইনসভা অথবা আহূত সভায় উপস্থিত ¾ সংখ্যক সদস্য দ্বারা অনুমোদিত হইলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইবে। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলণ্ডে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হইয়া থাকে। তবে একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং তাহা শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের আকারও কখনো কখনো গ্রহণ করে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মন্ত্রিসভার সৃষ্টি করিতে হইত তবে ইহা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার আদালতের সিদ্ধান্তের সাহায্যেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্য অনেক সময় সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেজন্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। আবার রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সেখানে সোভিয়েট সংবিধানের সংশোধন কেন্দ্রীয় আইন সভা বা সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্যবৃন্দের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের দ্বারা করা যায়। ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি সকল দিক বিচার করিয়া খুব অনমনীয়ও করা হয় নাই আবার খুব নমনীয়ও করা হয় নাই—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এইরূপ সংশোধন পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে।[১] ভারতের সংবিধানের

অনমনীয় ও নমনীয় শাসনতন্ত্রের আলোচনা —কতিপয় রাষ্ট্রের উদাহরণ

১। "The method of amendment provided by the Constitution of India strikes a just balance between flexibility and rigidity. It provides a variety of amending processes."—Setalvad.

সংশোধন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করিবার পূর্বে সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির কাম্য ব্যবস্থা হিসাবে অধ্যাপক লাস্কির উক্তিটি উল্লেখ করা যাইতে পারে—"amendment should be reasonably accessible without being too easy of access."

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি (Procedure for amending the Indian Constitution):

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দের হস্তে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের ভার ন্যস্ত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল; তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর সহিত সংশোধনটি জড়িত সেক্ষেত্রে তাঁহারা অন্য উপায়ের ব্যবস্থাও অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনের প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ :—(১) সংবিধানের অন্তর্গত কতিপয় বিষয়ের পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা সম্ভবপর। নূতন রাজ্যের সৃষ্টি বা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন (সংবিধানের ৪নং ধারায় বর্ণিত), রাজ্যগুলির আইনসভাতে দ্বি-কক্ষের বিলোপসাধন বা দ্বি-কক্ষের প্রবর্তন (সংবিধানের ১৬৯ নং ধারায় বর্ণিত), তপশীলভুক্ত জাতির শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি এইরূপ সংশোধন পদ্ধতির অন্তর্গত। (২) শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নং ধারায় বর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে সংবিধানের সংশোধন করা যায়। এখানে আবার দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি এমন কোন সংশোধন করিতে হয় যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্যগুলি লিপ্ত থাকে তাহা হইলে রাজ্যের আইনসভার অন্ততঃ অর্ধেকের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এইরূপ সংশোধন নিম্নরূপ :—

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি

(ক) কোন সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে উপস্থাপিত করিতে হয়। ইহা পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে গৃহীত হইতে হয়। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যকে আবার পার্লামেণ্টের উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সমস্ত সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। এইভাবে আইনসভা কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এই অনুমোদিত বিলটিতে সম্মতি প্রদান করিলে শাসনতন্ত্র সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। (খ) যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসন-সংক্রান্ত সম্পর্ক, সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট, কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষমতা বণ্টন, পার্লামেণ্টের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব, সংবিধানের সংশোধনপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে তাহা হইলে ২ (ক) বর্ণিত

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও দেখিতে হইবে যেন উক্ত বিলটি রাজ্যগুলির অন্ততঃ অর্ধেক আইনসভার দ্বারা সমর্থিত হয় এবং উক্ত সমর্থনের সিদ্ধান্ত পার্লামেণ্টে প্রেরণ করা হয়। বিলটি অতঃপর রাষ্ট্রপতির সম্মতি বা অনুমোদন লাভ করিলেই সংবিধান সংশোধন হয়। ২ (খ) বর্ণিত বিষয়ের সংশোধন এইরূপ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ছাড়া করা যায় না।

উপরোক্ত সংশোধন-পদ্ধতি হইতে ভারতের সংবিধানের সংশোধন করিবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সংশোধন সংক্রান্ত যে কোন বিল পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। রাজ্যগুলির আইনসভা এইরূপ কোন প্রস্তাব বা বিল প্রবর্তন করিতে পারে না। যে কোন বিলের ন্যায় সংশোধন সংক্রান্ত বিলকে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইতে হয়, এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিতে হয়। সংবিধানের প্রত্যেক ধারাকেই সংশোধন করিবার ব্যবস্থা সংবিধানে আছে; এমনকি সংবিধান সংশোধন করার ব্যবস্থাটি পর্যন্ত। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি সহজসাধ্য (flexible) এবং কষ্টসাধ্য (rigid) উভয়েরই সংমিশ্রণে গঠিত একটি বিশেষ পদ্ধতি।

এই সংশোধন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

ভারতের শাসনতন্ত্র ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে কার্যকর হইবার পর আজ পর্যন্ত অনেকবার[২] এই সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বা অনুচ্ছেদ সংশোধিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থে, অনমনীয় হইলেও অনেক সময় ভারতের শাসনতন্ত্রের দ্রুত সংশোধন সম্ভবপর হইয়াছে। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজনে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত বিলে শাসনতন্ত্রের কোন কোন বিষয়ের অনমনীয়তা কখনও বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই ইহাও দেখা গিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক সম্প্রদায়কে বস্তুতঃ শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে চরম ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং যদিও শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকার হিসাবে আদালতকে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তবুও আদালতের রায় শাসক সম্প্রদায়ের নিকট অকাম্য বলিয়া বিবেচিত হইলে উহা শাসনতন্ত্র সংশোধনে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই।[৩]

২। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর হইতে একবিংশতিবার শাসনতন্ত্র সংশোধিত হইয়াছে।

৩। এই প্রসংগে ডি. বসু বলেন, "Instead of leaving the matter to the slow machinery of judicial interpretation, our Constitution has vested the powers in the people's representatives and though the final power of interpretation of the Constitution as it stands at any moment belongs to the court, the power of changing the instrument itself has been given to Parliament and if Parliament considers that the interests of the country so require, it can amend the Constitution as often as it likes."

Introduction to the Constitution of India—D. Basu (1960—Edition)

ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনসভার এইরূপ ক্ষমতা আপাতদৃষ্টিতে কঠোর হইলেও সংশোধন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য খুবই অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। অকাম্য বা অসুবিধাজনক আদালতের রায় পর্যন্ত সংবিধানের সংশোধনের মারফৎ বাতিল করা বা অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে কখনই অসম্ভব ব্যাপার হয় নাই। তবে আদালতের রায়কে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করার মধ্যে যে শাসনতান্ত্রিক সংকট ও বিপর্যয় লুকাইয়া থাকে সে কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।[৪]

শাসনতন্ত্র সংশোধনে আদালত ও আইন-সভার ভূমিকা

১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলার রায় প্রদানকালে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করিয়াছে যে ৩৬৮ নং ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করা চলে বটে, তবে শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার-সমূহের সংশোধন করা অথবা সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পার্লামেণ্টের নাই। ইতিপূর্বে পার্লামেণ্ট সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া অসঙ্গত কাজ করিয়াছে, ভবিষ্যতে এইরূপ হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। অন্যান্য যুক্তির মধ্যে এই রায়ের সপক্ষে বলা হইয়াছে যে ১৩(২) ধারায় ব্যবহৃত 'আইন' (Law) শব্দটির দ্বারা সাধারণ আইন এবং শাসনতান্ত্রিক আইন বা সংশোধন উভয়কেই বুঝায়; সুতরাং শাসনতন্ত্রের ১৩(২) ধারায় যখন নিষেধ করা হইয়াছে যে মৌলিক অধিকার হরণ করিয়া অথবা ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না তখন পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়াও কোন মৌলিক অধিকার হরণ অথবা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। সুপ্রীম কোর্টের এই রায় সম্প্রতি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে শাসন-তন্ত্রের সংশোধন সম্পর্কে সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা বিশ্লেষণ করা হইলে ইহা মনে হয় যে শাসনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্পর্কিত ধারায় এমন কোন কথা বলা নাই যে, পার্লামেণ্ট মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন ধারার সংশোধন করিতে পারিবে না। আবার ইহাও অনেকে

মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের সংশোধন

৪। সেইজন্য ডি. বাসু বলেন, "Judges may, of course, err but as has already been demonstrated, even the highest tribunal is likely to change its views in the light of further experience. In the absence of serious repercussions, therefore, the process of constitutional amendment should not be resorted to for the purpose of over-riding unwelcome judicial verdicts so often as would generate in the minds of the lay public an irreverance for the judiciary which might shake the very foundation of constitutional government."

Introduction to the Constitution of India—D. Basu. (1960 Edition)

মনে করেন যে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত শাসনতন্ত্রের কোন বিধান যখন খুশী তখনই সংশোধন করা যেমন অনুচিত সেইপ্রকার এই বিধানগুলি অপরিবর্তনীয় থাকাও অনুচিত ; কেননা সেক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি পার্লামেণ্টের সদস্য শ্রীনাথ পাই একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নং ধারাটিকে সংশোধন করিয়া মৌলিক অধিকারের তালিকায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের থাকা উচিত। সুপ্রীম কোর্টের রায় মানিয়া লওয়ার অর্থ, তাঁহার মতে, পার্লামেণ্টের ক্ষমতার বিলোপ সাধন। এই বিলটি সম্প্রতি বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে এই বিলটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। সরকার পক্ষের মধ্যেই ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। বর্তমান মরসুমেই আশা করা যায় বিলটি লইয়া আলোচনা সুরু হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন সংশোধন
(Different amendments of the Indian Constitution)

ভারতে এই পর্যন্ত মোট একুশবার শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইয়াছে। এই সংশোধনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রথম সংশোধন হয় ১৯৫১ সালে। এই সংশোধনের দ্বারা (১) অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়, (২) শাসনতন্ত্রের ১৯ নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার-সমূহের উপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ (reasonable restrictions) আরোপ করিবার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়, (৩) ভূ সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যবিধানমণ্ডল প্রণীত আইনকে 'বৈধ' বলিয়া সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং (৪) পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলির অধিবেশন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হয় যে দুইটি অধিবেশনের মধ্যে ছয়মাসের বেশী সময় অতিক্রান্ত হইবে না। (মূল ব্যবস্থা ছিল বৎসরে অন্ততঃ দুই বার পার্লামেণ্টের ও রাজ্যবিধান-মণ্ডলগুলির অধিবেশন হইবে।)

দ্বিতীয় সংশোধন হয় ১৯৫২ সালে শাসনতন্ত্রের মূল বিধান অনুযায়ী লোকসভার নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কেন্দ্রের বণ্টন এরূপভাবে করিতে হইবে যেন প্রতি সাড়ে সাত লক্ষ লোক পিছু একজন করিয়া সদস্য লোকসভায় নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় সংশোধনে এই বাধ্যবাধকতা তুলিয়া দেওয়া হয়।

১৯৫৪ সালে শাসনতন্ত্রের **তৃতীয় সংশোধন** অনুযায়ী যুগ্ম তালিকার (concurrent list) সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হয়।

১৯৫৫ সালে শাসনতন্ত্রের **চতুর্থ সংশোধন** অনুযায়ী ৩১ এবং ৩১ (ক) ধারায় বর্ণিত সম্পত্তির অধিকারের কিছু পরিমাণে তারতম্য করা হয়। এই সংশোধনের অন্যতম ব্যবস্থা হইতেছে এই যে 'যথাযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই'—এই যুক্তিতে সম্পত্তি অধিগ্রহণের কোন আইন বাতিল হইবে না।

একই বছরে (১৯৫৫) শাসনতন্ত্রের **পঞ্চম সংশোধন** অনুযায়ী পার্লামেন্ট কর্তৃক নূতন রাজ্য গঠন, পুরাতন রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে আরও বিস্তারিত করা হয়।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের **ষষ্ঠ সংশোধন** অনুযায়ী ইউনিয়ন তালিকা (Union List) এবং রাজ্য তালিকার (State List) কিছুটা পরিবর্তন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যভুক্ত জিনিসপত্রের উপর ক্রয় বা বিক্রয়কর ধার্য করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। একই বৎসরে (১৯৫৬) শাসনতন্ত্রের **সপ্তম সংশোধন** অনুযায়ী রাজ্য পুনর্গঠন কার্য (States Reorganisation) সম্পাদন করা হয়।

১৯৫৯ সালে শাসনতন্ত্রের **অষ্টম সংশোধন** দ্বারা তপশীলী বর্ণ ও তপশীলী উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্যদের জন্য লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ১০ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

ভারতের ভূখণ্ড (territory) হইতে বেরুবাড়ী বিচ্ছিন্ন করা এবং উহা পাকিস্তানকে হস্তান্তরিত করিবার জন্য ১৯৬০ সালে শাসনতন্ত্রের **নবম সংশোধন** করিয়া ভারত সরকারকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৯৬১ সালে শাসনতন্ত্রের **দশম সংশোধন** অনুযায়ী পূর্বতন পর্তুগীজ উপনিবেশ দাদরা ও নগর হাভেলি পর্তুগীজ শাসন হইতে মুক্ত হইলে এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলে এই দুইটি অঞ্চলকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের (Union Territories) মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই বৎসরেই (১৯৬১) শাসনতন্ত্রের **একাদশ সংশোধনে** উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ধারাটির সামান্য পরিবর্তন করা হয়। মূল শাসনতন্ত্রে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষকে একত্র মিলিত হইয়া (assembled at a joint meeting) নির্বাচন-সংস্থা (electoral college) গঠন করিতে হইত। এই সংশোধনের দ্বারা একত্র মিলিত হইবার ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে।

১৯৬২ সালে শাসনতন্ত্রের **দ্বাদশ সংশোধন** অনুযায়ী পর্তুগীজ অধীনতা হইতে মুক্ত গোয়া, দমন ও দিউকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়। ইহা দশম সংশোধনের অনুরূপ। একই বৎসরে (১৯৬২) শাসনতন্ত্রের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংশোধন করা হয়। **ত্রয়োদশ সংশোধন** অনুযায়ী নাগাভূমি রাজ্য আইনের (State of Nagaland Act, 1962) পরিপূরক হিসাবে নাগাভূমি রাজ্যের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

চতুর্দশ সংশোধন দ্বারা লোকসভায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সদস্যের সংখ্যা ২০ হইতে ২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

১৯৬৩ সালেও শাসনতন্ত্রের পঞ্চদশ এবং ষোড়শ সংশোধন করা হয়। **পঞ্চদশ সংশোধন** অনুযায়ী হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ৬০ বৎসরের পরিবর্তে ৬২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণকে পুনরায় বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা যাইবে। এই সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যগণকে পদচ্যুত করিতে হইলেও বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। জাতীয় সংহতি আনয়নের জন্য **ষোড়শ সংশোধনে** ব্যবস্থা করা হয় যে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা (Sovereignty and integrity of India) অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরকার স্বাধীনতার অধিকারের (Rights to Freedom) উপর প্রয়োজনীয় বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, এই সংশোধনে ব্যবস্থা করা হয় যে পার্লামেণ্ট ও রাজ্যবিধানসভায় নির্বাচনপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের এবং "ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা" অক্ষুণ্ণ রাখিবার শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯৬৪ সালের শাসনতন্ত্রের **সপ্তদশ সংশোধন** দ্বারা ভূমিসংস্কারের পথে আইনগত বাধাগুলির অপসারণ করা হয়।

১৯৬৬ সালে শাসনতন্ত্রের তিনবার সংশোধন করা হয়। **অষ্টাদশ সংশোধন** (১৯৬৬) অনুযায়ী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সীমানা, নাম প্রভৃতির পরিবর্তন পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নের দ্বারা করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মতামত জানিবার প্রয়োজন হইবে না। **উনবিংশতি সংশোধন** (১৯৬৬) অনুযায়ী নির্বাচন সম্পর্কিত বিবাদ বিচার করিবার জন্য নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল (election tribunals) নিয়োগের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। **বিংশতিতম সংশোধন** (১৯৬৬) অনুযায়ী কতিপয় ক্ষেত্রে জিলা জজের নিয়োগ এবং জিলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় বৈধকরণ করা হয়।

১৯৬৭ সালে শাসনতন্ত্রের **একবিংশতিতম সংশোধন** করিয়া হিন্দি ভাষাকে শাসনতন্ত্রের অষ্টম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতিতে নমনীয়তা ও অনমনীয়তার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। কতকগুলি সংশোধন সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতেই করা যায়, কতকগুলি বিষয়ে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সহিত রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেকের বেশীর সম্মতি প্রয়োজন হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যায়। তবে পার্লামেন্টে ও রাজ্যের অধিকাংশ আইনসভাগুলিতে একই দলের নেতৃত্ব থাকায় ভারতের সরকারী দলের পক্ষে সংবিধানের কোন সংশোধন প্রস্তাবই কার্যকর করিতে অসুবিধাজনক হয় নাই।

Exercise

1. How can the Indian Constitution be amended?
[ভারতের শাসনতন্ত্র কিভাবে সংশোধন করা যায় ?] (৩৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা)

2. Is the Indian Constitution rigid? Give reasons for your answer
[ভারতের শাসনতন্ত্র কি প্রকার ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।

3 "The Indian Constitution is neither rigid nor flexible". Justify the statement with reference to the procedure of the amendment of the Indian Constitution. [ভারতের শাসনতন্ত্র কঠোরও নয়, নমনীয়ও নয়"—ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখপূর্বক তোমার উত্তরের যৌক্তিকতা দেখাও]
(৩৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা)

4 Explain the procedure of amendment of the Constitution of India? Is the Constitution rigid or flexible? State your reasons fully.
[ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। শাসনতন্ত্রটি কি কঠোর অথবা নমনীয় ? তোমার যুক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা কর।] [C. U. B. A. Part II 1965]
(৩৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা)

5. How far is it true to say that the Indian Constitution comprises flexilibility with rigidity? (C. U. B. A. Part I 1968)
[ভারতের শাসনতন্ত্র নমনীয়তা ও কঠোরতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, একথাটি কতটুকু সত্য ?] (৩৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা)

4. Give an account of the different amendments of the Indian Constitution.
[ভারতের শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন সংশোধনগুলির একটি বিবরণী দাও।] (৩৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)

———

সপ্তদশ অধ্যায়

নির্বাচক ও নির্বাচন-এলাকা
(Voters and Constituencies)

[নির্বাচক—ভারতের সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি কি সফল হইয়াছে?—লোকসভার সদস্যগণের নির্বাচন, রাজ্যসভার সদস্যগণের নির্বাচন—রাজ্যবিধান সভার সদস্যগণের নির্বাচন—রাজ্যবিধান পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচন—নির্বাচন কমিশন।]

নির্বাচক (Voters) ঃ ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে প্রত্যেক নাগরিক সরকার গঠন এবং পরিচালনায় পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে,—অর্থাৎ সরকার জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল। গণতন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকে এবং সেইজন্য সব নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকে। ভারতেও আমরা সার্বিক প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার (Universal adult suffrage) দেখিতে পাই। শাসনতন্ত্রের ৩২৬ নং ধারা অনুযায়ী "The elections to the House of the People and the Legislative Assembly of every State shall be the basis of adult suffrage." অর্থাৎ লোকসভা এবং প্রতিটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে। লোকসভা ও রাজ্যবিধান সভাসমূহের নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক কোন নাগরিকেরই একাধিক ভোট নাই। ভারতে নির্বাচন সম্বন্ধীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণকারীগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস দেখা যায়। নির্বাচনের ব্যয় সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমনভাবে যেন প্রার্থীরা সমতার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। নির্বাচনের পর প্রত্যেক প্রার্থীকে ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব প্রদান করিতে হয়, তবে এই সীমাদ্বারা দলগুলিকে আবদ্ধ করা হয় নাই; ফলে যে দল মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন এই বিষয়ে তাহাদের প্রাধান্য মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং কোন কোন দল ইহার দ্বারা যথেষ্ট সুবিধা লাভই করিয়াছে।

গণতন্ত্রে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার

এই ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে সার্বিক ভোটাধিকারের অর্থ এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের এই নীতি অনুযায়ী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। আবার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়া অথবা ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তবে তাহাকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। রাশিয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে, ইংলণ্ডে, ভারতবর্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২১ বৎসর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বৎসর বয়সে নাগরিকগণকে সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বর্তমানে

নির্বাচন এলাকায় বসবাস না করার জন্য, মস্তিক বিকৃতির জন্য এবং নির্বাচন চলাকালে বে-আইনী বা অসাধু আচরণের জন্য কোন নাগরিক নির্বাচক হইবার যোগ্যতা হারাইতে পারে। সুতরাং কোন ভারতীয় নাগরিককে নির্বাচক হইতে হইলে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে। (১) নির্বাচককে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে ; (২) নাগরিককে কোন নির্বাচন এলাকায় সাধারণভাবে বসবাসকারী (ordinarily resident) হইতে হইবে ; (৩) নাগরিককে ২১ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে ; (৪) নির্বাচক হইতে হইলে নাগরিককে কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক উন্মাদ বলিয়া ঘোষিত হইলে চলিবে না এবং (৫) নির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নাগরিকের কোন অসাধু আচরণ থাকিতে পারিবে না। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (Representation of the People's Act, 1951) অনুযায়ী অসাধু আচরণের লক্ষণ হইতেছে উৎকোচ প্রদান, ভোটদাতা এবং প্রার্থীকে জোর করিয়া অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করা, ভোটদানের কেন্দ্র (Polling station) হইতে অসাধু উপায়ে ব্যালট বাক্স কিংবা ব্যালট কাগজ সরাইয়া ফেলা এবং ভোটদাতাগণের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এককথায় নির্বাচক অথবা নির্বাচন প্রার্থী কোন নাগরিক এমন কোন কাজ করিতে পারিবেন না যাহাতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা এবং গোপনীয়তা নষ্ট হয় অথবা গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়।

ভারতীয় নাগরিকদের নির্বাচক হইবার সর্ত

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচকের সংখ্যা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক। ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এবং ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে যথাক্রমে ভারতের নির্বাচকদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১ কোটি এবং ২৫ কোটির মত। ইহা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। গণতন্ত্রের এত বৃহৎ বাস্তব রূপায়ণ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভারতে গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র।

ইংরাজ আমলে সম্পত্তি, আয়, শিক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার স্থির হইত বলিয়া মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ নির্বাচক হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে সার্বিক ভোটাধিকারের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। ভারতের নির্বাচকগণের মধ্যে সকলেই হয়ত শিক্ষিত নহেন ; কিন্তু সকলেই গণতন্ত্রের একটি অমূল্য রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়াছেন। আমাদের শাসনতন্ত্রের ৩২৫ নং ধারায় বলা হইয়াছে, "...no person shall be ineligible for inclusion in any such (electoral) roll...on grounds only of religion, race, caste, sex or any one of them". অর্থাৎ ধর্ম,

বংশ, বর্ণভেদ, স্ত্রী-পুরুষ শ্রেণীবিভাগ, প্রভৃতির ভিত্তিতে ভোটাধিকারের মধ্যে কোনও প্রকার তারতম্য করা হইবে না। ভোটের অধিকার প্রদান করার ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ না করায় আমাদের সংবিধান জনগণের শাসনব্যবস্থাকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ইহাছাড়াও, স্বতন্ত্র একটি নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে আছে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতি বহু গণতন্ত্রেই পরিলক্ষিত হয় না।

ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি কি সফল হইয়াছে? (Has the universal adult suffrage been successful in India ?): ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ না হইলেও বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। কারণ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ২৫ কোটি নির্বাচক নাই। কিন্তু বিগত চারটি সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সাল) অভিজ্ঞতা হইতে স্বতঃই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে আসে—তাহা হইতেছে, ভারতে কি সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি সফল হইয়াছে?

যাঁহারা সাধারণ ভাবে সার্বিক ভোটাধিকারের নীতি সমর্থন করেন না, তাঁহাদের মতে দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতের বিগত চারটি সাধারণ নির্বাচনে দেখা গিয়াছে যে নির্বাচকমণ্ডলীর বৃহত্তম অংশ (যাঁহারা আদৌ শিক্ষিত নহেন অথবা স্বল্পশিক্ষিত) জানিতেন না যে ভোটপ্রদানের মূল্য কতটুকু। ভোট প্রদান করিবার অধিকার আছে এইরূপ অনেকেই নিজেদের ভোট প্রদান করেন নাই। কোন কোন নির্বাচনকেন্দ্রে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, কোন্ নির্বাচন প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা উচিত অথবা কোন্ প্রার্থী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, কোন্ রাজনৈতিক দলের কিরূপ কর্মসূচী, কোন্ রাজনৈতিক দল জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে,—ইত্যাদি অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় (যেগুলি সব নির্বাচকেরই নির্বাচনের পূর্বে জানা উচিত) সম্বন্ধে অধিকাংশ নির্বাচক অজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই না জানিয়া ভোট প্রদান করিয়াছে অথবা ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হইয়াছে। রাজনৈতিক সচেতনতার পূর্ণ বিকাশ নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় নাই। এই সব কারণে অনেকে মনে করেন যে ভারতের জনসংখ্যার যেখানে প্রায় শতকরা

অনেকে মনে করেন সার্বিক ভোটাধিকার নীতি ভারতে সফল হয় নাই

৩০ ভাগ লোক শিক্ষিত সেইক্ষেত্রে সার্বিক ভোটাধিকার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া, ভারতে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য এবং তপশীলভুক্ত নাগরিকদের জন্য নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সব নাগরিকেরই নির্বাচক হইবার এবং নির্বাচন প্রার্থী হইবার সমান অধিকার আছে সেইক্ষেত্রে এই আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা থাকে না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি কতটা সফল হইবে সেই সম্বন্ধে শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণও সন্দিহান ছিলেন। সেইজন্য যাঁহারা মনে করেন যে ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি সফল হয় নাই, তাঁহাদের মতে শুধু সেই সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত যাহারা কল্যাণকারক রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম। এই মতের সমর্থকগণ অনেকক্ষেত্রে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তির নজির দেখাইয়া থাকেন। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে "Universal education must precede universal enfranchisement." অর্থাৎ, সার্বিক ভোটাধিকারের আগে সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাঁহারা মনে করেন যে অশিক্ষিত নির্বাচকগণ অনেকক্ষেত্রেই অর্থের লোভে নিজেদের ভোট বিক্রয় করিতে পারেন।

অনুন্নত শ্রেণীর জন্য এবং তপশীলভুক্ত নাগরিকদের জন্য আসন সংরক্ষিত

কিন্তু ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছে এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই যে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী, সরকার গঠনে এবং আইন প্রণয়নে সব নাগরিকেরই যে পরোক্ষভাবে একটি ভূমিকা আছে, অর্থাৎ সরকারকে যে সব নাগরিককেই সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তৎপর থাকিতে হয়,—ইহাই সরকারকে গণতন্ত্রের পথে চলিতে প্রেরণা দেয়। সরকারও জানেন যে ঠিকপথে না চলিলে উহাকে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নিকট সাধারণ নির্বাচনের সময়ে জবাবদিহি করিতে হইবে। হয়ত আমাদের দেশের নির্বাচকদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত। কিন্তু নিজেদের ভালমন্দ বুঝিবার মত চেতনা তাহাদের নাই অথবা কোন্ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হইলে দেশের কল্যাণ হইবে ইহা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই একথা বলা চলে না। যাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা নাই অথবা সাধারণ অর্থে যাঁহারা শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা প্রকৃতই রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বিগত চারটি সাধারণ জন-সাধারণের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনা এবং তৎপরতা আমরা দেখিয়াছি তাহাতে একথা বলা চলে না যে ভোট প্রদান করিবার প্রকৃত মর্ম ভারতের অশিক্ষিত

সার্বিক ভোটাধিকার নীতি ভারতে একেবারে বিরল হইয়াছে ইহা বলা চলে না

নির্বাচকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থীই নির্বাচিত করিবার চেষ্টা নির্বাচকগণ করিয়াছেন। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি সবদেশেই থাকে; আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু যে অনুপাতে আমাদের দেশের নির্বাচকগণ অশিক্ষিত, সেই অনুপাতে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের দেশে কমই দেখা গিয়াছে।

শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর হইতেই কংগ্রেস দল ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যে ও কেন্দ্রে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠন করে। কিন্তু গত চতুর্থ নির্বাচনের পর বহু রাজ্য হইতে এই দল ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং লোকসভায় অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক সভ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রে সরকার গঠন করিতে সক্ষম হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৬৯ সাল) চারটি রাজ্যে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন কার্য সমাধা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলা ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিয়াছে। কেননা একক বৃহত্তম দল হিসাবে আইনসভায় তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নাই। আমরা অতীতে এই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস-দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হইতে দেখিয়াছি। নানাবিষয়ে ঐ দলের শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ ও ক্ষোভ গত ১৯৬৭ সালের চতুর্থ নির্বাচন এবং ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে ঐ দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। পশ্চিমবাংলা ও পাঞ্জাবে যে বিরোধীদলগুলি ফ্রণ্ট গঠন করিয়া কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার মূলেও আছে জনগণের চাপ। জনসাধারণ যেভাবে ভোট দান করিয়াছেন তাহাতে কোন দলই আর অশিক্ষিত বলিয়া জনগণকে উপেক্ষা করিতে সাহসী নহে।

সুতরাং ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছে এই কথা বলা চলে না। দুইশত বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার জ্বালা ভোগ করিবার পর ভারতের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল, এবং যতই দিন যাইবে ততই ভারতীয় নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের যথাযথ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন। শুধু শিক্ষিত নাগরিকগণের মধ্যেই ভোটাধিকার সীমিত রাখিলে গণতন্ত্র বজায় থাকিবে না—মনে রাখা উচিত প্রকৃত গণতন্ত্রে অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয় না; নাগরিকগণও অধিকার লাভ করিলেই কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইতে আগ্রহশীল হন।

লোকসভার সদস্যগণের নির্বাচন (**Election of the Members of Lok Sabha or the House of the People**): ভারতীয় পার্লামেণ্টের লোকসভার নির্বাচন আঞ্চলিক ভিত্তিতে হইয়া থাকে। এইক্ষেত্রে

শাসনতন্ত্র দুইটি নীতির উল্লেখ করিয়াছে: প্রথমত রাজ্য সমূহের মধ্যে লোকসভার মোট আইনসংখ্যা বণ্টন এমনভাবে করিতে হইবে যেন রাজ্যের লোকসংখ্যা এবং রাজ্য হইতে লোকসভায় যতজন সদস্য নির্বাচিত করা হইবে তাহার অনুপাত যথাসম্ভব সব রাজ্যে সমান হয়।

লোকসভার সদস্যগণের নির্বাচন জনসংখ্যা বণ্টনর উপর নির্ভরশীল

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক রাজ্যকে এমনভাবে কতিপয় নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করিতে হইবে যেন জনসংখ্যা-পিছু লোকসভার সদস্য নির্বাচনের অনুপাত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সর্বত্র সমান হয়।

প্রত্যেক আদম স্থমারির (Census of Population) শেষে বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচন এলাকাগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, অমীনদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাভেলি, গোয়া, দমন ও দিউ এবং আসামের পার্বত্য ও উপজাতি এলাকা হইতে লোকসভায় যে সকল সদস্য প্রেরিত হন, তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর স্থপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি লোকসভার সদস্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি যে সকল সদস্যদের নিয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহারা ছাড়া লোকসভার অন্যান্য সদস্যগণ দেশের নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

পূর্বে তপশীলী শ্রেণীর (Scheduled castes) সদস্যগণের জন্য সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে (reservation of seats) একই নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে দুইজন সদস্য নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু, ১৯৬১ সালের Two Member Constituencies (Abolition) Act অনুযায়ী সেই ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় হইতে প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্র হইতে একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং নির্বাচন কেন্দ্রগুলির মধ্যে কতকগুলিকে তপশীলী শ্রেণীর সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

দ্বি-আসন বিশিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রের উচ্ছেদ

রাজ্যসভার সদস্যগণের নির্বাচন (Election of the Members of Rajya Sabha or the Council of States) : রাজ্যসভার সব সদস্যই নির্বাচিত সদস্য নহেন; রাষ্ট্রপতি কতিপয় সদস্যকে মনোনীত করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ অঙ্গরাজ্যগুলির এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি। অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিগণ রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং এই নির্বাচন একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটদানের পদ্ধতির মাধমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইউনিয়ন এলাকার প্রতিনিধিগণ কিভাবে নির্বাচিত হইবেন তাহা পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা স্থির করা হয়।

রাজ্যসভায় পরোক্ষ নির্বাচন একক হস্তান্তর যোগ্য ভোটপ্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়

বর্তমান আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন এলাকায় একটি নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) গঠন করিয়া সেই এলাকার প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করা হয়। দিল্লীর নির্বাচন-কেন্দ্রে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় দিল্লীর পৌরসভার কাউন্সিলরগণ এবং নয়াদিল্লী পৌরসমিতি ও দিল্লী ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ডের এলাকা হইতে দশজন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া। হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ইহাদের আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। ইউনিয়ন এলাকা হইতে যে সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁহারাও একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপ্রদান করিবার পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণের নির্বাচন (Election of the members of the Legislative Assemblies of the States): রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচনের জন্য আদম সুমারির ভিত্তিতে প্রতি সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচনকেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস করা হয়। এমনভাবে নির্বাচন কেন্দ্রগুলিকে বিভক্ত করা হয় যেন জনসংখ্যা পিছু সদস্যসংখ্যার অনুপাত যথাসম্ভব এক হয়। তপশীলভুক্ত জনসাধারণের জন্য অথবা উপজাতিদের জন্য, (যেমন, আসামের জন্য) পার্বত্য জাতিগুলির জন্য (যেমন, পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং-এর ক্ষেত্রে) বিধানসভায় আসন সংরক্ষিত রাখা হয় এবং সেইভাবে নির্বাচনকেন্দ্রের বণ্টন করা হয়। এইক্ষেত্রে নির্বাচনকেন্দ্রের গঠন-পদ্ধতি পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। লোকসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন দ্বি-আসন বিশিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্র তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সেইরূপ দ্বি-আসন-বিশিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্র তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজ্য বিধানসভায়ও কোন কোন ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে

রাজ্য বিধানপরিষদের সদস্যদের নির্বাচন (Election of the Members of the Legislative Councils of the States): রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের (functional representation) নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ভারতে সব অঙ্গরাজ্যগুলিতে বিধানপরিষদ নাই; কারণ সব রাজ্যের আইন সভাই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট নহে। যে সকল রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে, সেই সকল রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, গ্র্যাজুয়েটগণ এবং শিক্ষকগণকে আলাদা প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এইসব ক্ষেত্রে নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা এবং আসন সংখ্যাও নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজ্য বিধান পরিষদে বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়

কোন নাগরিক একই সঙ্গে দুইটি নির্বাচনকেন্দ্রে ভোট দিতে পারেন না,

অথবা ভোটারের তালিকায় তাঁহার নাম দুইটি কেন্দ্রে উল্লিখিত থাকিতে পারে না। কিন্তু একই ব্যক্তি একসঙ্গে রাজ্য বিধানসভা, লোকসভা, এবং উপযুক্ত যোগ্যতা থাকিলে রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই ধরণের ব্যবস্থা সুস্থ গণতন্ত্রের প্রগতির পথে অন্তরায়। গণতন্ত্রে সব নাগরিকের সমান ভোটাধিকার থাকে এবং আমরা তখন ইহাকে বলি সাম্যবাদী রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বা "*Equalitarian Political Democracy*"; কিন্তু এইজন্য সমাজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁহারা জ্ঞানে ও গুণে খ্যাতিমান তাঁহাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলে জনগণেরই আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপারে পার্লামেণ্টের হাত থাকে। যেমন সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে সব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতেছে পার্লামেণ্ট।

রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে পার্লামেণ্টের দায়িত্ব

নির্বাচন কমিশন (Election Commission): নির্বাচনের কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং যাহাতে সরকারের দিক হইতে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না করা হয়, তাহার জন্য শাসনতন্ত্রে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নির্বাচন কমিশন পূর্বে নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার জন্য নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল (Election Tribunal) নিয়োগ করিতেন। তবে সম্প্রতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদ ও গোলযোগের মীমাংসার ভার আদালতের উপর ন্যস্ত হওয়ায় (Representation of the People [Amendment] Act 1966) নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল বিলুপ্ত হয়। তাই নির্বাচন কমিশনের নিকট হইতে উহার নিয়োগ—ক্ষমতাও তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের সময় কোন্ দলকে জাতীয় দল হিসাবে স্বকৃতি দিতে হইবে তাহা নির্ধারণের দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commissioner) এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার লইয়া। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়া অন্যান্য কমিশনারের সংখ্যা কত হইবে তাহা স্থির করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিই সব কমিশনারদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হইবার পূর্বে নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি আঞ্চলিক কমিশনার (Regional Commissioner) নিয়োগ করিয়া থাকেন।

নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন

নির্বাচনী কমিশনারদের চাকুরির সর্ত ও মেয়াদ রাষ্ট্রপতি স্থির করিয়া

থাকেন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করিবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অসদাচরণ বা অকর্মণ্যতার অপরাধে অপসারণ করিবার জন্যও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাকে অপসারণ করিতে হইলে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্য-সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশকে তাঁহার অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করিতে হয়। নির্বাচন কমিশনের অপসারণ সম্পর্কে এই বিধান রাখিবার উদ্দেশ্য হইতেছে ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল যাহাতে ইহাকে প্রভাবিত না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। অন্যান্য সদস্যগণকে বা কোন আঞ্চলিক কমিশনারকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ ছাড়া পদচ্যুত করা যায় না।

নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ থাকিতে হয়

ভারতের নির্বাচন কমিশন গঠন এবং ইহার ক্রিয়াকলাপ অনেকটা এককেন্দ্রিক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশন গঠন করিবার ভার রাজ্য সরকারগুলির উপর আরোপিত হইয়াছে।

Exercise

1. Give an account of the qualifications of a voter in India. How are the members of the Union Legislature and the State Legislature elected? [নির্বাচকের যোগ্যতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ কিরূপে নির্বাচিত হন?] [৩৪০-৪২ ; ৩৪৪-৪৭ পৃষ্ঠা]

2. Write a short note on Election Commission. (C. U. B.A. 1966) [নির্বাচন-কমিশনের উপর টীকা লিখ।] [৩৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা]

3. Do you think that universal adult suffrage in India has been a failure? Give your answer in the light of the experiences of the last four general elections.

[ভারতে সার্বিক ভোটাধিকার নীতি কি ব্যর্থ হইয়াছে? গত ৪টি সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা কর।] [৩৪২-৪৪ পৃষ্ঠা]

4. Indicate the nature of franchise in India. Do you think that the existing system is suitable to Indian conditions? (C.U. B.A. 1967)

[ভারতে ভোটাধিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। প্রচলিত নীতি কি ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে)। [৩৪২-৪৪ পৃষ্ঠা]

5. "Adult franchise in India is a failure." Discuss. (C. U. P. II 1966)

("ভারতে সার্বিক ভোটাধিকার নীতি ব্যর্থ হইয়াছে।" আলোচনা কর।) [৩৪২-৪৪পৃষ্ঠা]

6. Examine the case for and against the grant of universal adult suffrage in India and state your own view.

[ভারতে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া তোমার মতামত দাও।] (C. U. B. A. 1969)

সংকেত : [৩৪২-৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রকৃত্যক
(Public Services)

রাষ্ট্রকৃত্যকের গুরুত্ব—সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিবার নিয়ম—সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা—সরকারী কর্মচারীদের কাজ—সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক—ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন—রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

বর্তমানকালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রকৃত্যকের (Public Services) উপরই বর্তমান কালের যে কোন রাষ্ট্রের শাসন-সংগঠন ভিত্তিশীল। লাওয়েলের (Lowell) "Government of England" গ্রন্থে রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন এত জটিল হইয়াছে যে উপযুক্ত সেক্রেটারীদের সাহায্য ছাড়া কোন দেশের সরকারের পক্ষে অথবা প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষে শাসন কাজ চালান সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরেও সরকারের কাজ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রিসভার পক্ষে এখন আর সচিবদের (Secretaries) সাহায্য ছাড়া কাজ চালান সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় হয়ত এমন একজন ব্যক্তি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অথবা অর্থমন্ত্রী হইলেন যিনি চিকিৎসা-বিদ্যা অথবা সরকারের আয়-ব্যয় নীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নহেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে কোন অসুবিধা হয় না, যেহেতু তিনি উপযুক্ত সচিবদের সাহায্যেই তাঁহার দপ্তরের কাজ নির্বাহ করিয়া থাকেন। Finer-এর ভাষায় "In a Parliamentary democracy the minister must of necessity be a paramount amateur, and the civil servant a permanent expert." যাঁহারা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তাঁহারা যে নিজ নিজ দপ্তরের কাজেও অভিজ্ঞ হইবেন এইরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। এই ফাঁকটুকু পূরণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে সরকারী কর্মচারীদের। দেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনার সহিত মন্ত্রিদের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার এবং দেশের সমস্যাগুলির একটি সঠিক চিত্র সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিবার মুখ্য দায়িত্ব হইতেছে সরকারী কর্মচারীদের; আবার রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমগ্র দেশের শাসন-পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজ সরকারী কর্মচারীদের সম্পন্ন করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকবর্গের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। শাসন-

রাষ্ট্রকৃত্যকের গুরুত্ব

কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্য সেই বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নতা থাকা প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীদের তাই এই সম্পর্কেও গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। Ogg-এর ভাষায় "They translate law into action from one end of the country to the other and bring the rank and file of the citizenry into daily contact with the Government.'

সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিবার নিয়ম (Method of Employing Public Servants) : সরকারী কর্মচারী সরকারের কাজ পরিচালনায় সাহায্য করে। এই কর্মচারীবৃন্দ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুযায়ী মন্ত্রীদের নির্দেশে সরকারের কাজ করিয়া থাকেন।

আধুনিককালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (Competitive examinations) মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদের মধ্য হইতে আবার তাহাদের পরীক্ষার ফল, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণ অনুযায়ী উচ্চতর সরকারী কর্মচারীর জন্য লোক বাছাই করা হয়। সেইজন্য আধুনিক কালে ভাল ভাল ছাত্ররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী পাইবার সুযোগ লাভ করে। আধুনিককালে এই বাছাইয়ের মারফৎ কর্মচারী নিয়োগ করা হয় বলিয়া সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়িতেছে এবং শাসনব্যবস্থারও উৎকর্ষ বাড়িতেছে। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইলেও সরকারী কর্মচারীদের কাজ সর্বদাই বজায় থাকে। যে সংস্থার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাকে পাব্লিক সার্ভিস কমিশন বলে।

সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা (Qualifications of Public Servants)—(১) সরকারী কর্মচারীদের সুশিক্ষিত হইতে হইবে। (২) সমুদয় রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শ হইতে তাঁহাদের মুক্ত থাকিতে হইবে। (৩) তাঁহারা আইনসভার সদস্য হইতে পারিবেন না। আইনসভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হইলে তাঁহাদের সরকারী কাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে। (৪) সরকারী কাজ করিবার সময় তাঁহাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন সরকারী নীতিকে কার্যকর করিতে হইবে। তবে সরকারী নীতির জন্য তাঁহাদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না,—সেই দায়িত্ব থাকিবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার। (৫) সরকারী কর্মচারী সরকারী কাজের জন্য যে মাহিনা পান তাহা ছাড়া অন্য কোনভাবে আয়ের চেষ্টা করিতে পারিবেন না। (৬) সরকারী কর্মচারীকে সবরকমের দুর্নীতি ও অসাধুতা হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। (৭) সরকারী কাজকর্মের যাবতীয় তথ্য তাঁহাদের গোপন

সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা

রাখিতে হইবে। সরকারী কর্মচারীগণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতনামা থাকিতে হয়।

সরকারী কর্মচারীদের কাজ (Functions of the Public Servants)ঃ সরকারী কর্মচারীদের মুখ্য কাজ হইতেছে দৈনন্দিন শাসনকাজ পরিচালনা করা। এই ব্যাপারে মন্ত্রিদের দায়িত্ব আছে; কিন্তু প্রকৃত করণীয় যাহা কিছু আছে, তাহা সরকারী কর্মচারীদেরই সম্পন্ন করিতে হয়।

দৈনন্দিন শাসনকাজ পরিচালনা করা

শাসন পরিচালনায় সরকারী নীতি নির্ধারণ প্রথম পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীগণই করিয়া থাকেন; পরে ইহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। শাসনতন্ত্র, দেশের প্রচলিত আইন এবং সরকার পক্ষের সাধারণ নীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারী কর্মচারিগণ দৈনন্দিন শাসনকাজ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে দেশের শাসনকাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা বাস্তবে মন্ত্রিদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটি মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবার পর অপর মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা একটি সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালে দেশের শাসনব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখিবার দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীগণই গ্রহণ করেন।

শাসনকাজে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা

শাসনকাজে বিশেষীকরণ (specialisation) করিবার দায়িত্বও সরকারী কর্মচারীদের, এবং তাঁহারা এই দায়িত্ব নির্বাহ করিয়া থাকেন নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে। দেশের শাসনব্যবস্থা প্রতিনিয়ত জটিল আকার ধারণ করিতেছে। এই জটিলতার মধ্যেও সুষ্ঠুভাবে বিভাগীয় দপ্তরগুলির কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। তাহা সম্ভবপর হয় সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে।

শাসনকাজের বিশেষীকরণ করা

সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত সুবিধা (Benefits derived by Public Servants)ঃ সরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের কাজের জন্য ভাল মাহিনা পাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করিলে সরকার হইতে তাঁহারা পেন্সন ও অন্যান্য ভাতা পাইয়া থাকেন। অতি গুরুতর দোষ না করিলে এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে কোন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা যায় না।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজ যতই বাড়িতেছে, সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও তত বাড়িতেছে। এইভাবে তাহাদের কাজকর্মের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক (Public Services in India) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠন করাই ভারতের আদর্শ। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের (Welfare state) সমুদয় নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য রাষ্ট্রকৃত্যককে সুসংগঠিত এবং সুসংহত করা প্রয়োজন। এইজন্য সরকারী কর্মচারীদেরও উপযুক্তভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া দরকার। সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে যে সকল বিধান ভারতীয় শাসনতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে সেইগুলি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উপর যথেষ্ট পরিমাণে ভিত্তিশীল। ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক দুইভাগে বিভক্ত যথা, কেন্দ্রীয় কৃত্যক (Central services) এবং রাজ্য-কৃত্যক (State services)। *Indian Foreign Service, Indian Railway Service, Indian Audit and Accounts Service, Indian Income-Tax Service, Indian Postal Service* প্রভৃতি হইতেছে কেন্দ্রীয় কৃত্যক। যদিও রাষ্ট্রকৃত্যককে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তবুও কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির শাসন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে সর্বভারতীয় কৃত্যকের (All India Services) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। *Indian Administrative Service* এবং *Indian Police Service* শাসনতন্ত্রে সর্বভারতীয় কৃত্যক হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও সিভিল সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। যে কোন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই এই দুই ধরনের কৃত্যকের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩১২ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে, যদি রাজ্যসভায় উপস্থিত এবং ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ এমন কোন প্রস্তাব সমর্থন করেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের জন্য এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক প্রবর্তন করা দরকার, তবে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যের পক্ষে প্রযোজ্য এরূপ এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যকের সৃষ্টি করিতে পারে। দেশের শাসনব্যবস্থায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে যেখানে সর্বভারতীয় কৃত্যকের প্রয়োজন।*

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে। প্রথমত, সেই সমস্ত কর্মচারী যাহাদের চাকুরীর সর্ত, স্থায়িত্ব ইত্যাদি সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত (যেমন হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, ইলেকসন কমিশনার, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভ্যবৃন্দ ইত্যাদি)। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই সমস্ত কর্মচারী আছেন যাহাদের চাকুরীর মেয়াদ রাষ্ট্রপতি

* ডক্টর আম্বেদকরের ভাষায় 'The Constitution provides that without depriving the states of their rights to form their own civil services there shall be an all-India service recruited on all-India basis common qualifications, with uniform scale of pay and members of which alone can be appointed to the strategic posts throughout the union."

কিংবা রাজ্যপালের খুশীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, ইহার অর্থ এই নয় যে, যে কোন সময়েই তাহাদের চাকুরি চলিয়া যাইতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতিতে ছাড়া অপসারণ করা চলে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মচীরগণকেও যথেচ্ছভাবে অপসারণ করা যায় না। যে কর্তৃপক্ষ সরকারী কর্মচারীকে নিয়োগ করেন, তাহার নিম্নপদস্থ কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরকারী কর্মচারী পদচ্যুত হইতে পারেন না (সংবিধানের ৩১১(১) নং ধারা)। তাহা ছাড়া, যে সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হইবে অথবা যাহার পদমর্যাদা হ্রাস করা হইবে, তাহাকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে ইহার বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ (reasonable opportunity) দিতে হইবে। কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে প্রথম পর্যায়ে ইহা লইয়া অনুসন্ধান (enquiry) করা হইবে; সেই সময়ে সরকারী কর্মচারী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইয়া থাকেন। অনুসন্ধান শেষ হইয়া যাইবার পর অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুপারিশ প্রদান করেন এবং সরকার যদি সেই পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াসী হন, তবে সরকারী কর্মচারীকে সেই শাস্তির বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হইবে।[১]

সরকারী কর্মচারীদের অপসারণের ব্যবস্থা এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা

অবশ্য ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি পাইলে কোন কর্মচারীকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা যায়। তবে যদি সরকার মনে করেন যে জনস্বার্থের খাতিরে অথবা দেশের নিরাপত্তার খাতিরে সরকারী কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, তবে সেই ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীগণ শাস্তির বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন না। এইরূপ সুযোগ দেওয়া যায় কি না সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ; আদালতের এই বিষয়ে প্রশ্ন করার কোন এক্তিয়ার নাই।[২] আমরা এই ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলিতে পারি যে সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের দ্বারা পদচ্যুত করাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ মন্ত্রিদের হাতে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু, এই ধরণের পদচ্যুতি ঘটাইবার পূর্বে একটি বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক করা বাঞ্ছনীয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission of India): সরকারী কর্মচারীগণ যাহাতে দক্ষতা ও

১। High Commissioner vs. Lal (1948)
John vs, State of Travankore & Cochin (1955)

২। সংবিধানের ৩১১(৩) নং ধারা।

সততার সহিত কাজ করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাদের স্বার্থসংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই স্বার্থসংরক্ষণ করিতে হইলে তাঁহাদের নিয়োগ ইত্যাদির দায়িত্ব সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের হাতে রাখা কর্তব্য। ভারতের পাবলিক সার্ভিস কমিশন এইরূপ একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে গঠিত ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

কমিশনের গঠন ও সভ্যগণের যোগ্যতা

কমিশনের সদস্য কতজন থাকিবেন বা তাঁহাদের চাকুরীর সর্ত কি হইবে তাহা নিরূপণ করেন রাষ্ট্রপতি। কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের কাজের মেয়াদ ছয় বৎসর। তবে উক্ত ছয় বৎসরের পূর্বেই কোন সদস্যের ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেকের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য-সরকারের অধীনে ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। বাকী অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি বা অনুরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে লওয়া হয়। অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সভাপতি অন্য কোন সরকারী পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। কমিশনের অন্যান্য সভ্যগণ সভাপতির পদে উন্নীত হইতে অথবা রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগ দিতে পারেন, অন্য কোন সরকারী পদ গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি অথবা সদস্যগণ যদি কমিশনের সদস্য থাকাকালে অন্য কোন বেতনভুক্ত চাকুরী গ্রহণ করেন, অথবা

সদস্যগণের অপসারণ পদ্ধতি

যদি কেহ দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন, অথবা যদি মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্যহেতু কেহ সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকার অনুপযুক্ত বিবেচিত হন, অথবা যদি সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরিত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ অনুসন্ধানের পর উহা সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সমর্থিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি সেই সদস্যকে পদচ্যুত বা অপসারিত করিতে পারেন।

সদস্যগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাঁহাদের বেতন ইত্যাদি লইয়া সংসদের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। ইহা সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (charged on the Consolidated Fund of India)। আবার

সদস্যেগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ব্যবস্থা

তাঁহাদের নিয়োগের পর স্বার্থের হানি করিয়া তাঁহাদের পদের সর্তাদির পরিবর্তন করা যায় না। সদস্যগণের বেতন ইত্যাদি লইয়া সংসদে কোনরূপ ভোটের ব্যবস্থা না রাখা, তাঁহাদের অপসারণ ব্যবস্থা অনায়াসসাধ্য না করা এবং অবসর গ্রহণের পর তাঁহাদিগকে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়া প্রভৃতি স্পষ্টই সূচিত করে যে কমিশন সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে পারিবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ

করার বিষয়টির উপর গণপরিষদে H. V. Kamath জোরালো বক্তৃতা করেন।[১]

কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা

৩২০ নম্বর ধারায় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন কাজ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই কমিশনের প্রথম কাজ হইতেছে (১) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মৌখিকভাবে যাচাই করিয়া এবং অধস্তন কর্মচারীদের উর্ধতন পদে উন্নীত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শূন্য পদগুলিতে উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা এবং (২) কর্মচারী নিয়োগের নিয়োগের নীতি নির্ধারণ, কর্মচারী নিয়োগের পদ্ধতি স্থির করা, সরকারী কর্মচারীদের বদ্‌লি অথবা উন্নত পদে বহাল করা, প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ প্রদান করা। (৩) সরকারী কাজে শৃংখলা বজায় রাখা সংক্রান্ত ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করা, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্মচারীর যদি চাকুরীর সর্ত অনুযায়ী কোন আর্থিক ক্ষতি হয় তাহার প্রতিকার করা অথবা ক্ষতিপূরণ করা, কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারী কাজের আইনভঙ্গজনিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ইহার পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ বজায় রাখা, প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর অর্পিত হয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহিত পরামর্শ করিতে পারে। (৪) শাসনতন্ত্রের ৩২১ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনীয় আইনের সৃষ্টি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব দিতে পারে।

(৫) শুধু শাসনসংক্রান্ত কাজের (Civil Services) ক্ষেত্রেই নহে, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে (Defence Ministry) প্রতিরক্ষা কাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে।

(৬) সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীর সর্ত অথবা বয়ঃক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উঠিলে সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত চাহিয়া পাঠান হয়।

"It is imperative that whichever Government comes into power the permanent services should carry out the policy laid down by the Government for the time being in office.......It is, therefore of the utmost importance that the Public Service Commissions that we contemplate under these Articles should be completely independent of the Government of the day whether at the Centre or in the States." H. V, Kamath.

(৭) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহার পাঠ্যসূচী পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করে।

রাষ্ট্রপতি কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ নির্দেশ দান করিতে পারেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোন কোন চাকুরী সম্পর্কে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ প্রয়োজন হইবে না। তবে ঐ বিষয়ের নিয়ম-কানুনকে পূর্বেই পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করাইয়া পার্লামেন্ট কর্তৃক গ্রহণ করাইতে হয়।

কমিশনের ক্রিয়াকলাপের বিবরণী প্রদান

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে প্রতিবৎসর ইহার ক্রিয়াকলাপের একটি বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতি সেই বিবরণী পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে মন্ত্রিসভার মাধ্যমে উপস্থিত করেন। যদি কোনও ব্যাপারে সরকার ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তবে সরকারকে ইহার কারণ দেখাইয়া একটি লিপি (memorandum) পার্লামেণ্টে দাখিল করিতে হয়।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপকারিতা

গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বজায় রাখার বিরাট উপযোগিতা আছে। প্রথমত, এই কমিশনের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির জন্য প্রকৃতই উপযুক্ত লোকদের নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করিবার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে ইহার মাধ্যমে প্রকৃতই মেধাবী ছাত্রদের সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সুযোগ থাকে। কোনও প্রকার দুর্নীতি অথবা আত্মীয়তোষণের প্রশ্ন ইহাতে উঠে না। ইহার ফলে আমেরিকার ন্যায় Spoils System"-এর দোষ হইতে ভারত অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, কর্মচারীগণও বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য, এবং চাকুরীর সর্ত সরকার ঠিকভাবে প্রতিপালিত করিতেছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষ আছে। তৃতীয়ত, সরকারী কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের ভার এবং তাঁহাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখিবার ভার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর ন্যস্ত হওয়ায় সরকার একটি গুরু দায়িত্বের বোঝা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সর্বশেষে, সরকারের কাজে সুউচ্চ ক্ষেত্রে যাঁহারা নিজেদের মেধা, কর্মপ্রতিভা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সুপ্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন এবং শিক্ষা বিভাগে সুউচ্চ ক্ষেত্রে যাঁহারা নিজেদের যোগ্যতা দেখাইতে পারিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হন বলিয়া

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা সম্ভব হয়।

তবে কমিশনের ভূমিকা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে ইহার কাজ কেবল সুপারিশ করা। উহা গ্রহণ করা অথবা না করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা সরকারের। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিয়াছে যে কমিশনের সহিত পরামর্শ করার অর্থ ইহা নয় যে কমিশনের সুপারিশ মানিতে সরকার বাধ্য। এ বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। তবে এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে অগ্রাহ্য করার কারণ পার্লামেণ্টের সদস্যদের জানাইতে হয়, এবং অন্যায়ভাবে সুপারিশকে অগ্রাহ্য করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত জনমত সুসংগঠিত করা চলে। দ্বিতীয়ত, সরকার কোন কোন নিয়োগ কমিশনের পরামর্শ ছাড়াই কার্যকর করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সরকারের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়ত, কমিশনের রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করার কোন নির্দিষ্ট সময় স্থির করা হয় নাই। সুতরাং কমিশনের রিপোর্ট আইনসভায় বিলম্ব করিয়া পেশ করিয়াও ইহাকে অনেক সময় মূল্যহীন করা হয়। সেইজন্য মনে হয়, এই রকম রিপোর্ট প্রদান করার একটি নির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া সংবিধানে এই মর্মে একটি ধারা লিপিবদ্ধ করা উচিত। সর্বশেষে, বহুক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ সরকার অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং নিয়োগ ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য যে বিষয়ে সুপারিশ চাওয়া হয় সেই ব্যাপারে সুপারিশ যাহাতে সরকার অগ্রাহ্য না করিতে পারে সেইজন্য উক্ত মর্মে সংবিধানে একটি উপযুক্ত ধারাও সন্নিবেশিত হওয়া উচিত।

কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা

রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন (State Public Service Commission): কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সম্পর্ক, রাজ্য সরকারের সঙ্গেও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেই সম্পর্ক। যে নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হন, সেই ভিত্তিতেই রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণও নির্বাচিত হন। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণেরও কাজের মেয়াদ ছয় বৎসর, তবে ৬০ বৎসর বয়স ইতিমধ্যেই হইলে সদস্যকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের নিয়োগ অথবা স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের নিয়োগ অথবা স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেই ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন; কমিশনের অন্ততঃ অর্ধেক সদস্যের পূর্বে সরকারী কাজে দশ

বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করিবার জন্য রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক যাচাই অথবা প্রত্যক্ষভাবে অধস্তন পদ হইতে উর্ধ্বতন পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, চাকুরির সর্তাদি ঠিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গজনিত ব্যবস্থাবলম্বন প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে উপদেশ দেওয়াও রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম কাজ।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে উপযোগিতা আমরা দেখিয়াছি রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরও অনুরূপ উপযোগিতা আছে।

Exercise

1. Discuss the qualifications of public servants in India.
[ভারতে সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (৩৫০-৫১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the composition and functions of the Union Public Service Commission of India.
[ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।] (৩৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা)

3. Examine critically the utility of Union Public Service Commission of India.
[ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যকের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (৩৫৩-৫৭ পৃষ্ঠা)

4. What are the functions of Civil Services in India? How are the members of the Civil Service recruited? [C.U. B. A. 1966]
(সরকারী কর্মচারীদের কাজ কি? তাহাদের নিয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।)
(৩৫১ পৃষ্ঠা; ৩৫০ পৃষ্ঠা)

5. Write a note on Public Service Commission. [C.U. B.A. PI 1966]
[রাষ্ট্রকৃত্যকের উপর একটি টীকা লিখ।] (৩৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা)

উনবিংশ অধ্যায়

ভারতের জেলা শাসন
(District Administration in Indin)

ভারতের শাসনব্যবস্থায় জেলা শাসনব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। জেলা শাসকের বিভিন্ন কাজ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান (Separation of Powers) করা হয় নাই। রাজ্যসরকারগুলির শাসন-ব্যবস্থার মূলকেন্দ্র হইতেছে বিভিন্ন জেলার শাসনব্যবস্থা। জেলার শাসন-ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপরেই রাজ্য-শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে।

জেলা শাসক বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (District officer or the District Magistrate) : ভারতের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলার শাসক ভারতীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। এইরূপ উচ্চ পদস্থ কর্মচারিগণকে নিয়োগ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। জেলা শাসকগণের অধিকাংশই ভারতীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসের সদস্য, কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক জেলা শাসক রাজ্য সিভিল সার্ভিস হইতে নিযুক্ত হয়।

এইরূপ সরকারী কর্মচারীবৃন্দের প্রয়োজন আধুনিক গণতন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় নীতি ইত্যাদি নির্ধারণ করেন মন্ত্রিমণ্ডলী ; কিন্তু সেই নীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন এই সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। রাজনীতির সহিত সম্পর্কবিহীন এই সমস্ত কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের স্থায়ী শাসকবৃন্দের অন্যতম ; কেননা রাজনৈতিক নানা কারণে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্তন সাধন হওয়ার ফলে একবার নির্বাচিত হইলেই মন্ত্রিমণ্ডলী স্থায়ী শাসক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন না। সুতরাং রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনয়ন করার জন্য এবং তাহাকে সুশৃংখলাবদ্ধ করিতে সরকারী কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান সম্পর্কে এই সমস্ত সৎ ও উপযুক্ত কর্মচারী-গণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী নূতন নূতন ভাব ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেইজন্য জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অনেক প্রগতিশীল নীতি প্রতিষ্ঠা করিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু এই সব সরকারী কর্মচারীগণ কিঞ্চিৎ পরিমাণ দৈনন্দিন 'রুটিন' কার্যের সীমাবদ্ধতার দ্বারা আবদ্ধ। কিন্তু এই ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে জেলা অথবা রাজ্যের শাসনব্যাপারে সরকারী কর্মচারিবৃন্দ পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া আছেন।

জেলার শাসকের উপর জেলার রাজস্ব আদায়ের ভারও ন্যস্ত থাকে বলিয়া তাঁহাকে জেলার কালেক্টরও বলা হয়। জেলা শাসক জেলার সমুদয় কাজের প্রধান নিয়ন্ত্রক। খাসমহল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান এবং জেলার কোষাগার পরিচলনার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত। তিনি সমগ্র জেলার শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য মুখ্যত দায়ী। জেলার পুলিশের কাজও তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। অবশ্য জেলার পুলিশবাহিনীর পূর্ণ সহায়তা ইহাতে তিনি লাভ করিয়া থাকেন। জেলা শাসকের অন্যান্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে, তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিদর্শন করেন এবং জেলখানা পরিদর্শন করেন। ইহা ছাড়া, সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কতটা কার্যকরী হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধান করা, সিভিল সার্জন, নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার (Executive Engineer), জেলা স্কুল প্রভৃতির কাজকর্মের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হইতেছে কিনা তাহা দেখাশোনা করাও জেলা শাসকের কাজ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে কর্মচারীদের অযোগ্যতার দরুণ অকার্যকর বা দুর্নীতিগ্রস্ত না হইয়া পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও তাঁহার অন্যতম কাজ। জেলার অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক অবস্থা যাহাতে বিপর্যস্ত না হইয়া পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব জেলা শাসকের। যদি কোন বৎসর অজন্মা, অনাবৃষ্টি অথবা বন্যা প্রভৃতির ফলে জেলার অধিবাসিগণ দুর্দশায় পড়ে, তবে তাহাদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য জেলা শাসক সরকারের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। শুধু তাহাই নহে, জেলার অধিবাসিগণের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতির জন্যও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কিছু কিছু কাজ করিতে হয়। এজন্য তিনি অনেক সময় বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সরকারের বিভিন্ন নীতির তাৎপর্য জেলার জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব যেমন তাঁহার, ঠিক তেমনি জেলার জনসাধারণের প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করাও তাঁহার কর্তব্য। ইহা হইতে অনুধাবন করা যায় যে জেলার শাসনকাজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে জেলার শাসককে। সরকারের সহিত জনসাধারণের যোগসূত্রের মাধ্যম হিসাবেও জেলার শাসককে অনেকে অভিহিত করেন।

জেলা শাসকের উপর কিছু বিচার-বিভাগীয় কাজও ন্যস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিচার-বিভাগীর এবং শাসন পরিচালনাগত সরকারের এই দুইটি বিভাগের ক্ষমতার সংমিশ্রণ জেলা শাসকের মধ্যে দেখা যায়। জেলার শাসনকর্তা হিসাবে তিনি কোন ফৌজদারী মামলার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, আবার বিচারক হিসাবে তাহার বিচারও করিতে পারেন। ফৌজদারী ব্যতীত অন্যান্য ধরণের অপরাধীকেও জেলা শাসক গ্রেপ্তার করিতে পারেন এবং নিজে তাহার বিচার না করিলেও তাহার বিচারের

ব্যবস্থা করেন। জেলা শাসক নিম্ন ফৌজদারী আদালতগুলি পরিদর্শন করেন; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে যে সমস্ত মামলার আপীল তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হয় সেগুলির শুনানী জেলা শাসকের এজলাসে হইয়া থাকে।

জেলা শাসকের হস্তে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় কিরূপ গুরুত্বপুর্ণ একটি পদের তিনি অধিকারী। জেলার শাসনব্যাপারে যে সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা জেলার শাসনব্যবস্থার পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। তবে একটি ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতার সমালোচনা করা হয়। এ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে যে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এরূপ একটি শাসনবিভাগের কর্ণধারের হস্তে রাখা সমীচীন কিনা। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of State Policy) বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অথচ ভারতের ক্ষেত্রে ইহা কার্যকর করা হয় নাই। জেলা শাসক শাসনবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ; আবার জেলার ফৌজদারী মামলাও তিনি পরিচালনা করেন। এইরূপ একই হস্তে বিচার ও শাসনক্ষমতার সংমিশ্রণ জনসাধারণের স্বাধীনতার ঘোর পরিপন্থী। সরকারের স্বেচ্ছাচারেরও সম্ভাবনা ইহাতে থাকে প্রচুর। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতার বিভাগ করণ না করিয়া বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে প্রয়োজন বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।[১] এমন কি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তেও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের স্বপক্ষে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তবে এইরূপ একজন উচ্চপদস্থ শাসন বিভাগের স্থায়ী কর্তৃপক্ষের হস্তে বিচার ও শাসনভার অর্পণ করার সমর্থন অনেকেই করেন না। আবার বিচার বিভাগীয় কাজেও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করা যায় না। ন্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিচারবিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসন বিভাগ এবং আইন সভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু পরিমাণ স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে বিচারবিভাগ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারে,—জনসাধারণের স্বাধীনতাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা খুব কম থাকে। জেলার শাসন ব্যাপারে এই ত্রুটি দূর করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সুরু হইয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির সহিত

১। "The Government of each unit is a unit, engaged in expressing and executing the will of the State, and a certain degree of harmony among the various organs, no matter how extensively differentiated, is essential,"—Gettel.

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিচার-বিভাগ ও শাসনবিভাগকে স্বতন্ত্রীকরণ করার কাজ কোন কোন রাজ্যে ইতিমধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, সমস্ত রাজ্যই বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও শাসন বা আইনের কর্তৃত্বমুক্ত করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রণেতৃবর্গের নির্দেশকে কার্যে রূপায়িত করিতে আর বিলম্ব করিবে না।

Exercise

1. Discuss the position and powers of the District Magistrate. (জেলা-শাসকের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (৩৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)
2. How is the administration of a District carried on? (জেলার শাসন কিরূপে পরিচালিত হয়?) (৩৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)

বিংশ অধ্যায়

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা
(Local Self Government in India)

[স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা—ইহার সংগঠন—গ্রাম পঞ্চায়েৎ—গ্রাম সভা, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, ন্যায় পঞ্চায়েৎ—ইউনিয়ন বোর্ড—জেলা বোর্ড—জেলা পরিষদ—মিউনিসিপ্যালিটি—ইহার কার্য—কলিকাতা করপোরেশন—ইহার গঠন, কার্য, আয়-ব্যয়—অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান—স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার দোষগুণ।]

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self Government in India) : জনসাধারণই মুখ্যত গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু শাসনকার্য শৃংখলাবদ্ধভাবে পরিচালিত হইবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় যোগ্যতা এবং নাগরিক চেতনার। এই নাগরিক চেতনা এবং যোগ্যতা বাড়াইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা। এই স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলগুলির জনসাধারণ নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করিয়া লইতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনগুলির সহিত জড়িত থাকার ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রের কার্যে অংশগ্রহণ করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে। সেইজন্য গণতন্ত্রে নাগরিকতার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে অভিহিত করা যায় ("The educative value of democracy depends very largely upon the nature and spirit of its local institutions")। জনগণ নিজেরাই নিজেদের সমস্যাবলী সম্পর্কে ভাবিতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রসর হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারে। একটি অঞ্চলের অর্থ দ্বারা অপর অঞ্চলের ঘাটতি দূর করার প্রয়োজন হয় না। ইহা ছাড়া, নিজেরাই নিজেদের কার্য করে বলিয়া সাধারণতঃ স্থানীয় শাসনকার্যের সহিত যুক্ত নাগরিকগণ ন্যায় ও নীতিবিগর্হিত কাজে লিপ্ত থাকে না। এই ব্যবস্থার আরও একটি সুবিধা হইল এই যে, বড় রাষ্ট্রে কেন্দ্রে অবস্থিত সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক সমস্যাবলীর সহিত পরিচিতির সুযোগের প্রচুর অভাব থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কর্তৃত্বভার স্থানীয় জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে বলিয়া এই সমস্ত ব্যাপারে কেন্দ্রের চিন্তার কোন প্রয়োজন থাকে না। ইহা ছাড়া, স্থানীয় জনসাধারণের উপর এইরূপ শাসনকার্যের ভার ন্যস্ত থাকায় তাহাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও স্বনির্ভরশীলতাবোধ জাগ্রত হয়। সুতরাং এই সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এইরূপ শাসনব্যবস্থা সর্বদেশে গৃহীত হওয়ার কারণও সেইজন্য সহজে বুঝিতে পারা যায়।

স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের নিজস্ব ধরণের যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে অপসারিত হইতে থাকে এবং তাহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্য ধরণের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। ১৬৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ পৌর প্রতিষ্ঠান এইরূপ স্বায়ত্তশাসন-মূলক ব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি শহরে ১৭২৬ সালের একটি আইনের দ্বারা পৌর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি আইন অনুমোদিত হওয়ার পর ভারতে প্রায় প্রত্যেকটি সহরে পৌর সংঘের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয় ও বিংশ শতাব্দীর ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ডের শাসন সম্বন্ধীয় সংস্কার ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভারতের প্রায় সর্বত্র স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা উন্নত ও গণতন্ত্রের আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগঠন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুই প্রকারের হইতে পারে; যথা গ্রাম্য ও পৌর। পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বা স্থানীয় বোর্ড, জেলা বোর্ড, জেলা পরিষদ ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর স্বায়ত্ত শাসন। পঞ্চায়েৎ এবং ইউনিয়ন বোর্ড কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হইতে পারে; আবার বড় গ্রাম হইলে একটি গ্রামেই পঞ্চায়েৎ এবং ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হইতে পারে। লোক্যাল বা স্থানীয় বোর্ডের এলাকা গঠিত হয় একটি মহকুমার পল্লী অঞ্চল হইয়া। জেলা বোর্ডের এলাকা গঠিত হয় একটি জেলার পল্লী অঞ্চল লইয়া।

গ্রাম ও পৌর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান

পৌর স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখিতে পাই, মিউনিসিপ্যালিটি, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট (Improvement Trust), বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান (Port Trust) এবং বড় বড় শহরে কর্পোরেশনের মধ্যে।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ (Village Panchayets)—গ্রাম পঞ্চায়েৎ সম্পূর্ণ-ভাবে একটি ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পল্লীর উন্নতি ব্যতিরেকে ভারতের উন্নতি সম্ভবপর নয়। সেইজন্য পল্লীর পঞ্চায়েৎ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া উভয়ের উপরেই উভয়কে নির্ভরশীল করিয়া গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এক সর্বাত্মক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছ। আশা করা যায় যে এইরূপ পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলে পল্লীর অনগ্রসরতা দূর হইবে এবং একটি আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। গ্রামপঞ্চায়েৎগুলির প্রধান কাজ হইতেছে গ্রামের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা, গ্রামের জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা, গ্রামবাসীদের মধ্যে ছোট ছোট কলহ-বিবাদের মীমাংসা করা ইত্যাদি। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন করিবার বিধান আছে। ভারতের সংবিধানের নির্দেশ-

মূলক নীতিতেও[১] এই গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। আশা করা যায় যে এইরূপে গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লীর অনগ্রসরতা দূর হইবে এবং একটি আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ প্রথা—১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ আইন পাশ করা হয়। ১৯৫৭ সাল হইতে এই আইন কার্যকর হয়। এই আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির বিলোপ সাধন করিয়া গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠন করিবে। এই আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েৎ গঠনের জন্য প্রথমে এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া গ্রামসভা গঠিত হইবে। গ্রাম সভার সদস্য হইবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচকমণ্ডলী লইয়া। গ্রাম সভা একবার ষাণ্মাষিক এবং একবার বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান করিবে।

গ্রাম-সভা

গ্রাম-সভার বিভিন্ন কাজ নির্বাহ করিবার ভার অর্পিত হইবে গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর। গ্রাম-সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে অনধিক ১৫ জন এবং কমপক্ষে ৯ জন সদস্য নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠনের ভার অর্পণ করিবে। ইহা ছাড়া, রাজ্যসরকারও কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারে। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের পঞ্চায়েতের ভোটাধিকার থাকিবে না, এবং তাঁহারা অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

গ্রাম-পঞ্চায়েৎ

গ্রাম-পঞ্চায়েতের কার্যকাল হইবে ৪ বৎসর। পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কার্যকালের মেয়াদও হইবে ৪ বৎসর। তাঁহারা যে শুধু পঞ্চায়েতের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন তাহাই নহে, পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজগুলি ঠিকভাবে চলিতেছে কি না সেদিকেও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কাজগুলি হইতেছে, আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মহামারী প্রতিরোধ, পানীয় জল সরবরাহ, সাধারণের ব্যবহার্য পুকুর, পশুচারণ-ভূমি, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সংরক্ষণ এবং গ্রামবাসীদের সংক্রামক ব্যাধি অথবা মহামারী হইতে রক্ষা করা। গ্রামোন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েৎগুলি সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সহিত একযোগে কাজ করিবে। ইহা ছাড়াও, পঞ্চায়েৎগুলির অন্যান্য কাজ আছে। প্রাথমিক, সামাজিক, ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পাঠাগার স্থাপন, নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রসূতিসদন স্থাপন, করা, ফেরিঘাটের দেখাশোনা করা,

পঞ্চায়েতের কাজ

১। সংবিধানের ৪০ নং ধারা :—

"The state shall take steps to organise village panchayets and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government."

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার এবং গ্রামীণ শিল্পগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা, পতিত জমির উদ্ধারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদিও পঞ্চায়েতের কাজের অন্যতম।

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ

পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামসভা লইয়া এক একটি অঞ্চল-পঞ্চায়েৎ স্থাপিত হয়। গ্রামসভার ২৫০ জন সভ্যপিছু একজন করিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভ্য নির্বাচিত হইবেন। অঞ্চল-পঞ্চায়েৎগুলির কার্যকাল গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির ন্যায় ৪ বৎসর। এই পঞ্চায়েৎগুলির সভাপতি ও সহসভাপতিগণকে যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান বলা হয়। অঞ্চল-পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ হইল আঞ্চলিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা। ইহা ছাড়াও কর স্থাপন করা এবং ন্যায় পঞ্চায়েৎ গঠন করাও অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজ।

কোন কারবার কিংবা পেশা ইত্যাদির উপর অঞ্চল-পঞ্চায়েৎ কর আরোপ করে। মামলার মধ্য ন্যায়পঞ্চায়েতের নিকট দেয় অর্থ, রাস্তাঘাটে আলো দেওয়ার জন্য বা জলসরবরাহ ইত্যাদির জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতেও অঞ্চল-পঞ্চায়েৎ আয় করিয়া থাকে। আবার ইহারা রাজ্যসরকারের নিকট হইতেও বাৎসরিক অনুদান লাভ করিয়া থাকে।

ন্যায় পঞ্চায়েৎ

গ্রাম সভার সদস্যের মধ্য হইতে ৫ জন সদস্য লইয়া প্রত্যেকটি ন্যায়-পঞ্চায়েৎ অঞ্চল-পঞ্চায়েৎ কর্তৃক গঠিত হয়। ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজ হইতেছে বিচারবিভাগীয়। অর্থাৎ, ইহা ছোটখাটো বিচারের ব্যবস্থা করিবে। গ্রাম-সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকগণ নির্বাচিত হইবেন। ন্যায়পঞ্চায়েতের সভ্য-সংখ্যা ৫ জন। সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন সভাপতিত্ব করার জন্য। তঁহাকে প্রধান বিচারক বলা হয়। এইরূপ ন্যায়-পঞ্চায়েৎ দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় প্রকার ছোটখাটো মামলার বিচার করে। এই ন্যায়-পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে না। তবে বিচার ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইলে দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে জেলাশাসক কিংবা মহকুমা শাসক ন্যায়-পঞ্চায়েতের আদেশ বাতিল করিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে পুনর্বিচারের জন্য আদেশ দান করিতে পারেন।

প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস

ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে জনগণের উপর কর ধার্য করিয়া পঞ্চায়েৎগুলির ব্যয় নির্বাহ করিতে হয় এবং এইজন্য অর্থসংগ্রহের ভার থাকে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের উপর। এই টাকা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ভাণ্ডার নামে একটি তহবিলে জমা হয় এবং ইহা হইতে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ এবং ন্যায়-পঞ্চায়েতের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। এই অর্থ ছাড়াও, গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত দান হইতে

পঞ্চায়েৎগুলি কিছু অর্থ পাইতে পারে। সরকার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে টাকা খরচ করে, তাহা হইতেও পঞ্চায়েৎগুলি পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়, কারণ পঞ্চায়েতের অনেক কাজ বিমিশ্র সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির (Composite Community Development Projects) মারফৎ অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের গ্রামীণ জীবনের উন্নতি করিতে হইলে পঞ্চায়েৎগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। সমবায়ের মূলনীতিগুলি পঞ্চায়েতের মারফৎ কার্যকর হইতে পারে। তাহা ছাড়া, পঞ্চায়েতের বৈঠকে মিলিত হইয়া কৃষকগণ নিজেদের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা যায় কিনা সে বিষয়েও পারস্পরিক মত-বিনিময় করিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচন কার্য সুরু হয় ১৯৫৯ সালে। ইহার কার্য পূর্ণভাবে সুরু হওয়ার কথা ছিল যদিও ১৯৬৪ সালের ১৪ই এপ্রিল হইতে—ঐ কার্য কার্যতঃ সমাপ্ত হয় ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর। ইহার ফলে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পূর্ণ পঞ্চায়েৎ রাজ পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board)—ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া। রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ডে ছয় হইতে নয়জন সদস্য নির্বাচিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটাধিকারী হইতে হইলে ইউনিয়নের অধিবাসীকে (১) প্রাপ্তবয়স্ক হইতে হইবে, (২) বার্ষিক ছয় আনা ইউনিয়ন রেট অথবা চৌকিদারী ট্যাক্স আট আনা দিতে হইবে, অথবা (৩) স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান হইতেছেন সভাপতি; তিনি সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েতের যাহা যাহা কাজ অর্থাৎ গ্রামে শান্তি রক্ষা করা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করা, পথঘাট নির্মাণ করা, ইত্যাদি—ইউনিয়ন বোর্ডও সেই কাজগুলি করিয়া থাকে। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজকর্ম তদারক করিবার জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সার্কেল অফিসার থাকেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস হইতেছে ইউনিয়ন রেট, চৌকিদারী ট্যাক্স, জেলা বোর্ড ও রাজ্যসরকার হইতে প্রাপ্ত সাহায্য, গ্রামের খোঁয়াড়, ফেরিঘাট, এবং মামলার ফী প্রভৃতি মারফৎ আয়, ইত্যাদি। এই আয়ের অধিকাংশ খরচ হইয়া যায় চৌকিদার এবং দফাদারের বেতন দিতে। তাহা ছাড়া, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পথঘাট নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার,

আয়ের উৎস

ব্যয়

*ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ড সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা থাকা উচিত বলিয়া ইহার প্রকৃতি ও কার্যাবলী কিরূপ ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইত্যাদি খাতে শতকরা ২৫ ভাগ আয় খরচ হয়। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পঞ্চায়েৎ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

জেলা বোর্ড (District Board)—জেলা বোর্ডের আয়তন হইতেছে সমগ্র জেলার পল্লী অঞ্চল। জেলা বোর্ডের সদস্যসংখ্যা ৯ হইতে ৩৬ জনের বেশী হয় না; সব সদস্যরাই নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী হইতেছে জেলার অন্তর্গত সব ইউনিয়নের ভোটদাতাগণ। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। জেলাবোর্ডের কার্যকাল ৪ বৎসর।

জেলা বোর্ডগুলির কাজ হইতেছে সমগ্র জেলার শিক্ষাব্যবস্থা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, ইত্যাদির তদারক করা। জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস হইতেছে পথকর, সেতু, খেয়াঘাট, ডাকবাংলা, খোঁয়াড় প্রভৃতি হইতে আয়, এবং সরকারী সাহায্য। ইহা ছাড়া জনসাধারণের নিকট হইতে জেলা বোর্ড ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। হাওড়া জেলা বোর্ড রেল হইতে লাভের অংশ বাবদ কিছু অর্থ লাভ করে। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রণীত আইনের দ্বারা স্থির হয় জেলা বোর্ডের স্থান জেলা পরিষদ অধিকার করিবে। সুতরাং জেলা বোর্ডের বিলোপের ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর সরকারী কর্তৃত্ব (Control of the Government over Local Bodies)—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কার্য পরিচালনার ব্যাপারে বোর্ডগুলি অযোগ্যতা প্রদর্শন করিলে সরকার যে কোন ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড অথবা জেলা বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিতে পারে। জেলা বোর্ডের উপর বিভাগীয় কমিশনার অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে কর্তৃত্ব করিতে পারেন, ইউনিয়ন বোর্ডের উপরেও জেলাবোর্ড অনুরূপ কর্তৃত্ব করিতে পারে। রাজ্যসরকার যেরূপ জেলা বোর্ডের সভাপতি অথবা সদস্যগণকে পদচ্যুত করিতে পারে, জেলা বোর্ডও সেইপ্রকার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিও সদস্যগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভাগীয় কমিশনার এইসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারেন।

পশ্চিম বাংলায় জেলা পরিষদ (Zilla Parishads in West Bengal) : ভারতের অধিকাংশ রাজ্য আমরা তিন পর্যায়ের (Three-tier) প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করি—গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ব্লক পঞ্চায়েৎ এবং জিলা পরিষদ। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু আছে চারি-পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান—গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ। স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার এই সংস্কার সাধন করা হয় বলবন্ত রায় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী।

জেলা বোর্ডের স্থানে জেলা পরিষদ গঠনের ফলে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (democratic decentralisation) নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে এবং জনগণ এইরূপ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া জেলার উন্নয়নমূলক কাজের বিভিন্ন দিকের সহিত পরিচিত হইয়া জেলার উন্নতির জন্য পরিপূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছে। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবাংলার আইনসভা পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিষদ গঠনের জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করে। এইরূপ আইন প্রণয়ন দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের জেলার স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। এই সংস্কারের ফলে জেলার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানটিকে জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যাহাতে হয় সেইসব কাজের সহিত সংযুক্তি সাধন করা হইয়াছে এবং এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে জনগণ আরও সক্রিয়ভাবে স্বায়ত্তশাসনমূলক কাজের সহিত নিজেদের যুক্ত করিয়া স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে।

জেলা পরিষদের গঠনে জেলার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার

নূতন আইনের দ্বারা স্থির হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করিয়া জেলা পরিষদ গঠন করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণা একটি বিজ্ঞপ্তির মারফৎ করা হয় এবং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এইরূপ জেলা পরিষদ একটি নির্দিষ্ট তারিখ হইতে প্রবর্তিত হয়। নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া জেলা পরিষদ গঠিত হয়—(১) পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ, (২) পদাধিকার বলে জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি, (৩) রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত জেলার অন্তর্গত কোন মিউনিসিপ্যালিটির একজন চেয়ারম্যান অথবা কর্পোরেশনের একজন মেয়র, (৪) প্রত্যেক মহকুমার অধ্যক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন করিয়া অধ্যক্ষ, (৫) মন্ত্রিগণ ছাড়া জেলা হইতে লোকসভা ও রাজ্যের বিধান সভায় নির্বাচিত সভ্যগণ, (৬) জেলায় বসবাসকারী মন্ত্রী ছাড়া পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভা কিংবা রাজ্যের বিধান পরিষদের সভ্যবৃন্দ। (৭) ইহা ছাড়া রাজ্যসরকার যদি দেখেন যে জেলা পরিষদের সদস্যপদে কোন স্ত্রীলোক নিযুক্ত হন নাই, তাহা হইলে তাঁহারা দুইজন স্ত্রীলোককে জেলা পরিষদে নিযুক্ত করিতে পারেন। জেলা পরিষদে উপরোক্ত সদস্য ছাড়া কিছু সংখ্যক সংযুক্ত সদস্যও (associated member) থাকিবেন। ইঁহারা হইলেন জেলার অন্তর্ভুক্ত মহকুমার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পঞ্চায়েৎ অফিসার (The District Panchayat Officer)।

জেলা পরিষদের গঠন

জেলা পরিষদে ৪ বৎসরের জন্য একজন সভাপতি থাকেন এবং একজন সহ-সভাপতি। এইরূপ সভাপতি ও সহ-সভাপতি উপরে ১, ৪, এবং ৬ নম্বরে বর্ণিত সদস্যগণের মধ্য হইতে জেলা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। বিশেষ কোন কারণে রাজ্যসরকার ৪ বৎসরের পূর্বেই ইহাদের পদচ্যুত করিতে

পারেন। ইহারা ছাড়া পরিষদের কার্য সম্পাদন করিবার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কার্য-নির্বাহক বা Executive Officer থাকেন। জেলা-পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মসচিব (secretary) এবং অন্যান্য কর্মচারী থাকেন। কার্যনির্বাহক এই সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে জেলা পরিষদের কাজকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করানোর জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বিভাগে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হইবে।

জেলাপরিষদের সভাপতি, সহসভাপতি ও অন্যান্য কর্মচারী এবং কমিটি নিয়োগ

জেলা-পরিষদের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হইল জেলার সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রবর্তন করা। উন্নয়নমূলক কাজগুলির অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত বিষয় আছে সেইগুলি হইল কৃষি, সেচ, সমবায়, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি। রাজ্যসরকারও আবার কখনও কখনও কোন বিশেষ পরিকল্পনা অথবা বিশেষ কাজ সম্পাদন করার ভার এইরূপ পরিষদের উপর ন্যস্ত করিতে পারে। পরিষদকে ঐরূপ অর্পিত কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। আবার জেলার উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দান করার ক্ষমতা এই জেলা পরিষদ ভোগ করে। স্কুল, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক পরিষদ প্রভৃতিকে অর্থসাহায্য করার ক্ষমতাও জেলা-পরিষদের আছে। গ্রামীণ হাটবাজারকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, আঞ্চলিক পরিষদের হিসাব পরীক্ষা ও মঞ্জুর করা, আঞ্চলিক পরিষদের পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও জেলা পরিষদের কার্যাবলীরঅন্তর্গত।

জেলা পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

জেলা-পরিষদ স্বীয় কার্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থলাভ করিয়া থাকে—কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার এই পরিষদকে অর্থসাহায্য করে কিংবা ঋণ প্রদান করে। আঞ্চলিক পরিষদগুলি হইতে জেলা পরিষদ অর্থলাভ করিতে পারে। আবার জেলা-পরিষদ সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, যানবাহনাদি, রেজেষ্ট্রী করার জন্য দেয় ফী, ইহার উপর ধার্য কর, খেয়ার উপর শুল্ক, রাস্তাঘাট আলোকিত করা ও জল সরবরাহের দরুণ ধার্য কর প্রভৃতির দরুণও জেলা পরিষদ অর্থলাভ করিয়া থাকে।

আয়ের উৎস

১৯৬৫ সালের ৩০শে জুন পশ্চিমবাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে জেলা-পরিষদগুলির সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণের একটি বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে পঞ্চায়েতী রাজকে একটি পরিপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উন্নীত করিয়া ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে রূপায়িত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য জেলা-পরিষদের অর্থের প্রয়োজন যে আরও বেশী, তাহাও অনুভূত হয়। এই পরিষদকে যথাযথভাবে কাজ করার

সাম্প্রতিক ব্যবস্থা

জন্য রাজ্যসরকার মোট ভূমি রাজস্বের শতকরা ১৫ ভাগ এইরূপ পরিষদকে প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। জেলা-পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদের সহিত এই অতিরিক্ত অর্থ ভোগ করিবে। কি অনুপাতে জেলা-পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে এই অর্থ বণ্টিত হইবে তাহা রাজ্যসরকার নির্ধারণ করিবেন।

প্রত্যেকটি জেলা আবার বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত হইয়াছে। নির্দিষ্ট অঞ্চল লইয়া গঠিত প্রত্যেকটি ব্লকের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে। আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয় নিম্নলিখিত সভ্যবৃন্দ লইয়া, (১) প্রত্যেক অঞ্চল-পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকার অধ্যক্ষগণ কর্তৃক অধ্যক্ষদের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সভ্য, (২) প্রত্যেক অঞ্চল-পঞ্চায়েতের প্রধানগণ, (৩) ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে সভ্য থাকিবেন (অবশ্য যতদিন পর্যন্ত এইরূপ বোর্ডের বিলোপ না হয়), (৪) ব্লকের এলাকা হইতে লোকসভা এবং রাজ্য-বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যগণ এবং ব্লকের এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভার কিংবা রাজ্যবিধানপরিষদের সদস্যগণ (অবশ্য মন্ত্রিগণ এই পরিষদের সভ্য হইতে পারেন না), (৫) অনুন্নত শ্রেণীর দুইজন প্রতিনিধি, (৬) দুইজন স্ত্রীলোক এবং সমাজসেবা ও গ্রাম-উন্নয়নমূলক কার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি। সংযুক্ত সদস্য হিসাবে অবশ্য ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার আঞ্চলিক পরিষদের সহিত যুক্ত থাকিবেন। তিনি পদাধিকারবলে এইরূপ পরিষদের প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। আঞ্চলিক পরিষদের একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি থাকেন। তাঁহাদের কার্যকাল ৪ বৎসর। আঞ্চলিক পরিষদের কার্যসমূহকে রূপদান করে পরিষদের স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ।

আঞ্চলিক পরিষদ ও ইহার গঠন

আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হইল:— তাহাদের এলাকার অন্তর্গত সমুদয় অঞ্চল ও অঞ্চলবাসীর সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা। এই উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ কৃষি, কুটিরশিল্প, জনস্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, জলসরবরাহ, সমবায় ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য যথোচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্পিত কার্যও ইহাদের জেলা-পরিষদের ন্যায় সম্পাদন করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে এইরূপ পরিষদকে অর্থব্যয়ও করিতে হয়।

আঞ্চলিক পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

এইরূপ পরিষদ প্রয়োজনীয় অর্থ লাভ করে হাটে-বাজারে লাইসেন্স করার জন্য যে ফী দেওয়া হয় তাহা হইতে, জল সরবরাহ ও রাস্তায় আন্দোলন করার জন্য ধার্য কর হইতে ফেরিঘাটের উপর ধার্য কর ও শুল্ক হইতে, যানবাহন রেজেষ্ট্রী করার দরুণ যে ফী দেওয়া হয় তাহা হইতে এবং যানবাহন ও জন্তু-জানোয়ারের উপর ধার্য শুল্ক হইতে। ইহা ছাড়া, পুর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে জেলা পরিষদ কিছু অর্থ এই পরিষদকে

আয়ের উৎস

সাহায্য দিতে পারে এবং সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি রাজস্বের আদায়ীকৃত অর্থের শতকরা ১৫ ভাগ দেয় অর্থের কিছু পরিমাণ অর্থ এই পরিষদ লাভ করিবে। আঞ্চলিক পরিষদ আবার রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারও আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থসাহায্য কিংবা ঋণ দিয়া সাহায্য করিতে পারে।

জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের গঠন প্রণালী হইতে সহজেই অনুধাবন করা হয় নাই। স্বায়ত্ত শাসনমূলক ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা জনগণকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে উৎসাহিত করার যে মুখ্য লক্ষ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই পরিষদগুলির গঠনের কথা চিন্তা করা হইয়াছিল তাহা বিশেষ কার্যকর হয় নাই বলিয়াই অনেক মহল অভিযোগ করেন। স্থানীয় জনসাধারণের যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এইরূপ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করে পরিষদগুলির গঠনকার্যে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে তাহা বিফল হইবে বলিয়া অনেকে ইহার গঠনকার্যকে সমালোচনা করেন। আবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে জনসাধারণের অর্থের অপচয় হইবে বলিয়াও এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমালোচনা করা হইয়া থাকে। ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতিও ১৯৬৩ সালের প্রণীত আইনটি ফলে গঠিত এইরূপ পরিষদের মারফৎ সম্পূর্ণভাবে সাধিত হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। সর্বশেষে, এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও এত বেশী করা হইয়াছে যে তাহার দ্বারা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। কেননা, রাজ্যসরকারের যদি এইরূপ প্রতীতি হয় যে উক্ত পরিষদগুলি তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে অসমর্থ হইতেছে অথবা উক্ত কার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে তাহা হইলে তাহাদের বাতিল করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে। এইরূপ বাতিল করার আদেশ দুই বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকে এবং সেই সময় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শাসক বা এডমিনিষ্ট্রেটর সংশ্লিষ্ট পরিষদের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করেন। আবার পরিষদগুলির যে কোন প্রস্তাব উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া রাজ্য সরকার বাতিল করিতে পারে। এইভাবে রাজ্য সরকারের এই পরিষদগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এত ব্যাপক ভাবে রাখা হইয়াছে যে উহা পরিষদগুলির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে ব্যাহত করিতে পারে। যে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করার ব্যবস্থা আমাদের দেশে করা হইয়াছে ইহাকে আন্তরিকতার সহিত এবং রাজনীতির উর্ধ্বে উঠিয়া কার্যকর করা গেলে সত্যই হয়ত বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভবপর হইবে। তবে এই কার্য করার সময় সতর্ক পদক্ষেপ ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে এককেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সংশোধন করার প্রথম ধাপ-ই হয় আঞ্চলিক ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থাকে

জেলা পরিষদ ও অঞ্চল পরিষদের সমালোচনা

এইভাবে বিকেন্দ্রীকরণে। তবে বিকেন্দ্রীকরণ কাজে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন না করা হইলে যে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার নীতি ব্যর্থ হইতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।[১]

পৌরসংঘ (Municipality)—আমরা প্রত্যেক শহরে (কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি মহানগর ছাড়া) মিউনিসিপ্যালিটি দেখিতে পাই। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যসংখ্যা কত হইবে, তাহা স্থির করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তবে কোন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার বা সদস্যসংখ্যা ৯ জনের কম এবং ৩০ জনের বেশী হইবে না। কমিশনারগণকে বর্তমানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণ নির্বাচিত করেন। মিউনিসি-

মিউনিসিপ্যালিটির গঠন

প্যালিটির কার্যকালের মেয়াদ থাকে সাধারণতঃ চার বৎসর। তবে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে এই মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়াইতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন সভাপতি (Chairman), একজন উপ-সভাপতি (Vice-chairman), একজন কর্ম-সচিব (Secretary), একজন হেলথ অফিসার (Health Officer), একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন অথবা একাধিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিদর্শক এবং অন্যান্য কর্মচারী থাকে। কমিশনারের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সভাপতিকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। যদি কোন মিউনিসিপ্যালিটি নূতন গঠিত হয়, তবে সরকার অনধিক দুই বৎসরের জন্য কমিশনারদের নিয়োগ করিতে পারেন। তপশীল শ্রেণীভুক্ত জনগণের প্রতিনিধির জন্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শহরের জনস্বাস্থ্য, যানবাহন, যাতায়াত, শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব মিউনিসি-প্যালিটির উপর ন্যস্ত। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য শহর হইতে নিয়মিত ময়লা

মিউনিসিপ্যালিটির কাজ

নিষ্কাশন এবং সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য টীকা, ইন্‌জেক্‌সন প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। তাহা ছাড়া, মিউনিসিপ্যালিটি স্কুল, বাজার, হাসপাতাল, শহরের যানবাহন ব্যবস্থা, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতির পরিচালনা করিয়া থাকে। গৃহ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা এবং বস্তিসমূহের উন্নতি করাও ইহাদের কাজের অন্তর্গত।

১। The Amrita Bazar Patrika—dated 2nd July, 1965.

"We have a bureaucracy with a tradition of centralisation. In such a context a fair degree of decentralisation at the local level seems to be a necessary corrective. But decentralisation involves risks which should be carefully guarded against ; it is an experiment demanding close watch and careful piloting."

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উৎস হইতেছে ইহার এলাকাভুক্ত বাড়ী এবং জমির উপর ধার্য কর, যানবাহনের উপর ধার্য কর, খেয়াঘাট, সেতু নির্মাণ, গৃহপালিত পশুর জন্য মালিকদের লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত অর্থ। ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের নিকট হইতে অনুমতিপত্র বাবদ মিউনিসিপ্যালিটি টাকা আদায় করে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্থ সাহায্য করে এবং মিউনিসিপ্যালিটিও সরকারের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া দেশের ভিতরেই ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উৎস

রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, হাটবাজার, গ্রন্থাগার, যাদুঘর, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শ্মশান ও কবরস্থান সংরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের খাতে মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ ব্যয় হয়।

মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়

ব্যয়ের যে সমস্ত কার্যসূচী দেওয়া হইয়াছে সাধারণতঃ তাহাতেই মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত টাকা খরচ হইয়া যায় বলিয়া কোনরূপ উন্নয়নমূলক কার্য তো দূরের কথা অনেক সময় জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির জন্যও উপযুক্ত খরচ করার মত অর্থ ইহাদের থাকে না। ইহা অত্যন্তই পরিতাপের বিষয় যে রাস্তাঘাট, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি জনগণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি, যে গুলির উন্নতি জাতীয় জনজীবনকে উজ্জীবিত করার প্রথম পদক্ষেপ, সেগুলি আজ প্রায় উপেক্ষিত। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে অধুনা ক্ষুদ্র পৌরসংঘগুলিকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগের সংহতিসাধনের মাধ্যমে সেইগুলিকে স্বনির্ভরশীল করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে।

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান (Calcutta Corporation): ১৮৬৩ সালে মিউনিসিপ্যালিটি শাসনব্যবস্থাকে পৌর সরকারের হাতে অর্পণ করা হইয়াছিল। ইহাই বর্তমান পৌর ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল বলা চলে। তদানীন্তন বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পলের সহায়তায় ১৮৭৬ সালে ৭২ জন সভ্য লইয়া একটি পৌরসংস্থা স্থাপনের আইন পাশ হয়। ইহাদের মধ্যে ৪৮ জন সভ্য নির্বাচিত হইতেন; এই আইনের ফলে কলিকাতা শহরের জন্য প্রতিনিধিমূলক সরকারী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৮৮ সালের সংশোধন দ্বারা কমিশনারগণের সংখ্যা ৭২ হইতে ৭৫ করা হয়। তন্মধ্যে ৫০ জন নির্বাচিত হইতেন, ১৫ জন সরকারের মনোনীত ব্যক্তি থাকিতেন এবং বাকী ১০ জন চেম্বার্স অব কমার্স, পোর্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য বণিক-সংস্থার দ্বারা মনোনীত হইতেন। এই আইন ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রতিনিধিমূলক কর্পোরেশনের শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রণীত আইন ও উহার বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ

"ম্যাকেঞ্জী এ্যাক্ট" প্রণীত হয়। কমিশনারের ক্ষমতা হ্রাস এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হইয়া এই আইনের প্রতিবাদে রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ২৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি পদত্যাগ করেন। ইহার পর প্রণীত হয় ১৯২০ সালের আইন। অবিভক্ত বাংলার স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথের ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনটি প্রণয়ন ব্যাপারে অবদান কম নয়। বস্তুতঃ, সেই সময় হইতেই বলা চলে জনপ্রিয় পৌরসংস্থা হিসাবে কর্পোরেশনের ইতিহাস স্থরু। সেই আইনের দ্বারা ৯০ জন কাউন্সিলর ও ৫ জন অলডারম্যান নির্বাচন, প্রতি বৎসর মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন প্রভৃতি সম্পাদিত হইবে স্থির হয়। পৌরসংস্থার শাসনভার একজন মুখ্য কার্যনির্বাহকের হস্তে সমর্পণ করা হয়; কাউন্সিলারদের মধ্যে ৬৮ জন করদাতাগণের ভোটে নির্বাচিত হইতেন। বাকী সদস্যগণের মধ্যে ১০ জন রাজ্য সরকারের মনোনীত, ৬ জন চেম্বার্স অব কমার্সের মনোনীত, ২ জন পোর্ট কমিশনার্সের মনোনীত এবং ৪ জন বণিক সংস্থার মনোনীত ব্যক্তি হইতেন। এই আইনেই সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকদের কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোটদান ও উহাতে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৩২ সালে এই আইনের সংশোধন করিয়া ২২টি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৮ সালে ১৯২৩ সালের প্রণীত আইনের দ্বারা চালিত কর্পোরেশনকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৫১ সালে নূতন একটি আইন (Calcutta Municipal Act, 1951) রচনা করা হয়। এই আইনের দ্বারা ৭৫ জন কাউন্সিলার ও ৫ জন অলডারম্যান নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে কর্পোরেশনের সভ্য হইবেন স্থির হয়। ১৯৫৩ সালে টালিগঞ্জ অঞ্চল কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় সংযুক্ত হইলে কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৮০তে পরিণত করা হয়। ইহা ছাড়া, ৫ জন অলডারম্যান এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সভাপতি পদাধিকার বলে সদস্য নিযুক্ত হইতেন। করদাতা ২১ বৎসর বয়স্ক হইলে অথবা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভোটার হইতে পারিতেন। সম্প্রতি উক্ত আইনের সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। কাউন্সিলারদের সংখ্যা ৮০ হইতে ১০০ জন করা হয়। গত ১৯৬৫ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে যে নির্বাচন সমাধা হইয়াছে তাহা এই সংশোধনী আইন অনুযায়ী করা হয় এবং এই সর্বপ্রথম সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১০০ জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ইহা ছাড়া, ৫ জন অলডারম্যান ও কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সভাপতিও সদস্যপদে নিযুক্ত হন। অর্থাৎ পৌর প্রতিষ্ঠান মোট ১০৬

কর্পোরেশনের গঠন

জন সদস্য লইয়া গঠিত। তাঁহাদের কার্যকাল ৪ বৎসর। তবে রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে এই কার্যকালের মেয়াদ ১ বৎসর বাড়াইতে পারেন। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে ১ বৎসরের জন্য একজন মেয়র (Mayor) এবং একজন ডেপুটি মেয়র (Deputy Mayor) নির্বাচিত করেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন ; তাঁহার অবর্তমানে ডেপুটি মেয়র সভাপতিত্ব করেন। তাঁহাদের বেতন দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

কর্পোরেশন বা পৌর প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নীতিগুলি নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে চীফ কমিশনারের। তাঁহার নীচে দুইজন ডেপুটি চীফ কমিশনার, একজন চীফ ইঞ্জিনিয়ার, একজন হেলথ্ অফিসার, কর্মসচিব এবং অন্যান্য কর্মচারী আছেন। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সংস্কারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার যে মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হইয়াছে, তদনুযায়ী কাউন্সিলারদের ক্ষমতা অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কমিশনারদের ক্ষমতা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে জনসাধারণের প্রতিনিধি কাউন্সিলারগণের প্রাধান্য যে খুব বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায় যখন গত ১৯৬৮ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারকে কাউন্সিলরগণ দলীয় বিভেদ ভুলিয়া একযোগে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করিয়া কর্পোরেশন হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক চীফ কমিশনার নিযুক্ত হন। কর্পোরেশন অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করে ; কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে কাউন্সিলার ও অলডারম্যানদের কার্যকাল ৪ বৎসর। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে ইহা আরও একবৎসর বাড়াইতে পারেন। বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির জন্য কর্পোরেশন বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগের প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারে। আবার ৪।৫টি ওয়ার্ড লইয়া গঠিত 'বরো' (Borough) বা এলাকার জন্য একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন এলাকায় পৌরকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা।

কর্পোরেশনের কাজ মিউনিসিপ্যালিটির কাজের ন্যায়। কলিকাতার জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ করার জন্য ময়লা জল নিষ্কাশন করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা, নর্দমা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা, রাস্তাঘাটের আবর্জনা দূর করা, ইত্যাদির দায়িত্ব কর্পোরেশন গ্রহণ করে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, কিভাবে গৃহ নির্মাণ হইবে সে বিষয়ে নিয়মকানুন প্রবর্তন করা, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের কাজের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা, পশুহত্যাশালা স্থাপন করা, হাটবাজার রক্ষণাবেক্ষণ

কর্পোরেশনের কাজ

করা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা ও ইহাদের আর্থিক সাহায্য করা, ইত্যাদি বহুবিধ কাজ কর্পোরেশন করিয়া থাকে। কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ যাহাতে না হয়, সেইজন্য কর্পোরেশন টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাজারে যাহাতে পচা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় না হয় সে-দিকেও কর্পোরেশনের লক্ষ্য থাকে। তাহা ছাড়া, সহরের কোন অংশে আগুন ধরিলে তাহা নিভাইবার জন্য দমকলবাহিনী থাকে। শহরের বিভিন্ন স্থানে যে সকল শ্মশান অথবা গোরস্থান আছে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও কর্পোরেশনের। কলিকাতা মহানগরীতে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারেও কর্পোরেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন অনেক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছে। তাহা ছাড়া কর্পোরেশন কর্তৃক একটি বাণিজ্যিক মিউজিয়াম (Commercial Museum) স্থাপিত হইয়াছে।

কর্পোরেশনের আয়

কলিকাতা কর্পোরেশন নিম্নলিখিত উৎস হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রথমত, এই মহানগরীর সমুদয় জমি ও গৃহের বাৎসরিক আয়ের উপর কর্পোরেশন নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করিয়া থাকে। জমি, বাড়ীর মালিক অথবা বাড়ী দখলকারীর নিকট হইতে সমান হারে এই কর আদায় করা হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদের নিজেদের ব্যবসায়ের জন্য কর্পোরেশনের নিকট হইতে সনদ লইতে হয়; ইহা হইতেও কর্পোরেশনের কিছু আয় হয়। তৃতীয়ত, গৃহপালিত পশু এবং বিভিন্ন যানবাহনের মালিকদের উপর কর ধার্য করা হয় এবং ইহা হইতেও কর্পোরেশনের কিছু আয় হয়। মোটরগাড়ীর উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহা আদায় করে রাজ্য সরকার এবং তাহার একটি অংশ কর্পোরেশন পাইয়া থাকে। চতুর্থত, হাটবাজার হইতে এবং কর্পোরেশনের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে কিছু আয় হয়। সর্বশেষে, রাজ্যসরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনের সময় করপোরেশন সাহায্য (Grants) পাইতে পারে এবং রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। সম্প্রতি, কলিকাতা কর্পোরেশন অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাব সরকারের নিকট রাখিয়াছেন —টার্মিনাল কর বৃদ্ধি, অক্ট্রয় পদ্ধতি চালু, রাজ্য সরকারের মোটর ভিইকিল্‌স্ এবং প্রমোদ কর হইতে আরও কিছু অংশ কলিকাতার উন্নয়নের জন্য ব্যয়। ইহা ছাড়াও, থিয়েটার ট্যাক্স প্রবর্তন, গ্যাস কোম্পানী, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও টেলিফোন কোম্পানীর নিকট হইতে ভূগর্ভস্থিত লাইন বসানোর জন্য ভাড়া, পোর্ট কমিশনার ও রেলের সহরে অবস্থিত সম্পত্তির উপর অতিরিক্ত কর ধার্য, কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী দাঁড়করাইয়া রাখার উপর কর, কলিকাতার বাহির হইতে আসা জনগণের উপর টোলকর প্রভৃতি ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কর্পোরেশন কর্তৃক কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট

ট্রাষ্টকে দেয় অর্থের সমপরিমাণ টাকা আদায়ের জন্য শহরের করদাতাদের উপর শতকরা ২ ভাগ অতিরিক্ত কর আরোপ করিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাস হইতে সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি সরকারের পরিবর্তে ১½ বৎসর প্রায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত ছিল। নূতন সরকারের আমলে আশা করা যায় এই দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে ও কর্পোরেশনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির অন্য প্রস্তাবিত বিষয়গুলি বিবেচিত হইবে।

কর্পোরেশনের যে সমস্ত কাজের কথা বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্যই কর্পোরেশনকে মোটা রকমের টাকা খরচ করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতা শহরের জনসাধারণের অতি ভয়াবহ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে যাইয়া অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যয় করার মত অবশিষ্ট অর্থ কর্পোরেশনের হাতে থাকে না। অথচ সমস্যাগুলির সমাধান যেমন আশু কর্তব্য, অন্যান্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ; সেইজন্য আরও অর্থের যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা অনস্বীকার্য। সরকারের এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কর্পোরেশনের আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে ইহার আয়ের বেশ কিছু অংশ অনাদায়ী রহিয়া গিয়াছে। এই অনাদায়ী আয়কে অবিলম্বে আদায় করার ব্যবস্থা করা এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ অনাদায় না থাকে, তাহারও ব্যবস্থা করা এবং সেইমত কর্পোরেশনের শাসনতন্ত্রের সংস্কার করা আশু কর্তব্য।

ব্যয়

অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা শহরে আমরা আরও দুইটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই ; যথা—কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট (Calcutta Improvement Trust), এবং কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট (Calcutta Port Trust)। প্রথমটির কাজ হইতেছে কলিকাতা শহর এবং শহরতলীর বিভিন্ন ধরণের উন্নতি সাধন করা। ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠানটি কর্পোরেশনের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পায়। তাহা ছাড়া, জমি বিক্রয় করিয়া এবং প্রয়োজনের সময় জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারে। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্য বন্দরে আগত বিভিন্ন জাহাজ হইতে অল্প হারে শুল্ক আদায় এবং নিজের মালিকানাধীন গুদামঘর ভাড়া দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। ইহা ছাড়া, সেনানিবাস অঞ্চলে আছে সেনানিবাস সংঘ (Cantonment Boards)।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দোষগুণ (**Merits and Demerits of the Local Bodies**)—স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান গুণ হইতেছে এইগুলি স্থানীয় স্বার্থের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত বলিয়া সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এত সুষ্ঠুভাবে ইহা করা

যাইত না। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা জনগণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন ধরণের কাজে স্থানীয় জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিলে একদিকে যেমন বিভিন্ন কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, অপরদিকে সেই প্রকার এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র সফল হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন-মূলক ব্যবস্থায় তিন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান (Three-tier System) গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আমরা চার পর্যায়ের (Four-tier System) প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করি। প্রথম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, তৃতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ ও চতুর্থ পর্যায়ে জেলা পরিষদ আছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, ব্লক-পঞ্চায়েৎ ও জেলা-পরিষদ দেখা যায়। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনে এইরূপভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকণর করার ব্যবস্থা অভিনন্দন যোগ্য সন্দেহ নাই।

তবে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক গলদও দেখা যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে বিচক্ষণ এবং কর্মকুশল কর্মচারীর অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মও আশাপ্রদ হয় নাই। ইহার মুখ্য কারণ হইতেছে দুইটি, যথা, অর্থের অনটন এবং নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনে জনগণের উদাসীনতা। দেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা আরও উন্নত করিতে হইলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের দিক হইতে আরও আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের উপযুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা এবং কর্তব্যবোধ বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্য ইহার কর্মচারীদের উচিত স্থানীয় জনগণের সহিত বিশেষ যোগাযোগ রাখা।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম পঞ্চায়েৎগুলিকে স্বার্থের সংঘাত ও তাহার ফলে সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি এরূপভাবে জর্জরিত করিয়াছে যে এইগুলির অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। গ্রামের পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি আজ বিত্তবান ও উন্নত শ্রেণীর জনগণের কুক্ষীগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যই এইজন্য মুখ্যতঃ দায়ী।

আবার, এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে অনেকে স্বজনপ্রীতি, স্বজনপোষণ, সদস্যবৃন্দ ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত—এই জাতীয় সমালোচনাও করিয়া থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে জনগণকে উদ্দীপিত না করিতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান হওয়া কষ্টকর। রাজ্যসরকারের এইজন্য এই বিষয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যাহাতে জনগণ উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে পারদর্শী হইয়া স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া যে চারিপর্যায়ের শাসনব্যবস্থা পশ্চিম বাংলায় গৃহীত হইয়াছে তাহা আর্থিক দিক হইতে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, কেননা, যে অল্প আয় প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান অর্জন করে তাহার দ্বারা তাহাদের পরিচালনার ব্যয়ই সংকুলান হয় না। গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থের অভাবে পরিকল্পিত বিষয়গুলিতেই অর্থসংস্থান করা সম্ভবপর হয় না।

আবার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ এত ব্যাপক রাখার ফলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন পরিচালনার ভার উহাদের উপরই ন্যাস্ত করা উচিত ছিল। আবার বৃহৎ বৃহৎ শহরের কর্পোরেশনের কমিশনারগণের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া কার্যতঃ কর্পোরেশন-গুলির উপর সরকারী কর্তৃত্বকে বজায় রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও মনোনয়ন প্রথা এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভার সদস্যগণের অন্তর্ভুক্তিকে অনেকে এই বলিয়া সমালোচনা করেন যে ইহা গণতন্ত্রকে ব্যাহত করিবে। জনগণের উপর আস্থা না রাখিয়া এবং জনগণকে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা সহযোগে গ্রামীণ উন্নতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টাকে কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা ব্যাহত করা হইলে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত হইবে। বরং যে সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতা শাসন ব্যাপারে দেখা যায়, তাহার অপসারণের জন্য জনগণের মনে বিশ্বাস, আস্থা এবং কর্মপ্রেরণা যোগাইবার সুমহান দায়িত্বই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সরকারের ভূমিকা হওয়া উচিত।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে তাহার নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রকাশ বর্তমানে দেখা যাইতেছে। স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাকে গ্রাম্য ও পৌর এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারে ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমাজোন্নয়ন ও সমবায়কে পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত করিয়া গ্রামীণ উন্নতির মাধ্যমে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিম বাংলায়ও এই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি বিলুপ্ত করা হইবে স্থির হইয়াছে। ইহা ছাড়া জেলা বোর্ডের উপর জেলার পল্লী অঞ্চলের যে উন্নয়ন কার্যের ভার এতদিন ছিল তাহাও জেলাপরিষদের গঠনের সাথে সাথেই বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৩ সালের একটি আইনের দ্বারা জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রামীণ এই সমস্ত স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থাদ্বারা অঞ্চলের অধিবাসিগণকে প্রশাসনিক কার্যে অংশ গ্রহণ করানো ও অভিজ্ঞতালাভ করানোর এই প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিকতার পথে দেশকে অগ্রসর করিবে সন্দেহ নাই। মউনিসিপ্যালিটি মহানগরী ছাড়া অন্যান্য শহরে প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার ন্যায় ইহার উপর স্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, পথ, হাট-বাজার প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার উন্নতির কাজ ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ বিভিন্ন কর, ফী প্রভৃতি হইতে পাওয়া যাইবে। মহানগরীতে পৌর প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশন স্থাপিত আছে। মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনার এবং কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ সাম্প্রতিক মিউনিসিপ্যাল আইনের ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন। কর্পোরেশনের কাজও শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আলো, পথঘাট, প্রভৃতি

সমুদয় উন্নয়ন-মূলক বিষয়ের সহিত জড়িত। ইহা ছাড়া, অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, পোর ট্রাষ্ট প্রভৃতি সংস্থা। ভারতের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপকারিতা অনস্বীকার্য। তবে অর্থাভাব, সরকারী নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের ঔদাসীন্য প্রভৃতি ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে নাই বলা চলে।

Exercise

1. Desribe the various institutions for Local Self-Government in India. Point out briefly the functions that each of them performs. [ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক কাজের প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (ইউনিয়ন বোর্ড ও জিলা বোর্ড বাদ দিয়া লিখিতে হইবে।) ৩৬৩-৬৮ পৃষ্ঠা)

2. Describe the composition and functions of the Calcutta Corporation. [কলিকাতা (কর্পোরেশন) পৌরপ্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (৩৭৪-৭৮ পৃষ্ঠা)

3. Give an idea of how administration is carried on in a mofussil municipality. (গ্রাম্য পৌরসভার শাসনকাজ কিরূপে সংশোধিত হয় আলোচনা কর।) (৩৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)

4. What are the functions of a municipality? Mention the principal sources of income of a municipality. (পৌরসভার কার্যাবলী কি কি? ইহাদের মুখ্য আয়ের উৎস উল্লেখ কর।) (৩৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the merits and demerits of Local Self-Governments. [স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূল্যায়ণ (দোষগুণ) কর।] (৩৭৮-৮০ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the composition and functions of Zilla Parishads in West Bengal. (পশ্চিমবঙ্গের জিলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (৩৬৮-৭৩ পৃষ্ঠা)

7, How far has the provision of the Directive Principles of State Policy in regard to the organisation of Village Panchayats been implemented in West Bengal? (পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠনের কাজে কতখানি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর হইয়াছে আলোচনা কর)। (৩৬৪-৬৭ পৃষ্ঠা)

8. Explain the composition and functions of the Council of the Corporation of Calcutta under the Calcutta Municipal Act, 1951.
(১৯৫১ সালের মিউনিসিপ্যালিটি আইন অনুযায়ী কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা কর।) [C. U. B. A. (PII) 1965] (৩৭৪-৭৮ পৃষ্ঠা)

9. Explain briefly the constitution and functions of the Municipal Corporation of Calcutta. (কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।) [C. U. B. A. P. I 1966] (৩৭৪- ৭৮ পৃষ্ঠা)

10. Give an outline of Village Self-Government in West Bengal and point out their utility. (পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার কাঠামো বর্ণনা কর।) [C. U. P. II. 1963] (ইউনিয়ন বোর্ড ও জিলা বোর্ড বাদ দিয়া লিখিতে হইবে।) (৩৬৫-৭৩ পৃষ্ঠা)

11. Explain the System of Village Government in West Bengal. (পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার ব্যাখ্যা কর।) [C. U. P. II. 1966] • (ইউনিয়ন বোর্ড ও জিলা বোর্ড বাদ দিয়া লিখিতে হইবে।) (৩৬৫-৭৩ পৃষ্ঠা)

12. Give a brief account of the system of rural self-government in West Bengal. (C. U. B. A. 1967.) (পশ্চিমবঙ্গের পৌর স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার আলোচনা কর। (ইউনিয়ন বোর্ড ও জিলা বোর্ড বাদ দিয়া লিখিতে হইবে।) (৩৬৫-৭৩ পৃষ্ঠা)

একবিংশ অধ্যায়

ভারতের দলীয় ব্যবস্থা
(Party System in India)

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা ভারতে সুপরিস্ফুট। ভারতের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার পরিচিতি দেওয়ার পূর্বে রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার কার্যাবলী ও প্রয়োজনীয়তার একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ প্রথমেই করা হইতেছে।

দল-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে ব্রাইসের উক্তিটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়—"Parties are inevitable. No free large country has been without them. No one has shown how representative government could be worked without them. They bring order out of the chaos of a multitude of voters." দলগুলির প্রধান কাজ হইল জনসাধারণকে রাজনৈতিক জ্ঞান দান করা ও আপন দলীয় সংগঠনের নেতৃত্বে আনয়ন করিয়া দলীয় মূলনীতি কার্যকর করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করিয়া সরকার গঠন করার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং সরকার গঠন করিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হয় নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী দলীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশের লোকের কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা, এবং প্রয়োজন হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা।

দলব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

সরকার গঠন করিতে সক্ষম না হইলেও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে না পারে তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিরোধী দলের ভূমিকা বিশেষতঃ পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহারা নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা জনমতকে প্রভাবিত করে, সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রস্তুত থাকিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। যদি জনমতকে রাজনৈতিক দলগুলি প্রভাবিত করিতে সক্ষম হয়, এবং কোন বিষয়ে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে তাহা হইলে গণতন্ত্র সত্যই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় আমরা বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখি। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরোধী দল বিশেষ সংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে

বিরোধী দলের ভূমিকা

নাই। বিদেশের শাসনমুক্ত হওয়ার পর হইতেই ভারতে কংগ্রেস দল শাসনব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে শাসন চালাইতেছিল। কিন্তু একাধিক দলের অস্তিত্ব এখানে থাকিলেও নানা কারণে ঐ দলগুলি চতুর্থ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (কেরালা ছাড়া) একটি বিকল্প সরকার গঠন করিবার মত শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথকভাবে কংগ্রেসী সরকারের বিরোধিতা করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এই দলগুলিকে একত্রে একটি সুপরিচালিত নীতির মাধ্যমে নিজেদের পরিচালনা করিয়া শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। তবে গত চতুর্থ নির্বাচনের পর ভারতের প্রায় অর্ধেক রাজ্যগুলিকে কংগ্রেস দল সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে না পারায় বিভিন্ন দলগুলি নিজেদের দলীয় নীতি ও মতবাদের পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ কর্মসূচীকে ভিত্তি করিয়া আইনসভায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে সরকার গঠন করিয়াছে। কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জনসাধারণের এই ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা একথা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করে যে গণতন্ত্রের পথে ভারত এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে।

দ্বি-দলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থা একদলীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল

পৃথিবীর দুইটি গণতান্ত্রিক দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডে, আমরা দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ ও উপযুক্ত বিকাশ এই দুইটি রাষ্ট্রে দেখা যায়। ইহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কতকাংশে দায়ী তাহা অনস্বীকার্য। সেইজন্য দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকেই অনেকে একদল অথবা বহুদল ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য দান করেন।[১] একদলীয় ব্যবস্থার ফলে গণতন্ত্র কখনই অকৃতকার্য হয় না। যদি বিকল্প সরকার গঠন করিবার মত একটি দল না থাকে তবে গণতন্ত্রের অর্থই ব্যর্থ হয়। জনসাধারণ যদি একটি সরকারের পরিবর্তে কখনও আর একটি সরকারের গঠন কামনা করে তবে প্রকৃত গণতন্ত্র অনুসারে তাহাদের সে দাবি স্বীকৃত হওয়া উচিত; অথচ এক দলীয় সরকারের এইরূপ হওয়ার কোনরূপ প্রশ্নই উঠিবে না।[২] এই সম্ভাবনা মূর্ত করিবার জন্যই একাধিক দলের অবিস্থিতি প্রয়োজন, এবং বিশেষ প্রয়োজন একটি অতি শক্তিশালী বিরোধী দলের। আবার বহুদল ব্যবস্থার যে ত্রুটি তাহা ফ্রান্সের পূর্ব-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলেই সুপরিস্ফুট হয়। এইরূপ রাষ্ট্র খুব কম ক্ষেত্রেই

১। ..."the only forms of party government which are genuine are the bi-party system developed in Great Britain and the United States."—(Shotwell).

২। এই প্রসঙ্গে ম্যাবটের (Mabbot) উক্তিটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "If the essential attribute of a democracy is its power to accept or reject a government, there must be a genuine possibility of an alternative government."

একটি স্থায়ী সরকার গঠন করিতে পারে। ভারতে যদিও একাধিক দলের অস্তিত্ব বর্তমান তবুও প্রকৃতপক্ষে সেখানে দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, কারণ ভারতে একদিকে আছে দক্ষিণপন্থী জাতীয় কংগ্রেস এবং অপরদিকে রহিয়াছে কংগ্রেস-বিরোধী সমুদয় বামপন্থী দল। এই বামপন্থী দলের কর্মসূচী এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে প্রচুর—যাহার ফলে এ যাবৎকাল কংগ্রেসী সরকারের বিরোধিতা করা ছাড়া ইহারা সংঘবদ্ধভাবে বিকল্প সরকার গঠন করিবার মত বিরোধী দল হিসাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে বহু রাজনৈতিক দল লইয়া গঠিত ভারতকে পাকিস্তান ও ফ্রান্সের ন্যায় সংকটের সম্মুখীন কখনও হইতে হয় নাই। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের একটি অন্যতম কারণ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ভারতে নাই বটে, কিন্তু ভারতের দলব্যবস্থা যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট এবং কংগ্রেস বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগোষ্ঠী এইভাবে অনেকটা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না হওয়ায় বহু রাজ্যের আইনসভায়ই বিভিন্ন দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করিয়া বেশ সুষ্ঠুভাবে সরকারী ক্রিয়াকলাপ চালাইয়াছে। কমিউনিষ্ট, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট, প্রজা সোসালিষ্ট, জনসংঘ, এস. এস. পি প্রভৃতি দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য প্রচুর থাকিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছাকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য কংগ্রেসকে শাসনক্ষমতাচ্যুত করিয়া একটি সর্বনিম্ন কর্মসূচীকে ভিত্তি করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারী কাজ চালাইয়া যাইতে সেই দলগুলির পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক ব্যাপার হয় নাই বা হইতেছে না। তবে ১৯৬৯ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে স্বতন্ত্র দল এবং জনসংঘের সহিত কমিউনিষ্ট দল কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে চাহেনা।

কংগ্রেস ছাড়া বর্তমানে যে দলগুলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট, কমিউনিষ্ট, স্বতন্ত্র, জনসংঘ, ডি. এম. কে. দল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনসংঘ, ডি. এম. কে প্রভৃতি কয়েকটি দল ভারতের সর্বত্র সমানভাবে জন সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। চতুর্থ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ও জনসংঘ দল যদিও লোকসভায় কংগ্রেসের পরই বৃহৎ দল, তথাপি এই দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব একটি আশার কিছু নাই বলিয়া অনেক মহল মনে করেন। গত ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই দুইটি দলের অবস্থা পশ্চিমবাংলা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে খুব ভাল নয়। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের কোন সমর্থকই নাই দেখা গিয়াছে। তাহা হইলেও দলীয় নীতি ও জন সমর্থন হইতে ইহা অপরিস্ফুট নয় যে এই দলগুলির প্রতি কিছু কিছু রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধী জনসাধারণের আকর্ষণ অধিক। ইহা

আজ অবিদিত নয় যে কমিউনিষ্ট দলের মধ্যেও আবার দুইটি পৃথক সংগঠনের সৃষ্টি হইয়াছে ; যথা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল [C P I (M)] এবং ভারতের কমিউনিষ্ট দল (C. P. I.)। গত চতুর্থ নির্বাচনে কংগ্রেস মাত্র আটটি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কেন্দ্রেও ঐ দলের অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়, কেননা ২৪।২৫ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় লোকসভায় ঐ দল পুনরায় সরকার গঠন করে। কংগ্রেসের এই স্বল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও অনেকেই বিরোধী পক্ষের মতানৈক্যের ফল বলিয়া অভিহিত করেন ; কারণ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবাংলা, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, প্রভৃতি অঞ্চলে বিরোধীপক্ষ বহু আসন নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির অথবা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে নষ্ট করিয়াছে এবং যাহার ফলে কংগ্রেস দল কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর কাশ্মীর ও রাজস্থানেই কেবলমাত্র কংগ্রেস দল স্বীয় গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছে ; অন্যান্য রাজ্যে সম্মিলিত বামপন্থী ও বিরোধীদলগুলি সরকার গঠন করিয়াছে। হরিয়ানায় কংগ্রেস দলের কয়েকজন সদস্য হঠাৎ দলত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও খুব সুবিধার নয়, এবং কেবলমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে যে সেখানে কংগ্রেস সরকার তাহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবে কিনা। ইহা ছাড়াও সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের বড় বড় শহরের (যেমন কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, আমেদাবাদ প্রভৃতি) জনগণের অধিকাংশ কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে ভোটদান করিয়াছে। নূতন ধারণা, নূতন সংগঠন ও প্রভাবের কেন্দ্রস্থল এইসব বড় শহর হইতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেশী ভোট প্রদান করা ঐ দলের সংগঠনী শক্তির অভাবেরই পরিচায়ক। আবার কমিউনিষ্ট (মার্কসবাদী) ও সি.পি. আই. দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কমিউনিষ্ট ও জনসংঘ কিংবা স্বতন্ত্রদলের নীতিগত পার্থক্য প্রভৃতির ফলে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতা হওয়ায় বিরোধী দল অনেক স্থানেই আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে নাই। তাহা হইলেও মোটামুটি ভাবে বিরোধী দল ও কংগ্রেসের মধ্যে যে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি ইঙ্গিত দেখা যাইতেছিল তাহা বর্তমানে কিছুটা কার্যকর হইয়াছে মনে হয়। তবে স্বতন্ত্র দল ও জনসংঘ চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী হওয়ায় বিরোধী দলগুলির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যের অভাব প্রতিপদে অনুভূত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যদি ঐক্য অর্জিত না হয় তবে ভবিষ্যতে বহু-দলীয় শাসনব্যবস্থার সূচনা হওয়াও আশ্চর্যের কিছু হইবে না।

গত ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে আমরা পশ্চিমবাংলা ও পাঞ্জাবে

সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাধান্য বেশী দেখি। পাঞ্জাবে আকালী দল, জনসংঘ প্রভৃতি একত্রে সরকার গঠন করিয়াছে, এবং পশ্চিমবাংলায় ১২টি বিরোধী দল যুক্তফ্রন্ট নামে অকংগ্রেসী সরকার গঠন করিয়াছে। পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী দলগুলি একত্র হইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কংগ্রেস দল ২৮০টি আসনের মধ্যে কেবলমাত্র ৫৫টি আসন লাভের অধিকারী হইয়াছে। কংগ্রেস দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস যে কতখানি হইয়াছে তাহা এই নির্বাচনের ফলাফল হইতে সহজেই অনুমান করা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এবং লোকসভায় চতুর্থ নির্বাচনের পর কংগ্রেস সরকারের দলীয় প্রাধান্য বিশেষ হ্রাস পায়। এই অবস্থা আরও শোচনীয় হয় পশ্চিমবাংলা, কেরল, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে। যদিও মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস দলকেই অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিতে আহ্বান জানানো হইয়াছে, তবুও বিরোধী দলগুলিও সেখানে কম শক্তিশালী নয় এবং যেহেতু দলত্যাগের যে সূচনা কিছুকাল যাবৎ দেখা যাইতেছে এবং কংগ্রেস দলের ভিতরই যে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য প্রচণ্ড ক্ষোভ পরিলক্ষিত হইতেছে সেইজন্য ঐ সমস্ত রাজ্যের পরিস্থিতি কি রূপ ধারণ করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যে বিহারে কংগ্রেস দলকে সহযোগী সমর্থনকারী দলের কয়েকজন সমর্থন জানাইবেন না বলিয়া হুমকী দিতেছেন।

একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নাই যে অকংগ্রেসী সরকার গঠনকারী কতিপয় রাজ্যের বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দল সেক্ষেত্রে তাহাদের পদচ্যুত করিয়াছে। তবুও নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে নিজ দলের ভাগ্য পরীক্ষায় আজ বহুলাংশে কংগ্রেস ব্যর্থ হইয়াছে। আবার যেহেতু পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জনসাধারণ সহ্য করিতে রাজী নয়, সেইজন্য তাহারাও এমন দলের সম্মেলনকেই আজ গ্রহণ করিতে রাজী যাহারা বহুদল হইলেও একটি দলের আধারেই নিজেদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখিয়া জনগণের আশা আকাংখাকে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হয়। সেইজন্যই স্বতন্ত্র দল এবং জনসংঘের প্রাধান্য ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে অনেক কমিয়া গিয়াছে দেখা যায়।

এই আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে ভারতের দলীয় ব্যবস্থা আজ বিভিন্ন সদস্যের দলত্যাগের (defection) দরুণ ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করিতে উদ্যত। হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবাংলা, পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি প্রত্যেকটি রাজ্যে ঘন ঘন দলত্যাগের দরুণ কোথাও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা; কোথাও বা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ভারতে দলীয় ব্যবস্থায় নমনীয়তাই (flexibility) এইজন্য বিশেষভাবে

দায়ী। সংসদীয় গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। সুতরাং সেই দলব্যবস্থার যদি সংস্কার সাধন না করা যায়, তবে ভারতের ন্যায় এইরূপ বিশাল রাজ্যের শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই. বি. চ্যবনের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। দলত্যাগ সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া এই প্রসঙ্গে তাহাদের মতামত ও সুপারিশ পার্লামেণ্টে পেশ করিতে কমিটিকে জানানো হয়। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সালে কমিটি তাহাদের রিপোর্ট সংসদের উভয় সভায় পেশ করেন।

দলত্যাগ ও সর্বদলীয় গঠন

এই কমিটির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও বিবৃতি হইতে জানা যায় যে ইহা দলত্যাগের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হইল—কোনও দলত্যাগী সদস্যকে তাঁহার দলত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী, স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার হইতে দেওয়া চলিবে না। তবে দলত্যাগ করিয়া নূতন দলে যোগ দেওয়ার পর কোনও সদস্য যদি তাঁহার নূতন দলের মনোনয়ন লাভ করেন ও আবার আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন তাহা হইলে তাঁহার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

এই কমিটি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি আচরণ-বিধি প্রবর্তনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সমস্ত দলই যাহাতে এই আচরণ-বিধি সর্বপ্রকারে মানিয়া চলে তাহার ব্যবস্থা করার জন্য কমিটি একটি পরিষদ কিংবা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের জন্যও প্রস্তাব করেন।

মুখ্যমন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রীকে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকার অর্পণ করা হইবে কিনা সে সম্বন্ধে সদস্যগণের মধ্যে তীব্র মতভেদ ঘটে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতে সংবিধান অনুসারে এই অধিকার মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর একান্ত অধিকার। তবে কমিটির সদস্যরা তাঁহার এই ব্যাখ্যা মানিতে রাজী হন নাই।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিতে মন্ত্রিসভার আয়তন কত বড় হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও কমিটি একমত হইতে পারেন নাই। সংবাদে প্রকাশ যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আরও সাতজন সদস্য এই কথা বলিয়াছেন যে যেখানে একটিমাত্র আইনসভা আছে সেখানে বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া উচিত। যেখানে আইন-সভার দুইটি কক্ষ আছে সেখানে বিধানমণ্ডলীর মোট সদস্যের শতকরা ১১ ভাগ সদস্যকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা যাইতে পারে। কমিটির কয়েকজন সদস্য এই সংখ্যাকে ৫০এ স্থির করিতে চাহেন। সদস্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকায় কমিটি স্থির করেন যে সংসদ ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ইহা প্রকাশিত হইবে ও তাহাদের মতামত লইয়া এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

আশা করা যায়, কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশের উপর পার্লামেণ্টে

আলোচনা হইবে এবং আইনের মাধ্যমে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পার্লামেন্ট ভারতীয় গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিতে উদ্যত এই দলত্যাগ ব্যবস্থার যবনিকা পাত ঘটাইবে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (The Indian National Congress) : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এলান অকতাভিয়ান হিউম নামক একজন ইংরাজ কর্মচারীর উদ্যোগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেস বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল। অবশেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি পরিপূর্ণ সংগঠনী শক্তি হিসাবে ইহা দেশের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে এই কংগ্রেস দল সর্বপ্রথম ভারতে স্বাধীনতা অর্জনই যে ইহার মুখ্য লক্ষ্য তাহা ঘোষণা করে। সেই সময় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারত যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছিল তাহার নেতৃত্বেও ছিল ভারতের কংগ্রেস দল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অবশ্য এই নীতিকে তৎকালে ব্রিটিশ-শাসন অবসানের জন্য সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ও গ্রহণযোগ্য একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিতে অনেকেই রাজী ছিলেন না। ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলন সুরু হয়। বহু কংগ্রেসী নেতাকে ব্রিটিশ শাসনের বর্বর অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে হয়। ১৯৪৭ সালে অবশেষে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া এই কংগ্রেস দল তৎকালে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অবশ্য অনেকে কংগ্রেসের ভারত বিভাগ সমর্থন করাকে তীব্র নিন্দা করেন। স্বাধীনতার পর ভারতে কংগ্রেস দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সরকার গঠন করিয়াছিল।

কংগ্রেসের যে শাসনতন্ত্র ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয় তাহা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও নীতিকে ব্যক্ত করে। এই উদ্দেশ্য হইল জনগণের সর্বাধিক মঙ্গল করা এবং এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যাহা শান্তি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা সামাজিক, আর্থিক সমানাধিকার ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের উপর ভিত্তিশীল ("the well-being and advancement of the people of India and the establishment in India by peaceful and legitimate means of a Co-operative Commonwealth based on equality of opportunities and of political, economic and social rights and aiming at world peace and fellowship.")।

ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যদিও লোকসভা ও রাজ্যসভাগুলির প্রায় সবগুলিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা

অর্জন করে তবুও দেখা যায়, প্রদত্ত মোট ভোটের মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ ভোট কংগ্রেস দল পায়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কার্যসূচী ও নীতির বিভিন্নতা তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিতে না পারায় কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কষ্টসাধ্য হয় নাই। ঐ রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিলে হয়ত কংগ্রেসের পক্ষে দেশের কার্য পরিচালনায় নেতৃত্বদান করা সম্ভবপর হইত না ; কেননা মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬০ ভাগের মত ভোট কংগ্রেসের বিপক্ষীয় দল লাভ করে। সেইজন্য শতকরা ৬০ ভাগ ভোট না পাইয়াও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একতার অভাবে কংগ্রেস দলই সর্বভারতীয় দল হিসাবে প্রাধান্য লাভ করে।

প্রথম নির্বাচনের সময় কংগ্রেস দল অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনে ব্রতী হয়। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও "মিশ্র অর্থনীতি"ই সমধিক প্রসিদ্ধ। আবাদী অধিবেশনে কংগ্রেস দল সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করে। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসী ইস্তাহারে এই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের উপরই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। ইহা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল জাতির সহ-অস্তিত্ব নীতিকে নির্বাচনী ইস্তাহারে সংযোজিত করে। প্রথম নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিল্পনাটিরও প্রবর্তনের ফলে নির্বাচনী ইস্তাহারের একটি বড় বিজ্ঞাপন কার্য সমাধা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দুই একটি রাজ্যের ক্ষেত্র ছাড়া সমস্ত জায়গায় এই দল আশানুরূপভাবে স্বীয় আসনসংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পারে নাই বা জনসমর্থনও অধিক লাভ করে নাই। কেরল ও উড়িষ্যা রাজ্যে বরং ইহাদের ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পায়। কেরলে কমিউনিষ্টদল প্রাধান্য লাভ করিয়া ক্ষমতালাভ করে এবং উড়িষ্যায় গণতন্ত্র পরিষদের সহিত ক্ষমতা ভাগ করিয়া কংগ্রেস দল সরকার গঠন করে। কেরলে অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও প্রজাসমাজতন্ত্রীদলের সহিত হাত মিলাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। উড়িষ্যায় কংগ্রেস অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতালাভ করিয়া সরকার গঠন করে। তৃতীয় নির্বাচনে উড়িষ্যায় কংগ্রেস দল সরকার গঠন করিলেও কেরল রাজ্যে কংগ্রেসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নাই।

তৃতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করে তাহা সাধারণভাবে পূর্বেরই মত। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিলোপ, পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠা, ভূমি সংস্কার, নিরস্ত্রীকরণ ও পরিকল্পনা মাধ্যমে বেকারত্ব ও জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করার কথাও ইস্তাহারে প্রচারিত হয়। অবশ্য এইরূপ আশার বাণীর ফলাফল যে খুব আশানুরূপ হয় নাই সেকথা নির্বাচনের ফলাফলই ঘোষণা করে। পূর্বাপেক্ষা কয়েকটি স্থানে কংগ্রেস তাহার আসন-সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করিয়াছে বহুস্থান হইতে তেমনি তাহাকে অনেক আসন

হারাইতেও হইয়াছে। ফলাফল দাঁড়াইয়াছ এই যে তাহার মোট প্রাপ্ত আসনসংখ্যা পূর্বেকার তুলনায় কিছু কমিয়াই গিয়াছে।

চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে তাহাতে বলা হয় যে দেশ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও দ্রুত সমাজতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইবে। যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কংগ্রেস চালু করিয়াছে সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার ফলে গ্রাম্য পর্যায়ে জনগণ শাসন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেইজন্য ইহা জনচেতনাকে গ্রাম পর্যায় হইতে জাগ্রত করার ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত ও ভারতীয় গণতন্ত্রকে একধাপ অগ্রবর্তী করার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে অভিনন্দন যোগ্য। অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয় যে ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন অত্যন্ত আশাপ্রদ সন্দেহ নাই, তবে সমস্ত তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে ভারত কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণের সহিত মোকাবিলা করিতে যাইয়া ভারতের ন্যায় শান্তিকামী দেশের উন্নয়নমূলক কার্যে যথেষ্ট বাধা পড়িয়াছে এবং সেইজন্য অনুন্নতি ও দারিদ্র্যের কঠিন কবল হইতে মুক্তি পাওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা বিলম্বিত হইয়াছে।[১] ইহা ছাড়াও, এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে সরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও অব্যবহৃত শিল্পসম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আশু কর্তব্য। সমস্ত ব্যাংক ব্যবসায়কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করার প্রয়োজনীয়তা এই নির্বাচনী ইস্তাহারে স্বীকৃত।[২] নির্বাচনী ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে কংগ্রেস উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর। কৃষি ও শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনসংখ্যা হ্রাস ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির কথাও তাই এইজন্য বিশেষ জোরের সাথে বলা হয়।

গোয়া, দমন, দিউ-র ভারতে অন্তর্ভুক্তি কংগ্রেস দলের মর্যাদা যথেষ্ট

১। ......"though the general picture of growth is doubtless encouraging we should not forget that during the whole of the Third Plan India had to go through a series of crisis...... We had cherished the hope that with our policy of peace and friendship we will be left in peace to make it possible for us to concentrate our energy and resources in solving our basic problems of poverty and under-development. We have, however, had some bitter and disillusioning experience."

২। "It is necessary to bring most of these banking and other institutions under social control in order to serve the cause of economic growth more effectively and to make credit available to the producer in all fields where it is needed. It should not be that the people who are better off control these institutions and gain over those who are not so well placed but who, however, are making a signifcant contribution to the goal of economic growth".

বাড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। তবুও চতুর্থ নির্বাচনের পর কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ৩৭০ হইতে হ্রাস পাইয়া প্রায় ২৮০-র মত হয়। অন্যান্য রাজ্যেও এই দলের প্রাধান্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। কেননা চতুর্থ নির্বাচনের পরেই অর্ধেকের উপর রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস শাসন বিলুপ্ত হয় ও সে স্থলে বিরোধী দলের সংমিশ্রণে যুক্তফ্রণ্ট বা সম্মিলিত কয়েকটি দল একত্রে সরকার গঠন করে। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কংগ্রেস দল কর্তৃক গঠিত ভারত সরকারের নীতিকে অনেকেই সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। চীন-ভারত বিবাদের সমাধান-কল্পে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নিকট ভারতের আবেদন কংগ্রেসের পররাষ্ট্রনীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্দেহ নাই ; তবে দেশের জরুরী অবস্থা ও সেই জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের উপর করভার চাপানো প্রভৃতি দরিদ্র জনগণের স্বার্থ-পরিপন্থী কার্যাবলী জনসাধারণের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষা সংক্রান্ত যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য কংগ্রেস দলের অধৈর্যই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। জাতীয় সংহতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ভাষা আন্দোলন খুবই ক্ষতিকর হইয়াছে এবং কংগ্রেস দলের ভিতরেও ইহা অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তানের সহিত সরকারের কচ্ছ সংক্রান্ত চুক্তিও অনেকাংশে দলের ভিতরে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ছাড়া, কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও প্রচুর গলদ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার ফলে সংগঠনটির আশু সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। বিভিন্ন উপনির্বাচনে এবং পৌরসভার নির্বাচনে এই দলের পরাজয়ে এইরূপ সংস্কার সম্বন্ধে দলের কর্তৃপক্ষের তৎপরতাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া, দলের মধ্যেই কংগ্রেসের একটি বিদ্রোহী উপদল ও অসন্তুষ্ট উপদলের অস্তিত্বও দেখা যায়। এইরূপ অসন্তোষ যে কোন রাজ্যের কংগ্রেসী দল কর্তৃক গঠিত সরকারের স্থায়িত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে ; তাহা চতুর্থ নির্বাচনের পর হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতেই সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা যায়।

কংগ্রেস দল আজ কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও কংগ্রেস দলের শাখা স্থাপন করা হইয়াছে। সরকারের দল হিসাবে ইহা অনেক সুযোগ-সুবিধার যে অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাকে যদি দলীয় স্বার্থের খাতিরে জনস্বার্থ বিরোধী কার্যে লাগান হয় তাহা হইলে যে এইরূপ দলের সংগঠন ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পায় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিছু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতার জন্য যদিও ভারতের কংগ্রেস দলকে এইরূপ অপবাদ দেওয়া চলে না, তবুও ভবিষ্যৎই বলিতে পারে কংগ্রেস দলের প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বিরোধীপক্ষ প্রতিষ্ঠিত রাজ্য

সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্ক সংহতিপূর্ণ করিতে এই দল কতখানি সক্ষম হইবে এবং সমগ্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংকটকে জাতীয় ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক দল-নিরপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে ইহার ভূমিকা কি হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ নির্বাচনের পরে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে রাজ্যপাল পদচ্যুত করার পর সেই রাজ্যে ১৯৬৯ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কয়েকটি জায়গায় কংগ্রেস দলের কোন সদস্যই নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। অভিযোগ করা হয় যে অতীতে ক্ষমতার লড়াইয়ে সুযোগমত কংগ্রেস কেন্দ্রের প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগাইতে কসুর করে নাই। কিন্তু জনগণ যেভাবে শাসনযন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিতে যাইয়া নিজেদের সচেতনতা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে অকংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত বোঝা-পড়া করার ব্যাপারে পদক্ষেপে একটুও ভুল করা হইলে আগামী ১৯৭২ সালের লোকসভার নির্বাচনেও যে তাহার প্রভাব পড়িবে সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অনেক মহল হইতেআশংকা প্রকাশ করা হইতেছে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া হৃত জনসমর্থন ফিরাইয়া আনার জন্য কংগ্রেস দলকে আরও সজাগ ও সচেতন হইতে হইবে।

যাহা হউক, কংগ্রেস দলটির সংগঠন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এই প্রসঙ্গে করা প্রয়োজন। কংগ্রেস সংগঠনের একটি সংস্থা গ্রাম কংগ্রেস কমিটি। তাহার উপরে মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি, জেলা কংগ্রেস কমিটি ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রহিয়াছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপরে আছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এবং কংগ্রেস সভাপতি (প্রেসিডেন্ট)। এই দলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হইতেছে কার্যনির্বাহক সমিতি বা কংগ্রেস হাইকমাণ্ড। কংগ্রেস দলের একটি 'পার্লামেণ্টারী বোর্ড আছে। ইহা কংগ্রেস সভাপতি এবং পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেসী প্রতিনিধি নির্বাচন করার দায়িত্ব এই পার্লামেণ্টারী বোর্ডের। দলীয় কর্মসূচী নির্বাচন, নির্বাচনী ইস্তাহার প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ ও নির্বাচনে দলের ভূমিকা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার ভারও এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ইহা ছাড়া, গ্রাম কংগ্রেস কমিটি, জেলা কংগ্রেস কমিটি, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন কমিটিও আছে। ইহাদের নির্বাচন ব্যাপারে গোলযোগ হইলে তাহার মীমাংসাকল্পে নিজেদের মধ্য হইতে ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করার দায়িত্বও এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

কংগ্রেসের সংগঠন

কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী সংস্থা এবং দলীয় সংস্থার মধ্যে বিরোধ ইত্যাদির অবসানের জন্য স্থির করা হইয়াছে যে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সংস্থা পার্লামেণ্ট সম্পর্কিত কার্যাবলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে, এবং পার্টির সংস্থা দলীয় নীতি

ইত্যাদির প্রচার এবং নির্বাচনী কার্যে মনোযোগী হইবে। উভয় সংস্থার মধ্যে গোলযোগ ইত্যদি যেমন একদিকে ইহাতে অনেক কমিবে, অপরদিকে তেমনি সংগঠনের শক্তি উভয় সংস্থার কার্য বিভাজনের মধ্য দিয়া অনেক উন্নত হইবে।

ভারতের দুই কমিউনিষ্ট দল (**The Communist Parties of India**) ঃ রাশিয়ার সাম্যবাদের আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কমিউনিষ্ট দল ১৯২৪ সাল হইতে কাজ সুরু করে। তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক কমিউনিষ্ট দল অবৈধ বিবেচিত হওয়ায় দলীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কংগ্রেস দলকেই কমিউনিষ্ট কর্মীবৃন্দ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে এই বাধা তুলিয়া লওয়া হইলে কমিউনিষ্ট দল স্বাধীনভাবে কাজ সুরু করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দলও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এই দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ছয়শতটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইহাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ভারতে সেই গণতান্ত্রিক দলের সরকার প্রবর্তন করার কথা বলা হয় যাহা প্রকৃত শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষক, মজদুর, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে।[১] ইহা ছাড়া, রাশিয়ার অনুকরণে একটি শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনের কথাও ইহাদের নির্বাচন ইস্তাহারে ছিল। নির্বাচনী ইস্তাহারে বর্ণিত অপরাপর কার্যক্রমের তালিকা ছিল—বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠন, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন ও তপশীল বর্ণসমূহের মুক্তি, বিনা খরচায় উদ্বাস্তগণের পুনর্বাসন, কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসা, মজুরদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, ভূমির পুনর্বণ্টন কার্য ত্বরান্বিত করা, ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিরোধিতা করা এবং বিনা পয়সায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিশেষ লক্ষ্যও তাহাদের ছিল।

কংগ্রেসের পর জনসমর্থনের ভিত্তিতে কমিউনিষ্ট দলকেই দ্বিতীয় প্রভাবশালী দল হিসাবে অভিহিত করা যায়। দ্বিতীয় নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা প্রায় ৯ ভাগ ভোট পাইলেও অন্যান্য দল অপেক্ষা কংগ্রেসের পরই ইহারা সর্বাপেক্ষা বেশী আসন লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় লাভ করে। কেরল রাজ্যে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার প্রতিষ্ঠা করিতেও কংগ্রেসের পর একমাত্র এই দলই পারিয়াছে। কেরলে ১৯৬২ সালে অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনে কংগ্রেস, প্রজা-সোস্যালিষ্ট ও লীগের নিকট ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইলেও, এবং সেখানে

১। ..."democratic parites, groups, and individuals, representing peasants, the middle classes and national capitalists who stand for genuine industrialisation and for freedom and independence of India."

অনুষ্ঠিত তৃতীয় নির্বাচনে ইহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হইলেও একথা বলা চলে যে উক্ত রাজ্যে কমিউনিষ্ট দলের প্রাধান্য তখন খুব প্রবলই ছিল। তৃতীয় নির্বাচনে কমিউনিষ্ট দল কতকগুলি আসন যেমন হারাইয়াছে তেমনি কতকগুলি নূতন আসনও লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কমিউনিষ্ট দল ভারতের বৈদেশিক নীতিকে সাধারণভাবে সমর্থন করিলেও এই নীতির আরও স্পষ্ট ঘোষণা দাবি করে। ইহারা কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য বিবেচনা করে, এবং চীন ও ভারতের বিবাদের মীমাংসা আপোষ আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব বলিয়া প্রচার করে। মৌখিক প্রচারে ইহারা কংগ্রেস দলকে ইঙ্গ-মার্কিন ও বিদেশী এবং বড় বড় একচেটিয়া কারবারীর পুঁজির প্রতিনিধি হিসাবে অভিহিত করে। ইহা ছাড়া, কমিউনিষ্ট দল প্রতিনিধিগণকে পদচ্যুত (recall) করার অধিকারও ভোটারগণের হস্তে ন্যস্ত করার পক্ষপাতী। আবার তাহারা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে স্পষ্টরূপে সংবিধানে ঘোষণা করার পক্ষপাতী। তাছাড়া, তাহাদের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রসার, পরোক্ষ করভার হ্রাস, প্রগতিশীল ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ প্রভৃতি। ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট দল লোকসভায় মোট ২৯টি ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভায় ১৮৪টি আসন দখল করিতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালে চীনের সীমান্ত সংঘর্ষের প্রশ্ন লইয়া বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্ট দলে যে চিড় ধরে তাহার প্রতিফলন ভারতেও হয় এবং ১৯৬৪ সালে ভারতে দুইটি দল সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ নির্বাচনে এই দল স্পষ্টরূপেই দুইটি দল হিসাবে বিভক্ত হইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অবিভক্ত এই দলটি কংগ্রেসের পর বিরোধী দল হিসাবে জনগণকে যেরূপভাবে নেতৃত্বদান করিতেছিল তাহাতে ইহা অনুমান করা শক্ত নয় যে ইহারা একক থাকিলে হয়ত ইহারাই কংগ্রেসের পর জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে জনগণকে নেতৃত্ব দান করিত। তবুও কেরালায় ও পশ্চিম বাংলায় এই দুইটি দল অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিয়াছে। এই দল যখন অবিভক্ত ছিল তখন লোকসভায় ১৯৬২ সালে ইহারা ২৯টি আসন লাভ করে। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ নির্বাচনে দুই কমিউনিষ্ট দল একত্রে লোকসভায় ৪১টি আসন লাভ করে।

ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল—Communist Party of India. (Marxist)

১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যে ফাটল ধরে এবং যাহার ফলে বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্ট শাখাগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়। তাহা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকেও আঘাত হানে।

১৯৬৪ সালে এই দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। পশ্চিমবাংলা ও কেরালায় বহু দলীয় সদস্য মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট দল গঠন করে। অন্ধ্র ও তামিলনাদের সদস্যগণ বাম ও দক্ষিণ উভয় অংশেই সমভাবে যোগদান করে। অন্যান্য স্থানে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দলের প্রাধান্য মোটামুটি বজায় থাকে।

গত চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট দল ভারতের দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দলের অধীনে ভারতের কি অসুবিধা হইতে পারে,সে সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করিয়াছিল। মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্টদলের মতে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দল হইতেছে শোধনবাদী (revisionists)। দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিপর্যস্ত হইতে পারে সে সম্বন্ধেও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। কংগ্রেস শাসনে দেশের কি ক্ষতি হইয়াছে এবং কংগ্রেসের সহিত একই স্বার্থে সংযুক্ত স্বতন্ত্র ও জনসংঘ দলকে যে সমূলে উৎপাটিত করা দরকার সেকথাও নির্বাচনের পূর্বে এই দল প্রচার করে। এই দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে আর যে সমস্ত সংস্কারের কথা ছিল তাহা হইল—ব্যাংক ব্যবসার জাতীয়করণ, ভূমি ব্যবস্থার বিশেষ সংস্কার, খাদ্যদ্রব্যের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, স্বাধীন বৈদেশিক নীতি, আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে জনগণের শিক্ষার প্রসার, প্রতিরক্ষার ব্যয়-হ্রাস, নির্যাতনমূলক আটক আইনের বিলোপ প্রভৃতি। পাকিস্তানের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক স্থাপন ও চীনের সহিত সীমান্ত বিরোধের আপোষ মীমাংসার দাবি এই দল করে। অবশ্য এই দল ভারতের ভূখণ্ডের কোন অংশের হস্তান্তর চায় না। চতুর্থ সাধারন নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ১৯টি এবং বিধানসভাসমূহে ১২৭টি আসন লাভ করিয়াছিল। তবে বিধান সভার এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় মধ্যবর্তী নির্বাচনে, বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলায়-ই এই দলের ৮০টি আসনলাভ করার দরুন। এই দলের জনপ্রিয়তা যে পশ্চিমবাংলায় খুবই বাড়িয়াছে তাহা মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল হইতেই সম্যক অনুধাবন করা যায়।

এইদল দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য কতিপয় দলের সহিত আঁতাত করিয়া ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও তাহাদের দ্বারা গঠিত যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবাংলার বিধানসভার ২৮০টি আসনের মধ্যে ২১৪টি আসন লাভ করিয়া সরকার গঠন করে।

ভারতের কমিউনিষ্ট দল (The Communist Party of India)

যখন বিভক্ত হইয়া চতুর্থ নির্বাচনে এই দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যায় তখন নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসী শাসনের অবসানই ইহাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। তবে বামপন্থী কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধেও কিছু কিছু অভিযোগের কথা ইহাদের কাছে শোনা যায়। কংগ্রেস যে বৈদেশিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে

নীতি পরিচালনায় ব্যর্থ হইয়াছে সে কথাও এই দলের নির্বাচনী অভিযানের অন্যতম।

এই দলের নেতৃত্বে আছেন শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে। ইহারা চতুর্থ নির্বাচনে যে কর্মসূচী প্রকাশ করে তাহাতে ছিল জনগণের উপর হইতে কর-হ্রাস, কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতি বিধান, একচেটিয়া কারবারী নিয়ন্ত্রণ, বিদেশের শোষণের অবসান, মার্কিণ জোটের বাহিরে চলিয়া আসিয়া স্বাধীনভাবে শান্তি ও সহাবস্থান নীতিকে রূপায়িত করা, প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের উন্নতিসাধন, চীনের সহিত আপোষ মীমাংসা দ্বারা সীমান্তের দ্বন্দ্ব মিটানো ইত্যাদি।

চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফল হইতে দেখা যায় যে লোকসভায় ২২টি ও বিভিন্ন রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলে এই দল ১২১টি আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সংমিশ্রণে যুক্তফ্রণ্টের অধীনে এই দলের আসন সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ নির্বাচনের পর অন্যান্য কয়েকটি দলের সমন্বয়ে এই দল বিভিন্ন রাজ্যেসরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করে।

ভারতের প্রজাসমাজতন্ত্রীদল (Praja Socialist Party of India) : কৃষক প্রজাদল এবং সমাজতন্ত্রী দলের সংমিশ্রণে এই প্রজাসমাজতন্ত্রী দল ১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর গঠিত হয়। প্রথম নির্বাচনে এই দুইটি দলের পরাজয় হওয়ায় তাহারা একত্রিত হয়। কৃষক মজদুর বা প্রজাদলের অনেক নেতৃবৃন্দই পূর্বে কংগ্রেসের সভ্য ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর নানা কারণে মতান্তর হওয়ায় ও অন্যান্য গোলযোগের ফলে তাঁহারা এই দল গঠন করিবার জন্য কংগ্রেস দল পরিত্যাগ করেন। এই দলের মতবাদে বলা হইয়াছিল যে ইহা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে অনুসরণ করিয়া গ্রাম্য সংস্কার, কৃষি ও শিল্প সংস্কার এবং উহাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সর্বাঙ্গীণ সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে। শিল্প ও খনির জাতীয়করণ, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, সমগ্র মূলধনের সামাজিকীকরণ প্রভৃতিও ইহাদের দলীয় কর্মসূচীর অন্তর্গত। যে দুইটি দলের সংমিশ্রণে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সৃষ্টি হইয়াছে দ্বিতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে তাহাদের কর্মসূচীর মধ্যে উপরোক্তভাবে সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় নির্বাচনে এই দল আশানুরূপভাবে আসনলাভ করিতে না পারিলেও ইহাদের ক্ষমতা যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়; কেননা তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় এই দল নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি অপেক্ষা কিছু বেশী ভোট লাভ করিয়াছে। এই দল কয়েকটি রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তৃতীয় নির্বাচনে জাতীয় সংহতি, বেকার সমস্যার সমাধান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জোর

দিলেও ক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়। ইহাদের মোট প্রাপ্ত আসনসংখ্যা দ্বিতীয় নির্বাচনের তুলনায় অনেক কমিয়াছে। চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই দল নির্বাচনী ইস্তাহারে বিপ্লবের উপর কিছু বেশী গুরুত্ব আরোপ করে ও গণ-তান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করে। এই দল বিধানসভাসমূহে ১২১টি আসন অধিকার করে ও লোকসভায় ১৩টি আসন লাভ করে। কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার তত্ত্বগত আলোচনা করিয়া এই দল টিকিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে অনেকেই যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থ নির্বাচনে এই দলের সাফল্য খুব কমই দেখা গিয়াছে। পশ্চিমবাংলা এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে এই দলের অবস্থা বিশেষরূপে খারাপ হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল সোস্যালিষ্ট দলের সহিত একত্রিত হইয়া সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিয়াছে। এই দলও কয়েকটি রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সহিত একত্র হইয়া মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করিয়াছে।

হিন্দু মহাসভা (Hindu Mahasava): বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতে হিন্দু মহাসভা দলটির প্রথম প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং রাজ-নৈতিক দলগুলির মধ্যে এই দলটি অত্যন্ত পুরাতন দল ও ইহার আলোচনা সেইজন্য খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। অবশ্য বর্তমানে উপযুক্ত নেতৃত্ব ইত্যাদির অভাবে এই দলের সংগঠনী শক্তিও যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে, জনসমর্থনও সেইরূপ ইহারা খুবই কম পাইতেছে। মুসলিম লীগের ক্ষমতার বিরুদ্ধে হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই দল বিশেষ চেষ্টা করে। ভারতে একটি অখণ্ড হিন্দুরাজ্য গঠন করাই এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইবার পর এবং ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর এই দলের কার্যকরী সমিতি ইহাদের রাজনৈতিক কার্যাবলী বন্ধ করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করে। কিন্তু কিছু-কাল পরে ইহারা পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। এই দলের অন্যান্য প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক বৈষম্য দূর করা, শিল্পসমূহের জাতীয়করণ, মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর হাতে মূলধন কেন্দ্রীভূত না হইতে দেওয়া, দেশের সমস্ত যুবক-যুবতীগণের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। বর্তমানে এই দল সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া জনহিতকর কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে এবং হিন্দুদের মধ্যেই সভ্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার ন্যায় রক্ষণশীল নীতির পরিবর্তনসাধন করিয়াছে। তবুও বর্তমানে এই দলের বিশেষ প্রভাব জনসাধারণের উপর পরিলক্ষিত হয় না। সেইজন্য নির্বাচনেও এই দলের প্রতিনিধিবৃন্দকে বিশেষ সমর্থনলাভ করিতে দেখা যায় না।

ভারতীয় জনসংঘ (The Bharatiya Jana Sangha): স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় জনসংঘ ১৯৫১ সালে গঠিত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে সংগঠনী শক্তির বিকাশসাধন করিতে সমর্থন হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচনে এই দলের আসনসংখ্যা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় নির্বাচনে মোট প্রাপ্ত ভোটের শতকরা ৪ ভাগ ভোটের কিছু বেশী পাইয়া ইহা সর্বভারতীয় দল হিসাবে পরিগণিত হয়। চতুর্থ নির্বাচনে কয়েকটি রাজ্যে এই দলের সমর্থন খুবই ভাল হয়, এবং লোকসভায় কংগ্রেসের ও স্বতন্ত্রের পর জনসংঘ দলই সর্বাধিক জনসমর্থন লাভ করে। চতুর্থ নির্বাচনের পর এই দল লোকসভার ৩৫টি আসন ও বিধানসভা সমূহেও ২৬৪টি আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়; দিল্লী রাজ্যে এইদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্জন করিয়া সরকার গঠন করে। পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী (১৯৬৯) নির্বাচনের পর আকালী দলের সহযোগিতায় জনসংঘ সেখানে সরকার গঠন করে। এই দলের উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে বেসরকারী ও সরকারী শিল্পসমূহের উন্নতি করা, দুর্নীতি দূর করা, বেকার সমস্যার সমাধান করা, শিল্পসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও সুসংবদ্ধ সংস্কার করা, জাতীয় ঐক্য স্থাপন করা, দ্রব্যমূল্য স্থিতি করা, শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সংস্কার সাধন করা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া সমস্ত দেশব্যাপী যুবক-যুবতীগণের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাও এই দলের লক্ষ্য। সকলের সমবায়ী মনোভাব স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ করিতে পারে; সেই সমবায়ের পথ প্রশস্ত করার কর্মসূচী ইহাদের নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম ছিল। এইরূপ দলের অস্তিত্ব খুব বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। কেননা একমাত্র নির্বাচনের সাফল্যই এইরূপ দলের অস্তিত্বের ভিত্তি হইতে পারে না।

স্বতন্ত্র দল (**The Swatantra Party**)**ঃ** ১৯৫৯ সালে স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরাজাগোপালাচরী কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রবর্তনের নীতিকে রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদ বলিয়া অভিহিত করেন এবং এইরূপ রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে বিরোধিতা করিবার জন্য এই দলটির পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সাব্যস্ত করেন। কংগ্রেসের আবাদী ও নাগপুর অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিকতার নীতি ঘোষিত হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের গঠনের জন্য জনগণকে আহ্বান করা হয়।

স্বতন্ত্র দলের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ গত তৃতীয় নির্বাচনেই প্রথম গৃহীত হয়। চতুর্থ নির্বাচনেও এই দল অংশ গ্রহণ করে ও লোকসভায় এবং কয়েকটি রাজ্যের আইন সভায় সাফল্য লাভ করে। নির্বাচনে স্বতন্ত্রদলের ইস্তাহার ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধাচরণ করা ("increasing trespasses of the state.")। এই দল শিল্প বাণিজ্য হইতে সরকারী মালিকানা সংকুচিত করিয়া ব্যাক্তগত উদ্যোগে শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করার পক্ষপাতী। ভারতীয় স্বতন্ত্রদল পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, অসম্ভব বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ, জনসাধারণের উপর করভার চাপানো এবং অত্যধিক ঘাটতি ব্যয়সাপেক্ষ এই পরিকল্পনাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। এইরূপ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া, পরিকল্পনার কার্যক্রমকে বাতিল করিয়া, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের আর্থিক সম্পদের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সংহতি সম্পন্ন একটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার দাবিও এই দলই করে। বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে নির্বাচনী ইস্তাহারে এই দল প্রয়োজন হইলে অন্যান্য বৃহৎ শক্তির সহিত একত্রিত হইয়া প্রতিরক্ষায় অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী। চীনের সহিত ভারতের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই দল ভারতের নিরপেক্ষ নীতির সমর্থন করে না।

তৃতীয় নির্বাচনে এই দলের আবির্ভাব হওয়ার পর এই দলের দলীয় আসন-সংখ্যা রাজ্যগুলিতে খুব খারাপ হয় নাই। স্বতন্ত্র পার্টি কর্তৃক সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া জনসাধারণকে প্রাধান্য দেওয়ার এই নীতি আজিকার দিনে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে। তবে দল হিসাবে স্বতন্ত্র দলের ভূমিকাও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাও অস্বীকার করা যায় না, যখন দেখা যায় যে এন. জি. রঙ্গ, এম. আর মাসানী, জয়পুরের মহারাজা মহারাণীর ন্যায় দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতির ন্যায় একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের সমর্থন এই দলের পশ্চাতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ, দক্ষিণ ভারতে হিন্দী ভাষা বিরোধী আন্দোলন সংগঠন করিয়া এই দল যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। চতুর্থ নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি কর্তৃক গঠিত সরকারের একজন অন্যতম প্রভাবশালী সরিক হইতেছে এই স্বতন্ত্র দল। চতুর্থ নির্বাচনে লোকসভায় স্বতন্ত্র দল ৪৪টি আসন লাভ করিয়া কংগ্রেসের পর দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিসাবে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন বিধানসভা সমূহে এই দল চতুর্থ নির্বাচনে ২৫৫টি আসন দখল করিলেও ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এই আসন সংখ্যার কিছুটা পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে মন্ত্রিসভার নেতৃস্থানীয় এই দল উড়িষ্যায় রাজ্যে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীদল (**Samyukta Socialist Party**) ঃ প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে এই দল চাহিয়াছিল সমাজতন্ত্র আনয়ন করিতে গণতান্ত্রিক বিবর্তনের মাধ্যমে। আর স্বর্গত ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রচারিত সমাজতন্ত্রী দলের লক্ষ্য হইল শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের দ্রুততর পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, একদিক হইতে বিচার করিলে উভয়ের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী একই কেবল সেই উদ্দেশ্যে পৌছাইবার কার্যপ্রণালী পৃথক। প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের তদানীন্তন অন্যতম নেতা শ্রীঅশোক মেহতার সমর্থনকারীগণ ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণ সাম্যগণ এবং সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যগণ একত্রিত হইয়া সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল গঠন করেন। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল এইরূপভাবে সমাজতন্ত্রী দলের সহিত

একত্রিত হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহাদের ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত রামগড় অধিবেশনে। এইরূপ মিলনের মুখ্য কারণ উভয় দলের নীতিগত ঐক্য নাই, প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সংগঠনও ইহার জন্য কতকাংশে দায়ী। প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা শ্রীঅশোক মেহতার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে (U. N.) যোগদান এবং ইহার পর তাঁহার প্ল্যানিং কমিশনে সহ-সভাপতির পদ গ্রহণের ফলে প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির ভাঙ্গন সুরু হয়। দলীয় কার্য-নির্বাহক সমিতি শ্রীমেহতাকে পদত্যাগ করাইতে না পারিয়া তাঁহাকে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ করার অপরাধে বিতাড়িত করে। শ্রীমেহতা ও তাঁহার অনুসরণকারী কিছু সদস্য অতঃপর কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন।

দুইটি দলের সংযুক্তির ফলে গঠিত নূতন দলটি প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী হইয়াছে। বিহার, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে এই সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলটি যথেষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তবে এথরূপ প্রাধান্য আর কতকাল থাকা সম্ভবপর হইবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা যে দুইটি দলের সংমিশ্রণে এই সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলটি গঠিত, সেই দুইটি দলের সদস্যগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিরোধ দেখা যাইতেছে। যে সমাজতন্ত্রী দলের নীতিকে এই সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে ভিত্তি করিয়া দলীয় সংগঠনকে উন্নত করার প্রয়াস খুবই স্বল্প। সেই নীতি সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবের ফলে উদ্ভূত কলহ, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নূতন দলের ভিত্তি শিথিল করিয়া দলীয় সংগঠনটির অবস্থা দুর্বল করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রাক্তন নেতা শ্রীঅশোক মেহতার অনুসরণকারী দলীয় সভ্যগণের তাঁহার উপর আস্থা, অন্যান্য সভ্যগণের তাঁহাকে সমর্থন করা ও পার্টির নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য সদস্যগণের দলত্যাগের সংকল্প প্রভৃতি সমস্তই একত্রে সূচিত করে যে পি. এস. পি. এবং সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি উভয় দলেরই সংগঠন ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়ে। বারাণসী অধিবেশনে এই দলের অন্তর্ভুক্ত প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের বেশীর ভাগ সদস্য দল হইতে বাহির হইয়া আসে ও পুনরায় প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

প্রজাসমাজতন্ত্রী দল ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল উভয়েই অস্তিত্ব আজ বর্তমান। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই দলের প্রাধান্য ভালই দেখা যায়। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্মসূচী লইয়া চতুর্থ নির্বাচনে এই দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। লোকসভায় এই দল চতুর্থ নির্বাচনে ২১টি ও বিভিন্ন বিধানসভাসমূহে ১৭৬টি আসন লাভ করে। অবশ্য এই সংখ্যার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ১৯৬৯ সালে চারিটি রাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলের পরিপ্রেক্ষিতে। এই দল কয়েকটি রাজ্য বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করে।

ভারতীয় ক্রান্তি দল (Indian Revolutionary Party) ঃ চতুর্থ

সাধারণ নির্বাচনের পর মাদ্রাজ রাজ্য ছাড়া অন্যান্য অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলিতে কংগ্রেসত্যাগী বিক্ষুব্ধ সদস্যগণ যোগদান করিয়াছেন; যেমন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাকংগ্রেস,কেরালায়কেরলকংগ্রেস,উড়িষ্যায় জনকংগ্রেস, বিহারেজনক্রান্তি, প্রভৃতি দলের সদস্যগণ মূলতঃ কংগ্রেসদলেরই সদস্য ছিলেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১৯৬৭ সালে ভারতীয় ক্রান্তিদল নামে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিল। এই দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনই কোন কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তবে এই দলের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের পথেই এই দল অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ, এই দলের আদর্শ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ হইতে পৃথক হইবে না। এই দল ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর উত্তরপ্রদেশে ৯৯টি আসন লাভ করিয়াছে। কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যবৃন্দ ভারতীয় ক্রান্তি দল হইতে বাহির হইয়া আসে ও বাংলা কংগ্রেস নামে দলীয় সংস্থার বিভিন্ন কাজ পরিচালিত করে। শ্রীঅজয় মুখার্জী এই দলের নেতা।

জাতীয় বাংলা কংগ্রেস দলের প্রাধান্য পশ্চিম বাংলায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই দল, কমিউনিষ্টের দুই দল ও অন্যান্য আরও কয়েকটি দলের সহিত চতুর্থ নির্বাচনের পর এবং ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করে।

ভারতের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা ও কাজ (Role and Functions of the political parties in the actual working of the constitutional system of India) : ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার একটি প্রধান নীতি। ভারতীয় গণতন্ত্রে বহু দলের অস্তিত্ব আছে। অধিকাংশ জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়া কোন দল সরকার গঠন করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহাদের কাজ হয় নির্বাচনকালীন কার্যসূচী অনুযায়ী দলীয় নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজেদের কাজের জন্য দেশের কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা ও প্রয়োজন হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা। প্রধানতঃ জনগণের হস্তে দলীয় প্রতিনিধিগণের নির্বাচন ব্যবস্থা রাখিয়া জনসাধারণ দ্বারা তাঁহাদিগের নিয়ন্ত্রণ করা গেলেই গণতন্ত্র সাফল্যের পথে একধাপ অগ্রসর হয়। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে দলগুলিকে ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রত্যক্ষ সংযোগ ভারতের জনগণের আছে। এইদিক হইতে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে দলগুলি যে একটি গণতান্ত্রিক রূপ দান করিয়াছে সে কথা অনস্বীকার্য। তবে যে কারণে ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্যে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন তাহা

হইল এখানে একটি উপযুক্ত শাসনতান্ত্রিক বিরোধী দল এখনও গঠিত হইয়াছে কিনা এই প্রশ্ন লইয়া। সত্যিকার একটি বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। [ইতিপূর্বেই ভারতীয় পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।] বিরোধী দলগুলি নিজেদের কাজের দ্বারা জনমতকে প্রভাবিত করে, সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এইভাবে বিরোধী দল জনমতকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইলে এবং কোন বিষয়ে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলে গণতন্ত্র সার্থক হইয়া উঠে। সুতরাং পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কেবলমাত্র জনগণের সর্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি ও এইরূপ ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনব্যবস্থাই একমাত্র অপরিহার্য অঙ্গ নয়, বিরোধীদলেরও এই ব্যাপারে একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রহিয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি সুসংগঠিত বিরোধী দল এতকাল গঠিত না হওয়ায় সরকার গঠনকারী দলের পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ করা কার্যতঃ অসম্ভব হয় নাই। সেইজন্য ভারতের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রবর্তিত পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে ১৯৬৭ সালে ও ১৯৬৯ সালে সংঘটিত ৪টি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে দলীয় নীতি ও আদর্শে পরস্পরের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি জনমতকে পরিচালিত করিয়া বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট সরকার (বিকল্প সরকার) গঠন করিয়াছে। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি বিকল্প সরকার গঠন করিয়া আটটি বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের চাহিদাকে কার্যকরী করিয়াছে। বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস, ও যেখানে কংগ্রেস দল সরকার গঠন করিয়াছে সেখানে অন্যান্য দলও আজ বিরোধী দলের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। সুতরাং যদিও বহু দলের অস্তিত্ব ভারতে বর্তমান এবং প্রকৃত বিরোধীদল হিসাবে কোন একটি দলের বিশেষ প্রাধান্য নাই, তবুও ভারতে যে সত্যিকার বিরোধী দল গড়িয়া উঠে নাই একথা বলা চলে না।

ইতিপূর্বেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে কংগ্রেস দল ছাড়া অন্য কোন দলের (কেরল ছাড়া) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সমগ্র রাষ্ট্রে চতুর্থ নির্বাচনের পূর্বে সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনের পর হইতেই দেখা যায় একমাত্র কংগ্রেস দলই কেন্দ্রে ও সমস্ত রাজ্যগুলিতে সরকার গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কেবলমাত্র ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় নির্বাচনের ফলের ভিত্তিতে কেরল রাজ্যে কমিউনিষ্ট দলের নিকট কংগ্রেসকে উক্ত রাজ্যের শাসনভার কিছুকালের জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়। উড়িষ্যায়ও কংগ্রেসকে কিছু কালের জন্য অন্য দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে দেখা গিয়াছে। আবার তৃতীয়

নির্বাচন (১৯৬২ সালে) সমাপ্ত হওয়ার পর কেরল রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন দলেরই না থাকায় সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে কংগ্রেসী দল কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের উক্ত রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিরোধী দল হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিষ্ট দল, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, স্বতন্ত্র দল, জনসংঘ, প্রভৃতির যে যথেষ্ট প্রাধান্য আছে তাহা তাহাদের ভূমিকা হইতেই স্পষ্ট হয়। তবে সংযুক্তভাবে সরকারের বিরোধিতা করিয়া সত্যিকারের বিরোধী দলের গণতন্ত্রে যে ভূমিকা, সেই ভূমিকায় ইহারা চতুর্থ নির্বাচন ও তাহার পর পশ্চিম বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহার ছাড়া অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। এককভাবে কমিউনিষ্ট দল সর্বভারতীয় বিরোধী দল হিসাবে যে কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছিল নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলে তাহাদের সেই অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। এই দলটি এখন দক্ষিণ ও বামপন্থীগণের মধ্যে বিভক্ত। একদল রাশিয়ার সাম্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত, অপর একটি দল পিকিংপন্থী। অবশ্য ইতিমধ্যেই এই দলের অপর একটি শাখা নকসালপন্থী নামে আবির্ভূত হইয়াছে। অন্তর্বিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে পারিলে কমিউনিষ্ট দলই যে কংগ্রেসের পর সত্যিকার অপর প্রধান দল হিসাবে মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইত তাহা তাহাদের কিছুকাল আগেকার কার্যাবলী হইতে ধারণা করিতে অসুবিধা হয় না। আবার স্বতন্ত্র ও জনসংঘের মত দক্ষিণপন্থী দলের উপর বিশেষ আস্থা অনেকে স্থাপন করিতে রাজী নহেন। বস্তুতঃ, লোকসভায় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহা অত্যন্ত নগণ্য। অথচ কমিউনিষ্ট দলের সহিত নীতিগত পার্থক্যের দরুণই সম্ভবতঃ এই দলগুলি কমিউনিষ্ট দলের সহযোগিতায় প্রকৃত বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকায় একযোগে অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। যাহা হউক, এইভাবে বিরোধী দলের ভূমিকা ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হওয়ার দরুণ অন্যতম সরকার গঠনকারী কংগ্রেস দলের পক্ষে মাত্র শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ ভোট পাইয়াও এককভাবে কেন্দ্রের ও অধিকাংশ রাজ্যগুলির আইনসভায় এতকাল প্রাধান্য ভোগ করা অসুবিধাজনক ব্যাপার হয় নাই। সত্যিকার বিরোধী দল যদি ভারতে থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নির্বাচনের মাপ-কাঠিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও চতুর্থ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত গতিতে শাসন কার্য চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে দলীয় ব্যবস্থা যে সেখানে গণতন্ত্রকে কতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। কয়েক বছর আগে মাত্র নয় মাসের জন্য ইংলণ্ডের 'লেবার' দলের গঠিত সরকারকে যে প্রাক্তন সরকারী দল 'কন্‌জার্ভেটিভ' পার্টির

বিরোধিতার দরুণ কিরূপ সংযত, সতর্ক ও সুবিবেচনা সহকারে প্রতিটি বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল তাহা সেখানকার শাসনতান্ত্রিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝা যায়। গত ৭ই জুলাই ১৯৬৫ সাল ইংলণ্ডের সরকারকে আইন সভায় যে পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে হয় (অবশ্য সরকারের পতন ইহাতে হয় নাই) তাহা নির্দিষ্টভাবেই ইংগিত করে যে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বিরোধী দলের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদিও এইরূপ একটি বিরোধী দল প্রত্যক্ষ করা যায় না, তবুও বিরোধী দল হিসাবে বিভিন্ন দল ক্রমশঃ যে ভাবে নিজেদের যৌথভাবে অথবা এককভাবে পরিচালিত করিতেছে তাহাতে ভারতের বহু দলীয় ব্যবস্থার মধ্য হইতেও এখানে একটি দ্বিমুখী অথবা ত্রিমুখী গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যাহার ফল ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইতেছে এবং হইবে আশা করা যায়। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় পশ্চিম বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে সংযুক্তভাবে বিরোধী দলগুলি কংগ্রেস শাসনের বিলোপ ঘটাইয়া জনগণের আশা-আকাংখাকে মূর্ত করার জন্য যেভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহার ফল স্পষ্টতঃই সূচিত করে যে, ঐসব রাজ্যে দলীয় ব্যবস্থায় একটি দ্বিমুখী গতি প্রতিফলিত। স্বতন্ত্র ও জনসংঘের ন্যায় দক্ষিণপন্থী দলগুলি পশ্চিমবাংলা হইতে নিশ্চিহ্ন হয় এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও ইহাদের প্রধান্য বেশ কিছুটা হ্রাস পায়।

ভারতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে দলীয় স্বার্থের খাতিরে অন্যায় ভাবে দলীয় সংগঠন আইনসভার কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কয়েক বছর আগে উড়িষ্যায়, পাঞ্জাবে এবং বিহারে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সংস্থা যেভাবে সেখানে যাইয়া আইনসভার অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন কংগ্রেসী নেতাকে ঐ সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ হইতে সরাইয়াছেন এবং অন্যদের তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহা দলের সংগঠনের দিক হইতে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলেও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কাম্য নয় বলিয়াই মনে হয়। আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা এইভাবে আইনসভার অভ্যন্তরেই আইনসভা অপেক্ষাও অধিক প্রভাবিত হন দলীয় নির্দেশ ও আদেশ দ্বারা। এমন কি, নেহেরু ও শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় আইনসভার নেতা হিসাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের সময়ও আমরা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির যে তৎপরতা দেখিয়াছি কেন্দ্রীয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আইন-সভার অভ্যন্তরে কংগ্রেসের মধ্যে ততটা তৎপরতা দেখি নাই। উড়িষ্যায় স্বয়ং তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট কামরাজ, এবং হরিয়ানার কিছুকাল পূর্বের গোলযোগ নিরসনের জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত শ্রীগুলজারিলাল

নন্দ বাহির হইতে রাজ্যগুলিতে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিকূল তাহা সহজেই অনুমেয়। নীতি গ্রহণ করিবে দল, এবং সেই নীতি অনুযায়ী সরকার গঠন করিতে পারিলে কাজ করিবে আইনসভায় সেই দল। সরকার গঠন করার পর আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই দলীয় নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করিবেন। সেই কার্য পরিচালনায় বাহিরের নিয়ন্ত্রণ, এমন কি, দলীয় নিয়ন্ত্রণও গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া কাম্য বিবেচিত হয় না। এই দিক হইতে ভারতের দলীয় ব্যবস্থা যে এখানকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ নির্বাচন ও ১৯৬৯ সালের মধবর্তী নির্বাচনের পর বিভিন্ন দলগুলি একভাবে কংগ্রেসের পরিবর্তে কয়েকটি রাজ্যে সরকার গঠন করিয়াছে। যেহেতু বিভিন্ন দলের নীতি ভিন্ন ভিন্ন এবং যেহেতু একটি সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ইহারা একত্রিত হইয়া কংগ্রেসের পরিবর্তে সরকার গঠন করিয়াছে, সেইজন্য আইনসভার অভ্যন্তরে আইন সভার বাহির হইতে দলীয় সর্বোচ্চ সমস্যাগুলি হইতে ইহাদের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এখনও আসে নাই। ভবিষ্যতে কি হয় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বিভিন্ন দলের দলীয় সংগঠনের জন্যই হউক, আর অন্য যে কোন কারণেই হউক, ভারতের ক্ষেত্রে সত্যিকার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের অনুকূল ও উপযুক্ত বিরোধী দলের বিকাশ এতকাল পর্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহার অপর একটি কারণ হিসাবে কেহ কেহ দলগুলির বিরোধী দল হিসাবে সঠিকভাবে কার্য করিতে অনিচ্ছাকেও নির্দেশ করেন। কোন দলই যে শৃংখলাবদ্ধভাবে ও গঠনমূলক পদ্ধতিতে এই বিরোধীদলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারে নাই সে কথা অনস্বীকার্য। কোন দলই কেবলমাত্র সরকারের বিরোধিতা করা ছাড়া এতকাল অন্য কোন বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। এইরূপ বিরোধিতা করার ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখাইলেও জনমতকে সুসংগঠিত করার যে অন্যতম কার্য পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে বিরোধী দলের থাকা উচিত সে বিষয়ে ভারতের কোন বিরোধী দলেরই এযাবৎ কাল বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় নাই। চতুর্থ নির্বাচনের পর দেখা যায় এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে সর্বপর্যায়ে। অভিযোগ করা হয় যে অনেক সময় কংগ্রেসও বিরোধী দলের সহায়তায় সরকার গঠন করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে কংগ্রেস কাহারও সঙ্গে 'কোয়ালিশন' করিবে না। অথচ বিহার ও উত্তর প্রদেশ কোয়ালিশন করার জন্য কংগ্রেস উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং ১৯৬৯ সালের মধবর্তী নির্বাচনের পর ঐ দুইটি রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে; অথচ আইনসভায় বিরোধী দল হিসাবে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিরোধীদলের ভূমিকায়

অবতীর্ণ হইয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে মর্যাদা দান করিতে তাহারা মোটেই আগ্রহান্বিত হয় নাই।

কিছুকাল পূর্ব হইতে আর একটি বিষয় ভারতের দলগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয় যাহা পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থায় খুবই অশোভন—ইহা হইল কিছু কিছু দলের সদস্যগণের ঘনঘন দলত্যাগ করা। এই দলত্যাগী সদস্যগণের অন্য দলে যোগদান অথবা অন্যদলকে সমর্থনের মাধ্যমে সরকারের অন্যতম সরিক হইয়া কাজ করার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দলীয় ব্যবস্থায় এই দলত্যাগ প্রথা যে স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কতখানি প্রতিবন্ধক তাহা ভারতের কতিপয় রাজ্যের কার্যাবলী হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করি। অবশ্য সংসদ কর্তৃক দলত্যাগ সম্পর্কিত গঠিত কমিটি এই বিষয়ে ইতিপূর্বেই তাহাদের সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। আশা করা যায় যে এই অবস্থা সম্পর্কে শীঘ্রই সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ভারতীয় গণতন্ত্র আজ প্রতিষ্ঠার পথে চলিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সেইজন্য শিক্ষিত জনগণ বিশেষভাবে তাকাইয়া আছে, একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রবর্তনের দিকে। অথচ দলীয় নীতি ও কার্যক্রমের বিচার করিলে দেখা যায় যে কমিউনিষ্ট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র বা প্রজাসমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষে একত্রিত হইয়া কাজ করা সম্ভবপর নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র আজ অবশ্যই আশা করিবেন যে সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি কেবল বিচ্ছিন্নভাবেই বামপন্থী দল হিসাবে সরকারের কাজকর্ম পর্যালোচনা করিবে না, ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি জাতীয় দলের নেতৃত্বে তাহারা সংঘবদ্ধ হইবে এবং জনস্বার্থ-বিরোধী সরকারীকাজের বিরোধিতা করিয়া প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিবে। একটি বিষয়ে অবশ্য সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন —জনগণই একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচারক। সুতরাং সেই জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিতে উদারতা ও প্রসারতা না আসিলে তাহাদের বিচার ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে যাইবে না। সুতরাং দলীয় সংগঠনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত সব স্তরের জনসাধারণের শিক্ষার সম্প্রসারণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থার উন্নতির ইহাও একটি ভিত্তি বলা যায়।

Exercise

1. Discuss the role of the Opposition Party in a democratic country with special reference to India. (৩৮২-৮৩ পৃষ্ঠা, ৪০১-৪০২ পৃষ্ঠা ।)
(ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা কর।)

2. Discuss the characteristics of the Indian Party System.
(ভারতের দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।)
(সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সারাংশ লিখ।)

3. Write noters :—টীকা লিখ :—
   (*a*) The Indian National Congress, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,
   (*b*) The Communist Party of India, কমিউনিষ্ট দল,
   (*c*) The Swatantra Party, স্বতন্ত্র দল
   (*d*) The Praja Socialist Party of India, প্রজাসমাজতন্ত্রী দল,
   (*e*) Hindu Mahasabha, হিন্দু মহাসভা,
   (*f*) The Bharatiya Jana Sangha. ভারতীয় জনসংঘ।

(৩৮৮-৪০০ পৃষ্ঠা।)

4. Give an account of the aims and progammes of different political parties in India.

(ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।)

(৩৮৮-৪০১ পৃষ্ঠা।)

5. Examine the role of the political parties in the actual working of the constitutional system of India. [C. U. B. A. Pt. II 1964]

(ভারতের শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থার প্রতিফলিত রূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

[পরিশিষ্ট "বিশেষ অনুশীলনী" দেখ] (৪০১-০৬ পৃষ্ঠা।)

6. Discuss briefly the aims and objects of any two of the political parties in India. (C. U. B. A. Pt. II 1965)

(ভারতের যেকোন দুইটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।)

(৩৮৮-৪০০ পৃষ্ঠা দেখ।)

7. Give an account of the Party system in India. (C.U. B.A. 1967)

(ভারতের দলীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

(সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সারাংশ লিখ।)

———

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সরকারী ভাষা
(The Official Language)

[ভারতের বিভিন্ন ভাষা—ভারতের কেন্দ্রে সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজী ও হিন্দী—ভাষা কমিশন—বিভিন্ন রাজ্যের যোগাযোগ স্থাপনকারী সরকারী ভাষা—ভারতের একটি আঞ্চলিক রাজ্যের সরকারী ভাষা—আদালতে প্রচলিত সরকারী ভাষা—১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা আইন—হিন্দীকে সরকারী ভাষায় পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণ করার প্রস্তাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া—১৯৬৩ সালের ভাষা সম্পর্কিত আইনের সংশোধনী প্রস্তাব—উপসংহার]

জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে ভাষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। একটি দেশে অসংখ্য ভাষাভাষী লোক অবস্থান করিলে সেই লোকদের সমস্ত ভাষাকে যদি সরকারী কার্যকলাপের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে সন্দেহ নাই। সুতরাং অনুসন্ধানের পর যখন ভারতে ৮৪৫টি ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় তখন সরকারী কার্যকলাপ ও যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায় এরূপ কোন ভাষার প্রয়োজনীয়তা সংবিধান-প্রণেতাগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। আরও অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে ১৪টি ভাষা ভারতের প্রধান ভাষা হিসাবে মর্যাদালাভের অধিকারী। সেইজন্য ১৪টি ভাষাই রাষ্ট্রের প্রধান ভাষা হিসাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে যেহেতু হিন্দীভাষার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে ইহা (উর্দুসহ) প্রায় শতকরা ৪৬ জন লোক ব্যবহার করে সুতরাং সরকারী ভাষার ক্ষেত্রে অপর ১৩টি ভাষা অপেক্ষা হিন্দী ভাষাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অবশ্য অন্য ১৩টি ভাষাকেও রাজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী ভাষা হিসাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

ভারতের বিভিন্ন ভাষা

সংবিধানে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, হিন্দীভাষা ও দেবনাগরী লিপি ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য হইবে। তবে ইহাও নির্দিষ্ট আছে যে সংবিধান চালু হওয়ার পর পনেরো বৎসর পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা পূর্বের ন্যায় ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। অবশ্য ঐসময়েই রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা ইংরাজীর অতিরিক্ত হিন্দী ভাষাতেও সরকারী কাজ চালাইবার নির্দেশ দান করিতে পারেন। আবার উক্ত ১৫ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলেও পার্লামেণ্ট ইংরাজী অথবা হিন্দী ভাষায় সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে (সংবিধানে ৩৪৩নং ধারা)। অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত ইংরাজীকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম চালাইবার ভাষা হিসাবে হিন্দীর সহিত ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়, এবং তাহার পর ইংরাজীর স্থায়িত্ব পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে স্থির হয়।

ইউনিয়নের সরকারী ভাষা

সরকারী ভাষা হিসাবে নির্ধারিত হিন্দী ভাষার উন্নতিকল্পে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্বন্ধেও সংবিধানে উল্লেখ আছে। ইহার প্রসার ও উন্নতির সকল প্রকার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে এমনভাবে করিতে হইবে যেন ইহা ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের ভাব বিনিময়ের একটি মর্যাদাসম্পন্ন মাধ্যম হইয়া উঠিতে পারে (সংবিধানের ৩৫৯নং ধারা)। অন্যান্য তেরটি ভাষাকেও সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আঞ্চলিক ভাষার প্রসারকল্পে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। কেন্দ্রে নির্ধারিত হিন্দীভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত আবেদন উভয়ই গ্রহণযোগ্য হইবে। ইহা ছাড়া, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষায় সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা সংবিধানের ৩৫০ যে ধারায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণী প্রদান করিবেন রাষ্ট্রপতি তাহা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারে নিকট প্রেরণ করিবেন।

সরকারী ভাষা ও গৃহীত অপর তেরটি ভাষার উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা

হিন্দীর ব্যবহারকে সকলের নিকট প্রিয় করিয়া তোলার জন্য এবং উল্লিখিত ১৫ বৎসর কাল অতিক্রম করার পর যাহাতে হিন্দী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি ভাষা কমিশন (Language Commission) গঠন করিবার ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। সংবিধান চালু হওয়ার ৫ বৎসর পর এবং আবার তাহার ১০ বৎসর পর পর এইরূপ ভাষা কমিশন রাষ্ট্রপতি গঠন করিতে পারেন। এইরূপ কমিশনের মুখ্য কাজ হইল রাষ্ট্রপতির নিকট নিম্নোক্ত বিষয়ে সুপারিশ করা—ইউনিয়নের সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর প্রগতিশীল ব্যবহার, কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা হিসাবে প্রচলিত ইংরাজী ভাষার কোন একটি অথবা অধিক বিষয়ে ব্যবহারের উপর বাধানিষেধ আরোপ, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টে ব্যবহৃত ভাষা, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষার কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত লিপি। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইউনিয়নের সরকারী ভাষা অথবা ইউনিয়ন ও রাজ্য কিংবা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে সুপারিশের জন্য কমিশনের নিকট প্রেরিত বিষয়েও কমিশনকে সুপারিশ প্রদান করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি ১৪টি প্রধান ভাষার অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি লইয়াই এই কমিশন গঠন করিবেন। এই কমিশন কর্তৃক দেওয়া সুপারিশকে বিবেচনা করার জন্য লোকসভা হইতে ২০ জন ও রাজ্য সভা হইতে ১০ জন সদস্য লইয়া একটি

ভাষা কমিশন (Language Commission)

কমিটি নির্বাচিত হইবে। আইনসভার এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি ভাষা সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

প্রথম ভাষা কমিশন স্বর্গত বি. জি. খেরের (B. G. Kher) সভাপতিত্বে ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়। কমিশন ১৯৫৬ সালে তাহাদের রিপোর্ট প্রদান করে। এই রিপোর্ট বা বিবরণী পার্লামেন্টের ৩০ জন সদস্যের একটি কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়। সেই কমিটি আবার ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহাদের রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করে। ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে জানা যায় যে সব সদস্য রিপোর্টটি বা বিবরণীটি সম্পর্কে একমত পোষণ করেন নাই। বরং কোন কোন সদস্য রিপোর্টটির কঠোর বিরোধিতা করেন। যে দুইজন সদস্য ভাষা কমিশনের সুপারিশসমূহে সায় দিতে পারেন নাই তাঁহারা হইলেন ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মাদ্রাজের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর পি. সুব্বারায়ান। যাহা হউক, কমিটির অধিকাংশ সদস্যগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল: ভারতের প্রশাসনিক নীতির গঠনতান্ত্রিক বুনিয়াদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজীকে কোনক্রমেই জনগণের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ("Mass medium") রূপে কল্পনা করা যায় না। ভাষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের কমিটি হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। তবে এইরূপ সতর্কবাণীও তাঁহারা উচ্চারণ করেন যে ইংরাজী হইতে সরকারী ভাষাকে পরিপূর্ণভাবে হিন্দীতে রূপায়ণ করার সময় যেন অত্যন্ত উদারতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

প্রথম ভাষা কমিশন (১৯৫৫)

উক্ত সুপারিশ ও কিছু অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের তীব্র সমালোচনার ফলে সরকার সরকারী ভাষা সম্পর্কিত একটি বিল পার্লামেণ্ট উত্থাপন করেন সেই বিলের বিভিন্ন ধারার আলোচনার পূর্বে আমরা বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী ভাষা, ইউনিয়ন ও রাজ্যের যোগাযোগকারী সরকারী ভাষা সম্বন্ধে সংবিধানের বিধানগুলি আলোচনা করিব।

রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্দেশ হইল—রাজ্যের আইনসভা আইনের দ্বারা রাজ্যে প্রচলিত এক কিংবা একাধিক ভাষাকে অথবা হিন্দী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে অথবা সরকারী কার্যকলাপ চালাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে। তবে সংবিধানে এরূপ নির্দেশও আছে যে যতদিন পর্যন্ত না রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন দ্বারা রাজ্যের সরকারী ভাষা নির্দিষ্ট করিতেছে ততদিন পর্যন্ত সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে রাজ্যগুলিতে যে সমস্ত সরকারী কাজের জন্য ইংরাজী ভাষা প্রচলিত ছিল সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য ইংরাজী ভাষাই রাজ্যটির সরকারী ভাষা হিসাবে

রাজ্যের সরকারী ভাষা

গণ্য হইবে। কোন রাজ্যের অধিকসংখ্যক লোক অন্য কোন ভাষাকে রাজ্যে সরকারী কার্যকলাপের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার আবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট করিলে (সংবিধানের ৩৪৭ নং ধারা অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতি উক্ত ভাষাকে রাজ্যের জন্য সরকারী কার্যকলাপের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান করিতে পারেন।

একটি রাজ্যের সহিত অপর রাজ্য এবং রাজ্য ও ইউনিয়নের যোগাযোগকারী সরকারী ভাষা

১৯৬৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হিসাবে স্বীকৃত ইংরাজী ভাষাকেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এবং একটি রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের যোগাযোগ স্থাপনকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তবে ইহাও স্থির হয় যদি দুই অথবা ততোধিক রাজ্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহাদের সরকারী কার্যকলাপের এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা চলিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষাকে সংযোগ স্থাপনকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ না করিলেও চলিবে (সংবিধানের ৩৪৬ নং ধারা)।

সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের ক্ষেত্রে সরকারী ভাষা

সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহাও সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যতদিন পর্যন্ত না এই মর্মে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতেছে ততদিন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের সমস্ত কার্যাবলী ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইবে। পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্যসরকারের বিল অথবা কোন আইন, কোন অর্ডিন্যান্স অথবা নিয়ম ও আদেশ প্রভৃতি সব কিছুই ইংরাজী ভাষায় প্রণীত হইবে। তবে রাজ্য-আইনসভা কোন বিল অথবা আইনের ক্ষেত্রে ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহারের বিধান দিতে পারে; কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিল অথবা আইনের ইংরাজী ভাষা অবশ্যই অন্য ভাষায় প্রণীত আইন অথবা বিলটির সহিত প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষায় দেওয়া অনুবাদ বা ভাষ্যটিকে "Authoritative Text" হিসাবে ধরিতে হইবে। রাজ্যের কোন ভাষায় প্রণীত বিল অথবা আইনের সহিত যদি ইহার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হয়, এবং ইহা লইয়া কখনও মতভেদ দেখা দেয় তাহা হইলে সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশই আছে যে ইংরাজী ভাষায় দেওয়া অনুবাদটি রাজ্যের ভাষায় লিখিত বিধানের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। আবার সংবিধানের ৩৪৮ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া রাজ্যপাল হাইকোর্টের কার্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য হিন্দী অথবা রাজ্যে সরকারী কাজের জন্য গৃহীত ভাষাকে অনুমোদন করিতে পারেন। তবে বিচারের রায়, আদেশ অথবা ডিগ্রীর ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা অবধি রাজ্যের গৃহীত প্রচলিত ভাষা

অথবা হিন্দীভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে।

১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা সম্পর্কিত আইন (The Official Language Act, 1963) :

১৯৬৩ সালের ১৩ই এপ্রিল ভারতের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারী ভাষা সম্পর্কে একটি বিল লোকসভায় উত্থাপন করেন। এই বিলটিতে ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পরও যাহাতে হিন্দীভাষা এবং ইংরাজী ভাষা উভয়কেই সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করা যায় তাহারই প্রস্তাব করা হয়। বিলটি অনেক বিতর্ক ও অনেক বাদানুবাদের পর পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ও উহা আইনে পরিণত হয়। ১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা সম্পর্কিত আইনের মুখ্য ধারাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, হিন্দীর সহিত ইংরাজী ভাষা ইউনিয়নের এবং পার্লামেন্টের কার্যাবলী পরিচালনায় সরকারী ভাষা হিসাবে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসের পর চলিতে পারে ("may continue")।

দ্বিতীয়ত, দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পর পার্লামেণ্ট একটি কমিটি নির্বাচিত করিবে। এই কমিটি রাষ্ট্রপতিকে সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীভাষা কিরূপ উন্নতি করিয়াছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া একটি বিবরণী প্রদান করিবে। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসরকার-গুলির সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিবরণী ও ঐ প্রসঙ্গে কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পরিপূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে কার্যকর করার আদেশ দান করিবেন।

তৃতীয়ত, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীর পর হইতে পার্লমেণ্টে উত্থাপিত বিল ও প্রণীত সমস্ত আইন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রবর্তিত সমস্ত অর্ডিন্যান্সই হিন্দী ও ইংরাজী উভয় ভাষায় তৈয়ার করিতে হইবে।

চতুর্থত, যে সমস্ত রাজ্যবিধানসভা হিন্দী ছাড়া অপর কোন ভাষা রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেই সমস্ত রাজ্যে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় সমস্ত আইন প্রকাশ করিতে হইবে। আইনটির হিন্দী ও ইংরাজী ভাষ্য এইরূপ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করিয়া কোন রাজ্যের রাজ্যপাল ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীর পর হিন্দী অথবা রাজ্যের জন্য গৃহীত সরকারী ভাষাকে রাজ্যের হাইকোর্টের রায়, আদেশ অথবা ডিক্রির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার আদেশ প্রদান করিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষায় উহাদের অনুবাদ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

ষষ্ঠত, উক্ত ৪ এবং ৫ নম্বরে বর্ণিত ধারাগুলি জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৯৬৩ সালের ভাষা সম্পর্কিত আইন রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণের উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। হিন্দীভাষার সমর্থকগণ হিন্দীর সহিত ইংরাজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবহার সংবিধান-বিরোধী আইন হিসাবে ইহার তীব্র সমালোচনা করেন। আবার যাঁহারা ইংরাজীর সমর্থক অথবা যাঁহারা পরিপূর্ণভাবে হিন্দীভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা ১৯৬৩ সালের আইনের অন্তর্গত বিশেষ শব্দের উপর জোর দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে হিন্দীর সহিত ইংরাজী "চলিতে পারে" শব্দটির দ্বারা হিন্দীকে সমগ্র দেশের উপর চাপাইবার একটি পরোক্ষ প্রচেষ্টা আইনটিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা "may" শব্দটির পরিবর্তে "shall" শব্দটি আইনটির মধ্যে সংযোজিত করিবার দাবি করেন। ১৯৬৫ সালে ভাষা সম্পর্কিত আইনটি কার্যকর করার সময়েই ভারতের দক্ষিণদিকে প্রবল বিক্ষোভ সুরু হয়। স্বর্গত নেহেরুর আশ্বাস অনুযায়ী ইংরাজী ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলিবে এইরূপ আশাই সমস্ত ভারতবাসী মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষাকে বিদায় দেওয়া ও হিন্দীকে দেশে চালানোর জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সরকারী মহলে চলিতে থাকে তাহারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমগ্র দক্ষিণ ভারত এক প্রবল হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া সরকারী কাজের তীব্র বিরোধিতা করিতে থাকে। ঘটনা যখন প্রায় আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখনই সরকারী মহলের টনক নড়ে। সমগ্র ভাষা-প্রশ্নটিকে নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখার কথা তখন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন। প্রথম পর্যায়ে সমস্ত অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণের এক বৈঠক বসে, এবং সেই বৈঠকে এই বিষয়ে পুংখানুপুংখভাবে বিচার ও বিবেচনা চলে।

ভাষা আইনে সমগ্র দেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

অতঃপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই মর্মে সুপারিশ করার জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করেন। সাবকমিটির সুপারিশের পরিপেক্ষিতে দেশের জটিল ভাষা সম্পর্কিত সমস্যাটির সমাধানের জন্য অতঃপর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর ২রা জুন ১৯৬৫ সালে তাহাদের সিদ্ধান্ত সরকারকে জানায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভাষার প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য যে সকল প্রস্তাব করিয়াছে তাহার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে ১৯৬৩ সালের ভাষা আইনটি উপযুক্ত রূপে সংশোধিত হইবে, ভাষা সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

কংগ্রেস ওয়ার্কিংকমিটির ভাষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত

১। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের জন্য হিন্দী এবং ইংরাজী উভয় ভাষাই দীর্ঘকাল চালু থাকিবে এবং প্রতি রাজ্যে প্রশাসন ও শিক্ষার মাধ্যমে হইবে সেই রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পর্যন্ত তিন-ভাষা নীতি প্রবর্তন করা হইবে এবং কঠোরভাবে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

৩। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাগুলি ইংরাজী, হিন্দী এবং অন্যান্য সংবিধান স্বীকৃত ভাষায় গৃহীত হইবে। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তবে ইহাও বলা হয় যে সর্বভারতীয় চাকুরীর মাধ্যম হিসাবে ১৪টি সংবিধান-স্বীকৃত ভাষা ঠিকভাবে প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ইংরাজীই একমাত্র মাধ্যম থাকিবে।

৪। এই পাবলিক সাভিস কমিশনের পরীক্ষায় হিন্দী এবং ইংরাজী আবশ্যিক বিষয় হইবে এবং যে প্রার্থীর ভাষা হিন্দী তাঁহাকে অন্য যে কোন একটি ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (ক) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জাতীয় ভাষা সেই রাজ্যের প্রশাসনের মাধ্যম হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হইবে, (খ) বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষার মান ধীরে ধীরে উন্নত করিতে হইবে। এবং (গ) ইংরাজী ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় এই ভাষার শিক্ষা চালু রাখিতে হইবে।

৬। হিন্দীভাষার উন্নতির জন্য এমনভাবে পর্যায়িত কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং দেশের সংযোগ রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত ভাষা হইয়া উঠিতে পারে।

৭। অন্যান্য জাতীয় ভাষাগুলির অগ্রগতির জন্যও কার্যসূচী রচনা করিতে হইবে এবং তাহা কার্যকর করিতে হইবে।

উপরোক্ত ভাষা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় অঙ্গরাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রিগণও উপস্থিত ছিলেন। বলা হইয়াছে এই সিদ্ধান্তটি সর্ববাদিসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল তাহা দূর হইয়াছে বলিয়াও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মহল হইতে দাবি করা হয়।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্টে নূতন সরকারী ভাষা আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে প্রাক্তন দুইজন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইংরাজী ভাষাকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতিকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইনে অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলি যতদিন চাহিবে ততদিন সরকারী কাজে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে, এবং ইংরাজী ভাষাও হিন্দী ভাষার সমান মর্যাদা লাভ করিবে। কিন্তু এই আইনে একটি বিধান করা হইয়াছে যে সরকারী চাকুরীর জন্য সর্বভারতীয় পরীক্ষা হিন্দী অথবা

১৯৬৭ সালের ভাষা আইন

ইংরাজী ভাষায় দেওয়া যাইবে। ইহাতে স্বভাবতঃই অহিন্দী ভাষীদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। ইহার ফলে মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে তীব্র ভাষা আন্দোলন সুরু হইয়াছে। অপরপক্ষে হিন্দী-ভাষীগণও "অংরেজী হঠাও" আন্দোলন জোরদার করিয়াছেন। হিন্দীভাষীদের মধ্যেও অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ত করার আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে অদূর ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলি আঞ্চলিক ভাষায় গ্রহণ করার কথা বিবেচিত হইবে। এইক্ষেত্রে ত্রি-ভাষা সূত্র গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়েও জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

সরকারী ভাষা সম্পর্কিত সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলি ও ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষার প্রসারের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ভাষা আইনটির সংশোধন

উপসংহার

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীঘ্রই করা হইবে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে উপসংহারে বলা চলে যে কেন্দ্রে ইংরাজী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ১৯৬৫ সালের পরও বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভালই করা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার জন্ম বিদেশে হইলেও ঐ ভাষাকে আমরা আপন করিয়া আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছি। উহা এককালে ভারতের শাসকসম্প্রদায়ের ভাষা থাকিলেও সেই সম্প্রদায় আজ আর ভারতের শাসক নয়। সুতরাং ইংরাজী ভাষাকে আজ আর বিদেশী শাসকের ভাষা বলিয়া পরাধীনতার প্রতীক হিসাবে গণ্য করা যায় না। এইরূপ ভাষাকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য গ্রহণ করা খুবই বাঞ্ছনীয়। কোন একটি আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ সেই অঞ্চলটির অধিবাসীদের জন্য অধিকতর সুবিধা অল্পায়াসে ভোগ করার সুযোগ করিয়া দেওয়া। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এমন কোন ভারতীয় ভাষা যদি পাওয়া যায় যে ভাষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকতম অধিবাসী মাতৃভাষার ন্যায় সমাদরের সাথে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে, তাহা হইলে সেই ভাষা অনায়াসে ভারতীয় সর্বজনীন ভাষা হিসাবে গৃহীত ও ভাষাগুলির শীর্ষে স্থাপিত হইতে পারে। তখন ইংরাজীর প্রয়োজন মোটেই অনুভূত হইবে না। হিন্দী ভাষাকে সেই ভাষার মর্যাদা দান করার চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং হইতেছে। অথচ ইহা মোটেই সর্বজন আদৃত ভাষা হিসাবে ভারতে গণ্য নয়। সেইজন্যই সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে সরকারী ভাষা হিসাবে ইহা সমস্ত দেশের স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জনসাধারণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি ভাষা বজায় রাখার নীতিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অনুসরণ করিতে হইবে। প্রত্যেককে স্বীয় মাতৃভাষা, ইংরাজী ভাষা ও হিন্দী ভাষা স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত অবশ্যই শিখিতে হইবে। যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাহাদের অপর একটি

আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা শিখিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সকল অঞ্চলের পক্ষে প্রয়োগ করিয়া কার্যকর করিতে পারিলে ইহা সুফল প্রসব করিবে মনে হয়। বস্তুতঃ, ভারতের সকল অঞ্চলের লোকেরই উচিৎ আজ নিজের অঞ্চলের ভাষা ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও সম্যক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের ভাষাকে জানিয়া ও তাহাদের শ্রদ্ধা করিয়া সেই জ্ঞান ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে পারিবে। তাহা হইলে জাতীয় সংহতি বজায় থাকিবে এবং এইরূপ সংহতি দেশকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে একধাপ অগ্রসর করিয়া দিবে। যে চৌদ্দটি ভাষা সংবিধানে স্বীকৃত তাহাদের প্রত্যেকটি ভাষাকে যদি আদরণীয় ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে ভারতীয় ভাষাগুলি একে অন্যের কাছে ক্রমেই সরিয়া আসিবে এবং কোন একটি ভাষা একদিন সংযোগরক্ষীরূপে আপন উপযোগিতা আপন প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই সহজ বিবর্তনের মধ্য দিয়া আসা ভাষাকে গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকার কথা নয়—সে হিন্দীভাষাই হউক আর অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষাই হউক। জোর করিয়া ইংরাজী তাড়ানো এবং ভাবাবেগে চালিত হইয়া হিন্দী প্রবর্তনের আয়োজন না করিয়া সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিলে জাতির জীবনে ভাষা-প্রশ্নটি কলঙ্ক লেপন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, অতীতের সেই কলঙ্কপূর্ণ ইতিহাসকে বিস্মৃত না হইয়া যদি বাস্তব ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভাষাপ্রশ্ন সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যত বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলেই মঙ্গল। কোন একটি বিশেষ ভাষাকে জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংসদে দলীয় সংখ্যাধিক্যের জোরে জনগণের উপর আরোপ করার সিদ্ধান্ত জাতীয় জীবনে কখনই ভাল ফল প্রদান করিবে না, বরং ইহা দেশের অগ্রগতিকে একধাপ পশ্চাতে ঠেলিয়া দিবে।

হিন্দী প্রেমীদের ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাবের জন্য সরকারী ভাষা সমস্যার সমাধান খুব সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহাদের জবরদস্তী পুনরায় সুরু হইলে যে কোন সময়েই পুনরায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হইতে পারে। তাই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ১৪টি ভাষাকেই সমান মর্যাদা প্রদান করা এবং পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষাকে বহাল রাখা।

সংক্ষিপ্তসার

সংবিধানের ভাষা সম্পর্কিত বিধানগুলি ৩৪৩ নং ধারা হইতে ৩৫৩ নং ধারায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকিবে। রাজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী ভাষা হইবে হিন্দী অথবা রাজ্যে প্রচলিত কোন ভাষা যাহা রাজ্য বিধানমণ্ডল আইনের দ্বারা স্থির করিবে। এরূপ স্থির না করা পর্যন্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে ইংরাজী সরকারী ভাষা হইবে। ইউনিয়ন ও রাজ্যের ক্ষেত্রে অথবা বিভিন্ন রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সরকারী

ভাষা হইবে ইংরাজী অথবা হিন্দী। তবে যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য স্বীকৃত হয় তাহা হইলে হিন্দী ভাষায় তাহাদের মধ্যে প্রশাসনিক কাজ চলিতে পারিবে। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের কার্যাবলী ইংরাজীতে চলিবে। তবে হাইকোর্টের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া রাজ্যপাল হিন্দী অথবা রাজ্যে প্রচলিত ভাষায় কার্যকলাপ সম্পাদন করার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু বিচারের রায়, ডিক্রী, আদেশ ও নিয়ম-কানুন ইংরাজীতেই প্রণীত হইবে। বিল, আইন, আদেশ ও নিয়মকানুন প্রসঙ্গে সংবিধানের বিধান হইল ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে—ইংরাজী ভাষায় উহা প্রণীত হইবে, তবে রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রচলিত ভাষায় ঐ কাজ সম্পাদিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার জন্য সেই বিল, আইন ইত্যাদির ইংরাজী অনুবাদ অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। ১৯৬৩ সালের ভাষা সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসের পর ইংরাজী হিন্দীর সহিত সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। সমস্ত বিল ও অর্ডিন্যান্স ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে। যে রাজ্যে হিন্দী ছাড়া অপর কোন ভাষা প্রশাসনিক কার্যের জন্য গৃহীত হইয়াছে সেই রাজ্যে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় সমস্ত আইন প্রকাশ করিতে হইবে। ভাষা সম্পর্কিত আইনের বিভিন্ন ধারা জনসাধারণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দক্ষিণ অঞ্চলের জনসাধারণ প্রবল বিরোধিতা করে। অবশেষে অহিন্দী ভাষী অঞ্চলের জনসাধারণের ইংরাজী বিতাড়নের জন্য ক্ষোভ দূর করার জন্য এবং হিন্দীভাষী অঞ্চলের জনসাধারণের হিন্দীকে পরিপূর্ণরূপে সরকারী ভাষার মর্যাদা না দেওয়ার জন্য বিরক্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট সাব-কমিটির উপর ভাষাপ্রসঙ্গটির সর্বাত্মক বিশ্লেষণভার অর্পণ করা হয়। ক্যাবিনেট সাব-কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা মুখ্যতঃ হইল ইংরাজীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইউনিয়নের সরকারী ভাষা হিসাবে চলিতে দেওয়া, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি রাজ্যে ত্রি-ভাষিক নীতিগ্রহণ করা ও উহাকে কার্যকরী করা এবং সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানে স্বীকৃত ১৪টি ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ করা। তবে হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য এক পর্যায়িত কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করা হয় যাহার ফলে ইহা অনতিবিলম্বে ভারতের মধ্যে সমস্ত রাজ্যের অন্যতম যোগাযোগকারী ভাষা হিসাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে এবং বিভিন্ন জনসাধারণের ভাব-বিনিময়ের একটি বিশিষ্ট মাধ্যম হইয়া উঠিতে পারে। অন্যান্য ভাষার উন্নতির কথাও অবশ্য উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তটির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের ভাষা আইনটি সংশোধিত করা হইয়াছে ১৯৬৭ সালে। ইহার মাধ্যমে জওহরলাল নেহেরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অহিন্দীভাষী অঞ্চলগুলিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইংরাজী ভাষাকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতিকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ভাষা সমস্যা খুবই গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই; সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এই বিষয়ের সমাধানে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Exercise

1. Discuss the main provisions of the Constitution of India relating to official language. (C. U. P I. 1965) (ভারতের সরকারী ভাষা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের প্রধান সর্তগুলি আলোচনা কর।)

2. Discuss the provisions of the Constitution of India regarding the official language of the Union and indicate the parliamentary decision on the question. (C. U. Hons. P I, 1965) (ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের সর্তগুলি আলোচনা কর এবং এই বিষয়ে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত নির্দেশ কর।

———

পরিশিষ্ট (ক)

অনুসূচিত অঞ্চল সমূহ ও অনুসূচিত জনজাতি সমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ এবং ঐ বিষয়ে সংবিধানের বিশেষ ব্যবস্থা (Administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes, and Special provisions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) ঃ

সংবিধান আসাম এবং অন্যান্য রাজ্যের অনুসূচিত অঞ্চল সমূহের এবং অনুসূচিত জনজাতিসমূহের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করিয়াছে। আসাম রাজ্যের জনজাতি অঞ্চলসমূহের প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলে (Sixth Schedule) সংযোজিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য রাজ্যের জন্য এবিষয়ে পঞ্চম তপশীল (Fifth Schedule) যথোচিত বিধান দান করিয়াছে।

অনুসূচিত জাতি বা জনজাতির জন্য কোন বিশেষ সংজ্ঞা সংবিধান নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। কোন্ কোন্ সম্প্রদায় এই পর্যায়ে পড়িবে রাষ্ট্রপতি তাহা একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্থির করেন। রাজ্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত জনজাতি যেমন একদিকে সংখ্যালঘু তেমনি অপরদিকে অর্থনৈতিক দিকে, শিক্ষায় ও অন্যান্য বহু বিষয়ে তাহারা অনগ্রসর ও দুর্বল। ইহাদের উন্নতি বিধান করিয়া অন্যান্য উন্নত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করার প্রয়োজনীয়তা গণতন্ত্রের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতের অনুসূচিতজাতি ও জনজাতির জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজিত করা হইয়াছে। সংবিধানে ইহাদের প্রশাসন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জনজাতি সমূহের প্রশাসন ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। রাজের রাজ্যপাল বার্ষিক অথবা রাষ্ট্রপতি যখনই চাহিবেন তখন, রাষ্ট্রপতির নিকট সেই রাজ্যের জনজাতি সম্পর্কে রিপোর্ট বা বিবরণ প্রদান করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারও উক্ত অঞ্চলের জনজাতিগণের প্রশাসন সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশ সেই রাজ্যকে দান করিতে পারিবে।

রাজ্যপালগণ অনুসূচিত অঞ্চল সম্পর্কিত শাসনব্যবস্থা নিজের মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী করিতে বাধ্য নহেন। এ বিষয়ে তাঁহারা তাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া কার্য করিতে পারেন ("in his discretion")। তবে সে ক্ষেত্রেও তাঁহাদের রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও অনুমোদন গ্রহণ করিয়াই কাজ করিতে হয় বলিয়া কখনই তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না।

অনুসূচিত অঞ্চল অধ্যুষিত এলাকার জন্য এবং যে সকল রাজ্যে অনুসূচিত জাতি আছে কিন্তু অনুসূচিত অঞ্চল নাই সেখানেও রাষ্ট্রপতির নির্দেশানুসারে

একটি জনজাতি মন্ত্রণা-পরিষদ (Tribes Advisory Council) গঠিত হয়। রাজ্যপালগণ এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ এই পরিষদের কাছে অনুসূচিত জনজাতিসমূহের উন্নতি ও মঙ্গলার্থে যে সকল বিষয় রাজ্যপালগণ উপস্থিত করেন সেই বিষয়ের পরামর্শ প্রদান করিতে উক্ত মন্ত্রণা-পরিষদ বাধ্য থাকে।

রাজ্যপাল রাজ্যের অনুসূচিত জাতি ও অঞ্চলের শান্তি রক্ষা ও সুশাসন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে যাইয়া এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্যের আইনসভার কোন আইন ঐ রাজ্যের অনুসূচিত অঞ্চল বা জনজাতি সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না অথবা সংশোধিত ভাবে প্রযুক্ত হইবে। তবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ কিছুটা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে—প্রথমত, রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতিরেকে এই ধরণের কোন নির্দেশ কার্যকর হইবে না, এবং দ্বিতীয়ত, এই ধরণের নিয়মকানুন প্রবর্তন করিবার সময় যেখানে জনজাতি মন্ত্রণা-পরিষদ আছে সেখানে সেই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।

যে সমস্ত রাজ্যে জনজাতি অঞ্চল ও জনজাতিসমূহ আছে সেখানে তাহাদের উন্নতিবিধানের জন্য ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে ভারতের সঞ্চিত তহবিল হইতে অনুদান (Grants-in-aid) (সংবিধানের ২৭৫নং ধারা) লাভ করার ব্যবস্থাও সংবিধানে রাখা হইয়াছে।

অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতির জন্য যে সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হইয়াছে তাহার মধ্যে আইনসভার আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে প্রথমেই বলা যায় যে লোকসভায় অনুসূচিত জনজাতি ও অনুসূচিত জাতির জন্য ইহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসনসংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছে।

আবার সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অতিরিক্ত আসনের জন্য প্রয়োজন হইলে ইহারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। বিধানসভায়ও সংবিধানের ৩৩২নং ধারা অনুযায়ী অনুসূচিত জাতির ও জনজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রথম পর্যায়ে সংবিধানে চালু হওয়ার পর দশ বৎসর পর্যন্ত বজায় ছিল, তবে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন দ্বারা ইহার মেয়াদ ২০ বৎসর পর্যন্ত বজায় রাখার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত জন-জাতির জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার ও তাহাদের দাবি বিচার বিবেচনার জন্য সংবিধানের ৩৩৫নং ধারায় সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। সংবিধানের ৩৩৮নং ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত

একজন বিশেষ কর্মচারী (Special Officer) উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন ও সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন। উক্ত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপিত করাইবেন।

অনুসূচিত জনজাতিদের কল্যাণ ও অনুসূচিত অঞ্চলের প্রশাসন সম্পর্কে রিপোর্ট দান করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা সংবিধানের ৩৩৯নং ধারায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যদিও এই কমিশনকে রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়েই নিযুক্ত করিতে পারেন তথাপি সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ১০ বৎসর পর রাষ্ট্রপতি অবশ্যই এইরূপ একটি কমিশন নিয়োগ করিবেন। ইহা ছাড়াও, শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণী সমূহের বিভিন্ন অসুবিধা ও সেই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদান করার জন্য আরও একটি কমিশন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করিতে পারেন।

বর্তমানে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই অনুসূচিত জাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর জনগণের উন্নয়নের জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন এবং বিশেষ দপ্তর আছে। সেই দপ্তরের মাধ্যমে ইহাদের সামগ্রিক কল্যাণ ও তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণীর উপযুক্ত করিয়া তোলার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

পরিশিষ্ট (খ)

ফিনান্স কমিশন (Finance Commission)

সংবিধানের ২৮০নং ধারা অনুযায়ী সংবিধান চালু হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে এবং তাহার পর প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অথবা রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করিলে আরও অল্প সময়ের মধ্যে (রাষ্ট্রপতি) একটি ফিনান্স কমিটি নিয়োগ করেন। প্রথম ফিনান্স কমিশন শ্রী কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে নিযুক্ত হয়। ইহার পর শ্রী কে শান্তনম, শ্রী এ. কে চন্দ এবং শ্রী পি. ভি. রাজা মান্নারের সভাপতিত্বে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ফিনান্স কমিশন যথাক্রমে ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৮ সালে শ্রীমহাবীর ত্যাগীর সভাপতিত্বে পঞ্চম ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হয়। সংবিধান অনুসারে কমিশন একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য লইয়া গঠিত। সকলেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

সংবিধানে ফিনান্স কমিশনের কাজ সম্বন্ধে নির্দেশ হইল, প্রথমত, এই কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগি ইত্যাদি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ প্রদান করিবে। রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজস্ব বণ্টন সম্বন্ধীয় নীতি ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের সঞ্চিত তহবিল হইতে রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য, অনুদান ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নীতিও ফিনান্স কমিশন পরীক্ষা করে ও সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ প্রদান করে।

সর্বশেষে, অর্থসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য যে কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশনের নিকট পরামর্শ চাহেন, উক্ত কমিশন সেই পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকে। (Art. 283 (3) (c) of the Constitution)।

ফিনান্স কমিশনের কোন সুপারিশ গ্রহণ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য নয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এইরূপ কমিশন অর্থবণ্টন বিষয়ে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য কতখানি রক্ষা করিতে সক্ষম সে বিষয়ে বহু লোক বহু বিরূপ মত পোষণ করেন। তবুও বহু অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত এইরূপ কমিশনের সুপারিশকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য মনে না করা হইলেও ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

পরিশিষ্ট (গ)

বিশেষ অনুশীলনী

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর সংকেত ছাত্র-ছাত্রীগণের সুবিধার জন্য দেওয়া হইল।

1. Summarise and explain the Preamble to the Constitution of India (C. U 1964)

(ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা ও ব্যাখ্যা লিখ)।

Or

Explain the ideals and objectives of the Indian Constitution as indicated in its Preamble. (C. U 1969).

(যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের সংবিধান রচিত হইয়াছে উহার প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার ব্যাখ্যা কর।)

উত্তর সংকেত :—শাসনতন্ত্র হইতেছে একটি দেশের মৌলিক আইন, সুতরাং শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় এবং ইহার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের প্রণেতাগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রের উৎস, আইনগত ও নৈতিক ভিত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবুও স্মরণ রাখা দরকার যে প্রস্তাবনা শাসনতন্ত্রের কার্যকর অংশের অন্তর্গত নয়।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধ করিয়াছে ভারতের জনগণ। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আইনগত এবং নৈতিক ভিত্তি

হইল ভারতীয় জনসাধারণ। সুতরাং জনগণ সরকারের সমালোচনা করিতে পারিলেও সংবিধানের অমর্যাদা করিতে পারে না।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র"। সংবিধানে ইহাও বলা হইয়াছে যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যক উপলব্ধি করার এবং মৈত্রী বন্ধন ও দেশের মধ্যে ঐক্যভাবকে সুদৃঢ় করার জন্য। 'সার্বভৌম' কথার অর্থ হইল ভারত সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। 'প্রজাতন্ত্র' কথাটির তাৎপর্য হইল এখানে রাজশক্তির আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। ভারত সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে যে কোন সময়েই কমনওয়েলথ্ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী ভারতের নিকট আনুগত্য পাইবেন না, তিনি শুধু কমনওয়েল্থের প্রতীক হিসাবেই বিরাজ করিবেন। সুতরাং কমনওয়েল্থের সদস্য থাকায় ভারতের সার্বভৌমত্ব কিংবা প্রজাতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই গণতন্ত্র যদিও রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র, তবুও সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র গঠনের নির্দেশ, নির্দেশাত্মক নীতি, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে স্বাধীনতা, সাম্য মৈত্রী প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সামাজিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্ভবপর করে তাহারও উল্লেখ ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় করা হইয়াছে।

(বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠা হইতে ৭৭ পৃষ্ঠারবিশদ আলোচনা দেখ)

2. It is stated that the Government of India is luasi federal. Justify this view. (C. U 1969)

(বলা হয় যে ভারত সরকারের শাসনব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। এই মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।)

Or, Is the Constitution of India unitary or federal in nature ? State your arguments fully. (C. U 1967)

[ভারতের সংবিধান প্রকৃতিতে এককেন্দ্রিক না যুক্তরাষ্ট্রীয় ? সম্পূর্ণভাবে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।]

উত্তর সংকেত :— যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় সংবিধানে পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার, ইহাদের মধ্যে সংবিধান মারফৎ ক্ষমতা বণ্টন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের শাসনতন্ত্রে দেখা যায়। তবুও সংবিধানের বিভিন্ন ধারাগুলির আলোচনা করা হইলে দেখা যাইবে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা আমাদের সংবিধানে প্রবল।

১। কেন্দ্র কেবলমাত্র ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়েই নয় যুগ্ম তালিকা,

অবশিষ্ট বিষয়ে এবং কোন কোন অবস্থায় রাজ্য তালিকা সম্পর্কেও ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। এই সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন করার এই ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী বলিয়া অভিহিত করা হয়।

২। রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক প্রধান রাজ্যপালকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ ব্যবস্থার অনুকরণ না করিয়া ভারতে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিতে পারেন।

৩ জরুরী অবস্থার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় পরিণত করিতে পারেন। (৩৫২নং ধারা)।

৪। রাজ্যপালের মাধ্যমে 'রিপোর্ট' পাইলে অথবা অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রপতির যদি প্রতীতি হয় যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে না তাহা হইলে তিনি সেই রাজ্যের শাসনব্যবস্থাও রাজ্যের আইনপ্রণয়ন বিভাগকে খারিজ করিয়া আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা কেন্দ্রের হস্তে তুলিয়া দিতে পারেন (৩৫৬নং ধারা)।

৫। কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে (২৪৯নং ধারা)।

৬। ক্ষমতা বণ্টন নীতিতেও দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রাধান্য। অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী নীতির পরিপন্থী করিয়া ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত (২৪৮নং ধারা)। যুগ্ম তালিকায়ও কেন্দ্রীয় সরকার অধিক প্রাধান্য ভোগ করে।

৭। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে চূড়ান্ত সম্মতির অন্য বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার কাছে প্রেরণ করিতে পারেন।

৮। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

৯। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রের শাসন ও আইনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। এই নির্দেশ অমান্য করা হইলে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রের অধীনে আনয়ন করিতে পারেন।

১৪। আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকার সময় (৩৬০নং ধারা) রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ও অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কিত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অকার্যকর করিতে পারেন।

১১। পার্লামেন্টের আইনের ফলে যে কোন অঙ্গরাজ্যের সীমানা পরিবর্তিত হইতে পারে।

১০। ভারতীয় অঙ্গরাজ্যগুলি ইউনিয়ন অঞ্চল অপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী।

এইসব কারণেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হইলেও "এককেন্দ্রিকতা প্রবণ শাসনতন্ত্র" বলিয়া ভারতে শাসনতন্ত্রকে অভিহিত করা হয়। অবশ্য অধ্যাপক হোয়ার এই সংবিধানকে "আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়" (Quasi-federal) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

3. Describe and comment on the legislative relationship between the Union on the one hand and the States on the other. (C. U. 1965)

(ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার সম্পর্ক বর্ণনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ কর।)

Or

How are the legislative powers divided between the Union and the State Governments ? Would you advocate any change in the existing system ? State your arguments fully. (C. U. 1967)

(ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিরূপে আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টিতহইয়াছে ? এই বণ্টন ব্যবস্থার কি কোন পরিবর্তন সুপারিশ কর ? যুক্তিসহকারে উত্তর দাও।)

সংকেত :—ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। তবে এই ক্ষমতার বণ্টনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য খুব বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টন করা হয় তিনটি তালিকার মাধ্যমে—ইউনিয়ন, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা। ৯৭টি বিষয় ইউনিয়ন তালিকায় উল্লেখ আছে যাহার উপর ইউনিয়ন সরকার আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা উপভোগ করে। রাজ্য তালিকায় যে ৬৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহার উপর কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা রাজ্য সরকারের। যুগ্ম তালিকাভুক্ত ৪৭টি বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই যুগ্মভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারে, তবে উভয়েই আইন প্রণয়ন করিলে এবং রাজ্যের আইন কেন্দ্রের আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হইলে রাজ্যের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যায়।

রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে পার্লামেণ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্যে জাতীয় স্বার্থে কোন রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণীত হওয়া

উচিৎ বলিয়া কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পার্লামেণ্ট সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিতে পারে (২৪৯ নং ধারা)।

(২) পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি বা সন্ধির সর্ত পালনের জন্য যে কোন রাজ্যের যে কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (২৫৩নং ধারা)

(৩) দুই অথবা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ করিলে পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (২৫২নং ধারা)

(৪) রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করিয়া রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন।

(৫) কোন তালিকায় উল্লেখ নাই এইরূপ বিষয় কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। (২৪৮নং ধারা)

১৯৬৭ সালের পর বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে অকংগ্রেসী দলগুলি কর্তৃক গঠিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন ব্যাপারে কেন্দ্রের চরম প্রাধান্যকে খর্ব করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রকৃত প্রতিফলন আমাদের সংবিধানে প্রয়োজন বলিয়া অনেকে তীব্র আন্দোলন করেন। এই-জন্য একদলের সোচ্চার দাবি হইল ক্ষমতা বণ্টন নীতির সংশোধন করা এমন-ভাবে যাহাতে এককেন্দ্রিক প্রবণতার পরিবর্তে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রূপ আমাদের সংবিধান পরিগ্রহ করে।

এইরূপ দাবির যৌক্তিকতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য মনে হয় ক্ষমতার বণ্টন নীতির কিছুটা সংস্কার আশু কর্তব্য। প্রথমত, অবশিষ্ট ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকে হ্রাস করিয়া রাজ্যের উপর এই ক্ষমতা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকরণে অর্পণ করা বিধেয়। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকার উপর আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে ক্ষমতার বণ্টন নীতির পরিবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পার্লামেণ্টের মাধ্যমে রাজ্য তালিকার উপর আইন প্রণয়ন করিবার যে ধারা সংবিধানে আছে তাহার অযথা অপপ্রয়োগ আশু বন্ধ করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করা এখনই দরকার। তৃতীয়ত, যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়কে রাজ্য তালিকায় এমনভাবে স্থানান্তরিত করা দরকার যেন রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রাধান্য হ্রাস পায়।

4. Discuss the administrative relationship between the Union Government on the one hand and the State Governments on the other. [C. U. B. A. 1965, 1966, 1968]

(কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্কের একটি বিবরণী দাও।)

উত্তর সংকেত ঃ

কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করার অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে, সেই বিষয়ে ইহা শাসনক্ষমতাও পরিচালনা করে। রাজ্যসরকারের শাসনক্ষমতাও রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। যুগ্ম বিষয়ে যে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা পরিচালনা না করিবে সেই পর্যন্ত রাজ্যসরকারগুলি শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্যগুলি সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ, এবং এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে কতিপয় ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। রাজ্যসরকারগুলিকে শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা এরূপে পরিচালিত করিতে হয় যেন উহা পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

জাতীয় স্বার্থ অথবা দেশ রক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে এই-রূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজ্যের ভিতর রেলপথের সংরক্ষণের জন্য, আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তির সর্ত পালনের ক্ষেত্রে, জরুরী অবস্থা থাকা-কালীন, প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ রাজ্যগুলিকে মানিতে হয়।

চতুর্থ নির্বাচনের পর ও সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী নির্বাচনোত্তর সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক লইয়া বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, কেননা প্রায় অর্ধেক রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রবর্তিত হওয়ার ফলে কেন্দ্রের কংগ্রেস দল কর্তৃক পরিচালিত সরকারের সমস্ত নির্দেশ বা আদেশকে খোলা মনে সমস্ত রাজ্যই গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সেইজন্য সংবিধানের ২৬৩নং ধারাকে অনুসরণ করিয়া আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলের (Inter-State Council) গঠনের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করানোর দাবি আজ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। (বইয়ের ১২৭ হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

5. Give an account of the financial arrangements between the Union on the one hand and the States on the other hand under the Constitution of India,

(ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিভাবে রাজস্ব সংক্রান্ত সম্বন্ধ নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর)।

উত্তর সংকেত ঃ

ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে কর স্থাপন সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করে, রাজ্য তালিকার বিষয়ে অনুরূপ-ভাবে রাজ্যগুলির প্রাধান্য দেখা যায়, এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে যে সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে সেই সরকার সবক্ষেত্রে উক্ত রাজস্ব ভোগ করে না কিংবা কোন কোন

ক্ষেত্রে যে সরকার রাজস্ব ভোগ করে সেই সরকার উহা আদায় করে না। কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগির ব্যবস্থাও আছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারই গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বসূত্রগুলি লাভ করিয়াছে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজ্যের করস্থাপনের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে। অনুদান (Grants-in-aid) ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে। ঋণগ্রহণ করিতে হইলেও রাজ্য-সরকার গুলিকে কতিপয় বাধানিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রাজ্যগুলিকে অর্থের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেই হয়।

(বইয়ের ১৩৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)

6. Explain fully the composition, powers and functions of the Legislative Council of West Bengal.

(C. U. B. A 1969)

(পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।)

উত্তর সংকেতঃ—কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের আকার উক্ত রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এইরূপ পরিষদকে রাজ্যের আইন- সভার উচ্চকক্ষ বলে। ইহার সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম এবং বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইতে পারে না। (সংবিধানের ১৭১নং ধারা)।

পশ্চিম বাংলায় ও বিধানসভা ও বিধান পরিষদ দুইটি কক্ষ আছে। এই বিধান পরিষদের সদস্যগণ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক একক হস্তান্তর যোগ্য সমানুপাতিক ভোট দ্বারা, প্রায় এক দ্বাদশাংশ রাজ্যের স্নাতককেন্দ্র হইতে গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক, আরও প্রায় এক-দ্বাদশাংশ ন্যূনপক্ষে তিন বৎসরকাল রাজ্যের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক ও প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যবৃন্দের দ্বারা নির্বাচিত হন। বাকী অংশ রাজ্যপাল বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিবৃন্দ হইতে মনোনয়ন করেন।

অন্যান্য রাজ্যের বিধান পরিষদের ন্যায় পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের সভ্য হইতে হইলেও যে কোন সদস্যকে ভারতীয় নাগরিক, ৩০ বৎসর বয়স্ক ও রাজ্যের বিধানসভার ভোটার হইতে হয়। তিনি অপ্রকৃতিস্থ বা নির্বাচনে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অথবা ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকারের অধীন কোন লাভজনক পদে আসীন থাকিলে সদস্যপদের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন না।

এইরূপ বিধান পরিষদ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, তবে সংবিধানের ১৭২ (২) নং

ধারা অনুযায়ী প্রতি দুই বৎসরে ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যার মধ্যে ২৭ জন বিধান-সভা, ২৭ জন স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা, ৬ জন শিক্ষকগণ দ্বারা ও আরও ৬ জন গ্রাজুয়েটগণ কর্তৃক নির্বাচিত। রাজ্যপাল ৯ জনকে মনোনীত করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন।

১৯৬৯ সালে পশ্চিম বাংলায় মধ্যবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে বিধান পরিষদ লোপ করার একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় প্রায় সমস্ত দলের সদস্যই বিধান পরিষদের প্রয়োজনীয়তা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তাহা জোরের সহিত ঘোষণা করিয়া অনাবশ্যক ব্যয়-বহুল এই পরিষদের বিলুপ্তির দাবি করেন। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই প্রস্তাব সংসদে সম্প্রতি প্রেরিত হইয়াছে। সংসদের সরকারীদল আইনের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার বিধানসভার মারফৎ দেওয়া জনগণের ইচ্ছাকে রূপায়িত করিতে বিলম্ব করিবেন না বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করা যায় সংসদের আগামী অধিবেশনেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের দীর্ঘ বিশবছরের জীবনের উপর যবনিকা-পাত ঘটিবে।

পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদ বিধানসভার ক্ষমতার তুলনায় অতি নগন্য ক্ষমতা ভোগ করে। অন্যান্য রাজ্যের বিধান পরিষদও একইরূপ ক্ষমতা উপভোগ করে। আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে রাজ্য বিধান পরিষদ ও বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিলেই তাহা আইনে পরিণত হয়। অর্থবিল বিধান পরিষদে উত্থাপন করা যায় না। যে কোন বিলেই বিধান পরিষদ 'ভেটো' দিলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে অনুমোদন করাইতে বিধানসভার কষ্ট হয় না।

শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করাও আইন সভার কাজ। এই ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা বিধানসভা গ্রহণ করে। কেননা মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব। মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব বিধানসভায় অনুমোদিত হইলে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। বিধান পরিষদ মন্ত্রি-মণ্ডলীকে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা বা নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেও তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারে না। কারণ পরিষদের অনাস্থা মন্ত্রিমণ্ডলীকে স্পর্শ করে না।

চতুর্থ নির্বাচনের পর যখন পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পদচ্যুত করা হয় ও তাহার পর যখন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করা হয় তখন

রাজ্যবিধান পরিষদ বিলুপ্ত না হইলেও বিধানসভা না থাকায় উহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকরী হইয়া থাকে। তখন কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট রাজ্যের আইন প্রণয়নভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল।

আইন প্রণয়ন, অর্থ বিল প্রণয়ন, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই বিধানপরিষদ যে অত্যন্ত গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ তাহা তাহাদের কার্য ও ক্ষমতা হইতেই সম্যক বুঝান যায়। সুতরাং শুধু পশ্চিম বাংলায় নহে অন্যান্য রাজ্যেও এই পরিষদের স্থায়িত্ব আর কতকাল সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়।

(বইয়ের ২৮৬ হইতে ২৯১ পৃষ্ঠাও দেখ)

7. "The President of India is a constitutional symbol without any substance of power." Examine. (C.U. 1965)

সংকেত : ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে বিশেষতঃ, জরুরী অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি যত ক্ষমতা ভোগ করেন, পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রধান শাসক এত ক্ষমতা ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্র প্রদত্ত ক্ষমতার পর্যালোচনার পর স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, ভারতের রাষ্ট্রপতি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন কি না, অথবা তিনি নিছক নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের মতে ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্বদাই মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া চলিবেন এবং একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কাজ করিবেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় শ্রীজওহরলাল নেহেরুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "We have not given our President any real powers, but we have made his position one of the great authority and dignity."

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবেন। কারণ, আইনতঃ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য নহেন। তবে শাসনতন্ত্রের ৫৩ নম্বর ধারায় ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কাজ করিতে নীতিগতভাবে বাধ্য। অবশ্য কাহারও কাহারও মতে রাষ্ট্রপতি দেশের একমাত্র শাসকে পরিণত হইতে পারেন না এবং শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসক, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়, রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আহ্বান জানাইতে হইবে। অথচ যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মানিয়া চলেন, তবে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে আর একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতেই হইবে। কিন্তু, পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন, তবে বুঝিতে হইবে, প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। রাষ্ট্রপতি বড়

জোর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রীর দল যদি পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে, তবে বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার দলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে, এবং রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইবার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। সেই অভিযোগে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত (Impeachee) করিতে পারে (৬১ নং ধারা)। শাসনবিভাগের প্রকৃত প্রধান হইতেছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভা। অতএব, দেখা যাইতেছে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। সাংবিধানিক অনুশাসন অপেক্ষা প্রথাগত অনুশাসনের প্রভাবই বৃটিশ রাজের ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান বলাই শ্রেয়।

কেন্দ্রে সরকারী দল হিসাবে কংগ্রেসের পূর্বেকার বিপুল সংখ্যাধিক্য বর্তমানে নাই; আবার রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও অনেক রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী দলের প্রাধান্য নাই। সুতরাং আগামী নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোন একটি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভবপর না হইলে রাষ্ট্রপতিকে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে, হয়ত প্রথাগত বিধানই স্থির করিবে রাষ্ট্রপতির সেই ভূমিকা কিরূপ হইবে।

8. Distinguish between the position of the President and that of the (a) Prime Minister of India and (b) Governor of an Indian State.

সংকেত :

(a) রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন বিভাগেরও নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শাসনবিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান না হইলেও সরকারের প্রকৃত প্রধান। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ করেন না, কেন না, সরকারের সব কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয় মন্ত্রিসভাকে, এবং মন্ত্রিসভার সমস্ত দায়িত্বের বোঝা প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর উপরই পড়ে। রাষ্ট্রপতি সমগ্র রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শুধু শাসন-বিভাগের প্রকৃত পরিচালক। তবে জরুরী অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজে সরকারের ক্রিয়াকলাপে কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং ঐ সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র লংঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগ ব্যতীত তাঁহাকে অপসারণ করা যায় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কার্যে বহাল থাকেন ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যগণের আস্থাভাজন থাকেন। আবার প্রধানমন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা রাষ্ট্রপতির বেশী হইলেও শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বেশী এবং শাসনবিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রীই।

(b) রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত রাজ্যের শাসনবিভাগের কর্তৃত্ব রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত।

রাষ্ট্রপতি ভারতীয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং পদাধিকারবলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন প্রভৃতি করিতে পারেন। এই ধরণের ক্ষমতা রাজ্যপালের নাই। যুগ্ম বিষয়ক আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীর দণ্ড রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত যুগ্মভাবে মকুব করিতে অথবা কমাইতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ক্ষমা করিতে পারেন। দণ্ড হ্রাস করিয়া অন্য দণ্ড দান করিবার ক্ষমতা উভয়েরই আছি।

রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত বিল রাজ্যপাল যদি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি এইরূপ বিলে সম্মতি প্রদান না করেন তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এই ক্ষমতা রাজ্যপাল ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির হস্তে জরুরী অবস্থায় এই ধরণের ঘোষণার মাধ্যমে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, এই ক্ষমতা রাজ্যপালগণের নাই।

রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রাজ্যপালগণকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, অথচ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক। শুধু রাজ্যপালের নিয়োগ নয়, তাঁহাদের পদচ্যুতও করিতে পারেন রাষ্ট্রপতি। হাইকোর্টের জজসমেত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিয়োগের ও পদচ্যুতির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত, অথচ রাজ্যপালগণকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই।

রাজ্যপালগণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুসারে কতিপয় কার্য সম্পাদনে সক্ষম, অথচ রাষ্ট্রপতিকে এইরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় কাজ করিবার গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংবিধান প্রদান করেন নাই।

9. "Behind formal Parliamentary democracy, the Union cabinet functions in reality as a dictator." Discuss.

সংকেত :

ভারতীয় কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন যে সংসদীয় গণতন্ত্রের পশ্চাতে ভারতবর্ষে ক্যাবিনেটের একনায়কতন্ত্র পরিলক্ষিত হয় এবং তুলনামূলকভাবে পার্লামেন্টের ক্ষমতা ক্যাবিনেট অপেক্ষা অনেক কম। তাঁহারা আরও বলেন যে শুধুমাত্র ক্যাবিনেটের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে স্বীকৃতি প্রদানের সংস্থা হিসাবেই পার্লামেন্টকে

বিবেচনা করিতে হয়। মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব থাকিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য এবং দলীয় নিয়মানুবর্তিতা থাকায় পার্লামেন্টের আলাপ-আলোচনা-সমালোচনা মন্ত্রিসভাকে বিশেষ স্পর্শ করে না এবং সেইহেতু মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টকে খুব বেশী ভয় করিয়াও চলে না।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের ন্যায় সদাজাগ্রত সংবাদপত্র ও নির্বাচকমণ্ডলী এবং সুগঠিত ও সুদৃঢ় বিরোধীদল নাই। আর সেইজন্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনকারী কংগ্রেসদল স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের মধ্য দিয়া কিছু কিছু রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারের গঠনের মধ্য দিয়া জনগণ তাহাদের মতকে অনেক বেশী জাগ্রত প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং সরকারপক্ষকে জনমতের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে বাধ্য করিতেছে। তবে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুণ এখনও যে দায়িত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা অনস্বীকার্য।

ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের দুর্বলতা দৃষ্ট হইলে ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভা পুরোপুরি শক্তিহীন এবং ভারতে মন্ত্রিসভার এক নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই অভিযোগ মানিয়া লওয়া হওয়া হয় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে বিরোধীদলগুলির ভূমিকা এবং দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি নির্বাচকমণ্ডলীর সচেতনতাও যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। উপরন্তু আইনসভায় কমিটি ব্যবস্থার উৎপত্তি হওয়ায় বিরোধী-দলগুলি বিভিন্ন কমিটির সাহায্যে সরকারের কার্যের গঠনমূলক সমালোচনার মধ্য দিয়া সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং ইহা মন্ত্রিসভাকে নায়কতন্ত্রে পরিণত হইতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ইহা ব্যতীত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে দলীয় সভ্যদের সমালোচনাও সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিরয়াছে। মন্ত্রিসভা পক্ষে যে আইনসভায় সমালোচনা এবং জনমতকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় তাহার জলন্ত প্রমাণ স্বরূপ কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রীর পদত্যাগের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে মন্ত্রিসভার নায়ক-তন্ত্রের অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা যায় না। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে এবং মন্ত্রিসভার একনায়কতন্ত্রের গতি রুদ্ধ করিতে হইলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও অনেক বেশী পরিমাণে সংহত ও সুদৃঢ় হইতে হইবে এবং সদাজাগ্রত জনমতের সৃষ্টি করিতে হইবে। অন্যথায় মন্ত্রিসভার একনায়কতন্ত্রের দোষে দুষ্ট হওয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অস্বাভাবিক হইবে না।

10. Examine the case for and against the grant of uni-

versal adult franchise in India and state your own view. (C. U. B. A. 1969)

(ভারতে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া তোমার মতামত দাও)

উত্তর সংকেতঃ—সর্বজনীন ভোটাধিকার ভারতের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কিনা অথবা সমস্ত জনগণকে ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত কিনা এই সম্পর্কে বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তির পক্ষে ও বিপক্ষে দেওয়া তত্ত্বগত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনগণের উত্তরোত্তর মঙ্গলে ব্রতী। সুতরাং জনগণের জন্য করা কাজ জনগণের মাধ্যমেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য সার্বিক ভোটাধিকার নীতি ভারতের ক্ষেত্রে গৃহীত হওয়া উচিত মনে হয়।

কেহ কেহ বলেন সম্পত্তি, করপ্রদান ও শিক্ষার ভিত্তিতে জনগণকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই নীতি নাগরিকদেরমধ্যে বৈষম্য বাড়াইয়া তুলিবে ও ফলে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে। বহু দরিদ্র অথবা তথাকথিত শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হন নাই এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা রাজনৈতিক জ্ঞানদ্বারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং যাহাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা সত্যই অনুকরণীয়। এই সমস্ত ব্যক্তিকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইলে রাষ্ট্র বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সন্দেহ নাই। ভারতীয় রাজনীতিতে এইরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব যে সম্ভবপর হইয়াছে সার্বিক ভোটাধিকারের ফলে তাহা নিঃসন্দেহে ভারতের গণতন্ত্র বিকাশের পথ সুগম করিয়াছে।

সাম্যের যুক্তিতেও মানুষে মানুষে তারতম্য করা উচিত নয়। একশ্রেণীর লোককে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইলে সেই শ্রেণীর স্বার্থ যে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহাদের ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে তাহারা অবশ্যই সরকারের কাজে অংশগ্রহণ করা হইতে বাদ পড়িবেন এবং কখনই সরকার খোলা মন লইয়া তাহাদের সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজিবেন না। লাস্কি এই প্রসঙ্গে বলেন, "Exclusion from power means exclusion from the benefits of power." জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার Representative Government গ্রন্থে এই যুক্তি জোরদার করিয়া বলেন যে শাসক গোষ্ঠী সেই সমস্ত জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে বাধ্য যাহারা ভোটের অধিকারী, কিন্তু যাহাদের ভোট নাই—সেই সম্প্রদায়ের মঙ্গল করা বা না করা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শাসকবর্গের ইচ্ছার উপর। যে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতের উপর কর্তৃত্বকারী ইংরাজ সরকারকে বিতাড়ণ করা সম্ভবপর হইয়াছিল,

যে জনগণের নৈতিক সমর্থনের জোরে বিপুল ক্ষমতার আসীন ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেই জনগণের মধ্যে সাম্যনীতি বহির্ভূত কাজ করিয়া জনগণকে রাষ্ট্রনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ করা হইতে কিরূপে বিরত রাখিতে পারে? সেইজন্যই ভারতে সার্বিক ভোটাধিকার নীতি স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সার্বিক ভোটাধিকার দান করার স্বপক্ষে বলা হয় যে যাহা সকলকে স্পর্শ করে তাহা সকলের দ্বারা নির্বাচিত হওয়াই উচিত ("What touches all should be decided by all")। ভারতের সমস্ত জনগণের রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের ভিত্তিতেই প্রত্যেককে শাসক নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

এই কথাও বলা হয় যে সকলকে ভোটাধিকার দান করার ফলে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নীতির দিক হইতে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে ভোটাধিকারের ফলে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়, নাগরিক চেতনা বাড়ে ও ফলে গণতন্ত্র সার্থক হইয়া উঠে। ভারত সম্বন্ধে অনেকে অবশ্য একথাও বলিয়া থাকেন যে ভারতের অধিকাংশ নাগরিকই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। সুতরাং সেক্ষেত্রে তাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম থাকাই সম্ভব। সুতরাং ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকারনীতি গ্রহণের বিপক্ষে বলা হয় যে রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে যাহারা সক্ষম নয় তাহাদের ভোট প্রদান করিবার অধিকারী করা উচিত নয়। আবার বলা হয় যে ভারতীয় জনসাধারণ যোগ্য প্রার্থী নির্বচনে কতটা বিবেচনা শক্তি প্রদর্শন করিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

ভারতে এই সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করা হউক না কেন গত ৪টি নির্বাচন যে সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা যে এই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কৌতুহলী করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হইলেও ভারতীয় জনগণ এই ব্যাপারে যে সচেতনতা প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে তাহা সত্যই অভূতপূর্ব।

গত চারটি নির্বাচনেই জনগণের সচেতনতার প্রকাশ কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। কোন একটি দল জনগণের আশা আকাংখাকে মূর্ত করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা জনগণকে নির্বাচনের পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই দল সরকার গঠন করার পর কাজ করিতে অপারগ হইলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাহাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়া আপনাদের রাজনৈতিক জ্ঞান প্রকাশিত

করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচনে আসন লাভের ব্যাপারে কংগ্রেস দল যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, চতুর্থ নির্বাচন কিংবা তাহার পর অনুষ্ঠিত কোন কোন রাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর। তাহাদের সেই সাফল্য সমস্ত রাজ্যগুলিতে কিংবা কেন্দ্রেও সেই অনুপাতে তাহারা বজায় রাখিতে পারে নাই। বহু রাজ্যেই তৃতীয় ও চতুর্থ নির্বচনের পর এই দল ক্ষমতা-চ্যুত হয়; ঠিক তেমনি অন্যান্য বিভিন্ন দলের ব্যর্থতাও পরিস্ফুট হয় তাহাদের নির্বাচনের কম আসন লাভ করার মধ্যে। অর্থাৎ জনগণ ভোটের অধিকার এই সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তবে সার্বিক ভোটাধিকার নীতি যে ভারতে ত্রুটিহীন তাহাও নহে। একথা অনস্বীকার্য যে, যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান জনগণের এই রাজনৈতিক চেতনা বাড়ায় সেই শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা জনগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে হয়ত পৃথিবীর সফলতম সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারত একদিন আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই দায়িত্ব নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের।

11. Indicate the importance of the Council of States in the Constitution of India and point out its composition and. functions. (রাজ্য সভার গঠন, কার্য ও প্রয়োজনীয়তা)

(C. U. B. A 1962, 1965, 1966.)

উত্তর সংকেত :—

পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা। ইহার সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন তাঁহাদের ২৩৮ জন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি ও ১২ জন রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তি। ইহা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

নিম্নকক্ষ লোকসভার স্বৈরাচার প্রতিহতকারী সভা হিসাবে রাজ্যসভার গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় দ্রুত বিবেচনাহীন আইন নিম্নকক্ষ অনুমোদন করিতে পারে। উচ্চকক্ষ এই ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিয়া জনগণের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

রাজ্যসভা অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া থাকে :

যখন জরুরী অবস্থায় লোকসভা ভাঙ্গিয়া যায় অথবা সাধারণভাবেই নির্বাচনের সময় লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় তখন রাজ্যসভার গুরুত্ব বাড়িয়া যায়, কেননা এই কক্ষ স্থায়ী এবং ইহার বিলোপ করা যায় না।

সংবিধানের ২৪৯নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা লাভ করে।

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের পক্ষে প্রযোজ্য সর্বভারতীয় চাকুরীর ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের সার্ভিস গঠনের কাজ (All India Services) সংবিধানের ৩১২নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য সভার প্রস্তাবানুসারে পার্লামেণ্ট করিতে পারে।

রাষ্ট্রপতি, বিচারকবৃন্দ, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল প্রভৃতি কর্তৃপক্ষকে পদচ্যুত করিতে হইলে লোকসভার সহিত রাজ্যসভার সদস্যগণের ও সম্মতি প্রয়োজন। সুতরাং রাজ্যসভার অবস্থিতি অনেকের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অর্থ বিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে, শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে রাজ্যসভা লোকসভার সহিত প্রায় সমান ক্ষমতাই উপভোগ করে।

বহু গুণী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির সেবা যে ভারত পাইয়াছে তাহা কিছু পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে তাহাদের রাজ্যসভায় মনোনয়ন করার ফলেই।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ক্ষমতা অত্যন্ত নগন্য দেখা যায়। তবুও ইহা ইংলণ্ডের উচ্চকক্ষ লর্ড সভার ন্যায় ক্ষমতাহীন নয়; অবশ্য ইহা আমেরিকার আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের ন্যায়ও ক্ষমতাশালী দ্বিতীয় কক্ষ নয়।

(বইয়ের ১৯৮-৯৯, ২০৩-২০৯ পৃষ্ঠা দেখ)

12. Discuss the constitutional relationship between the Governor of a State and his Council of Ministers. Can the Governor act independently of the Ministers. If so, how & when? (C. U. B. A 1968)

(রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভার শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক আলোচনা কর। রাজ্যপাল কি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই কাজ করিতে পারেন? যদি পারেন, কিভাবে এবং কখন পারেন?)

উত্তর সংকেত :—

রাজ্যপালকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই রাজ্যপাল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান করেন, বজায় রাখেন ও ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তবে রাজ্যপাল যে সর্বদাই নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন তাহা নহে, অনেক সময় রাজ্যপাল অবস্থাবিশেষে সংবিধানে বর্ণিত না থাকিলেও কিছু ক্ষমতা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ন্যায় পরিচালনা করিয়া থাকেন।

কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট পাঠাইতে পারেন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দেওয়া এইরূপ রিপোর্ট কখনই মন্ত্রিসভার জ্ঞাতসারে করা হয় না। বহু রাজ্যপাল এইরূপ রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন।

আবার রাজ্য বিধানসভায় কোনদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলে রাজ্যপালের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রশ্ন ওঠে।

রাজ্যের কোন বিল রাজ্য আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও মন্ত্রিপরিষদকে পরামর্শ করিতে রাজ্যপাল বাধ্য নহেন।

রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত ও রাষ্ট্রপতির অভিরুচি অনুযায়ী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাই বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপালগণ বিভিন্ন রাজ্যে বিরাজ করেন। বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিয়া ও মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যপালগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। সাধারণতঃ, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সরকারীদল একই থাকাকালে এই সমস্যার উদ্ভব হয় নাই; কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের পর বিভিন্ন দল কর্তৃক গঠিত কতিপয় রাজ্যের সরকারীদল কেন্দ্রের সরকারী দলের বিপরীত হওয়ায় রাজ্যপালগণের পক্ষে রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া কাজ করিতে অসুবিধাজনক হয় নাই। তবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি মারফৎ গঠিত মন্ত্রিসভাকে উপেক্ষা করা যে রাজ্যপালগণের পক্ষে বিপজ্জনক তাহা পশ্চিমবাংলার জনমতই সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছে; সেখানকার রাজ্যপালকে কেন্দ্রীয় সরকার ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে; প্রচণ্ড জনমতের চাপে তাহাদিগকে নতি স্বীকার করিতেই হইয়াছে।

তবুও মন্ত্রিপরিষদের সহিত সম্পর্কে বিশ্লেষণের পর বলা যায় যে রাজ্যপালগণ একেবারে নামেমাত্র প্রধান হিসাবে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় বিরাজ করেন না। মন্ত্রিসভাকে উপদেশ দান করিয়া, সতর্ক করিয়া দিয়া ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় কার্য পরিচালনা করিয়া তাঁহারা যে নামেমাত্র প্রধান নন তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

(বইয়ের ২৬২-২৭৫ পৃষ্ঠা দেখ)

13. "Party System in India has not been of much help in the proper working of Parliamentary democracy". Discuss.
('ভারতের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পক্ষে দলীয় ব্যবস্থা বিশেষ সহায়ক হয় নাই'। আলোচনা কর।)

উত্তর সংকেত :—

ভারতে বহু দলীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়, অথচ পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উপর। বহু দলের অবস্থিতির ফলে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রথম সর্তটি অকার্যকরী হইয়াছে। অবশ্য দলগুলি বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে একত্রে ফ্রণ্টের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া প্রভাবশালী অন্যদলের বিরুদ্ধে জনগণকে নেতৃত্ব দান করিবার

জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ফলে বহুদল ব্যবস্থা বর্তমান থাকিলেও ভারতে কার্যতঃ দ্বিদলীয় ও কখনও কখনও দলীয় ব্যবস্থার একটা ত্রিমুখী ভাব প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে।

সরকার ও বিরোধীদলগুলির মধ্যে প্রকৃত বোঝাপড়ার অভাবও ভারতীয় পার্লামেণ্টারী সরকারের সাফল্যকে ব্যাহত করিয়াছে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক দল বিরোধীদল হিসাবে কাজ করিতে অনিচ্ছুক। অথচ গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে একটি বলিষ্ঠ বিরোধীদলের অবস্থিতির ফলে।

সবশেষে বলা যায় যে, ভারতের দলীয় ব্যবস্থার নমনীয়তাই ভারতের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সাফল্যের এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। দলত্যাগ প্রথা (defection) আজ বহু রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটাইয়াছে। অবশ্য এই বিষয়ে উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত সরকার ইতিমধ্যেই তৎপর হইয়াছেন। আইনসভার সদস্যগণ যদি অনবরত দলত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে বহুদল ব্যবস্থায় স্থায়ী সরকার গঠন করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে ইহা দুর্বল করে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্য অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হইবার পর এবং একমাত্র তামিলনাড়ু ছাড়া সেই রাজ্যগুলিতে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় বিধান সভার সদস্যদের মধ্যে দলত্যাগের প্রবণতা বাড়িয়া যায় এবং ইহার ফলেই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৪০১-০৬ পৃষ্ঠা দেখ)

Calcutta University Questions

1965

Part 1

Second Paper

1. "Indian Constitution is federal in form but unitary in suhstance". Discuss.

2. Indicate the importance of the Council of States in the Constitution of India and point out its composition and functions.

3. Examine : "The President is a constitutional symbol without any substance of power".

4. Discuss the Directive Principles of State Policy under the Constitution of India.

5. Explain the provisions of the Constitution of India regarding the Official Language of the Union.

6. Describe and comment on the legislative relationship between the Union on the one hand and the States on the other.

7. Give an account of the system of Local Government in the rural areas of West Bengal.

8. Write notes on the following :—

(*a*) The Speaker of the House of the People (Loka Sabha) ; (*b*) The Attorney General of India.

9, Discuss the procedure of passing Money Bills in the State Legislatures of India.

10. "The Chief Minister is the real ruler of an Indian State". Examine.

B. A. Part II 1965

1. Discuss the administrative relationship between the Union Government on the one hand and the State Governments on the other.

2. Discuss the salient features of the Directive Principles of State Policy.

3. Explain fully how the Parliament exercises financial control over the Union Government.

4. "Legislative Councils in Indian States should be abolished." Discuss. State your reasons fully.

5, Discuss briefly the aims and objects of any two of the political parties in India.

6. The Chief Minister of a State is its real ruler."

Discuss the statement with reference to the provisions of the Constitution of India in this behalf.

7. Discuss the functions and importance of the High Courts. How are the judges of High Courts appointed ?

৪. Explain the procedure of amendment of the Constitution of India. Is the constitution rigid or flexible ? State your reasons fully.

9. Explain fully the procedure of ordinary (other than financial) legislation in Indian States.

10. Explain the composition and functions of the Council of the Corporation of Calcutta under the Calcutta Municipal Act, 1951.

1966

Revised Regulation

Second Paper

1. Discuss the provisions of the Constitution of India regarding citizenship.

2. Explain fully the right to freedon of religions under the Constitution of India.

3. State and comment on the administrative relationship between the Union and the States of India.

4, Discuss the powers exercisable by the President in emergencies.

5. Explain clearly the constitutional relatioaship between the Council of States (*Rajya Sabha*) and the House of the People (*Loka Sabha*).

6. Indicate fully the procedure of passing Money Bills in the Indian Parliament.

7. Discuss the position and functions of the Prime Minister of India.

2. Describe the composition and function of the Supreme Court, and indicate its importance in the constitutional system of India.

9. Explain briefly the constitution and functions of the Muincipal Corporation of Calcutta.

10. Write notes on *any two* of the following ;—

(*a*) Scheduled Tribes; (*b*) Appropriation Bill ; (*c*) Supplementary Grant ; (*d*) Publie Service Commission.

1967

Revised Regulation

Second Paper

1. Discuss the Right to Property as guaranteed by the Constition of India.

2. State and criticise the division of powers between the Union and the States.

3. Discuss the nature of financial control exercised by Parliament over the finance of the Union.

4. "The President is a mere symbol of the executive authority. He does not govern". Discuss

5. Discuss the constitutional relationship (*a*) between the the President of India and the Governor of a State, and (*b*) between the Governor and the Chief Minister.

6. Give a brief account of the system of rural self-government in West Bengal.

J. Write a short note on the privileges and immunities of the State Legislature and their members.

8. Give an account of the Party system in India.

9. Indicate the nature of franchise in India. Do you think that the existing system is suitable to Indian conditions ?

10. Write notes on *any two* of the following :—

(*a*) Comptroller and Auditor-General of India. (*b*) Joint sitting of both Houses of Parliament. (*c*) Consolidated Fund. (*d*) Scheduled Castes.

1968

1. Point out the distinguishing features of the Indian Federation.

2. Discuss the nature of the administrative relations between the Union and the States in India.

3. How far is it true to say that the Indian Constitution combines flexibility with rigidity ?

4. Discuss the constitutional relationship between the Governor of a State and his Council of Ministers. Can the Governor act independently of the Ministers ? If so, how & when ?

5. Indicate the circumstances under which there can be 'Presidential Rule' in the States of India. Is it subject to any restrictions ?

6. Discuss the constitutional position of the Supreme Court of India.

7. What is a Money Bill ? Carefully describe the procedure in introducing and passing a Money Bill in the Union Parliament.

8. Discuss the case for and against the establishment of second chambers in the States of India.

9. How does a Municipalty in West Bengal raise its revenue ? How is it spent ?

10. Write Short Notes on *any two* of the follawing :

(*a*) The Union Public Service Commission.

(*b*) The Finance Act (of the Union Parliament).

(c) The Zilla Parishad.

(*d*) Union Territories.

1969

1. Explain the ideals and objectives of the Indian Constitution as indicated in its preamble.

যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের সংবিধান রচিত হইয়াছে, উহার (সংবিধানের) প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার ব্যাখ্যা কর।

2. It is stated that the Government of India is quasi-federal. Justify this view.

বলা হয় যে ভারত সরকারের শাসনব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। এই মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

3. Critically discuss the Indian Party System.

ভারতের সংবিধানে যে সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া তোমার মন্তব্য লিখ।

5. Describe the relations between the Council of Ministers (in the Union Government) and the Indian Parliament.

ভারতীয় সংসদের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।

6. Explain how the Union Parliament exercises control over finance.

কেন্দ্রীয় সংসদ কি প্রণালীতে সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।

7. Give a short account of the judicial system of West Bengal.

Or

Fully explain the composition, powers and functions of the Legislative Council of West Bengal.

পশ্চিমবঙ্গের বিচার-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

অথবা

পশ্চিমবঙ্গের বিধানপরিষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্য সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।

8. Examine the case for and against the grant of universal adult franchise in India and state your own view.

ভারতে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া তোমার মতামত দাও।

9. Describe the composition and functions of the Calcutta Corporation.

কলিকাতার পৌরসংস্থান গঠন ও কার্য্যাবলী বর্ণনা কর।

10. Write short notes on *any two* of the following subjects :

(*a*) The Vice-President of India.
(*b*) The Indian Citizenship Act, 1955.
(*c*) Scheduled Castes.
(*d*) The official language of India.
(*e*) The re-organization of States in India, 1956.

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনো দুইটি বিষয়ের উপর সংক্ষেপে মন্তব্য কর ঃ

(ক) ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি।
(খ) ভারতীয় নাগরিকতা আইন, ১৯৫৫।
(গ) তপশীলভুক্ত জাতিসমূহ।
(ঘ) ভারতের সরকারী ভাষা।
(ঙ) ভারতীয় রাজ্যসমূহের পুনর্বিন্যাস, ১৯৫৬।